

সাম্রাজ্যের গ্রাস

মাইকেল শইয়ার

INKLIGHT

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সাম্রাজ্যের ত্রাস

মাইকেল শইয়ার

ভাষান্তর

ইরফান সাদিক ও নাঈমুর রহমান

সম্পাদনা ও টীকা

তানভীর আহমাদ

INKLIGHT

সাম্রাজ্যের ত্রাস

প্রথম সংস্করণ : জুন, ২০২১
অফিসিয়াল পিডিএফ : জুন, ২০২৫
ISBN: 978-984-0309-64-2

মূল : মাইকেল শইয়ার

ভাষান্তর : ইরফান সাদিক ও নাঈমুর রহমান
সম্পাদনা ও টিকা : তানভীর আহমাদ

প্রকাশক : ইঙ্কলাইট

Samrajjer Traas based on the book ‘Osama Bin Laden’ by Michael Scheuer,
published by INKLIGHT, Dhaka Bangladesh. Official PDF, June 2025.

উৎসর্গ

রব্বের পথের ধুলো মেখে
যারা শত্রুকে করে গ্রাস,
মেরে আর মরে হয়ে রয়
যারা সাম্রাজ্যের ত্রাস।

সূচীপত্র

গোয়েন্দা কর্মকর্তা যখন লেখক

মাইকেল শইয়ারের (Michael Scheuer) জন্ম ১৯৫২ সালে নিউ ইয়র্কে। তার পরিচয় একাধারে ব্লগার, লেখক, আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির সমালোচক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শান্তি ও সুরক্ষা' কেন্দ্রের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তার কর্মজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচয়টি হলো তিনি আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা CIA-এর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা। ত্রিশ বছর বয়সে যোগদানের পর থেকে ২০০৪ সালে পদত্যাগ করার আগ পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর CIA-তে কাজ করেছেন। আর এই ক্যারিয়ারেও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো, তিনি ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত CIA-এর কাউন্টার টেরোরিজম সেন্টারে 'বিন লাদেন ইস্যু ইউনিট'-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত একই ইউনিটের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। 'বিন লাদেন ইস্যু ইউনিট' কিংবা অন্য নামে Alec Station ছিল উসামা বিন লাদেনকে ট্র্যাক ডাউন করার জন্য আমেরিকার গোয়েন্দাদের বিশেষায়িত দল।

'বিন লাদেন ইস্যু ইউনিট'-এ কাজ করার পুরো সময় জুড়ে উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা এবং এর মিত্রদের ব্যাপারে অধ্যয়ন করে মাইকেল শইয়ার বেশকিছু উপলব্ধিতে পৌঁছান। এভাবে চলতে চলতে এক সময় নিজের সেই উপলব্ধিগুলো তিনি আমেরিকানদের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও তাগিদ অনুভব করেন। সেই তাগিদ থেকে বইও লিখতে শুরু করেন। কিন্তু একইসাথে তৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজের উপলব্ধিগুলো ভয়ঙ্করভাবে স্রোতের বিপরীত অনুভব করে শইয়ার প্রথম প্রথম নিজের বই নাম গোপন করে প্রকাশ করেন। এভাবে ২০০২ সালে তাঁর Through Our Enemies' Eyes এবং ২০০৪ সালে Imperial Hubris : Why the West Is Losing the War on Terror প্রকাশিত হয়।

বইগুলোতে তিনি মূলত আমেরিকার ইসলামপন্থী শত্রুদের ব্যাপারে নিজ মাতৃভূমির নীতি নির্ধারকদের ভুল ধারণার সমালোচনা করেন। এছাড়া আমেরিকার আফগানিস্তান ও ইরাক আগ্রাসনের সমালোচনা করে শইয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, আমেরিকা আল-কায়েদার ফাঁদে পা দিয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে আমেরিকার অর্থনীতি অচিরেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। ২০০৪ সালে CIA থেকে পদত্যাগ করার পরপরই তিনি বইগুলোর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এভাবেই মাইকেল শইয়ার

আমেরিকার যুদ্ধ ও রাজনীতি, ইসলামপন্থীদের আদর্শ ও কর্মপন্থার একজন মৌলিক ও প্রামাণ্য চিন্তাবিদ হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে মাইকেল শইয়ারের আরও দুটো একক বই Marching Toward Hell: America and Islam After Iraq (২০০৮) এবং Osama Bin Laden (২০১১) প্রকাশিত হয়। এই বইগুলোতে শইয়ার তার উপলব্ধি ও বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করার পাশাপাশি আরও দালিলিক প্রমাণ দিয়ে বলিষ্ঠ করে তোলেন। এখনও পর্যন্ত মাইকেল শইয়ারের একক মৌলিক বই চারটি হলেও পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি বইয়ের সহলেখক হিসেবেও কাজ করেছেন। শইয়ারের সর্বশেষ একক বই Osama Bin Laden বাংলা ভাষায় 'সাম্রাজ্যের ত্রাস' (২০২১) নামে প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠন আল-কায়েদার আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাসের একেবারে মৌলিক উৎসগুলো নিয়ে মাইকেল শইয়ার যেভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন, তা এক কথায় বিরল। তার কাজ প্রকাশ্যে আসার পর থেকে দেশ-বিদেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল মহলের মানুষদের বাহবার পাশাপাশি সম্পূর্ণ এক ব্যতিক্রমী এক মূল্যায়নও তিনি পেয়েছেন। আর সেটা হলো, স্বয়ং আল-কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেনের মূল্যায়ন। ২০০৭ সালের একটি বক্তব্যে উসামা বিন লাদেন আমেরিকানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা যদি জানতে চাও যে আসলে কী ঘটছে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে হেরে যাচ্ছো, তাহলে উচিত হবে মাইকেল শইয়ারের বই পড়ে দেখা।" [1] কিন্তু নিজেদের লোকের রেফারেন্স পেয়েও আমেরিকার নীতি নির্ধারকরা স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য বজায় রেখেছিল, আরও ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ঢেলে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। হয়তো রেফারেন্স শত্রুর মুখে পেয়েছিল বলেই আমেরিকা তখন এমন আচরণ করেছিল।

মাইকেল শইয়ারের সত্যান্বেষণ এবং লিখালিখির ময়দানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা যায় লরেন্স রাইটকে (Lawrence Wright)। লরেন্স রাইট ২০০৬ সালে তার লিখা The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 বইয়ের জন্য খ্যাতি পান। এমনকি ২০০৭ সালে বইটির পুলিৎজার পুরস্কারও জেতেন। কিন্তু লরেন্স রাইট তার বইতে আল-কায়েদা বিশেষ করে উসামা বিন লাদেনের উত্থানের যে ন্যারেটিভ বর্ণনা করেছেন, সেটিকে পরবর্তীতে মাইকেল শইয়ার তার ২০১১

1 OBL Statement 'The Solution', Al-Sahab Media, September 2007; Also: 'Message to Americans', Al-Fallujah Islamic Minbar (Internet), 8 September 2007.

সালের Osama Bin Laden বইতে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একেবারে বানচাল করে দেন। সেই সাথে শইয়ার দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে লরেন্স রাইটের মতো লেখকরা সময়ের জনপ্রিয় স্রোতে গা ভাসিয়ে তথ্য খুঁজতে নামে বলেই এমন কাজগুলোকে রীতিমতো পূজা করা হয়, এমনকি আমেরিকার মতো পরাশক্তি নিজেকে ধোঁকার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার সুযোগ পায়। এভাবে লরেন্স রাইটের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কাজকেই মাইকেল শইয়ার প্রশ্নবিদ্ধ করে দেন।

স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে শইয়ার শত্রুকে সত্যিকার রূপে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন ঠিক। তবে এখানে ভুল বোঝারও কোনো অবকাশ নেই। তার সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত প্রচেষ্টা ছিল নিজ মাতৃভূমিকে শত্রুর ফাঁদে পা দেওয়া থেকে বাঁচানো। অবশ্য আমেরিকার নীতি নির্ধারকরা সেই পথে হাঁটেনি। দিনশেষে নিজের উপলব্ধিগুলো যে আমেরিকাকে বোঝাতেই মাইকেল শইয়ার এত পরিশ্রম করেছিলেন, এত বাক্য ব্যয় করেছিলেন, সে আমেরিকাই তাকে সত্যিকার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর ফলস্বরূপ এই প্রাক্তন CIA কর্মকর্তার এক কালের অপ্রিয় কথাবার্তাগুলোই পরবর্তীতে পশ্চিমা সাম্রাজ্য সময়ে সময়ে সত্য হতে দেখেছে।

আমেরিকার যুদ্ধ ও রাজনীতির ব্যাপারে মৌলিক চিন্তাধারা, লিখালিখি এবং অধ্যাপনার বাইরে বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন আলাপে মাইকেল শইয়ারের নাম উঠে এলেও বর্তমানে (২০২১) প্রায় ৭০-এর কোঠায় পা দেওয়া এই প্রবীণ বোদ্ধা আমেরিকায় তার পরিবারের সাথে ছিমছাম জীবন যাপনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

সম্পাদনার আলাপ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাদের ওপর। অতঃপর...

একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা সাম্রাজ্য বনাম ইসলামি সভ্যতার চলমান সংঘর্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে পশ্চিমা হয়েও যেসব লেখক, বিশ্লেষক কিংবা অ্যাক্টিভিস্টরা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে চাননি, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাইকেল শইয়ার। কোনোকিছুই যেন এই মানুষটিকে আমেরিকার জন্য কিছু অপ্রিয় সত্য বর্ণনা করা থেকে রুখতে পারেনি। এই ব্যাপারে মাইকেল শইয়ার অনন্য এবং প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু তবুও কারও দৃষ্টিভঙ্গি-বিশ্লেষণ যে একেবারেই নিখুঁত থাকবে, ব্যাপারটি তেমনও নয়। বিশেষ করে মাইকেল শইয়ারের মূল ইংরেজি বইগুলোর টার্গেট অডিয়েন্স যেখানে ছিল মুজাহিদদের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ কাফিররা, সেখানে বাংলায় অনূদিত বইয়ের টার্গেট অডিয়েন্সের বেশিরভাগই হলো মুসলিমরা। আর মুসলিম হয়ে ইসলাম কিংবা ইসলামের জন্য যুদ্ধরত মুজাহিদদের সম্পর্কে ভুল জানার বা ভুল বোঝার সামান্য অবকাশও যেন না থাকে, সেই লক্ষ্যেই মূলত মাইকেল শইয়ারের বইও সম্পাদনা করা হয়েছে। অবশ্য সম্পাদনা না বলে 'ব্যাখ্যামূলক টিকা যোগ করা' বললেই বরং আরও যথাযথ হয়। তবে সেই ব্যাপারে সবিস্তারে যাওয়ার আগে প্রথমে বই সিলেকশনের ব্যাপারেই কিছু বিষয় জানানো সমীচীন মনে করছি।

৯/১১-এর থেকে উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে বই কম লিখা হয়নি। কিন্তু সবগুলোর মধ্যে মাইকেল শইয়ারের এই বইটাই পছন্দ করার দুটো প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, উসামা বিন লাদেনের জীবন এবং কর্মপন্থার ওপরে যে পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত, বই, আর্টিকেল, বক্তব্য সামনে রেখে বইটি রচনা করা হয়েছে, তাতে বইটিকে একটি রিসার্চ পেপার বললেও কম বলা হয়। আর দ্বিতীয়ত, লেখক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে গৎবাঁধা সব কথাবার্তা কপি পেস্ট করে দেন নাই, বরং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের প্রয়াস চালিয়েছেন; এবং শেষমেশ নিজের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। তাই বইটিকে এক কথায় Comparative Biography বললেই বরং অধিক যুতসই হয়। এইসমস্ত অনন্যতার জন্য উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে লিখা অনেক অনেক বইয়ের মধ্যে মাইকেল শইয়ারের বইটিই বেছে নেওয়া হয়েছে।

মাইকেল শইয়ারেরও এখনও (২০২১) পর্যন্ত একক বই চারটি। আর সেই চারটির মধ্যেও সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা কুড়োনো বই হলো Imperial Hubris (২০০৪)। কিন্তু তবুও তার লিখা Osama Bin Laden (২০১১) বইটিই বেছে নেওয়ার কারণ হলো – এই বইতে একদিকে লেখকের আগের সমস্ত বইয়ের মূলভাব চলে এসেছে, অপরদিকে বইটি আগেরগুলোর তুলনায় অনেকবেশি তথ্যসমৃদ্ধ এবং একাডেমিক মানসম্পন্ন হয়েছে। মাইকেল শইয়ারের এই বইটি মনোযোগের সাথে পড়লেই সামগ্রিকভাবে তার সমস্ত বইয়ের চিন্তা ও উপলব্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই কারণে মাইকেল শইয়ারের একক বইগুলোর মধ্যেও Osama Bin Laden বইটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

এই তো গেল বই সিলেকশনের গল্প। এবার আসা যাক বইটি সম্পাদনার ব্যাপারে।

প্রথমত, পুরো বইয়ের মূল কন্টেন্ট প্রায় হুবহু রেখে শুধু বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় টিকা যোগ করা হয়েছে। বিশেষ করে লেখকের 'হয় এসপার, নয় ওসপার' ধরনের মানসিকতার কারণে বেশ কয়েকবার ইসলামি শরিয়াহর মৌলিক কিছু ব্যাপারে ভিন্ন এমনকি উল্টো মেসেজও চলে এসেছিল। সেগুলো টিকার মাধ্যমে সাধ্যমতো স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

তবে মূল বইয়ের প্রায় কিছুই বাদ দেওয়া না হলেও সাথে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ্য। আর তা হলো, বইটিকে সহজপাঠ্য করতে এবং বাহুল্যতা মুক্ত করতে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সম্পাদক টিমোথি বেন্ট (Timothy Bent) বইটির বিভিন্ন জায়গায় লেখকের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। আর সেই সাথে লেখকের বিশাল বর্ণনামূলক কথাবার্তা বইয়ের শেষের নোটে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে হলেও বইয়ের মূল অংশেই যেহেতু লেখকের বক্তব্য স্পষ্টভাবে চলে এসেছে এবং পুরো বই আরও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে, তাই অযথা পৃষ্ঠা না বাড়িয়ে বইয়ের নোট অংশের বিশাল বিশাল আলাপ অধিকাংশই বাদ দেওয়া হয়েছে। এগুলোর বাইরে গুরুত্বের কারণে অল্পকিছু টিকা রেখে দেওয়া হয়েছে, আর হাতে গোণা কয়েকটিকে মূল বইয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

'নোটস' অধ্যায়ে উল্লেখিত রেফারেন্সগুলো অবশ্যই রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে সেগুলো স্ব স্ব পৃষ্ঠার ফুটনোটে আনা হয়েছে। ফলে মূল ইংরেজি বইয়ের 'নোটস' অধ্যায়টি বাংলায় অনূদিত 'সাম্রাজ্যের ত্রাস'-এ আর থাকেনি।

দ্বিতীয়ত, আপাত ছোট একটি ব্যাপার অনেক বাক্য ব্যয় করে বলা হলে, জোর দিয়ে বলা হলে কিংবা বারবার বলা হলে সেই ব্যাপারটি পাঠকের মনে আর ছোট কিছু থাকে না। বরং তা বিশাল কিছু হিসেবেই মনে গেঁথে যায়। আরব যোদ্ধাদের ব্যাপারে শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে উসামা বিন লাদেনের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে লেখকের ক্ষেত্রে এমন হয়ে গিয়েছে। তাও একাধিক স্থানে। তাছাড়া এক্ষেত্রে রেফারেন্স স্যাম্পল সিলেকশনেও লেখকের ত্রুটি হয়েছে বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। দিনশেষে এই ছোট ব্যাপারটি এত বড় আকার ধারণ করেছে যে টিকা দেওয়া সত্ত্বেও শুরুতে একবার উল্লেখ করে দেওয়া সমীচীন মনে করলাম।

তৃতীয়ত, উসামা বিন লাদেনের চিন্তার বিবর্তন নিয়ে যেসমস্ত ন্যারেটিভ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে একটি হলো ‘সৌদি ন্যারেটিভ’ বা ‘রিয়াদ ন্যারেটিভ’। এই ন্যারেটিভের ব্যাপারে একটি প্রান্তিক অবস্থান খণ্ডন করলেও লেখক মাইকেল শইয়ার আরেকটি প্রান্তিক অবস্থান নিয়ে নিয়েছেন। এই ব্যাপারটিও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষ করে পুলিৎজার জেতা লরেন্স রাইট এবং তার সমমনাদেরকে একহাত নিতে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিতে আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের চিন্তা ও পরামর্শের ব্যাপারগুলো বইতে একেবারেই নিভু নিভু হয়ে গিয়েছে। এমনকি রিয়াদ ন্যারেটিভকে খন্ডনের রেশ ধরে আল-কায়েদার বিস্তারিত কর্মপন্থাকেও অনেকটা শাইখ উসামা বিন লাদেনের একক অবদান হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু বৈশ্বিক জিহাদের কর্মপন্থার যেকোনো একনিষ্ঠ ছাত্র উপলব্ধি করতে পারবে যে, এই বিস্তারিত কর্মপন্থা কারও একক চিন্তার ফসল নয়। বরং এই কর্মপন্থা শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম থেকে শুরু হয়ে উসামা বিন লাদেন, ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি, আবু মুসআব আস-সুরি, আবু বকর নাজি সহ অসংখ্য আলিম, সেনানায়ক এবং সমরবিদদের সমন্বিত চিন্তার ফসল। তাই আল-কায়েদার বিস্তারিত কর্মপন্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংগঠনটির নেতৃত্বের ‘সমন্বিত চিন্তার’ ব্যাপারটি মাথায় রেখেই বইটি পড়বার আহ্বান রইলো।

চতুর্থত, বইটিতে বেশকিছু জায়গায় একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এমনভাবে হয়েছে যে, কোনোটিই বাদ দেওয়া যায় না। কেননা সেগুলো আদতে বাহুল্য দোষ না, বরং এক প্রকার প্রয়োজনীয় ও বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি। সেক্ষেত্রে একই ধরনের টিকারও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর ওজনের কারণে পুনরাবৃত্তিই উত্তম মনে করা হয়েছে।

পঞ্চমত, লেখক পশ্চিমা কাফির হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর কথা উল্লেখের পরে ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’, সাহাবাদের নামের পরে ‘রদিআল্লাহু আনহু’, ইসলামের বিভিন্ন সময়ের গণ্যমান্য ইমাম, আলিম কিংবা সমরনায়ক নামের পরে ‘রহিমাহুল্লাহ’ ইত্যাদি অনুপস্থিত ছিল। বইয়ে শুধু রাসূলুল্লাহ সা.-এর ব্যাপারে উল্লেখের পর ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বোঝাতে সা. এবং সাহাবাদের নামের পর ‘রদিআল্লাহু আনহু’ বোঝাতে রদি. যুক্ত করা হয়েছে। অন্য সমস্ত জায়গায় অপরিবর্তিত রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটিকে ইসলামের বিভিন্ন সময়ের ইমাম ও আলিমদের প্রতি অসম্মান কিংবা বেয়াদবি হিসেবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মুসলিম হিসেবে আমরা ইসলামের সমস্ত যুগের সমস্ত রব্বানি ইমাম, আলিম, দাঈ, মুজাহিদ ও সমরনায়কদেরকে সম্মান করি ও ভালবাসি।

এবং পরিশেষে, উসামা বিন লাদেন শহীদ হন ২০১১ সালের ২রা মে। আর মাইকেল শইয়ারের এই বইটি লিখার সময়কাল ছিল ২০১০-২০১১; প্রথম প্রকাশকাল ২০১১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়। অর্থাৎ, উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর মাত্র সাড়ে মাত্র তিন মাস আগে বইটি প্রকাশিত হয়। আর উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর এখনও পর্যন্ত বইটিতে আর তেমন কোনো সংযোজন বা বিয়োজন ঘটেনি। কিন্তু এটা যেহেতু জীবনীগ্রন্থ বা Biography, তাই উসামা বিন লাদেনের জীবনাবসান এবং অতঃপর তাঁর সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন নিয়ে ‘সার্থক পরিসমাপ্তি?’ শিরোনামে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদও যুক্ত করা হয়েছে। যাতে লেখকের মূলনীতি ও দৃষ্টিতেই উসামা বিন লাদেনের এই জীবনী পূর্ণতা পায় এবং পাঠকের কৌতুহল কিছুটা হলেও নিবৃত্ত হয়।

মোটামোটি এই হলো মূল বইয়ে যাবার আগের যাবতীয় আলাপ। আশা করি বইটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনবদ্য একটি কাজ হয়ে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহুতাআলা ‘সাম্রাজ্যের ত্রাস’ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বান্দাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। একইসাথে কবুল করুন গুনাহ মাফের এবং সাওয়াবে যারিয়ার উপলক্ষ্য হিসেবে। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাগণের ওপর।

তানভীর আহমাদ
শাওয়াল, ১৪৪২ হিজরি

প্রাককথন

আগস্ট ২৩, ২০১০।

এই দিনে আমেরিকার বিরুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের যুদ্ধ ঘোষণার বরাবর ১৫ বছর পার হলো। প্রথমবার দেওয়া ঘোষণার পর ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দ্বিতীয়বার একই ঘোষণা দেন। সেটা যেন ছিল আমাদের চোখ না এড়ানোর জন্যই। আর সেই ঘটনার পর থেকে আমেরিকানরা এই ব্যক্তি, তাঁর সংগঠন আল-কায়েদা এবং সমমনা ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে অসংখ্যবার শুনেছে, পড়েছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন মানসিকতার রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, তত্ত্ববিদ কিংবা সমাজবিজ্ঞানী; রেডিও, প্রেস কিংবা টিভি বিশেষজ্ঞ সবার কাছ থেকেই হয়তো কিছু না কিছু শোনা হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন এডমিরাল, জেনারেল, পশ্চিমা কিংবা কট্টরপন্থী মুসলিম, দক্ষ কিংবা শুয়ে-বসে থাকা মনোবিজ্ঞানী, যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ - কেই বা বাদ ছিল?

আর এতসব বয়ান আর উপদেশে সুসজ্জিত হয়ে আমেরিকানরা যুদ্ধ করতে রওনা হয়েছিল - তাও কিনা আবার দুই পক্ষের নেতৃত্বেই (রিপাব্লিকান এবং ডেমোক্রেট)।

কিন্তু এরপর থেকে সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আমেরিকা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের ইসলামপন্থী শত্রুরা হেরে যায়নি, তাদের সমৃদ্ধিও বন্ধ হয়নি। আর আমার দৃষ্টিতে এখনও আমেরিকা ব্যাপক আকারে অরক্ষিত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। আমি এই বইটিতে দেখাব, আল-কায়েদা আর তার মিত্রদের বিরুদ্ধে আমেরিকান সরকার আর তার ইউরোপীয় মিত্রদের অনুসৃত যুদ্ধকৌশল কীভাবে উল্টো ইসলামপন্থীদের বিজয়েই সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাদের ভাষায় সেটা হলো উসামা বিন লাদেনের সেই তিন উদ্দেশ্য অর্জন, যেগুলো তিনি তার মূল বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন –

১. আমেরিকাকে তিলে তিলে দেউলিয়া করে দেওয়া;

২. আমেরিকার সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীকে এমন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া, যা তাদের প্রতিরক্ষা এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দুর্বল করে দিবে;

৩. আমেরিকার মিত্রদেরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং রাজনৈতিকভাবে আমেরিকাকে যথাসম্ভব বিভক্ত করে দেওয়া।

আরও খারাপ হয়েছিল, যখন ওয়াশিংটন আর তার ইউরোপীয় মিত্ররা তাদের সমস্ত বিবৃতি-বক্তব্য থেকে 'ইসলামি', 'ইসলামপন্থী' এবং 'জিহাদ' শব্দগুলো বাদ দিয়ে এগুলোর পরিবর্তে আরও ঘোলাটে সব শব্দ 'চরমপন্থী' বা 'কট্টরপন্থী' ইত্যাদির প্রচলন করেছিল। ২০১০ সালে ওয়েস্ট পয়েন্টের (আমেরিকান মিলিটারির ট্রেইনিং ক্যাম্প) গ্র্যাজুয়েশন বক্তব্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ওবামা ওইসমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করেননি। তিনি উসামা বিন লাদেনের কথাও উল্লেখ করেননি। আর যখন আল-কায়েদার কথা উল্লেখ করলেন, তাও এমনভাবে করলেন যেন তা এক ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা বিলুপ্তপ্রায় সংগঠন। ওবামা বলেছিলেন, "আল-কায়েদা আর তার সহযোগিরা হলো ইতিহাসের ভুল দিকের পুঁচকে সব মানুষ।" আসলে তিনি জর্জ ডব্লিউ বুশ আর বিল ক্লিনটনের সাথে সাদৃশ্য রেখেই বলেছিলেন, "তারা কোনো জাতির নেতৃত্ব দেয় না। কোনো ধর্মের নেতৃত্ব দেয় না।" [2]

অথচ বাস্তবতা হলো, আমেরিকার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে, তারা মুসলিম – আর নিষ্ঠার সাথেই তারা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান ভাইয়েরা বিশ্বাস করে যে তারা আত্মরক্ষামূলক জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে এবং তাদের ভূমিকে রক্ষা করছে, যেমনটি আল্লাহ ও নবি মুহাম্মাদ সা. নির্দেশ দিয়েছেন। এইসব ব্যাপার অস্বীকার করে আমেরিকান এবং ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ ভোটারদের সাথে প্রতারণা করে, এবং সেই জনগণকেই অসন্তুষ্ট করে বসে যাদের প্রতি তারা কিনা সংবেদনশীলতা দেখাতে চায়। অথচ বেশিরভাগ মুসলিম এটাই জানেন যে, ২০০৩-এ আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনের পর থেকে উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা এবং তাদের মিত্ররা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ রক্ষণাত্মক জিহাদ পরিচালনা করছে।

কিন্তু পশ্চিমা নেতারা একমাত্র যে পন্থায় নিজেদের গর্হিত প্রতারণাকে বজায় রাখে, সেটা হলো ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা বলা। আর বলাই বাহুল্য, এই কাজে তারা ভালই পটু। 'ওবামা কেন আমেরিকার ইসলামপন্থী শত্রুদের স্পষ্ট নামোল্লেখ নিষেধ করেছিল' হয়তো এমনই প্রশ্ন এড়াতে ওবামার সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা জন ব্রেনান (John Brennan) বলেছিলেন, "আমরা আমাদের শত্রুকে 'জিহাদি' কিংবা 'ইসলামপন্থী' হিসেবে বর্ণনা করি না। কেননা, জিহাদ হলো (মুসলিমদের) পবিত্র সংগ্রাম যা নিজেকে বা নিজের সম্প্রদায়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য করা হয়ে থাকে (নফসের জিহাদ)।" [3] অথচ কথাগুলো মিথ্যা। আর তার চেয়েও বাজে ব্যাপার হলো - এসব কথাবার্তা জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

---

2 Barack Obama, "Remarks by the President at the United States Military Academy at West Point Commencement," 22 May 2010. [http://www.WhiteHouse.gov]

3. John O. Brennan, "Speech at the Center for Strategic and International Studies," 26 May 2010.

১৯৯৬ সালের পর, বিশেষত আল-কায়েদার ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর হামলার পর থেকে আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা এবং পেশাদার পরামর্শদাতারা সফলভাবে যে শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন; দুঃখজনক হলো – সেই ধরনের কোনো শত্রুর অস্তিত্বই নেই। কেননা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, আল-কায়েদা হলো কিছু মাথানষ্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত যতসব দুর্বৃত্তদের এক সংগঠন; ৯/১১-এর হামলা হলো স্রেফ এক নৃশংসতা; বিন লাদেনের বক্তব্যগুলো স্রেফ কিছু ফালতু আলাপ – সেগুলো কোনো প্রকার চিন্তা বা বিশ্লেষণের যোগ্যতাই রাখে না; আর ইসলামপন্থীরা হলো ধ্বংসবাদী বা (পশ্চিমা) স্বাধীনতার ঘৃণাকারী, অথবা বার্নার্ড লুইসের (Bernard Lewis) মতো তারা বিশ্বাস করে যে – তাদের সমস্ত দুর্দশার জন্য পশ্চিমই দায়ী।[4]

এর ওপর আমেরিকানরা শুনে এসেছে যে, আল-কায়েদা আর তার মিত্রদের 'অবশিষ্টাংশও' একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের সংখ্যাও একেবারে কমে গিয়েছে; আর রীতিমতো অলৌকিকভাবে তাদের গুটি কয়েকজন মিলে যে দেড়শো কোটি মুসলিমের বিশ্বাসকে নিজেদের আদর্শে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে, মূলধারার ইসলামের সাথে সেটার নাকি কোনোই সম্পর্ক নেই। এছাড়া পশ্চিম আরও জেনে এসেছে যে, আল-কায়েদা ও তার মিত্রদের লক্ষ্য নাকি সমস্ত খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে হত্যা করা। কিন্তু এটা হলো এমন এক শত্রুর চিত্রায়ন, যার অস্তিত্বই নেই। উল্টোদিকে, বাস্তব দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে গড়া এই কাহিনীর সত্যিকার সংস্করণটি সামনের অধ্যায়গুলোতেই আসছে। নিঃসন্দেহে তা পাঠকদের সামনে উন্মোচিত হবে পাল্টা প্রতিবেদন কিংবা বিকল্প ইতিহাস হিসেবে।

এমনকি স্বয়ং উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারেও, আমেরিকানদের অনর্গল বলা হয়েছিল তিনি এই, তিনি সেই। কিন্তু সেসবের কোনো চিত্রায়নেই তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, উদারতা, সাহসিকতা, কৌশলগত দক্ষতা, ক্যারিশমা এবং সবরকে দেখানো হয়নি। বরং সবসময়ই জোর গলায় বলা হয়েছে – তিনি নাকি একজন উন্মত্ত উচ্চাভিলাষী, রক্তপিপাসু, অযৌক্তিক, সীমিত বুদ্ধিমত্তার মেসিয়ানিক ব্যক্তি। এমন একজন, যে নাকি ভয়ঙ্কর খুনে কূটবুদ্ধির সহযোগী আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং অন্যান্য মিশরীয় ইসলামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত; যে নাকি বেঁচে আছে কেবল ইহুদি ও খ্রিস্টান হত্যার আহ্বান জানাতেই।

আমেরিকা সত্যিই এমন কোনো শত্রুর মুখোমুখি হলে তা বরং সৌভাগ্যই হতো। কিন্তু না, আমরা আদৌ এমন কারও মুখোমুখি নই। উসামা বিন লাদেন এমন ব্যক্তিত্ব নন, যেমনটা

4 Bernard Lewis, What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response (New York: Oxford University Press, 2002).

আমরা নিজেরা তাঁকে এঁকেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমাকে যদি স্রেফ দশটি বৈশিষ্ট্যেও উসামা বিন লাদেনকে বর্ণনা করতে বলা হতো, তাহলে সেগুলো হতো: ধার্মিক, সাহসী, উদার, বুদ্ধিমান, ক্যারিশম্যাটিক, ধৈর্য্যশীল, স্বপ্নদর্শী, অদম্য, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সর্বোপরি একজন বাস্তববাদী। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি এক ধ্রুবসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন; আর তা হলো – যুদ্ধগুলো কেবল বুদ্ধিমত্তার সাথে হত্যা করেই জেতা যায়। যারা দাবি করেন উসামা বিন লাদেন এক উন্মাদ, আর তাঁর সহযোগীরা কেবল সংখ্যায়ই কম নয় বরং তারা 'প্রকৃত' ইসলাম নিয়েও একেবারে মূর্খ পাগলাটে সব মানুষ, যারা দাবি করেন উসামা বিন লাদেন সমস্ত অমুসলিমদেরকে হত্যা করতে চায়, তাদের অবস্থা হলো এনলাইটেনমেন্টের আগের সময়কার পোপদের মতো। এই পোপরা বিশ্বাস করতো – ধ্রুপদী এথেন্স গড়ে উঠেছিল গণতান্ত্রিক, স্বাধীন জীবনযাপন সহিষ্ণু ও কলা-প্রেমী অ্যাথেন্সবাসীদের দিয়ে; আর বিপরীতে স্পার্টা পরিচালিত হতো কিছু সর্বগ্রাসী, বর্বরদের দ্বারা। অথচ যদিও স্পার্টার তুলনায় এথেন্সের 'আধুনিক' সমাজ এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যুদ্ধে স্পার্টাই জয়লাভ করেছিল। সত্য হলো, স্পার্টা আসলে সর্বগ্রাসী কিংবা বর্বর - কোনোটিই ছিল না। বরং স্পার্টানরা সেইসব যুদ্ধেই অংশ নিতো যেগুলো তাদের জন্য জেতা সহজ ছিল; আর ফলস্বরূপ তারা বিজয়ীও হতো। কোনো যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছা করা মাত্রই তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তো না।

একইভাবে, আমেরিকা আর তার ইউরোপীয় মিত্ররা আজকের যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে 'উন্মাদ' উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর নগণ্য সব ইসলামি মিত্রদের কাছে। কারণ আমেরিকা কেবল তার নেতাদের মনের মধ্যে বসে থাকা এক অস্তিত্বহীন শত্রুকেই বারংবার আঁকছে। কিন্তু অন্যদিকে উসামা বিন লাদেন আর তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের সুসংজ্ঞায়িত রেখা ধরেই জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে পশ্চিম নিজেদের ওপর যে বিভ্রান্তি টেনে এনেছে, তা জনস হপকিন্স ল্যাবরেটরির 'জাতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষণ' বিভাগের মাইকেল ভ্লাহোস (Michael Vlahos) সংক্ষেপে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ২০০২ সালে ভ্লাহোস লিখেছিলেন, "তারা (ইসলামপন্থীরা) নিজেদের সম্পর্কে কী ভাবে, সেটা আমরা তাদের সম্বন্ধে কী ভাবি - তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে ইচ্ছেমতো 'জঙ্গি' 'সন্ত্রাসী' ইত্যাদি ডাকা স্রেফ আমাদের মনকেই শান্ত রাখে; কিন্তু এগুলো তাদের সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বাড়ানোতে আদৌ সাহায্য করে না।" [5]

---

5 Michael Vlahos, "Terror's mask: Insurgency within Islam," Johns Hopkins University / Applied Physics Laboratory, May 2002.

উসামা বিন লাদেনের ক্ষেত্রে তাঁর পশ্চিমা তুলিতে আঁকা চিত্রায়নের চেয়ে আমি বরং সব ধরনের পূর্ব ধারণামুক্ত সত্যিকার কেইস স্টাডিতেই বেশি আগ্রহী। এই বইতে 'ধ্বংসবাদী', 'গণহত্যাকারী', 'নাজি', 'নৃশংস', 'মেসেঞ্জিবাদী', 'ইসলামি ফ্যাসিস্ট', 'উন্মাদ' কিংবা 'অপরাধী' – এসব ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমা আখ্যাগুলো ব্যবহার করা হবে না কেননা এগুলো অপ্রযোজ্য। এই জাতীয় শব্দগুলো ক্ষতস্থানে মলম দেয়, নিজেদের অহংকার চেপে রাখে; এগুলো আমেরিকা আর তার মিত্রদেরকে আঘাত করা, লাঞ্ছিত করা এই লোকটির ব্যাপারে লিখা-বক্তব্য পেশকারীদের আবেগকেই কেবল সন্তুষ্ট করে। কিন্তু এসব আমাদেরকে সত্যিকার উসামা বিন লাদেনকে বুঝতে সাহায্য করে না; আর ফলস্বরূপ তাঁকে (এবং তাঁর মতো লোকদেরকে) হারাতেও সাহায্য করে না। তাই ঐসব আখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে আমি মনোনিবেশ করবো সেইসব ব্যাপারে – যাকিছু উসামা বিন লাদেন নিজে বলেছেন এবং করেছেন, যাকিছু তাঁকে সবচেয়ে ভাল জানা মানুষগুলো বলেছেন। আমি আরও মনোনিবেশ করবো তাঁর কথা ও কাজ কীভাবে বিশ্বের সেই অংশে প্রতিফলিত হয়েছে, যে অংশ এক বিরাট সময় জুড়ে বিশ্বস্ত-ধর্মপ্রাণ নেতৃত্বের জন্য রীতিমতো মরিয়া হয়ে ছিল। আর এই ব্যাপারটা তো বহু শতাব্দী ধরে ইসলামি ইতিহাসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সময়ে সময়ে আমি আমার মূল্যায়নগুলো নিয়ে আলোচনা করব; সেগুলো কোন পর্যায়ের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়ায়, তা মেপে দেখবো। আর পরিশেষে – আমি বিশ্বাস রাখি যে আমার দলিল-প্রমাণ আর মূল্যায়নগুলো উসামা বিন লাদেনের আরও ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তব একটি চিত্র তুলে ধরবে।

স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমার উদ্দেশ্য উসামা বিন লাদেনের প্রশংসা করা নয়, বরং তাঁকে কবর দিতে সাহায্য করা। কিন্তু তা করার জন্য, আমাদের আগে 'তিনি কে' এবং 'তিনি কী' সে সম্পর্কে আন্তরিক মনের, স্পষ্ট দৃষ্টির মূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা যদিও এটা সত্য যে উসামা বিন লাদেন কোনো ইউনিফর্ম পরিধান করেন না, কিন্তু আমেরিকার নিরাপত্তা এমনকি টিকে থাকার জন্য ইতিহাসের যেকোনো শত্রু জেনারেলের চেয়েও তিনি বড় হুমকিস্বরূপ। ওয়াশিংটন তো এর আগে লর্ড হাওকে (Lord Howe) বোকা, অসচ্চরিত্র লোক হিসেবে দেখায়নি; গ্রান্টও (Grant) তো রবার্ট লি-কে (Robert Lee) উন্মাদ বলে উড়িয়ে দেননি; অনুরূপভাবে লি-ও গ্রান্টকে মাতাল বলে চালিয়ে দেননি। আইজেনহাওয়ারও (Eisenhower) কখনও ভাবেননি যে, উত্তর আফ্রিকায় রোমেলকে (Rommel) তিনি অপরাধী তকমা দিয়ে হারিয়ে দিতে পারবেন। বরং প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষের পদক্ষেপ বোঝার চেষ্টা করেছেন আর সে অনুসারেই ব্যবস্থা নিয়েছেন। আর আজকে উসামা বিন লাদেনকে আমরা নিজেরা যেভাবে কল্পনা করতে পছন্দ করি তা

সরিয়ে রেখে তিনি আসলেই যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনটাই বুঝতে যাওয়ার অর্থ হলো কিছু অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হওয়া।

১৮৫২ সালে ওয়েস্ট পয়েন্টে থাকাকালীন সময়ে রবার্ট লি তার ছেলে কাস্টিস লি-কে (Custis Lee) চিঠি লিখেছিলেন, “তুমি বাস্তবে যে জগতটায় বেঁচে আছো, সেখানেই থেকো। যে বিষয়টা যেমন, সেটাকে ঠিক সেভাবেই দেখো। আর সেগুলোরই সর্বোচ্চ ব্যবহার করো। কখনও ভেবো না যে তুমি নিজে যেটাকে যেভাবে চাও, সেটা ঠিক সেভাবেই হবে। বরং আশা রাখো যাতে সব ঠিকঠাক মতো হয়ে যায়। আর তারপর তা সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাও।” [6]

উসামা বিন লাদেনকে আমাদের কীভাবে দেখা উচিত, তার জন্য এর চেয়ে ভাল উপদেশ আর হতে পারে না। তাই আসুন তাঁকে আমরা ঠিক সেভাবেই নিই, যেভাবে সত্যিই তাঁকে খুঁজে পাই।

মাইকেল শইয়ার

6 Elizabeth Brown Pryor, Reading the Man: A Portrait of Robert E. Lee through His Private Letters (New York: Viking, 2007), p. 251.

বিষয় হিসেবে উসামা

উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যে পরিমাণ সত্য-মিথ্যা লিখার বন্যা বয়ে গিয়েছে, সে তুলনায় বায়োগ্রাফারদের জন্য নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নের উৎস যেন ছোট্ট এক পুকুরই বলা চলে। আর এই নির্ভরযোগ্য উৎসগুলোর মধ্যে প্রথমদিকের গুলো হলো উসামা বিন লাদেনের নিজস্ব বিবৃতি, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার এবং পদ্যসমূহ; মোটকথা যা কিছুই তিনি ১৯৯৩-এ প্রকাশ্যে বক্তব্য শুরু করার পর থেকে বলে এসেছেন। এছাড়াও বিগত দশকগুলোয় তাঁর ব্যাপারে অসংখ্য স্মৃতিচারণ আর মন্তব্য আমরা দেখেছি, আর সেসবের সংখ্যা এখনও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েই চলেছে। সেইসব স্মৃতিচারণ আর মন্তব্যগুলোর কিছু এসেছে এমনসব মানুষদের থেকে যারা তাঁকে দেখেছেন একজন যুবক হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে, একজন স্বামী কিংবা একজন কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে; এমনকি যারা তাঁকে দেখেছেন সোভিয়েত বিরোধী আফগান জিহাদের একজন উদীয়মান যোদ্ধা কিংবা আল-কায়েদার নেতা হিসেবে। আর এইসমস্ত দলিলাদি উসামা বিন লাদেনের জীবনকে বোঝার এবং মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অপরিহার্যও। কিন্তু একইসাথে সেসব ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাই করেই নিতে হবে, যাতে করে তাঁর সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য সমস্ত এজেন্ডাগুলো থেকে সতর্ক থাকা যায়।

সমসাময়িক জীবনী, ঐতিহাসিক রচনা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলোয় আমরা প্রায়ই 'ন্যারেটিভ' [7] কথাটার উল্লেখ দেখতে পাই। এই শব্দটা আসলে এটাই প্রমাণ করে যে – যুদ্ধাবস্থায় বাস্তবতা বলে কিছু নেই। বরং রয়েছে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতামূলক কিছু ন্যারেটিভ। আর কেউ যদি তার শত্রুর ন্যারেটিভ বুঝতে অক্ষম হয়, তাহলে সে হেরে যাবে। জিততে হলে তাকে অবশ্যই শত্রুর ন্যারেটিভকে বুঝতে হবে এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী নিজের পথ ও পন্থা বাছাই করতে হবে। ন্যারেটিভ বোঝা হলো বিজয়ের চাবিকাঠি। এখন, 'ন্যারেটিভ'-এর ক্ষেত্রে যদি এটাও বলা হয় যে 'ধারণা বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে', তাহলে আমি অবশ্যই একমত হবো। এমনকি আমি আরও আগে বেড়ে বলবো যে, 'ধারণা কখনও জ্ঞানেরও ভিত্তি প্রস্তুত করে দেয়।' আমেরিকানদেরকে বুঝতে হবে যে উসামা বিন

---

7 কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গি-কেন্দ্রিক যাবতীয় বর্ণনা, মতামত, সংকলন ইত্যাদি। লেখক এই বইতে মোটামোটি 'দৃষ্টিভঙ্গি' অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শুধু 'দৃষ্টিভঙ্গি' অনুবাদ করা হলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে বলে পুরো বইতে শব্দটিকে 'ন্যারেটিভ' হিসেবেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

লাদেন এবং ইসলামপন্থীরা তাদেরকে আক্রমণ করছে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা সরকারের কার্যকলাপের নেতিবাচক প্রভাবের কারণেই। কিন্তু বিভিন্ন ন্যারেটিভের প্রবক্তাদেরকে এটা মেনে নিতেই দেখা যায় না। উল্টো তাদেরকে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্টের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে। আর সেসব স্ক্রিপ্ট লিখাই হয় যেন টার্গেট অডিয়েন্সের মন জোগানোর জন্য, তাদের আগে থেকেই করে থাকা ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করার জন্য। এইসব ন্যারেটিভে বাস্তবতা ততটুকুই প্রবেশ করে যতটুকু ন্যুনতম প্রয়োজন হয়, যাতে করে একটা পর্যায়ের 'সত্য' অনুভূতি দেওয়া যায়। কিন্তু দিনশেষে তা 'অস্পষ্টতার বাহন' হিসেবেই থেকে যায়।

এইসব পূর্বধারণাকেন্দ্রিক স্ক্রিপ্টেড ন্যারেটিভগুলো বাস্তবতাকে সরিয়ে কিছু মিথ্যা তত্ত্বকে সেই আসনে বসায়। আর সেগুলো বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে যতসব ভ্রান্ত ধারণার এক দারুণ উৎস হিসেবেও কাজ করেছে। আমার মতে, সেইসব ন্যারেটিভেরও তিনটা ফালতু সংস্করণ প্রথমেই বাদ দেওয়া দরকার: ১। বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা হলো ইরানের দালাল; ২। তারা CIA-এর দালাল; এবং ৩। তারা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI-এর দালাল।

এই সংস্করণগুলোয় বিশ্বাসীরা রীতিমতো এক উগ্র পর্যায়ের উৎসাহ নিয়ে এসব বলে বেড়ায়, অথচ এসবের বিপরীতের অসংখ্য তথ্য-প্রমাণকে আবার ঠিকই এড়িয়ে যায়। যাই হোক, অন্য পাঁচটি ন্যারেটিভ উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে অধ্যয়নকে সত্যিই প্রভাবিত করেছে, কেননা সেগুলো আদতে 'সত্য ও মিথ্যার এক মিশ্রণ'। এই ন্যারেটিভগুলো এসেছে মূলত পুরোনো দিনের সন্ত্রাসবাদ বিশ্লেষক, বিন লাদেনের পাশ থেকে ছিটকে পড়া প্রাক্তন মুজাহিদ, সৌদি সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র, আমেরিকার কিছু ইসরাঈলপন্থী লেখক ও তাদের সহকর্মী, এবং সেইসব পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের থেকে যারা কিনা আল-কায়েদা প্রধানের ব্যাপারে প্রাথমিক উৎসগুলোতেই নির্ভর করে না।

প্রবীণ ন্যারেটিভ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, থিংকট্যাঙ্ক এবং সরকারি সংস্থাগুলোয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবীণ সাংবাদিক ও সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞদের দেখা যায়, যারা কিনা মনে করেন – উসামা বিন লাদেন এবং তার সহযোদ্ধারা আবহমানকাল ধরে আসা একই সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি। তারা নিজেদের বইপুস্তক, ব্লগ আর জার্নালগুলোয় আল-কায়েদা সহ অন্যান্য ইসলামি দলগুলোকে পুরোনো সন্ত্রাসবাদের উপমায় ভরে ফেলেন। উদাহরণ হিসেবে তারা দেখান - আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি, লেবানিজ হিজবুল্লাহ, কলম্বিয়ার FARC, আবু নিদাল এবং ফিলিস্তিনি অন্যান্য সেক্যুলার গোষ্ঠী, পেরুর সেন্ডেরো লুমিনোসো, রাশিয়ার উনিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের কিংবা সালাউদ্দিনের সময়কার আততায়ীদেরকে। এই প্রবীণেরা নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং নিজ পাঠকদেরকে আশ্বস্ত করতে ভালই তৎপর, "আমরা বিশেষজ্ঞরা তো এসব (সন্ত্রাসবাদ) আগেও দেখেছি।" জোর গলায় তারা দাবি করেন, আল-কায়েদার মতো দলগুলো নাকি কেবলই কিছু রাজনৈতিক নাটক আর তারা যেভাবে এসেছে, সেভাবেই নাকি বিলীন হয়ে যাবে। তাই তাদের পরামর্শ হলো, আমাদেরকে নাকি ধৈর্য্যশীল হতে হবে আর এইসব খারাপ লোকদেরকে নিয়ন্ত্রণে পুলিশের মতো বাহিনী ব্যবহার করতে হবে; সামরিক পদক্ষেপ নাকি হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

তাদের বিবরণগুলো ভালই যুক্তিযুক্ত; তাছাড়া আগাগোড়া নথিভুক্তও বটে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সেগুলোর প্রযোজ্যতা একটি নির্দিষ্ট সময়েই আবদ্ধ। উপরোল্লিখিত কোনো দলই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা জাতি-রাষ্ট্রের জন্য আদৌ অতটা হুমকি ছিল না, যতটা আল-কায়েদা – আমেরিকা আর তার মিত্রদের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া ওইসব গ্রুপের কারও আজকের ইসলামপন্থীদের মতো এতটা ভৌগলিক উপস্থিতি, (আক্রমণের) এতটা নাগাল, এত বিশাল তহবিল, জনশক্তি, মিডিয়া সক্ষমতা কিংবা যুদ্ধ সহনশীলতা ছিল না। আর বলাই বাহুল্য, তাদের কারও কাছেই নিজেদের সংস্কৃতির লোকদের আগা-গোড়ায় আবেদন সৃষ্টি করার মতো মানসিক ও তাত্ত্বিকভাবে দক্ষ কোনো নেতা ছিল না। 'আল-কুদস আল-আরাবি'-এর প্রধান সম্পাদক আবদুল বারি আতওয়ানের (Abdel Bari Atwan) সাথে যদিও আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একমত নই; সেটা হলো – 'উসামা বিন লাদেন আজ কেবলই একজন প্রতীকী নেতা ছাড়া কিছুই নন'। কিন্তু তাঁর The Secret History of Al-Qaeda গ্রন্থে পুরোনো সন্ত্রাসের সাথে আল-কায়েদাকে মেলানোর প্রবীণ

ধারণাকে উপযুক্ত যুক্তিতেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। আতওয়ান লিখেন,

> *"উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর ইতিহাসে আল-কায়েদা অনন্য। কোনো সন্ত্রাসীদের বৈশ্বিক আবেদন সৃষ্টির ঘটনা এটিই প্রথম। এর দুটো কারণ আছে। প্রথমত, পুরো বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা। এর ফলে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মুসলিমই অনায়াসে ইলেক্ট্রনিক উম্মাহর অংশ হয়ে যেতে পারে, যার জিহাদি শাখাটি আল-কায়েদার তৈরিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত।*
>
> *সাংগাঠনিক দিক থেকে আল-কায়েদা অনন্য। এখানে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতীকী মেধা এবং অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিনই তাদের মাঠ পর্যায়ের কমান্ডারদের লজিস্টিক সাপোর্ট বেড়ে চলেছে, যার বিস্তৃতি এখন ৪০টিরও বেশি দেশজুড়ে। আবারও বলি, এমনটা ইন্টারনেটের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ইন্টারনেটই এমনসব দল এবং সেগুলোর নেতৃবৃন্দের জন্য আদর্শিক ও কৌশলগত কাঠামো বজায় রাখা কিংবা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের উপায় করে দিয়েছে।*
>
> *এবং দ্বিতীয়ত, আল-কায়েদা বিপদসীমায় রীতিমতো অতুলনীয় কেননা তারা ইসলামের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বিশ্বের ১৭০ কোটি মুসলিমের হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। আর বিশ্বের ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামই নিজের ছায়াতলে যুদ্ধকে ফরজ (আবশ্যক) করেছে।"* [8]

আল-কায়েদা এবং তার মিত্ররা সমস্ত সমীকরণেই পুরোনো সন্ত্রাসবাদের তুলনায় ভিন্ন। কিন্তু প্রবীণ অভিজ্ঞ ন্যারেটিভের বিশেষজ্ঞরা মর্মান্তিকভাবে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। আল-কায়েদা দমনের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ হলো – মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে (পুতুল সরকারের মাধ্যমে) আরও কঠোরভাবে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, আরও বেশি হস্তক্ষেপ, সেসব রাষ্ট্রের পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক উন্নতি, নারীর অধিকার প্রচার করা ইত্যাদি। সহজভাষায়, দেড়শো কোটি মুসলিমদেরকে আরও বেশি পশ্চিমা করে তোলা।

---

8 Abdel Bari Atwan, The Secret History of al-Qaeda (University of California Press), p. 220.

সুতরাং তারা যা সমাধান দেন, তা হলো –

(১) মুসলিম বিশ্বকে গণতন্ত্রীকরণের দিকে চাপ দেওয়া;

(২) মুসলিমদের ঘৃণামূলক বক্তব্য বন্ধ করতে বিশ্বব্যাপী ঘৃণাবিরোধী সুশীল দল গঠন করা;

(৩) আরও চৌকস নীতিমালা এবং আরও গোছালো পুলিশি সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা;

(৪) আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ এবং কাশ্মীরি বিদ্রোহে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বাড়ানো এবং এইসব প্রচেষ্টায় আমেরিকান তহবিল আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা;

(৫) এমন একটি সংঘবদ্ধ কৌশল গড়ে তোলা, যার দরুণ আমেরিকার সমস্ত সরকারি সংস্থা থেকেই বিশ্বের 'ঝুঁকিপূর্ণ সমাজে পূর্ণ সহায়তা'র জন্য এগিয়ে যাওয়া হবে;

(৬) অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকেও এইরকম উদারনীতি গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া। [9]

এই প্রবীণ বক্তাদের সময় যে বহু আগেই গত হয়ে গিয়েছে, তার সবচেয়ে নিশ্চিত লক্ষণটা সম্ভবত এটাই যে – তারা এমন এক যুদ্ধকে দমানোর জন্য আমেরিকার হস্তক্ষেপ বাড়াতে বলছে, যার উৎপত্তিই কিনা হয়েছে আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণেই।

---

9 Mary Habeck, Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror (New Haven: Yale University Press, 2006), pp. 176–177; Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), p. 182; Jonathan Randall, Osama: The Making of a Terrorist (New York: Knopf, 2004), p. 39; Bruce Riedel, The Search for al-Qaeda: Its Leadership, Ideology, and Future (Washington, D.C.: Brookings Institution, 2008), pp. 136–147; David Kilcullen, The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One (New York: Oxford University Press, 2009), p. 289; Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat (New York: Random House, 2006).

সাবেক সহকর্মী ন্যারেটিভ

জিহাদপন্থীদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত, কারাবন্দী কিংবা বহিরাগত এমন অনেকে রয়েছেন, যারা তাদের অজস্র লিখা-বক্তব্যের মাধ্যমে উসামা বিন লাদেনের সমালোচনা করে থাকেন। তাদের অনেকেই ছিলেন মুজাহিদ, যারা কিনা স্বেচ্ছায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানদের পাশে থেকে লড়াই করেছিলেন (১৯৭২-১৯৯২)। আর তাই তাদের মতামতগুলো গড়ে উঠেছে একেবারে চোখে দেখা অভিজ্ঞতা থেকে। তাছাড়া সেগুলো তথ্যপূর্ণও বটে। অতএব উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা সংক্রান্ত যে কোনো গবেষণায় সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।[10] এখানে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার জন্য আমি যে তিনজন মানুষের কাজকে বেছে নিয়েছি, তারা প্রত্যেকেই বুদ্ধিদীপ্ত এবং সাহসী বীর। আর প্রায়ই তারা বিন লাদেনের সমালোচনা করে থাকেন। এই তিনজনের নিজেদের মধ্যে যা-ই মতপার্থক্য থাকুক না কেন, তাদের সমালোচনাগুলো মোটামোটি তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়,

(১) জিহাদি কাউন্সিলগুলোয় তাদের মতামত প্রাধান্য পায়নি;

(২) তারা ব্যক্তিগত কোনো লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং/অথবা তাদের পছন্দের কোনো নেতা হারিয়ে গেছে;

(৩) তারা বিন লাদেনের কৌশলগত কর্মপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[11]

---

10 'সাবেক সহকর্মী ন্যারেটিভ' ব্যক্তি বা সংগঠনের ব্যাপারে জানাশোনা কিংবা মূল্যায়নের যোগ্য হতে পারে ঠিক। কিন্তু যে 'চোখে দেখা অভিজ্ঞতার' ভিত্তিতে সাবেক সহকর্মী ন্যারেটিভ এই সমীকরণে আসে, সেই একই ভিত্তিতে 'বর্তমান সহকর্মী ন্যারেটিভ'-কেও সমীকরণে স্থান দেওয়া অপরিহার্য হয়। কেননা সাবেক সদস্যদের ন্যারেটিভে যেমন একপক্ষীয় বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, বিপরীতভাবে বর্তমান সদস্যদের তথ্য ও মূল্যায়নে তা যথার্থভাবে খন্ডিতও হতে পারে। বলাই বাহুল্য, উভয়পক্ষের বক্তব্য জানতে পারলেই কেবল কোনো একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

11 ইসলামি শরিয়ায় কৌশলগত কোনো ব্যাপারে একইসাথে একাধিক কর্মপন্থা বা উপায় অবলম্বন জায়িজ হলে সেই জায়িজ বিষয়গুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক পন্থাকে অপরগুলোর ওপর প্রাধান্য দেওয়া যেতেই পারে। এমনসব ক্ষেত্রে কেউ একমত না হয়ে সহকর্মী থেকে সাবেক সহকর্মী হয়ে গেলেই তা সংগঠন কিংবা নেতৃবৃন্দের ত্রুটি নির্দেশ করে না। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সংগঠনের কোনো সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করতে হলে শারঈ এবং কৌশলগত সবগুলো ফ্যাক্টর সামনে রেখেই মূল্যায়ন করতে হবে।

আবারও বলছি, এই ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই এক সময়ের সত্যিকার মুজাহিদ। আর ইসলামপন্থীদের আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য তাদের বক্তব্যে প্রচুর খোরাক রয়েছে। অবশ্য তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে একান্ত ব্যক্তিগত মতামতও রয়েছে।

আলজেরীয় মুজাহিদ আবদুল্লাহ আনাস আফগানিস্তানের একজন বিদ্রোহী হিসেবে সাহসের সাথে লড়াই করেছিল। কিন্তু সেই সাহসিকতা আবার এমন পর্যায়েরও ছিল না, যেমনটা সৌদি ন্যারেটিভে প্রভাবিত লরেন্স রাইট তাকে অভিহিত করেন – 'আরব-আফগান যোদ্ধাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।' [12] সে ছিল শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাংগাঠনিক সহযোগী এবং জামাতা। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে আবদুল্লাহ আযযামকে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনার পর আনাস তার শ্বশুরের সংস্থা, ফান্ডিং এবং সৈন্য নিয়োগ নেটওয়ার্কের ওপর ক্ষমতা লাভ করতে চেয়েছিল। আফগান ও অনাফগান মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীদের পরিচালনা সম্পর্কে আনাসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবদুল্লাহ আযযামের মতোই। আর আবদুল্লাহ আযযামের মতোই সে বিশ্বাস করতো যে, তাজিক সেনাপতি আহমাদ শাহ মাসউদই ছিল একমাত্র আফগান, যে কিনা সোভিয়েতরা চলে যাওয়ার পর আফগানকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। [13]

---

12 Lawrence Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 (New York: Knopf, 2006), p. 135

13 আফগানিস্তানে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালে আহমাদ শাহ মাসউদ বীরের মতোই যুদ্ধ করেছিল। সেসময় তার মাঝে ইসলাম বিরোধী কিংবা শরিয়াহ বিরোধী কিছুই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু সোভিয়েতরা চলে যাবার পর থেকে ধীরে ধীরে তার অবস্থান স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৯৬-এ তালেবান সরকার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে শরিয়াহ কায়েম করলে তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রব্বানি এবং আহমাদ শাহ মাসউদ সহ আফগান জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃবৃন্দ মিলে সেই বছরের শেষের দিকে Afghan Northern Alliance (সংক্ষেপে শুধু Northern Alliance) গঠন করে তালেবান এবং আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সেই সময় Northern Alliance-এর সামরিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আহমাদ শাহ মাসউদ।

মোদ্দাকথা হলো, আহমাদ শাহ মাসউদ প্রথম শ্রেণির সমরকুশলী ছিল ঠিকই, কিন্তু তা ঠিক দ্বীন ইসলাম কিংবা শরিয়াহ শাসনের জন্য ছিল না। আর শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সময় প্রথমদিকে তার এই ব্যাপারগুলো গোপন থাকলেও পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়ে যায়। কিন্তু সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালীন অবস্থাতেই মাসউদের মূল চরিত্র ফাঁস হয়ে গেলে মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল বলে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম সেসময় মাসউদকে আপাতত ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেষদিকে তিনি নিজেই মাসউদকে প্রকাশ করে দিতে মনস্থির করেছিলেন। উসামা বিন লাদেনের এক সময়ের বডিগার্ড আবু জান্দালের তথ্য অনুযায়ী, শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এক পর্যায়ে মাসউদের ব্যাপারে সতর্ক করে বই লিখারও নিয়্যাত করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই শাইখকে শহীদ করে দেওয়া হয়। দেখুন Khalid al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 10."

আনাস একবার বলেছিল, ‘‘মাসউদ এমনই একজন প্রথম শ্রেণির সমরকুশলী, যিনি স্বভাবে ছিলেন সাদাসিধে কিন্তু তাঁর মধ্যে আরব ও আফগান সেনাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব তৈরি করে দেওয়ার মতো সবকিছুই ছিল।’’ [14]

কিন্তু আনাসের মনমতো কিছুই কার্যকর হয়নি, যেমনটা স্টিভ কোল (Steve Coll) রূপায়ন করেছেন, ‘‘আবদুল্লাহ আযযামের রেখে যাওয়া জিহাদ, সৈন্য নিয়োগ আর সাহায্যকারী নেটওয়ার্কগুলোকে নিজ আয়ত্তে নেওয়ার যে স্বপ্ন আনাস দেখেছিল, তা উসামা বিন লাদেন ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।’’ [15] আনাস এখন (২০১০-২০১১) ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছে এবং সেখান থেকেই সে সময়ে সময়ে বিন লাদেনের দিকে গুলি ছোঁড়ে (সমালোচনা করে)। [16]

আনাসের সমালোচনাগুলো মোটামোটি অনুমেয় পথ ধরেই এগোয়। অনাফগান (বিশেষত আরব) মুজাহিদদের পরিচালনাকে কেন্দ্র করে শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে উসামা বিন লাদেন দ্বিমত করেছিলেন। আবদুল্লাহ আযযাম এবং আনাস তাঁদেরকে আফগানদের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বিন লাদেন চেয়েছিলেন তাদেরকে আলাদাই রাখতে। [17] পরবর্তীতে শাইখ আযযাম নিহত হলে উসামা বিন লাদেন আনাসকে একপেশে করে দেন। এরপর সোভিয়েত পরবর্তী গৃহযুদ্ধে বিন লাদেন তালেবানদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে যান। তখন তিনি আবদুল্লাহ আযযামের (এককালের) এবং আনাসের (সবসময়) সমর্থিত আহমাদ শাহ মাসউদের বিরোধিতা শুরু করেন; এমনকি মাসউদকে হত্যারও ব্যবস্থা করেন। আনাসের বিশ্বাস – উসামা বিন লাদেন সৌদির সাংগঠনিক কিংবা রাজনৈতিক দক্ষতার কারণে হুমকি হয়ে ওঠেননি, বরং সেটার কারণ ছিল কিছু মিশরীয় ইসলামপন্থী যারা কিনা তাঁর হৃদয় ও মন জয় করে নিয়েছিল। আর সেই মিশরীয়রা এসে নাকি উসামা বিন লাদেন এবং শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আনাস

---

14 Muhammad al-Shafi’i, “Arab Afghan says Usama bin Ladin’s force strength overblown,” Al-Sharq al-Awsat (Internet version), 6 October 2001.

15 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York: Penguin, 2005), p. 204.

16 Al-Shafi ’i, “Arab Afghan says Usama bin Ladin’s force strength overblown.”

17 জাজির যুদ্ধের পর শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেনের মধ্যকার এই মতপার্থক্যের অবসান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ আনাস বিষয়টিকে এমনভাবে প্রচার করেছে যেন তা শেষ পর্যন্তই অনেক বড় কিছু ছিল। পরবর্তীতে এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

আরও বলে বেড়িয়েছে, আবদুল্লাহ আযযাম নাকি বিন লাদেনকে ডা. জাওয়াহিরির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। আইমান আজ-জাওয়াহিরিকে নাকি তিনি বলেছিলেন গোলমাল পাকানো লোক। [18] এগুলো ছাড়াও আনাস আরও ধারণা করেছিল যে, আরব স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে উসামা বিন লাদেনও নাকি সেই দলে ছিলেন, যারা আফগানে যাবার বদলে পেশোয়ারেই থেকে যাওয়া বেছে নিয়েছিলেন। [19] আনাসের মতে – বিন লাদেনের শুধু সাহসিকতারই অভাব ছিল না, বরং তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতাও নাকি ছিল বাজে ("সংগঠক হিসেবে – পুরোপুরি এক বিপর্যয়")। [20] আর তাঁর "কোনো নিজস্ব সার্কেল, ক্যাম্প কিংবা সরবরাহ ডিপোর কোনো অবকাঠামোও ছিল না।" এককথায় মিশরীয়দের সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত উসামা বিন লাদেনের নাকি কিছুই ছিল না। [21]

আরও এক সাবেক সহকর্মী – হাশিম আল-মাক্কি ওরফে আবু ওয়ালিদ আল-মিশরিও সোভিয়েত-বিরোধী জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। যদিও হাশিম আল-মাক্কি আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার কথা দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন, [22] কিন্তু তিনি কট্টর আমেরিকাবিরোধী। এমনকি তিনি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেনের মতো সামরিক তৎপরতা প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে করেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমি শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে একমত হয়েছি। বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় ইসলামের দ্বীন ও স্বার্থ রক্ষার একমাত্র পন্থা হলো জিহাদ। মুসলিমদের মূল যুদ্ধ আজ ইহুদি আর ওদের ক্রুসেডার মিত্রদের বিরুদ্ধে।" [23]

উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে হাশিম আল-মাক্কির সমস্ত সমালোচনা মূলত তালেবান প্রধান মোল্লা মুহাম্মাদ উমার আর তাঁর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে। আর তিনি এটাও মনে করতেন যে, মোল্লা উমার এবং আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত – উভয়ের ওপরই উসামা বিন লাদেনের নাকি বাজে এক প্রভাব ছিল।

---

18 Wright, The Looming Tower, p. 130.

19 Al-Shafi'i, "Arab Afghan says Usama bin Ladin's force strength overblown."

20 Peter Bergen, The Osama bin Laden I Know (New York: Free Press, 2006), p. 105.

21 Al-Shafi'i, "Arab Afghan says Usama bin Ladin's force strength overblown."

22 "Hotline to jihad", Leah Farrall, Australian (Internet version), 7 December 2009; Sally Neighbor, Australian (Internet version), 11 December 2009.

23 Muhammad al-Shafi'i, "Arab Afghans' theorist writes in book found by U.S. forces after Taleban's fall, part 1," Al-Sharq al-Awsat (Internet version), 24 October 2006.

হাশিম ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আল-জাজিরা টেলিভিশনের কান্দাহার ব্যুরো চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন; আর সেখানেই তিনি মোল্লা উমারের ঘনিষ্ঠ হন। [24] হাশিমের দাবি অনুযায়ী, যদিও মোল্লা উমার বিশ্বাস করতেন যে সাধারণভাবে মিডিয়াগুলো "অনৈতিক" এবং "মূলত মিথ্যাচার"-এর ওপরই নির্ভরশীল, কিন্তু তবু তিনি তাকেই তালেবানদের মাসিক পত্রিকা 'ইমারাত'-এর আরবি সংস্করণ প্রকাশের জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই মোল্লা উমারের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে ওঠে। তার ভাষায়, মোল্লা উমারকে তিনি "একজন শান্ত কিন্তু বলিষ্ঠ চরিত্রের একজন মানুষ" হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। এছাড়াও কথিত আছে যে, বিদেশি মুসলিমদের মধ্যে হাশিম আল-মাক্কিই নাকি মোল্লা উমারের কাছে সর্বপ্রথম আনুগত্যের বায়াত দিয়েছিলেন এবং তালেবানদের ইসলামি রাষ্ট্রকে সর্বাত্নক সহায়তা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। [25]

৯/১১-এর আগে হাশিম আল-মাক্কি সাহেবের কাছ থেকে উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনো সমালোচনা পাওয়া যায় না। বরং তার সমস্ত বিরোধিতা শুরু হয় ৯/১১-এর ঘটনা এবং তালেবানদের পতনের পর। তখন থেকেই তিনি উসামা বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর "সামগ্রিক পরিণাম" সম্পর্কে এতকালের "গোপন সব তথ্য" প্রকাশে হঠাৎ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এমনকি তার দৃষ্টিতে উসামা বিন লাদেনের রাজনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্যের "চরম দুর্বলতা"ও তিনি স্পষ্ট করতে শুরু করেন। [26] পুরনো স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছিলেন, উসামা বিন লাদেন নাকি আল-কায়েদার "নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যই ছিলেন না।" [27]

এছাড়াও (নিজে মিডিয়ার লোক হওয়া সত্ত্বেও) হাশিম আল-মাক্কি সাহেব মিডিয়া – বিশেষত আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রতি উসামা বিন লাদেনের বিবৃতি ও সম্বোধনকে "উন্মাদ আকর্ষণ" বলে অভিহিত করেছিলেন। আর সেই কারণেই নাকি মোল্লা উমার সেসময় আমেরিকা সহ অন্যান্য শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছিলেন; অথচ তালেবানরা

---

24 Muhammad al-Shafi'i, "The story of Abu Walid al-Masri," Al-Sharq al-Awsat (Internet version), 11 February 2007.

25 "The Arab Afghans, part 3," www.aawsat.com, 9 July 2005; Farrall, "Hotline to jihad."

26 "Welcome in Yemen, bin Ladin, but!" Al-Mahrusah (Internet), 6 December 2002; and al-Shafi'i, "The story of Abu Walid al-Masri."

27 "The Arab Afghans, part 2," www.aawsat.com, 1 July 2005.

তখনও কেবল শক্তি সঞ্চয় করছিল। [28] এগুলো ছাড়াও, উসামা বিন লাদেন নাকি "চূড়ান্ত একক নেতৃত্ব" চাইতেন, তিনি "বিস্ফোরক বেল্ট আর গাড়ি-বোমাকে জিহাদের সমার্থক" বানিয়ে ফেলেছিলেন, "পা মাটিতে পড়বে কিনা, তা না ভেবেই বিন লাদেন শুন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পছন্দ করতেন"... ... এই সবকিছুই হাশিম আল-মাক্কি অনেক ক্ষোভের সাথে লিখেছেন। [29] তার উপসংহার হলো, উসামা বিন লাদেনের কারণেই তালেবান পরাজিত হয়েছিল এবং "ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ" আফগানিস্তান ইসলামি রাষ্ট্রের পতন হয়েছিল। [30] কিন্তু আশ্চর্যজনক হলো, তিনি ৯/১১-এর হামলার নিন্দা করেন না; বরং উসামা বিন লাদেন মোল্লা উমারের জন্য কতোটা সমস্যা তৈরি করেছিলেন, তিনি কেবল সেদিকটাই ফোকাসে রাখেন। তার ভাষায়, "এই ধার্মিক মানুষটি (মোল্লা উমার) সবকিছু ছেড়েছুড়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করে ছিলেন, স্রেফ যেন তাঁর কাছে আশ্রয় খোঁজা মুসলিমদেরকে বিপদে পড়তে না হয়।" [31] [32]

বর্তমানে আল-কায়েদা ও সমঘরানার ইসলামপন্থী সমর বিশ্লেষকদের মাঝে প্রবীণ আরব আফগান আবু মুসআব আস-সুরির কদর খুব বেশি। [33] আবু মুসআব আস-সুরি ওরফে উমার আবদুল হাকিমের আসল নাম মুস্তফা বিন আবদুল কাদির সেতমারিয়াম নাসার। তাঁকে প্রায়ই উসামা বিন লাদেনের পর এই আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন যোগ্য 'উত্তরসূরি' হিসেবে অভিহিত করা হতো। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্যতম হলো, ৯/১১-এর মতো বিরাট আক্রমণের বদলে বিশ্বজুড়ে স্বতন্ত্র লোন উলফ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল

---

28 "The Arab Afghans, part 1," www.aawsat.com, 29 June 2005, and "The Arab Afghans, Part 3."

29 Farrall, "Hotline to jihad," and al-Shafi'i, "Al-Qaeda fundamentalist: Bin Laden believed the media exaggerations about him."

30 "The Arab Afghans, part 1."

31 "Welcome in Yemen, bin Ladin, but!"

32 তাঁর কাছে আশ্রয় খোঁজা মুসলিমরা বলতে এখানে মূলত উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি সহ ভিনদেশি মুজাহিদদের কথা বোঝানো হচ্ছে। আর তাঁদের 'বিপদে পড়তে না হয়' বলতে ৯/১১-এর পরে আমেরিকার দাবি অনুযায়ী উসামা বিন লাদেন সহ ভিনদেশি মুজাহিদদেরকে আমেরিকার কাছে তুলে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ৯/১১-এর হামলার কেউ পক্ষপাতিত্ব করুক কিংবা না করুক, যুদ্ধরত কাফিরদের কাছে মুসলিমদেরকে সেভাবে তুলে দেওয়া আসলে ইরতিদাদ গণ্য হতো। তাই মোল্লা উমার আফগানের মসনদে থাকার চেয়ে সেখানকার পাহাড়কেই বেছে নিয়েছিলেন।

33 Brynjar Lia, Architect of Global Jihad: The Life of al-Qaeda Strategist Abu Musab al-Suri (New York: Columbia University Press, 2008).

তৈরির করে ক্ষুদ্র, স্বাধীন এবং বিক্ষিপ্ত আক্রমণ পরিচালনা করা। আস-সুরি যুক্তি দেখান যে, এই ধরনের হামলাগুলো পশ্চিমের হাতে আক্রমণকারীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঠেকাবে। কারণ এক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের কোনো নির্দিষ্ট সামরিক বেইজ কিংবা খুঁজে বের করার মতো কোনো সাংগাঠনিক সংশ্লিষ্টতা থাকছে না।[34]

অবশ্যই এই ধরনের পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়। জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো এমন পরিকল্পনা যুগ যুগ ধরেই ব্যবহার করে আসছে; তাও আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে ইউরোপের IRA ও ETA, আর আন্তর্জাতিকভাবে রয়েছে আবু নিদাল কিংবা কার্লোস দ্য জ্যাকালের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো। এসমস্ত আক্রমণ স্রেফ কিছু ছোটখাটো উপদ্রবের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেনি। সাফল্যের জন্য কিছুটা হলেও নিয়মতান্ত্রিক ও সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ে।

কিন্তু এই ব্যাপারটি আস-সুরি এবং তাঁর মতো বিক্ষিপ্ত আক্রমণ পছন্দকারীদের কাছে রীতিমতো অভিশপ্ত। তাছাড়া আর যাই হোক না কেন, ১৯৯৮-এ ‘ক্রুসেডার এবং ইহুদি বিরোধী ওয়ার্ল্ড ফ্রন্ট’ গঠনের পর থেকে বিক্ষিপ্ত হামলা সর্বদাই আল-কায়েদার সেকেন্ডারি বা পরোক্ষ কৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ২০০১ সালে আইমান আজ-জাওয়াহিরির লেখা Knights under the Prophet’s Banner বইতেও ব্যাপারটিকে এভাবেই সমর্থন করা হয়। আর উসামা বিন লাদেন এই ধরনের আক্রমণকে উৎসাহিত করেছেন ঠিক, কিন্তু আস-সুরির বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করেন, এই ধরনের হামলা শত্রুদেরকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ঠিক, এমনকি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যেও কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু (শুধুমাত্র) এই ধরনের হামলা কখনও বিজয় এনে দিতে পারে না।[35]

---

34 Lia, Architect of Global Jihad, p. 7.

35 এখানে যে দুইটি কৌশলের কথা বলা হয়েছে, তা পরস্পর সাংঘর্ষিক কিছু নয়। পরবর্তীতে আল-কায়েদা অঞ্চলভেদে উভয় পদ্ধতিতেই গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু আবু মুসআব আস-সুরির জীবনী লেখক ব্রিঞ্জার লিয়া তার বই Architect of Global Jihad-এর অনেক জায়গাতেই এই ব্যাপারগুলোকে পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং আল-কায়েদা নেতৃত্বের সাথে আবু মুসআব আস-সুরির চরম দ্বন্দ্ব হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। আর মাইকেল শইয়ারও এক্ষেত্রে ব্রিঞ্জার লিয়ার অন্ধ অনুসরণ করে আবু মুসআব আস-সুরিকে ‘সাবেক সহকর্মী ন্যারেটিভের’ একজন স্যাম্পল হিসেবে নিয়েছেন, যা স্পষ্টই ভুল। এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত টিকা সামনে আসছে।

আবু মুসআব আস-সুরি বেশ কয়েক বছর ধরে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কৌশল ও মিডিয়া পরিচালনায় তাঁর সাথে থেকে কাজ করেছিলেন। আল-কায়েদার সদস্য ছিলেন ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত।[36] উসামা বিন লাদেন আস-সুরির পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তিনি নাখোশ হয়েছিলেন। তিনি হয়তো নিজেকে বিন লাদেনের চেয়েও বেশি চৌকস ও দক্ষ বলে মনে করতেন; যেমনটা ব্রিঞ্জার লিয়া (Brynjar Lia) তার অসাধারণ বইয়ে উল্লেখ করেছেন।[37] [38]

---

36 প্রকৃতপক্ষে আবু মুসআব আস-সুরি কখনোই আল-কায়েদার সাথে একেবারে সম্পর্কচ্ছিন্ন করেননি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত আফগান-আরব ক্যাম্পের প্রশিক্ষক এবং লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর উসামা বিন লাদেনের অনুমতিতেই স্পেন এবং ব্রিটেনে নিজের মতো করে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে ফিরে আসার সময় তিনিও আফগানিস্তানে চলে আসেন এবং পুনরায় একটি মুজাহিদ ক্যাম্পের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি আল-কায়েদার একটি মিডিয়া সেলেও কাজ করেছিলেন দীর্ঘদিন। এরপর থেকে ২০০৫ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আল-কায়েদার অন্যতম সমর বিশেষজ্ঞ হিসেবেই ছিলেন।

37 Lia, Architect of Global Jihad, pp. 279, 290.

38 যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনেই একজনের মতের ওপর আরেকজন মত প্রাধান্য পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এখানে ব্রিঞ্জার লিয়ার অনুকরণে লেখক যে উপসংহার টেনেছেন, তা মোটেও বিশুদ্ধ নয়। কেননা প্রথমত, আবু মুসআব আস-সুরি কখনোই আল-কায়েদার ছায়া ত্যাগ করেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁর চিন্তাধারার সাথে উসামা বিন লাদেন সহ আল-কায়েদা নেতৃত্বের চিন্তার পার্থক্য খুঁজলে তা ছিল কেবলই কৌশলের প্রাধান্যের ব্যাপারে; আর তাও ছিল সাময়িক। এর প্রমাণ হলো, ২০০৫ সালে আবু মুসআব আস-সুরির লিখিত 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামা' কিংবা The Global Islamic Resistance Call বইয়ে তিনি যে আধুনিক যুদ্ধের সেলভিত্তিক কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন, তা আল-কায়েদা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গ্রহণ করেছে। এমনকি উসামা বিন লাদেন বেঁচে থাকতেই ২০১০ সালে আল-কায়েদার ইংরেজি ম্যাগাজিন Inspire-এর প্রথম ইস্যু থেকেই The Jihadi Experiences শিরোনামে আবু মুসআব আস-সুরির বই থেকে ধারাবাহিক সিরিজ প্রকাশ করা হতে থাকে। তাছাড়া পরবর্তীতে আল-কায়েদা নেতৃত্বের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যেও আবু মুসআব আস-সুরির নাম শ্রদ্ধার সাথে একাধিকবার উঠে এসেছে।

যেভাবে বললে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হয় তা হলো – উসামা বিন লাদেন, ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি, আবু মুসআব আস-সুরি প্রমুখের চিন্তাধারার সমন্বয় করেই শেষ পর্যন্ত আল-কায়েদার সর্বশেষ কর্মপন্থা গড়ে উঠেছে। এখানে আফগানিস্তান, ইরাক বা সিরিয়ার মতো অঞ্চলের জন্য সেনাবাহিনী এবং প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, আর অন্যান্য যুদ্ধবিহীন অঞ্চলের জন্য সেলভিত্তিক একাকি জিহাদকে ব্যাপকভাবে প্রমোট করা হয়েছে। তাই এই পুরো অংশে আবু মুসআব আস-সুরিকে যেভাবে আল-কায়েদা নেতৃত্বের একজন প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তা আদৌ বিশুদ্ধ নয়।

৯/১১-এর পর বিন লাদেনের ব্যাপারে আস-সুরির সমস্ত সমালোচনাই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। (এরপর) ২০০৫ সালে আস-সুরি গ্রেপ্তার হন এবং এখনও তিনি বন্দী অবস্থাতেই আছেন – এমনটাই অন্তত সিরিয়া প্রশাসনের দাবি। [39] [40]

উসামা বিন লাদেনের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এসমস্ত সাবেক সহকর্মীরা কিন্তু আদৌ পশ্চিমের বন্ধু নয়। বিন লাদেনের সাথে তাদের মনোমালিন্য স্রেফ সময় আর কৌশল নিয়ে। তারা কেউই কিন্তু উসামা বিন লাদেনকে খারাপ মুসলিমও ভাবতেন না, এমনকি তাঁর কৌশলগত লক্ষ্যকে বাস্তবতা-বিবর্জিতও মনে করতেন না। হাশিম আল-মাক্কির ভাষায়, "কে উসামা বিন লাদেনের গুরুত্ব জানে না? কে জানে না তাঁর উদারতা, ধার্মিকতা, সাহসিকতা আর জিহাদে-ইবাদাতে তাঁর প্রবল উৎসাহের কথা?" [41] এমনকি হাশিমের বক্তব্যে বিন লাদেনের প্রতিধ্বনিও শোনা যায়... মুসলিমবিশ্বে আমেরিকার হস্তক্ষেপের প্রবল বিরোধিতার প্রতিধ্বনি, "আমরা এই যুদ্ধ চালিয়েই যাব যতক্ষণ না ওরা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে চলে যায়।" [42]

আর হাশিম আল-মাক্কির মতো আবু মুসআব আস-সুরিও তালেবানের পতনে কিছুটা নাখোশ থাকলেও, তিনি বিন লাদেনের World Front against Crusaders and Jews গঠনকে তিনি "একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ৯/১১-এর হামলাকেও সমর্থন করতেন; তাঁর মতে এর একটি ইতিবাচক প্রভাব ছিল এবং এর মাধ্যমে মুজাহিদদের ঐক্যের দ্বার খুলে গিয়েছিল। [43]

---

39 William Maclean, "Al-Qaeda ideologue in Syrian detention", Reuters Online, 10 June 2009.

40 আবু মুসআব আস-সুরিকে গ্রেপ্তারের জন্য আমেরিকা ৫০ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পাকিস্তানি গোয়েন্দারা বেশ কিছুদিন তাঁকে এবং তাঁর আশেপাশের যোদ্ধাদেরকে নজরদারি করার পর ২০০৫ সালের ৩১ অক্টোবর কোয়েটা শহরে তুমুল সংঘর্ষের পর গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। সময়টা ছিল সেবছরের রমাদানের ইফতারের সময়। এরপর পাকিস্তান আবু মুসআব আস-সুরিকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করেছে এবং আমেরিকা তাঁকে একজন Ghost Detainee হিসেবে বিভিন্ন ব্ল্যাক সাইট এবং কারাগারে গোপনে স্থানান্তরের ওপর রেখেছে। এই বইটি লিখার সময় অর্থাৎ, ২০১১ সালের দিকে আবু মুসআব আস-সুরি সিরিয়ার কোনো একটি কারাগারে আটক ছিলেন। ২০১৪ সালের এপ্রিলে স্বয়ং ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি একটি বক্তব্যে আবু মুসআব আস-সুরির তখনও গ্রেপ্তার হয়ে থাকার ব্যাপার উল্লেখ করেছিলেন।

41 "Welcome in Yemen, bin Ladin, but!" and al-Shafi'i, "Al-Qaeda fundamentalist: bin Laden believed the media exaggerations about him", p. 4.

42 Farrall, "Hotline to jihad."

43 Lia, Architect of Global Jihad, pp. 286 & 314.

রিয়াদ ন্যারেটিভ

'সৌদি আরব আসলেও আমেরিকার সত্য ও নির্ভরযোগ্য মিত্র' – আমেরিকান জনগণ ও সরকারের এহেন বিশ্বাসে ৯/১১ ক্ষয় ধরিয়ে দিয়েছিল। ৯/১১-এর হামলার ১৯ জন মুজাহিদদের মধ্যে ১৫ জনই ছিলেন সৌদি নাগরিক। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকানদের, এমনকি গোটা পশ্চিমের মনেই সৌদির ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। এর ওপর বুশ প্রশাসন যে উসামা বিন লাদেনের পরিবারকে আমেরিকা থেকে কোনোরকম প্রশ্নপর্ব ছাড়াই যেতে দিতে বাধ্য হয়েছিল, সেটাও হয়তো সম্ভব হয়েছিল সৌদির পক্ষ থেকে কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকার কারণে। ফলে সেসময় সৌদিদের জন্য 'আমেরিকার বন্ধু' ইমেজ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা সমস্ত প্রমাণাদি তাদের বিপক্ষেই রায় দিচ্ছিল।

কিন্তু রিয়াদের সৌভাগ্য যে, তারা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য শ্রোতা হিসেবে পেয়েছিল বুশ প্রশাসনকে। আর বুশ প্রশাসন আগের থেকেই বিশ্বাস করতে চাইতো যে, সৌদি রাজতন্ত্র তাদের বন্ধু। তাই উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে 'ভাল সৌদি ছেলেটা খারাপ মিশরীয়দের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে' ধরনের বয়ান প্রমাণের জন্য সৌদি (বুশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত) ওয়াশিংটনের ওপর আস্থা রাখতে পেরেছিল। বিশেষত এই ব্যাপারে যে, আমেরিকার মিডিয়া সৌদিকে যেভাবে খুশি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা আমেরিকাপন্থী প্রপাগান্ডা প্রচার করতে দিবে। তাছাড়া (লরেন্স রাইটের মতো) সাংবাদিকরাও উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে উচ্চপদের সৌদিদের - বিশেষত প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সালের থেকে - মন্তব্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। আর এসব কিছুর সাথে ছিল আমেরিকার কংগ্রেসে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সৌদপন্থী লবি! যেহেতু সামরিক খাতে রিয়াদ যে বিশাল অঙ্কের অর্থ ঢালতো, তা থেকে ওইসব অস্ত্র ব্যবসারীরা দারুণ মুনাফা করতো।

নিজের শ্রোতাদের স্বউদ্যোগে প্রভাবিত হওয়া ছাড়া সৌদিদেরকে তার দেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় সংহতিতে আঘাত না দেওয়ার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছিল। এছাড়াও সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছিল তাদের খিটখিটে তালেবান ভাইদেরকে রাগিয়ে দেওয়া থেকেও। বলে রাখা ভাল যে, ৯/১১ পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিকভাবে যে সৌদি-তালেবান

সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়, তা আদতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না [44] অবস্থা এমন ছিল যে, সৌদির পক্ষে যদি উসামা বিন লাদেনকে 'বাইরের কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন' বলে প্রমাণ করা না যায়, তাহলে তো সেখানকার উলামা ও শিক্ষাব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। কেননা তা এটাই ইঙ্গিত করে যে, সৌদির অভ্যন্তরীণ সিস্টেম দেশে-বিদেশে ভয়ঙ্কর মুসলিম তৈরি করছে যাদের মধ্যে রয়েছে ৯/১১-এর আক্রমণকারীরা, মোল্লা উমারের তালেবান এবং অন্যান্য সুন্নি ইসলামি দলগুলো। আর এমন চিত্রায়ন একবার সবার মনে গেঁথে গেলে তা সৌদির আলিমদেরকে চাপে ফেলে দিবে, দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও ভারসাম্যহীনতা বাড়িয়ে দিবে। তাছাড়াও এমন চিত্রায়ন কাবুলে তালেবানের মতো সরকার প্রতিষ্ঠায় সৌদিকে কূটনৈতিকভাবে অক্ষম করে দিবে, যা কিনা আফগানিস্তানের ব্যাপারে সৌদির আবহমান পররাষ্ট্র নীতি। [45]

প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সৌদির প্রপাগাণ্ডার প্রথম কৌশলটি ছিল ভুল। তারা দেখাতে চেয়েছিল যে বিন লাদেনের মা ছিলেন সিরিয়ান অর্থাৎ, সৌদির বাইরের। এছাড়া তিনি নাকি মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সবচেয়ে অবহেলিত স্ত্রী ছিলেন, তার ছেলে

---

44 এই কথা মতবিরোধপূর্ণ। তবে আমেরিকাপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে এমন মতামত আসাই স্বাভাবিক। কেননা কাফিরদেরকে খুশি করতে গেলে শারঈভাবে পুরো দ্বীন বিসর্জন করে দিলেও সেটা ওদের সংজ্ঞা, ওদের প্রয়োজন, ওদের মনমতো করে না হলে ওরা খুশি হয় না। এ কারণেই সৌদি আরব মুসলিম তালেবানদের ওপরে কাফির আমেরিকাকে বন্ধু হিসেবে বাছাই করার ইরতিদাদে জড়ালেও মাইকেল শইয়ারের মতো পশ্চিমা বিশ্লেষকদের মতে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে বিবেচিত হয়নি। আর অন্য অনেক জায়গায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ হলেও এই জায়গায় এসে গৎবাঁধা আমেরিকান পথেই তিনি হেঁটেছেন।

45 এমন ভ্রান্ত ধারণা লেখকের অতি সরলীকরণের ফল, বিশেষ করে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে। আমেরিকান লেখক এখানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়কালে আফগানিস্তানে সৌদি আরবের সাহায্যের ইঙ্গিত করে কথাগুলো বলেছেন। অথচ সৌদি শাসকদের প্রকৃত রূপ বোঝা যায় আফগানের জিহাদ আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘুরে যাওয়ার পর। লেখক নিজেই প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন যে, ৯/১১-এর পরে সৌদি নিজেদেরকে আমেরিকার বন্ধু প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু এখানে এসে আফগানের ব্যাপারে সৌদির পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে উল্টো কথা বললেন; যেখানে বাস্তবতা হলো সৌদির পররাষ্ট্র নীতি আমেরিকার স্বার্থরক্ষাকারীই ছিল; এমনকি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়ও।

আর রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়ে সৌদির (সহ সমস্ত বিশ্বের) যেসকল আলিমরা সেই জিহাদের পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হলে (বিশেষত ৯/১১-এর পর) তারাও মোটাদাগে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক দলের বক্তব্য ও অবস্থান সৌদি শাসকের মনঃপূত করে আমেরিকান স্বার্থের পক্ষে যায়, আর অন্য দলটির অবস্থান যায় তালেবান ও আল-কায়েদার জিহাদের পক্ষে। বলাই বাহুল্য, এই দুই দলের মধ্যে সৌদি সরকার প্রথম দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং দ্বিতীয় দলকে নানা মাত্রার জুলুম করেছে। কিন্তু এখানে ২য় দলটির অবস্থানকেই আফগানিস্তানের ব্যাপারে সৌদি আরবের আবহমান পররাষ্ট্র নীতি মনে করা হলে তা স্পষ্টতই ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(উসামা বিন লাদেন) নাকি কিশোর বয়স থেকেই বৈরুতের বারে বারে মারামারি, মাতলামি আর আজেবাজে কাজ করে বেড়াতো।[46] কিন্তু এগুলো হালে পানি পায়নি। কেননা এসবের কোনোটা বিন্দুমাত্রও সত্য না। উসামার মা আলিয়াকে বিশাল বিন লাদেন পরিবারের সবাই ভালবাসতো। আর উসামার ভদ্রতা ও স্বভাবও ছিল স্বচ্ছ ও প্রশংসিত। চূড়ান্ত বোকা কিংবা গোঁড়া সৌদপন্থী আমেরিকানরাই কেবল এইসব গালগপ্প গিলতে পারে। তছাড়া এসব গালগপ্প সৌদি প্রশাসনের জন্য গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতোও হয়ে গিয়েছিল; কেননা তা সৌদির শান্তিপূর্ণ ধর্মপ্রাণ সমাজচিত্রের বদলে ব্যর্থ বিয়ে আর নষ্ট যুবকদের সমাজচিত্র এঁকে দিয়েছিল।

প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সৌদি সরকার নিখুঁতভাবে এমন আরেক চিত্র আঁকার চেষ্টা চালায়, যা পরবর্তীতে এক সফল ও কার্যকরী প্রপাগান্ডা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এবার তারা উসামা বিন লাদেনের জীবনকে দুইটি ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগ অর্থাৎ শৈশব থেকে ১৯৯০-১৯৯১ এর উপসাগরীয় যুদ্ধ পর্যন্ত তাঁকে ভদ্র, সাংসারিক, পরিশ্রমী হিসেবে দেখানো হয়। আঁকা হয় পুরোদস্তুরভাবে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ধনী, আনুগত্যশীল পরিবারের 'সভ্য ছেলেটি' হিসেবে। বলা হয় – ১৯৯১ সালের আগে উসামা তাঁর পরিবারকে ভালবাসতেন, স্কুলে মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করতেন এবং বাবার কোম্পানির কাজ দেখাশোনা করতেন (আমি ১ম অধ্যায় থেকে ৩য় অধ্যায় পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রেই 'উসামা' শব্দটি ব্যবহার করেছি যেন অন্য বিন লাদেনদের সাথে বিভ্রান্তি তৈরি না হয়)। সব ভাল সৌদি যুবকের মতোই উসামা বিন লাদেন নাকি এমন অহিংস বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন যা কেবল আক্রমণ হলেই প্রতিরোধ করে। উদাহরণস্বরূপ - আফগানিস্তান জিহাদ। আফগানিস্তানের জিহাদ শুরু হলে অন্যসব ভাল সৌদি ছেলেদের মতোই তিনি কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে সোভিয়েতের রেড আর্মির বিরুদ্ধে লড়তে রওনা হয়ে যান। রিয়াদের চিত্রনাট্যে কোনো সুন্নি মুসলিমই সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী নয়, যতক্ষণ না তারা সৌদ পরিবারের বিরোধী হয়ে যায়। আর এখনও পর্যন্ত এমনটাই চলে আসছে।

উসামা বিন লাদেনের ১৯৯১ পূর্ববর্তী জীবনের মূল ন্যারেটিভে বাড়তি আস্তরণ দেওয়ার মতো ভাল সংখ্যক সৌদি ব্যক্তিত্বই ছিল – তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, আত্মীয়স্বজনরা ছাড়াও রাজদরবারে থাকা যুবরাজ, কর্মকর্তা থেকে সরকারি আলিমরা পর্যন্ত ছিল। ৯/১১-এর পরে তাদেরকে চিরুনি খোঁজা করে একত্র করা হয়েছিল, যাতে তারা উসামা বিন লাদেনের এহেন কর্মকান্ডে অবাক হওয়ার ভান করতে পারে। আর তাদের প্রত্যেকের মতেই, উসামা

46 Jane Mayer, "The house of bin Laden", New Yorker (Internet version), 12 September 2002.

আদৌ পার্থিব বিষয়ে আগ্রহী কেউ ছিলেন না। আর তিনি নাকি শৈশব থেকে যৌবন – কখনোই নেতৃত্ব দেওয়ার মতো পারঙ্গম কিংবা নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না। "তাহলে কোন বিষয়টা এত ভাল সৌদি যুবককে খারাপ বানিয়ে ছাড়লো?" সৌদির সেই নাট্যমঞ্চে যাদেরকে প্রশ্ন করে করে করে যে এই রিয়াদ ন্যারেটিভ / সৌদি ন্যারেটিভ দাঁড় করানো হয়েছিল, তা মোটামাথার পশ্চিমারা, বিশেষ করে আমেরিকান সাংবাদিকরা গোগ্রাসে গিলেছিল। সৌদির নাট্যমঞ্চের মূল মূল চরিত্রগুলো ছিল এমন,

প্রধান চরিত্র

- প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল: সাবেক সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ও আমেরিকায় সৌদির রাষ্ট্রদূত। [47]
- আহমাদ বদীব: প্রিন্স তুর্কির সাবেক চীফ অব স্টাফ এবং এককালে জেদ্দায় 'আস-সাগার' মডেল স্কুলে উসামা বিন লাদেনের জীববিজ্ঞান শিক্ষক।
- জামাল খাশোগি: উসামা বিন লাদেনের যৌবনের বন্ধু, প্রিন্স তুর্কির এক সময়ের উপদেষ্টা এবং ইদানিংকালে (২০০৫ পরবর্তী সময়ে) সৌদির একজন সিনিয়র সাংবাদিক। [48]

---

47 প্রিন্স তুর্কি আমেরিকায় সৌদির রাষ্ট্রদূত হিসেবে ছিল ২০০৫-২০০৬ সালে। আর এই বই লিখার সময়কাল ২০১০-২০১১। তাই আজকের হিসেবে তার রাষ্ট্রদূত পদটাও সাবেক।

48 ২০১৮ সালের অক্টোবরে সংঘটিত হওয়া জামাল খাশোগির হত্যাকান্ড বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ৯/১১-এর পরবর্তী সময়ে উসামা বিন লাদেনের মৃত্যু (২০১১) পর্যন্ত খাশোগি সৌদি ন্যারেটিভের অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবেই কাজ করেছেন। উসামা বিন লাদেনের সাথে পূর্ব ঘনিষ্ঠতার জের ধরে খাশোগির অনেক কথাই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হতো, যা কেবল সৌদি ন্যারেটিভকেই প্রমোট করেছে। জামাল খাশোগি নিজে সৌদির ১৯৭৯ পূর্ববর্তী লিবারেল প্রশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। আর সৌদির বর্তমান (২০২১) ক্রাউন প্রিন্স বিন সালমানও একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই লালন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ে সৌদি রাজ পরিবারের নানারকম জুলুমের বিরুদ্ধে কলম ধরায় ইস্তাম্বুলের সৌদি দূতাবাসের মধ্যে জামাল খাশোগিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।

নানা ঘটনাপ্রবাহের পর আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা CIA তদন্ত শেষে ঘোষণা করে যে, সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমানের নির্দেশেই নাকি খাশোগির হত্যাকান্ড সম্পন্ন হয়েছিল। দেখুন, "CIA concludes Saudi crown prince ordered Jamal Khashoggi's assassination". The Washington Post. Shane Harris; Greg Miller; Josh Dawsey, 16 November 2018. Archived.

- মুহাম্মাদ জামাল খলিফা: উসামা বিন লাদেনের যৌবনের বন্ধু, মুজাহিদ সাথী এবং উসামার বোনের সাবেক স্বামী।

- খালিদ আল-বাতারফি: বিন লাদেনের যৌবনের বন্ধু, মেডিকেল ডাক্তার এবং সময়ে সময়ে সৌদি সাংবাদিক।

- শাইখ মূসা আল-কারনি: সৌদির একজন শ্রদ্ধাভাজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৮০-এর দশকে উসামা বিন লাদেন ও আফগান মুজাহিদদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেসময় তিনি উসামার উপদেষ্টা হিসেবে শরিয়াহর বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যার দায়িত্বে ছিলেন। এখন তিনি উসামার বিরুদ্ধেই সৌদি প্রশাসনকে সমর্থন দেন।

- শাইখ সালমান আল-আওদাহ: উসামা বিন লাদেনের এক সময়কার প্রিয় সৌদি আলিম এবং সৌদ পরিবার বিরোধী সংস্কার আন্দোলনে এক সময় বিন লাদেনের সহযোদ্ধা। ১৯৯৪ সালে সৌদিদের দ্বারা জেলবন্দি হন। সেখানে নিজ অবস্থান থেকে সরে আসার জন্য প্ররোচিত হয়ে কিছু বছর পর মুক্তি পান। এখন (২০১০-২০১১) তিনি অন্যতম একজন বিন লাদেন বিরোধী ও সৌদিপন্থী আলিম। তার উচ্চ সার্টিফিকেট সমৃদ্ধ অবস্থান, বেশকিছু জনপ্রিয় টেলিভিশন প্রোগ্রাম এবং ওয়েবসাইট রয়েছে। [49]

পার্শ্ব চরিত্র

- প্রিন্স বান্দার বিন সুলতান - আমেরিকায় নিযুক্ত সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূত, বর্তমানে (২০১১) সৌদির জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

- প্রিন্স নায়েফ বিন আবদুল আজিজ - সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (২০১২ পর্যন্ত)

---

49 শাইখ সালমান আল-আওদাহ প্রথমে সাহওয়া সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৪ সালে কারাবরণের পর সৌদি প্রশাসন কর্তৃক প্ররোচিত হয়েছিলেন। আর স্পষ্টতই তিনি সৌদি প্রশাসনের প্রতি নমনীয় হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত টিকা যোগ করা হয়েছে।

উসামাকে ‘একটি ভাল ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে’ প্রতিষ্ঠা করার পর রিয়াদের একটি বিশ্বাসযোগ্য ‘খারাপ প্রভাব’-এর দিকে আঙ্গুল তোলার প্রয়োজন হলো। সাথেই ছিল মিশরীয় ইসলামি জিহাদের (Egyptian Islamic Jihad বা সংক্ষেপে EIJ) নেতা ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি। ব্যস, হয়ে গেল। সৌদির গল্পে ধারণা করা হয়, ১৯৮০ সালে পেশাওয়ারে ডা. জাওয়াহিরির সাথে থাকার সময় থেকেই বিন লাদেনের পতন শুরু হয়েছিল। ডা. জাওয়াহিরিই নাকি সৌদির এই ভদ্র যুবককে এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছেন, যার ব্যাপারে পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিল “মন্দলোক” আর ওবামা প্রশাসন ডেকেছিল “একজন খুনি গুন্ডা”। আর উসামা বিন লাদেনের নিজের ছেলে উমার সৌদির এই চিত্রায়ন পূর্ণ করে দিয়ে বলেছিল, “আমার আব্বার ওপর মিশরীয় ডাক্তারটির খারাপ প্রভাব ছিল।” [50]

প্রথম পর্যায়ের গল্পে বলা হয়, ডা. জাওয়াহিরি তরুণ ও অনভিজ্ঞ উসামাকে বন্ধু বানান। এরপর নাকি শাইখ আযযাম এবং আহমাদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে তাঁর মনকে বিষাক্ত করে তোলেন। এমনকি ডা. জাওয়াহিরি নাকি আবদুল্লাহ আযযামকে আমেরিকা ও সৌদির দালাল আখ্যা দেন। [51] এছাড়া ‘নিতান্ত সাধু’ আফগান কমান্ডার আহমাদ শাহ মাসউদের নামেও নাকি ডা. জাওয়াহিরি উসামাকে ভুল বোঝান। এমনকি এক সময় উসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সার্কেলে নাকি ডা. জাওয়াহিরি নিজের সহকর্মীদেরকে প্রবেশ করাতে শুরু করেন; এমনকি ক্রমান্বয়ে আল-কায়েদার মধ্যেও। আর এগুলো ১৯৮৮ সালে আল-কায়েদা গঠিত হওয়াকালীন সময়ের কথা। এভাবেই নাকি আইমান আজ-জাওয়াহিরি এক সময়ের ভদ্র উসামা বিন লাদেনকে এমন এক মানুষে রূপান্তর করেন, যে কিনা শুধু ‘খুন করতেই বাঁচে’।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে বলা হয় উসামার সুদানে থাকাকালীন সময়ের কথা। সেই সময়েই নাকি ডা. জাওয়াহিরি বিন লাদেনের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে ফেলেন। এমনকি ১৯৯৬ সালে যখন উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে ফিরে আসেন, ততদিনে নাকি তিনি ডা. জাওয়াহিরির হাতের পুতুল – যেভাবে নাচানো হয়, সেভাবেই নাচেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ২০০৬ সালে উসামা বিন লাদেনের এক কালের বন্ধু ও উপদেষ্টা শাইখ মূসা আল-কারনির জনসম্মুখে দেওয়া বক্তব্য, “তিনি (উসামা) এখন পুরোপুরিভাবে

---

50 Growing Up bin Laden, pp. 129, 130, and 132.

51 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 95.

মিশরীয় আল-জিহাদ সংগঠনের আদর্শে দীক্ষিত এবং সেটারই এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছেন। আর সেটার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি পরিকল্পনা সাজান।” [52]

এত হাস্যকর আর ফালতু ন্যারেটিভ হওয়া সত্ত্বেও এটাকে পশ্চিমের অনেকেই গিলেছিল; অবশ্য The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 বইয়ের মতো করে অতটা গোগ্রাসে কেউ গিলতে পারেনি। আমরা সামনে দেখবো যে, আইমান আজ-জাওয়াহিরি তো বিন লাদেনকে প্রভাবিত করেনই নি, বরং উল্টোটাই ঘটেছিল। তবে হ্যাঁ, এটা মানতেই হবে যে রিয়াদ এই ন্যারেটিভের মাধ্যমে খুব ভালভাবেই নিজের স্বার্থোদ্ধার করে নিয়েছিল। তারা এর মাধ্যমে আমেরিকার এমন প্রশাসনকে বুঝ দিয়ে দিয়েছিল, যারা আগের থেকেই 'সৌদিরা ভাল, অনুগত সাথী' বিশ্বাস করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। তাই তারা সৌদিকে পূর্ণ সমর্থন করে যায়; আর নিজ জনগণকে ফেলে রাখে – আরব উপদ্বীপে বোধ হয় সব ঠিকঠাকই আছে – এই ধরনের এক সংশয়ে। তাছাড়া এই ন্যারেটিভ সৌদির ধর্মীয় এস্টাবলিশমেন্টের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আর তারা মিডিয়ার কাছে এই গল্প ফেরি করতেও ভাল ভূমিকা রেখেছিল। এর ওপর এই বয়ান তালেবান নেতাদেরকেও অসন্তুষ্ট করেনি যাদের মাধ্যমে সৌদি পরবর্তীতে কোনো এক সময়ে হলেও আফগানে ইসলামপন্থী প্রশাসন গড়ার স্বপ্ন বুনে রেখেছিল। [53] আর যেহেতু এই ন্যারেটিভ শুরু থেকেই ওয়াশিংটনের উচ্চমহলে সাদরে গৃহীত হয়েছিল, তাই অল্পকালের মধ্যেই রিয়াদ এটার আরও বাহুল্যতায় ভরা সংস্করণ হাজির করলো। এমনকি সেই জগাখিচুড়ি পরবর্তীতে আরও উদ্ভট সব আয়োজনেরও অগ্রদূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আফগান ফেরত মুজাহিদদেরকে রি-এডুকেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও নিজেদের জন্য উপকারি নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মতো প্রকল্পের কথা বলা যায়। ওয়াশিংটন আর ন্যাটোর কর্মকর্তারা এমন উদ্ভট বিষয়কে সম্ভবও ভেবেছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সৌদি ন্যারেটিভ গড়েই উঠেছিল 'উসামার ওপর ডা. জাওয়াহিরির কুপ্রভাব'-কে কেন্দ্র করে। আর এই ন্যারেটিভের পাইকারি খদ্দের হয়ে পশ্চিমা লেখকরা উসামা বিন লাদেনকে এমনভাবে দেখায়, যেন তিনি 'এসি রুমে চা খেতে খেতে' জীবন কাটাতেন। একজন তো এভাবে লিখেও ফেলেছিল, “তাঁর (উসামার) দিন কেটে যেতো অল্পস্বল্প বিতর্ক, ফাতওয়া সম্পাদনা, এদিক সেদিক কিছু মানবতাবাদী প্রজেক্ট

---

52 Jamil al-Dhiyabi, “Interview with Shaykh Musa al-Qarni, part 2”, Al-Hayah (Internet version), 9 March 2006.

53 এই ব্যাপারে 45 নং টিকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

আর টুকিটাকি ইঞ্জিনিয়ারিং ও জনসেবামূলক কাজকর্ম করে।" [54] এরপর হঠাৎ করেই যেন ডা. জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে জাদু করে ফেললো।

সৌদি ন্যারেটিভ প্রেক্ষাগৃহে আসার আগেও মিশরীয় সাংবাদিক আইসাম দারাজ (Isam Darraz) – যিনি কিনা মিশরের প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা অফিসার – তিনি তার Chronicling the Anti-Soviet Jihad-এ লিখেছিলেন, "উসামা বিন লাদেনের ওপর ডা. জাওয়াহিরি কিংবা EIJ-এর তেমন কোনো প্রভাবই ছিল না।" কিন্তু কিছুদিন পরের এক সাক্ষাৎকারে হঠাতই তার অবস্থান পাল্টে গেল; তার মনে পড়ে গেল, "মিশরীয়রাই এই উৎসাহী সৌদি যুবকটির চারদিকে দেয়াল তৈরি করে দিয়েছিল।" [55] এছাড়া ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক হিউব্যান্ড (Mark Huband) বলেন, "জাওয়াহিরিই আল-কায়েদার রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন।" [56] ফরাসি পণ্ডিত স্টিফেইন (Stephane Lacroix) তো দাবি করেন, "জাওয়াহিরি ছিলেন আল-কায়েদার প্রধান মস্তিষ্ক ও পরামর্শদাতা... ... তাঁকে আমেরিকায় ৯/১১ আক্রমণের মূল হোতাও ধরা যায়।" [57] আর সৌদি ন্যারেটিভের কঠোর বিশ্বাসী লরেন্স রাইট বলে বেড়ান যে, ডা. জাওয়াহিরিই নাকি আল-কায়েদার বর্তমান ভিশন তৈরি করে দিয়েছেন এবং উসামা বিন লাদেনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতা হওয়া শিখিয়েছেন। [58] রাইট কিন্তু পাঠকদের কাছে এটা কখনোই ব্যাখ্যা করেন না – যে সময়ে আইমান আজ-জাওয়াহিরির নিজেরই কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, সে সময়ে তিনি কীভাবেই বা আরেকজনকে সফল আন্তর্জাতিক নেতা বনে যাওয়ার ক্লাস করাতে পারেন। আমি বাদেও সৌদি ন্যারেটিভের প্রতি কঠোরভাবে দ্বিমত পোষণকারী মানুষটি হলেন আইমান আজ-জাওয়াহিরি নিজেই। [59]

---

54 Coll, Ghost Wars, p. 153.

55 Wright, The Looming Tower, p. 129

56 মার্ক হিউব্যান্ড থেকে নকল করা হয়েছে – Wright, The Looming Tower, p. 131. আরও এসেছে – Mark Huband, Brutal Truths, Fragile Myths: Power Politics and Western Adventurism in the Arab World (Boulder: Westview, 2004), p. 110.

57 Stéphane Lacroix, "Ayman al-Zawahiri. Veteran of the jihad", in Gilles Kepel and Jean-Pierre Milelli, eds., Al-Qaeda in Its Own Words (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008), p. 130.

58 Wright, The Looming Tower, p. 130.

59 উল্লেখ্য, আইমান আজ-জাওয়াহিরি তাঁর 'আরব বসন্ত' সিরিজে সৌদি ন্যারেটিভে আক্রান্ত বই পড়তে নিষেধও করেছিলেন। কেননা তা পাঠকদের কাছে ভুল ও অতিরঞ্জিত মিথ্যা মেসেজ দেয়।

সবার বক্তব্য আলাদা করে খন্ডাতে গেলে প্রচুর কালি নষ্ট হবে। তার চেয়ে আমি সবগুলো পয়েন্টের একটি সংক্ষিপ্ত ক্যাটালগ দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে প্রমাণ করছি যে, আসলে ডা. জাওয়াহিরি নন, বরং উসামা বিন লাদেনই ডা. জাওয়াহিরিকে (বেশি) প্রভাবিত করেছেন।

- উসামা বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত আইমান আজ-জাওয়াহিরি মনেপ্রাণে মূলত মিশরীয় সরকারের পতন চাইতেন। তিনি মনে করতেন যে, জেরুজালেমের রাস্তা কায়রোর মধ্য দিয়েই অঙ্কিত হবে।
- উসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত ডা. জাওয়াহিরি বিশ্বাস করতেন – দূরের শত্রুর (আমেরিকা) দিকে নজর না দিয়ে ইসলামপন্থী দলগুলোর আগে কাছের শত্রুকে মোকাবেলা করা উচিত।
- উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত ডা. জাওয়াহিরি EIJ-এর ন্যায় ছোট এবং খুবই গোপন সংগঠনের প্রতি বেশি ঝুঁকে ছিলেন।
- আরব স্বৈরাচারীদের পতনের ব্যাপারে ডা. জাওয়াহিরি বিশ্বাস করতেন – বিদ্রোহ নয়, বরং সামরিক অভ্যুত্থানেই তা করতে হবে।
- তাত্ত্বিক ধরনের বিতর্ক ছাড়া ডা. জাওয়াহিরি কঠোরভাবে গোপনীয়তা অনুসরণ করতেন। প্রচারণা তেমন পছন্দ করতেন না। আর অবশ্যই তা উসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত – যিনি মিডিয়া যুদ্ধে ছিলেন অসম্ভব পারদর্শী।
- ডা. জাওয়াহিরি প্রায়ই সাইয়্যেদ কুতুব এবং EIJ-এর মুফতি আবদুস সালাম আল-ফারাজের প্রশংসা করতেন এবং তাদের থেকে উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু উসামা বিন লাদেন থেকে কখনোই এমনটা পাওয়া যায় না।
- ডা. জাওয়াহিরি EIJ-এর আন্তর্জাতিক সেল চালাতে খুব বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন না। যার দরুণ আমেরিকা ও মিশরের গোয়েন্দা সংস্থা মিলে তাদের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি এক পর্যায়ে ডা. জাওয়াহিরি উসামা বিন লাদেনের সাহায্য নেন ও তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে বাধ্য হন।

- ডা. জাওয়াহিরি ও তাঁর সহকর্মীরা মিশরীয় সরকারের ক্ষতি করতে পুরোপুরিই ব্যর্থ ছিলেন। তাই তারা উসামা বিন লাদেনের পরিকল্পনা মোতাবেক - মুবারক প্রশাসনকে পর্দার আড়াল থেকে সাহায্য করে যাওয়া আমেরিকাকেই টার্গেট বানানোর প্রতি মনোযোগী হন।
- উসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত ডা. জাওয়াহিরি মিশরীয় জাতীয়তার দিকে কিছুটা ঝোঁকা ছিলেন। এমনকি তিনি মিশরীয়দেরকে আরবদের চেয়ে উত্তম ভাবতেন – যতদিন না তাঁর উসামা বিন লাদেনের সাথে পরিচয় হয়। বলাই বাহুল্য, উসামা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরিবেশে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন।
- ডা. জাওয়াহিরি ভাল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহে অক্ষম ছিলেন।
- উসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত চিন্তাবিদ হিসেবে ডা. জাওয়াহিরির পরিচয় কিংবা তাঁর নরম ব্যক্তিত্ব - কোনোটিই তাঁকে আন্তর্জাতিক স্পটলাইট এনে দেয়নি। আর উসামা বিন লাদেনের সংগঠনে যোগ দেওয়ার আগে ময়দানের যোদ্ধা হিসেবেও তাঁর খুব যে অভিজ্ঞতা বা প্রতিভা ছিল - এমনটাও নয়।

সৌদি ন্যারেটিভ থেকে সত্য মিথ্যা আলাদা করা যেকোনো বায়োগ্রাফারের জন্য সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। আসলে এই ন্যারেটিভটা যে হারে পশ্চিমা রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত ও সাংবাদিকরা কবুল করে নিয়েছে, তাতে সত্য-মিথ্যা যাচাই কঠিন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর ওপর সৌদি ন্যারেটিভে নিজেদের মনগড়া মিথ্যার সাথে সাথে অনেক প্রয়োজনীয় সত্য তথ্যও রাখা হয়েছে। বিশেষ করে উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে সৌদির বলা ১৯৯১-পূর্ববর্তী গল্প অনেকাংশেই সত্য; যদিও সেই অংশেও সৌদির কিছু দাবি গালগপ্পের মাত্রায় গিয়ে ঠেকে।

আসলে উসামার ১৯৯১-পূর্ববর্তী জীবনকেই তাঁর ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে (সৌদি ন্যারেটিভের বরাত দিয়ে) আসা কাজগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়। বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে বের হওয়া কারমেন বিন লাদেন, উমার বিন লাদেন ও নাজওয়া বিন লাদেনের লিখিত বইগুলোর তথ্য দিয়ে। আর রিয়াদের ১৯৯১-পরবর্তী গল্প থেকে সত্য আলাদা করা কিছুটা সহজ কেননা উসামা বিন লাদেন কখন কী বলেছেন, কখন কী করেছেন – এসবের অনেক অনেক প্রমাণই আমাদের সামনে আছে। সাথে আছে আল-কায়েদায় আইমান আজ-জাওয়াহিরির সত্যিকার ভূমিকা কী ছিল এবং কীভাবে তাঁর মানসিকতা সময়ের সাথে

সাথে কীসে পরিণত হলো – তারও অসংখ্য প্রমাণ। উসামা বিন লাদেনকে বোঝার জন্য তাঁর ব্যাপারে ১৯৫৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর সেসব তথ্য থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবেই বোঝা যায় যে, উসামার এক সময়ের খুব কাছের মানুষেরা যেমন - আহমাদ বদীব, মুহাম্মাদ জামাল খলিফা, শাইখ মূসা আল-কারনি কিংবা সালমান আল-আওদাহ – তারা উসামার বিন লাদেনের প্রতি তাদের সুপ্ত ভালবাসা, কিংবা তাঁর সাহসিকতা ও ব্যক্তিগত ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পুরোপুরি কখনোই গোপন করতে পারেননি। এই ব্যাপারটা সৌদি ন্যারেটিভের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী উসামা বিরোধী কথা বলার সময়েও তাদের থেকে মাঝেমাঝেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।[60]

---

60 রিয়াদ ন্যারেটিভের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক আরেকটি প্রান্তিক অবস্থান নিয়েছেন। রিয়াদ ন্যারেটিভ উসামা বিন লাদেনকে একেবারে ভদ্র সভ্য কিছুই না বোঝা যুবক হিসেবে উপস্থাপন করে; আর দাবি করে যে আইমান আজ-জাওয়াহিরি সহ অন্যান্য মিশরীয়রাই নাকি তাঁকে (তাদের ভাষায়) ‘নষ্ট’ করেছেন। অপরদিকে মাইকেল শইয়ার আরেক প্রান্তিক অবস্থান নিয়ে উসামা বিন লাদেনের চিন্তার ক্রমবিকাশে আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং অন্যান্য মিশরীয়দের সাহায্যকারী অবদানকে পুরোপুরিই অস্বীকার ও বিলুপ্ত করে বসেছেন।

সত্য হলো, নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে সৌদির হঠকারিতা প্রকাশ পাবার সময়টায় আফগানের মিশরীয় সহযোদ্ধাদের সাথে উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎ এবং পরামর্শ হতো। তাই উসামা বিন লাদেনের সৌদিভক্তি থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে মিশরীয়দের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

আবার উসামা বিন লাদেনের চিন্তা ও আদর্শে রিয়াদ ন্যারেটিভের মতো সমস্ত কৃতিত্বও (তাদের মতে দোষ) ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি কিংবা অন্যান্য মিশরীয়দের দেওয়া যায় না। কেননা নব্বইয়ের দশকে সৌদির বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর উসামা বিন লাদেন নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু আগে থেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবার চিন্তাচেতনা লালন করতেন। তাই সৌদির আমেরিকাপ্রীতি স্পষ্ট হওয়ার পর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাঁর জন্য এমন কঠিনও ছিল না, যেটাকে রিয়াদ ন্যারেটিভে রীতিমতো ‘মিশরীয়দের দ্বারা ব্রেইনওয়াশ’ ধরনের বলে প্রচার করা হয়। একইসাথে উল্লেখ্য, আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং অন্যান্য মিশরীয়দের চিন্তাভাবনাও প্রথমদিকে মিশরকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু উসামা বিন লাদেন তাঁদেরকে সমরবিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এহেন চিন্তার অসারতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে আরও কিছু ভিন্নমত মাইকেল শইয়ার শেষে নিজেই উল্লেখ করেছেন, যে ব্যাপারগুলোতে পরবর্তীতে উভয়ে একমত হয়েই এগিয়েছিলেন।

তাই খুবই সহজ করে বললে, উসামা বিন লাদেন এবং আইমান আজ-জাওয়াহিরিরা একে অপরের চিন্তাভাবনা পরিশুদ্ধ করতে করতে এগিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক কখনোই একে অপরকে ব্রেইনওয়াশ ধরনের ছিল না। বরং সেটা ছিল একে অপরকে বোঝাপড়া, শুধরে দেওয়া এবং সমন্বয়ের সম্পর্ক। এরই ধারাবাহিকতায় আল-কায়েদার বর্তমান আদর্শিক ও কর্মপদ্ধতিগত রূপ দাঁড়িয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ন্যারেটিভ

ইতিহাসবিদ ভিক্টর হ্যানসন ডেভিসের (Victor Hanson Davis) এই কথাটুকু উল্লেখ করতেই হবে, "উসামা বিন লাদেন এবং ডা. জাওয়াহিরি অন্যসব ফ্যাসিস্টদের মতোই নিজেদের সর্বগ্রাসী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা চেয়েছেন ঠিক। কিন্তু পশ্চিমাদের প্রতি তাঁদের ক্ষোভের একেবারে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কারণ ছিল না। বরং তাঁরা সামগ্রিকভাবে গোটা পশ্চিমা লিবারেল সভ্যতার প্রতিই চরম মাত্রার ঘৃণা পোষণ করতেন।" [61]

এই কথা সঠিক হতো যদি ডেভিস এর দ্বারা এটা বোঝাতেন যে, ইসলামপন্থীরা তাদের নিজেদের ভূমিগুলোতে সামরিক থেকে শুরু করে সমস্ত ধরন ও মাত্রার পশ্চিমা লিবারেল প্রভাবের বিরোধী। কিন্তু ডেভিস এখানে সেটা বোঝাতে চাননি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই দু'জন হলেন "গণহত্যাকারী" আর "তাদের চিন্তাভাবনার আদৌ কোনো যৌক্তিক মাপকাঠি নেই।" [62] খুব সংক্ষেপে বললে তিনি চাইছিলেন যেন তার পাঠকরা ইসলামপন্থীদের সমস্ত বক্তব্যকে অবজ্ঞা করে। অনেকটা জায়নিস্ট নব্য রক্ষণশীলদের মতো তিনিও উইলসোনিয়ান সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরাঈলের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মিশ্র আদর্শ প্রচার করেন।

'আল-কায়েদা ও তার মিত্রদের ক্ষোভের জায়গাটা আসলে মুসলিমবিশ্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির বাইরের কিছু' – এমন বক্তব্য যুক্তি-প্রমাণ সহ বহু আগেই খন্ডিত হয়েছে। কিন্তু এখনও ইসরাঈলপন্থী বহু লেখক, সাংবাদিক ও অ্যাকাডেমিকরা এমন আছেন যারা কিনা এই মত প্রচার করে বেড়ান। এফ্রেইম কার্শ (Efraim Karsh) ২০০৭ সালে তার বইয়ে আল-কায়েদা সহ সমস্ত মুসলিমদেরকে নাৎসিদের মতো ভূমির প্রতি লালায়িত, ছন্নছাড়া সাম্রাজ্যবাদীর উপমায় চিত্রায়িত করেছেন। কার্শের মতে, "(৯/১১ বা) এই ধরনের আক্রমণ কিংবা আরব ও মুসলিমদের আমেরিকাবিরোধী হওয়ার মূল কারণ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নয়। আজকে আমেরিকার এই-সেই পলিসি তাদের রাগের কারণ নয়। বরং তাদের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের খিলাফাতকে পুনরুজ্জীবিত করার পথে আমেরিকা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাধা বলেই তাদের এতটা ক্ষোভ। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা তাদের টার্গেট। উসামা বিন লাদেন কিংবা অন্য কোনো ইসলামপন্থীর যুদ্ধ

---

61 Davis's introduction to Raymond Ibrahim, ed. and trans., The al-Qaeda Reader (New York: Broadway Books, 2007), p. xxx.

62 Ibrahim, The al-Qaeda Reader, pp. xxxi and xxii.

মৌলিকভাবে আসলে আমেরিকার বিরোধিতার কারণে না, বরং আজকে ইসলামপন্থীদের জিহাদ মূলত বিশ্বব্যাপী ইসলামি সাম্রাজ্যের (বা উম্মাহর) পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।" [63] কার্শ বলার চেষ্টা করেছেন যে অনেক মুসলিমদের মতে, উসামা বিন লাদেন হলেন এই যুগের সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির উত্তরসূরী – যিনি কিনা ছিলেন ক্রুসেডার বিলুপ্তকারী। একইসাথে কার্শ আজকের ইসলামি যুদ্ধের সাথে হিটলারের তুলনা ইঙ্গিত করে বলেছেন, "এটা হলো বিশ্বজয়ের জন্য ইসলামের যুদ্ধ"। [64] কিন্তু কার্শ কখনও এটা উল্লেখ করেন না যে, সালাহউদ্দিন তাঁর সময়ে আত্মরক্ষামূলক জিহাদই করেছেন। তিনি মিশরকে শিয়াদের থেকে এবং জেরুজালেম ও শামকে খ্রিস্টানদের থেকে পুনরুদ্ধার করতেই যুদ্ধ করেছিলেন। সেগুলোকে কীভাবে 'বিশ্বজয়' বলা যায়, কার্শ কিন্তু তা ব্যাখ্যা করেন না। কিন্তু আবার ঠিকই দাবি করেন যে, "সালাহউদ্দিন আসলে ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে নিজের লোভ আর উচ্চাকাঙ্খার পেছনেই ছুটেছিলেন আর সারাটা জীবন কেবল সাম্রাজ্য গড়তেই ব্যয় করেছিলেন।" [65]

দুঃখজনক হলো, কার্শের মতো এমন আদর্শিক বিশ্লেষণ অহরহ পাওয়া যায়। [66] Weekly

---

63 Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History (New Haven: Yale University Press, 2007), p. 239.

64 Karsh, Islamic Imperialism, p. 240.

65 Karsh, Islamic Imperialism, pp. 84 and 87.

66 খিলাফাত সহ আজকের জিহাদের ব্যাপারে কার্শের বক্তব্যের 'উপস্থাপন' নেতিবাচক হলেও তা আদতে অসত্য নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জিহাদের বিধানের ব্যাপারে এটাই বোঝা যায় যে, আমেরিকা কিংবা এমন কোনো সুপারপাওয়ার বিলুপ্ত হয়ে গেলেও জিহাদ চলতে থাকবে – যতকাল না মুসলিমদের খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যতকাল না ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

লেখক মাইকেল শইয়ার পরবর্তী বেশ কয়েক প্যারায় খিলাফাত ও জিহাদ নিয়ে আমেরিকাপন্থী কিছু লেখক-সাংবাদিকদের এমনই দৃষ্টিভঙ্গির এভাবে সমালোচনা করতে চেয়েছেন যে – এই ধরনের বক্তব্য পেশ করা হলে নাকি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না। কিন্তু এভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে তা একইসাথে ইসলামে জিহাদের ব্যাপকতার উল্টো উপস্থাপন করা হয়ে গিয়েছে। সত্য হলো, আল্লাহর দ্বীন (খিলাফত) পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠা পাবার আগ পর্যন্তই জিহাদ চলতে থাকবে বলে অসংখ্য সহিহ হাদিসেই প্রমাণ রয়েছে।

তবে জিহাদের ব্যাপকতার অংশটুকু পাশে সরিয়ে রাখলে লেখকের বক্তব্যও ফেলনা নয়। কেননা 'বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে' মুজাহিদদের প্রধান টার্গেট আমেরিকা হওয়ার কারণ তার আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতিই। আর মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা ও তার মিত্রদের আগ্রাসনমূলক ঐ পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তনই মুজাহিদদের 'এখনকার উদ্দেশ্য'। আর এই উদ্দেশ্য ততকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতকাল না তা পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হচ্ছে। তাই সেসময় পর্যন্ত 'আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিই তাকে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত করেছে' – এমন বক্তব্যও মোটেও ভুল নয়।

Standard, National Review, Wall Street Journal ইত্যাদি সাময়িকীতে এবং FrontPage.com ও Powerline.com এর মতো ওয়েবসাইটগুলোতে ডগলাস ফেইথ, বার্নার্ড লুইস, চার্লস ক্রাউসামার, জর্জ উইগেল, জন বোল্টন, উইলিয়াম ক্রিস্টল এবং নরম্যান পডোরেজ- সহ আরও অনেকেই এই ধরনের কথাবার্তা লিখেছেন। আর মিডিয়া তো বটেই, উভয় পার্টির (ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও এই অবস্থান যতটা জনপ্রিয়, তা সত্যিই অবাক করার মতো।

আচ্ছা বলুন তো, এই ন্যারেটিভের এত প্রভাব কীভাবে হলো? উত্তরটা হলো কারণ তা রাজনীতিবিদদেরকে সহজ রাস্তা দেখিয়ে দেয়। এই ন্যারেটিভ প্রশাসনের লোকদেরকে আশ্বস্ত করে যে, তাদের ঐ ভুলে ভরা পররাষ্ট্র নীতি নাকি ঠিকই আছে! আর তাই আমেরিকার জন্য ইরাক আগ্রাসনের মতো আরও জায়গায় জায়গায় সামরিক, রাজনৈতিক প্রভাব বাড়িয়ে যেতে নাকি কোনো সমস্যা নেই! এদিকে রাজনীতিবিদরাও এসব শুনে খুশিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তখন তাদেরকে আর একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হয় না যে, আমেরিকা-ইসরাঈলের মিত্রতা আর আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিই মূলত আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়েছে। তারা নিজেদের নীতির এরকম আকাশকুসুম 'বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব' দেখে গর্বিত হয়।

নিও-কনসার্ভেটিভদের এসব প্রচারণার ফলে, ১৯৯৬ সালে উসামা বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকে আমাদের নেতারা ও মিডিয়াগুলো (অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবেই) এমন এক কাল্পনিক শত্রুর সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে, বাস্তবে যেটার কোনো অস্তিত্বই নেই। তাদের কল্পনায় সেই শত্রুর রূপায়ন হলো – এমন একটি দল, যারা নাকি একসময় পৃথিবী দখল করে ফেলবে। এভাবেই পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ যখন এক কাল্পনিক ড্রাগন হত্যা করায় ব্যস্ত, তখন আমরা প্রকৃত অর্থে যে শত্রুর সাথে লড়ছি তারা মুসলিম ভূমিগুলোতে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেই জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। একইসাথে সংখ্যা এবং ভৌগলিক ব্যাপ্তির বিচারে তারা ক্রমশ শক্তিশালীই হয়ে চলেছে।

নির্মমতা হলো, বিখ্যাত আরব পণ্ডিত ইবনু খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ) সেই সময়ই দেখিয়েছেন কীভাবে 'সুবিধাবাদীরা' (এই নামটা আজকের নব্য রক্ষণশীলদের জন্য যথার্থই) সমস্যাগ্রস্ত নাগরিক সমাজকে প্রভাবিত করতে আসে এবং তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি নির্ধারণে বাজে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। ইবনু খালদুনের বিশ্লেষণে লেন ইভান গুডম্যান (Lenn Evan Goodman) লিখেন, "হোক রাজনৈতিকভাবে কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে... সুবিধাবাদীদের কারণে একটি সমাজ মেদবহুল ও মৃতপ্রায় দেহের মতো

হয়ে যায়, এর সম্পদ ও খনিগুলো কেবল লুটের অপেক্ষায় থাকে – আর সেটা বেশিরভাগ সময়েই হয় নিজেদেরই কোনো সৃষ্ট সঙ্কট নিরসনের বেশে। এমন সময়ে তাদের সামনে প্রকৃত পতন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট সুযোগ তো থাকে। কিন্তু তারা সেই পতন ঠেকাতে পারে না কারণ সুসজ্জিত ও নগরায়িত সমাজগুলোর স্বভাবই এমন যে, তারা তাদের কাল্পনিক সঙ্কট এড়াতেও নামধারী সব পেশাদার ও দক্ষ লোকদের শরণাপন্ন হয়। আর রাজনৈতিক থেকে সামরিক – সব সুবিধাবাদীরা এই সুযোগটাই গ্রহণ করে নেয়। সঙ্কট নিরসনে ডেকে আনা ওইসব সামরিক, জনপ্রিয় আর বুদ্ধিবৃত্তিক ভন্ডরা সমাজকে ক্রমে ক্রমে আরও ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়।" [67]

কার্শ, লুইস ও অন্যদের সৃষ্টি করা বিভ্রান্তিকে এর চেয়ে ভালভাবে বলা কষ্টকর। এইসব বিভ্রান্তির কারণে আমেরিকা ইসলামপন্থীদের কথার তেমন গুরুত্বই দেয় না। আর তার ফলে তাদেরকে দমনে কোনো ভাল পলিসিও আমেরিকা তৈরি করতে পারে না। মাইকেল ভ্লাহোসের ভাষায় বলতে হয়, "অহংকারি সামরিক শক্তি এবং চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্রায়ন (মুসলিম বিশ্বে) জনগণের মন তো হারিয়েছেই, ভবিষ্যতে তা জয় করার ছিটেফোঁটা সম্ভাবনাও পিষে মেরে ফেলেছে।" [68] ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে উসামা বিন লাদেনও আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমাদের নিজেদের নব্য সুশীলদের সৃষ্ট ভয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস থেকে বের হয়ে আসা দরকার।" এছাড়া জর্জ বুশ কিংবা বারাক ওবামা – যার নেতৃত্বেই হোক না কেন, তিনি আরও উল্লেখ করেন, "তিক্ত সত্য হলো, নব্য সুশীলগুলো এখনও তোমাদের জন্য বিরাট বোঝা।" [69]

---

67 Lenn Evan Goodman, "Ibn Khaldun and Thucydides", Journal of the American Oriental Society, Vol. 92, No. 2 (April/June 1972), p. 261.

68 Michael Vlahos, "Examining the War of Ideas", Washington Times (Internet version), 19–22 July 2004.

69 OBL, "Address to the American People", Al-Sahab Media, 14 September 2009.

‘বিন লাদেন অভিজ্ঞ’-দের ন্যারেটিভ

‘বিন লাদেন অভিজ্ঞ’-দের ন্যারেটিভ সবচেয়ে বেশি বিদঘুটে কেননা তারা এই মানুষটির বক্তব্যগুলোকেই এড়িয়ে যান। উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে পান্ডিত্য ঝরানো যে বিশাল পরিমাণ কাজ হয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগই তাঁর মূল বক্তব্য এড়িয়ে আর বাকি সবকিছু দিয়ে ঠাসা। অন্য ভাষায় বলতে গেলে এই অভিজ্ঞরা বিন লাদেনের যতো প্রকার শত্রু রয়েছে – তাঁর সৌদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, আমেরিকার প্রশাসনে থাকা কর্মকর্তা, স্বঘোষিত কোনো পণ্ডিত কিংবা সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ – তাদের সবার কথাই নিয়ে আসেন। কিন্তু বিন লাদেন নিজে কী বললেন, তা তারা চোখেই দেখেন না। ব্যাপারটা অনেকটা জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী লিখতে গিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন বাদে আর সবার – তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, আমেরিকান টরি [70], রাজা তৃতীয় জর্জ, ব্রিটিশ আর্মি অফিসার কিংবা বর্তমানের ওয়াশিংটনকে শ্বেতাঙ্গ দাস ব্যবসায়ী মনে করা কিছু ঐতিহাসিকদের বক্তব্য গ্রহণ করার মতো। এই ধরনের কাজ করে হয়তো পুলিৎজার পুরস্কারও পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তাতে জর্জ ওয়াশিংটনের সত্যিকার জীবনের তেমন কিছুই ফুটে উঠবে না। আর উসামা বিন লাদেনের ক্ষেত্রেও এইকথা সত্য।

৯/১১-এর পর থেকে পশ্চিমা ও অমুসলিম অনেক লেখকই উসামা বিন লাদেনের চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের নিজস্বতা, আন্তর্জাতিক প্রভাব ও সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে বেশ কিছু বই লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজগুলো হয়েছে পিটার বার্গেন, আবদুল বারি আতওয়ান, স্টিভ কোল এবং ব্রিঞ্জার লিয়ার হাতে। [71] এগুলোর বাইরে তেমন কোনো কাজই অল্প ‘গুরুত্বপূর্ণ’ হওয়ার বৈশিষ্ট্যও ধারণ করতে পারেনি। আমি এমন বইগুলোর একটা লিস্ট করেছি। সেই লিস্টে বইগুলোর ফুটনোটে বা শেষে উসামা বিন লাদেনের কতোটি বক্তব্য, ইন্টারভিউ বা বিবৃতি ইত্যাদির রেফারেন্স আনা হয়েছে, তা আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। সেই সাথে ওই পরিমাণ উদ্ধৃতিও যে তুলনামূলকভাবে আরও নগণ্য সংখ্যক

---

70 ব্রিটিশদের থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা আদায়ের যুদ্ধের সময় আমেরিকায় থেকে ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন করা লোকদেরকে Tories কিংবা Royalists বলে ডাকা হতো। এরা জর্জ ওয়াশিংটনের ঘোর বিরোধী ছিল।

71 Bergen, The Osama bin Laden I Know; Atwan, The Secret History of al-Qaeda; Steve Coll, The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century (New York: Penguin, 2008); and Lia, Architect of Global Jihad.

মৌলিক ডকুমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাও দেখিয়ে দিয়েছি। এখানে বইগুলো প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। উল্লেখিত বইগুলোর কোনো নির্দিষ্ট একটির মান নিয়ে আমি কিছু বলছি না। সার্বিক বিচারে দুয়েকটি তো অবশ্যই ভাল হয়েছে। কিন্তু বাকিগুলোর নাম রাখা হয়েছে – উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে সিরিয়াস কাজের সংখ্যাই খুব কম বলে।

- Rohan Gunaratna, *Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror (2002)* – ২০ টি উদ্ধৃতি, ৮ টা ডকুমেন্ট থেকে।
- Jason Burke, *Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror (2003)* – ৫ টি উদ্ধৃতি।
- Jonathan Randall, *Osama: The Making of a Terrorist (2004)* – ২ টি উদ্ধৃতি।
- Marc Sageman, *Understanding Terror Networks (2004)* – ২ টি উদ্ধৃতি।
- Steve Coll, *Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001* (2005) — ২ টি উদ্ধৃতি।
- Fawaz A. Gerges, *The Far Enemy: Why Jihad Went Global (2005)* — ১৫ টি উদ্ধৃতি, ৫ টি ডকুমেন্ট থেকে।
- Mary R. Habeck, *Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror (2006)* – ৫২ টি উদ্ধৃতি, ১৪ টি ডকুমেন্ট থেকে।
- Lawrence Wright, *The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11* (2006) – ২৮ টি উদ্ধৃতি, যার ২২ টাই মাত্র ৪ টি ডকুমেন্টারি থেকে।
- Steve Coll, *The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century* (2008) – ১৭ টি উদ্ধৃতি, ১০ টি ডকুমেন্ট থেকে।

- Bruce Riedel, *The Search for Al Qaeda: Its Leadership, Ideology, and Future* (2008) – ১২ টি উদ্ধৃতি।
- Roy Gutman, *How We Missed the Story: Osama bin Laden, the Taliban, and the Hijacking of Afghanistan* (2008) – ১১ টি উদ্ধৃতি। [72]

এমনটা কেউ আশা করে না যে, জনপ্রিয় একজন 'সন্ত্রাসী নেতা' তাঁর নিজের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের গবেষণাযোগ্য অঢেল পরিমাণ প্রাথমিক উৎস রেখে যাবেন। সেটা সাধারণত হয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কিংবা রাষ্ট্র পরিচালকদের ক্ষেত্রে। কিন্তু উসামা বিন লাদেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁর ব্যাপারে প্রাথমিক উৎস হিসেবে আমার নিজের কাছেই সব মিলিয়ে ৭৯১ পৃষ্ঠার ১৫৯টি ডকুমেন্ট রয়েছে। অবশ্যই আমার এই আর্কাইভও যথেষ্ট কিনা – তা জানার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কেবল এই সংখ্যা থেকেই অন্তত এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উপরোক্ত বইগুলোতে যে দায়সারা পরিমাণ উৎসের রেফারেন্স আনা হয়েছে, তা নিতান্তই নগণ্য। সাথে এটাও স্পষ্ট হয় যে, উসামা বিন লাদেনকে জানার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কাজকর্মকে বইগুলোতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

একটি সাধারণ মূলনীতি হলো, আপনি কারও বিরোধীদের মত নিয়ে তাঁর কথা ও কাজকে মূল্যায়ন করতে চাইলে সেই বিরোধীদের সম্পর্কে তাঁর মতামত কী – সেটাও বিবেচনা করে ভারসাম্য করতে হবে। আর এটা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য, যাকে কিনা বেশিরভাগ লেখক-পাঠক আগ থেকেই ইতিহাসের দানবদের একজন হিসেবে গণ্য করে বসে আছে। যেমন ইয়ান কার'শ (Ian Kershaw) হিটলারের পেপার, বিবৃতি ঘৃণা করলেও তিনি সেসব রীতিমতো অধ্যয়ন করেছিলেন। অথচ উসামা বিন লাদেনের গল্প যেন ঘুরেফিরে কেবল অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই বর্ণিত হয়েছে। লরেন্স রাইট তো উসামা বিন লাদেনের

---

72 Rohan Gunaratna, Inside al-Qaeda: Global Network of Terror (New York: Columbia University Press, 2002); Jason Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror (London: I. B. Tauris, 2003); Randall, Osama; Sageman, Understanding Terror Networks; Coll, Ghost Wars; Fawaz A. Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global (New York: Cambridge University Press, 2005); Habeck, Knowing the Enemy; Wright, The Looming Tower; Coll, The Bin Ladens; Riedel, The Search for al-Qaeda; Roy Gutman, How We Missed the Story: Osama bin Laden, the Taliban, and the Hijacking of Afghanistan (Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2008).

বিভিন্ন প্রতিপক্ষ ও শত্রু – আবদুল্লাহ আনাস, প্রিন্স তুর্কি ও আহমাদ বদীবের বক্তব্য সংকলন করেছেন। রয় গাটম্যান এবং স্টিভ কোলদের বই ইঙ্গিত করে যে তারা আহমাদ শাহ মাসউদের অন্ধভক্ত ছিলেন। আবার ফাওয়াজ গের্গেস তার The Far Enemy বইতে বেনামী সব বিন লাদেন বিরোধী সোর্সের কথাবার্তার উপর ভেসে বেড়িয়েছেন। এগুলোর বেশিরভাগই উসামা বিন লাদেনের কার্যক্রমের পেছনে যতসব হাতুড়ে-মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। এইসব বইগুলোর একত্রিত মূল ভাব অনেকটা এমন, "উসামা বিন লাদেন (এবং সাধারণভাবে সমস্ত মুসলিমরা) যদি আমাদের - পশ্চিমাদের মতো হতেন!"

কখনও তো এইসব একপেশে ব্যাখ্যার চেষ্টা একেবারে অন্ধত্বে রূপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century বইটার কথাই ধরা যাক। সেখানকার অধিকাংশ চরিত্রগুলোকেই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট দেখানো হয়েছে। পুরো বইয়ে যদি কোনো নায়ক চরিত্র থেকে থাকে, তো সেটা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের আরেক ছেলে সালেম বিন লাদেন (উসামা বিন লাদেনের ভাই)। কিন্তু আমার মতে সালেম একইসাথে – পশ্চিমা এবং ইসলামিক – দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতো। সে ছিল স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও ভন্ড। পশ্চিমে এমন দুমুখো চরিত্রের অনেককেই আজ মানুষ চেনে (যেমন বিল ক্লিনটন; আপাতত এই নামটাই মাথায় এলো)। সালেমকে কোনোভাবেই উসামা বিন লাদেনদের, সৌদিদের কিংবা মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী বলা যায় না। বইয়ে মাত্র তিনজন সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক, পরিশ্রমী ব্যক্তির কথা এসেছে – মুহাম্মাদ বিন লাদেন, কিং ফয়সাল এবং অপরজন উসামা বিন লাদেন নিজে। আর এটাও এই ইঙ্গিতই করে যে, বিষয় হিসেবে উসামার প্রাথমিক উৎসগুলো আরও অনেক গহীনে যাবার দাবি রাখে।

শিক্ষাজীবন, ১৯৫৭-১৯৭৯

উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের আল-মালাঝ জেলায় ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'উসামা' নামের অর্থ সিংহ। আর উসামা বিন লাদেন নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর নাম রাখা হয় "রাসূলুল্লাহ সা.-এর খুব কাছের একজন সাহাবি উসামা বিন যায়িদ রদি.-এর নামে – যাকে ও যার বাবাকে রাসূল সা. ভালবাসতেন।" [73] উসামার জন্মের ৬ মাস পরেই তিনি মদিনায় আসেন এবং ১৯৯১ সালে সৌদি আরব ছাড়ার আগ পর্যন্ত তিনি মোটামোটি মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দাতে বসবাস করেন। [74] তিনি এমনই এক সম্ভ্রান্ত, ধনী ইয়েমেনি বংশে জন্ম নেন, যেটার পুরুষেরা প্রচন্ড পরিশ্রম, জেদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, ঝুঁকি ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আর এই বিষয়গুলোই পরবর্তীকালের উসামা বিন লাদেনকে গড়ে তুলেছিল; এমনকি এখনও পর্যন্ত (২০১১) তিনি যেভাবে তার সংগঠন আল-কায়েদার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করছেন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে চলেছে।

উসামার বাবা মুহাম্মাদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন। তিনি ইয়েমেনের কেন্দা গোত্রে ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদরামাউত অঞ্চলের 'ওয়াদি দন' উপত্যকার আল-রুবাব বায়েশান গ্রামে বসবাস করতেন। তরুণ বয়সে তিনি ইথিওপিয়া যান। সেখানে এক দুর্ঘটনায় তিনি তাঁর ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান। পরবর্তীতে তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় চলে যান। সেখানে তিনি কুলি ও রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৩১ সালে তিনি একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সহজ-সরল নাম দিয়ে দেন 'বিন লাদেন কোম্পানি'। [75] উসামার বাবার ব্যাপারে স্টিভ কোল লিখেছেন, "মুহাম্মাদ বিন লাদেন তাঁর কর্মচারীদের সাথে শ্রমগীত গাইতেন এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন। তিনি তাঁর আশপাশের মানুষদের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করতে পারতেন এবং সহজেই মানুষের আস্থা অর্জন করে নিতে পারতেন।" [76]

---

73 Rahimullah Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", www.ABCNEWS.com, 4 January 1999.

74 Jamal Abd-al-Latif Ismail, "Interview with Usama bin Laden", 23 December 1998

75 http://www.sbg.com.sa/aboutus.html

76 Coll, The Bin Ladens, pp. 31 and 43.

আর যদিও খুব একটি লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবসায়ে মুহাম্মাদ ছিলেন দারুণ দক্ষ। ব্যবসায়ে এতই হিসেব নিকেশ করে ঝুঁকি নিতেন যেন "তাঁর মস্তিষ্ক চলতো কম্পিউটারের মতো।" [77] মুহাম্মাদ বিন লাদেন এবং তাঁর কোম্পানির শুন্য থেকে ধন্য হওয়ার গল্প অনেক লেখকই বর্ণনা করেছেন। এমনকি উসামা বিন লাদেন নিজেও এসব নিয়ে প্রকাশ্যে আলাপ করেছেন। [78] মুহাম্মাদ বিন লাদেন একাধিক বিয়ে করেছেন। আর উসামা ছিল মুহাম্মাদের ১৭তম সন্তান, জন্মেছিলেন তাঁর সিরিয়ান স্ত্রী আলিয়া ঘানেমের ঘরে। [79]

উসামার যুবক বয়সে বেশ কয়েকটি বিষয়ের সরাসরি এবং দীর্ঘমেয়দি প্রভাব ছিল বলে মনে হয় – তাঁর বাবার অসাধারণ উদাহরণ, মায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক, বিশাল বিন লাদেন গোত্রের সাথে তাঁর হৃদ্যতা, স্কুলের পরিবেশ, ছোটবেলা থেকেই কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা এবং ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা। এই সবকিছুই উসামা বিন লাদেনের চরিত্র ও কার্যক্রমের কাঠামো গড়ে দিয়েছিল।

---

77 Mayer, "The house of bin Laden."

78 Abdel Bari Atwan, "Interview with Saudi oppositionist Osama bin Ladin", Al-Quds al-Arabi, 27 November 1996; Steve Coll, The Bin Ladens.

79 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 40.

উসামা ও তাঁর বাবা

উসামার বাবা কেমন মানুষ ছিলেন? কারমেন বিন লাদেন (উসামা বিন লাদেনের ভাইয়ের স্ত্রী) ২০০৫ সালে লিখেছেন, "শাইখ মুহাম্মাদ বিন লাদেন অনেক উঁচু মাপের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ এবং ধার্মিক। তাঁর সাক্ষাৎমাত্রই মানুষ তাঁকে পছন্দ করে ফেলতো। আর তাঁর সন্তানদের চোখে তিনি ছিলেন একাধারে একজন হিরো, কিংবদন্তী, দৃঢ়চিত্ত, ধার্মিক এবং ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একজন মানুষ।" [80] ১৯৬৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর একটি বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তবে সাম্প্রতিক সময়গুলোর মধ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের এক ম্যাগাজিনে মুহাম্মাদ বিন লাদেনকে স্মরণ করা হয়। সেখানে তাঁকে উল্লেখ করা হয় একজন সৎ, বিশ্বস্ত, আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে, যার কিনা ছিল 'প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি'। আর্টিকেলটিতে এমনও বলা হয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তাঁর নাকি কম্পিউটারের মতো এক মস্তিষ্ক ছিল। এছাড়া তিনি নিজ খরচে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ এবং ডোম অব রক পুনর্নির্মাণের কাজ করেছিলেন, "কয়েকশ মণ্ড [81] স্বর্ণ দিয়ে তিনি এর গম্বুজে প্রলেপ দিয়েছিলেন।" [82] উসামা তাঁর বাবাকে এভাবেই দেখতেন। উসামার প্রথম স্ত্রী নাজওয়া লিখেন, "তিনি তাঁর বাবাকে খুবই ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।" আর বাবার সামনে সবসময়ই "নিজ আচরণ ও কথায় এক ভিন্ন মাত্রায় সতর্ক থাকতেন।" এই শ্রদ্ধা তাঁর বাবার মৃত্যুর পর আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। [83] আর উসামার নিজ বক্তব্যই নাজওয়ার এই কথাগুলোর সত্যায়ন করেছে –

> *"যখন তিনি [মুহাম্মাদ] জানতে পারেন যে, জর্দানের সরকার ডোম অব রকের সংস্কার কাজের জন্য টেন্ডার ছেড়েছে, তখন তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদেরকে একত্র করলেন। তাদেরকে কোনোপ্রকার লাভ ছাড়া কেবল কাজের জন্য কতো খরচ হতে পারে, তা নির্ণয় করতে বললেন।*

---

80 Carmen bin Laden, Inside the Kingdom: My Life in Saudi Arabia (New York: Grand Central Publishing, 2004), pp. 26–27; Christopher Dickey, "Portrait of a family", Newsweek, 5 April 2004.

81 'মণ্ড' ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহৃত একটি একক; প্রতি মণ্ড ৩৭ কেজিরও কিছুটা বেশি হয়ে থাকে।

82 Professor Mohyuddin, "Something with Regard to Saudi Arabia, Syria, and Yemen", Ausaf (Internet version), 8 January 2010.

83 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 9

এরপর তিনি – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – কাজ পাবার জন্য আরও কম দামে টেন্ডার জমা দেন। আল্লাহর রহমতে প্রায়ই তিনি (প্রাইভেট হেলিকপ্টারে) একদিনে তিন মাসজিদে সলাত আদায় করতেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আরবের সেরা স্থপতিদের একজন।" [84]

"আমার বাবা... কিং ফয়সালের আমলে মন্ত্রী ছিলেন... কিং ফয়সাল আমার বাবার মৃত্যুর সময় জীবিতই ছিলেন... তিনি কেবল দু'জন মানুষের মৃত্যুতেই কেঁদেছিলেন – একজন মুহাম্মাদ ইব্রাহিম, আর অপরজন হলেন আমার বাবা... আমার বাবার মৃত্যুতে কিং ফয়সাল বলেছিলেন, 'আজ আমি আমার ডান হাতকে হারালাম।' " [85]

উসামা তাঁর বাবার সাথে কীভাবে কতটা সময় কাটিয়েছেন – এই ব্যাপারে উসামার নিজের বক্তব্যের সাথে তাঁর ব্যাপারে লিখালিখি করনেওয়ালাদের ভালই পার্থক্য দেখা যায়। উসামা নিজে তাঁর বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই বলেছেন। আর তাঁর আশেপাশের মানুষদের কথা অনেকটা এমন যে উসামা "তাঁর বাবার পাশে চুপচাপ বসে থাকতেন।" [86] উসামা বিন লাদেন একবার নাকি তাঁর ছেলেদের কাছে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বাবাকে মোটে পাঁচবার দেখেছিলেন। আর এই ব্যাপারে সব পণ্ডিতের বক্তব্য এই কথাকেই সমর্থন বা সংকলন করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, স্টিভ কোল উল্লেখ করেছেন যে, উসামা তাঁর বাবাকে খুব অল্পই জানতেন। এছাড়া উসামার প্রয়াত শ্যালক মুহাম্মাদ জামাল খলিফা বলেছিলেন, "উসামা তাঁর বাবার সাথে খুব একটি ছিলেন না।" [87] আবদুল বারি আতওয়ানের মতেও, মুহাম্মাদ বিন লাদেন তাঁর বড় ছেলে বাদে আর কোনো সন্তানকেই তেমন একটা সময় দিতেন না; যেহেতু বড় ছেলেই পরবর্তীতে তাঁর ব্যবসা ও পারিবারিক দায়দায়িত্বের হাল ধরার কথা ছিল। আর তাই

---

84 Jamal Abd-al-Latif Ismail, Bin Ladin, Al-Jazeera, and I; "Usamah bin Ladin: The Destruction of the Base", Al-Jazeera Satellite Television, 10 June 1999

85 Hamid Mir, "Interview with Osama bin Laden", Pakistan, 18 March 1997.

86 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 41, and bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 190.

87 Coll, Ghost Wars, p. 85; Khalid al-Batarfi is quoted in Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 17.

বাবার সময় পাবার ক্ষেত্রে ৫২ ভাইবোনদের মধ্যে উসামা বিন লাদেন নাকি তুলনামূলকভাবে বাড়তি কিছুও ছিলেন না। [88]

উসামার ওপর সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা প্রভাব ফেলেছিল, তা হলো তাঁর বাবার ধার্মিকতা। মুহাম্মাদ বিন লাদেন নিজে রক্ষণশীল মুসলিম ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ওয়াহাবি ধারায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা মূলত কঠোর ধার্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। [89] তিনি তাঁর সন্তানদেরকে মিতব্যয়ী, কঠোর পরিশ্রমী, ধার্মিক এবং আত্মনির্ভরশীল হতে বলতেন। স্টিভ কোল লিখেছেন, "তিনি ইসলামের বিধিবিধান এবং শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারেও সন্তানদেরকে জানাতেন। তিনি নিজে ইবাদাতগুজার ছিলেন আর তাঁর সন্তানদের থেকেও তেমনই আশা করতেন।" [90]

ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ বিন লাদেন প্রচণ্ড ধনী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খুবই ধার্মিক জীবনযাপন করতেন এবং ইসলামের আলিম ও মুফতিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর আয়োজন করা সব সামাজিক ও ধর্মীয় হালাকাগুলোর বরাতে যুবক বয়স থেকেই অনেক প্রভাবশালী ইসলামি ব্যক্তিত্বের সাথে উসামার সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল। আর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বড় ভাইয়েরা এমন হালাকার আয়োজন করা জারি রেখেছিলেন। একজন উল্লেখ করেছিলেন, "এই হালাকাগুলো উসামার মধ্যে অল্প বয়স থেকেই এক ধরনের ধর্মীয় দায়িত্ববোধ গড়ে দিয়েছিল।" বিশেষ করে উসামার বাবা প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই আলিম ও মুফতিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে হালাকা করতেন। [91]

এছাড়াও বিন লাদেন পরিববারের ছিল অসংখ্য বাড়ি। সেগুলোয় সারা বছরই দেশ বিদেশ থেকে হাজ্জ, উমরাহ কিংবা অন্য কোনো কাজে আগত গণ্যমান্য আলিম, মুফতি এবং নেতৃবৃন্দের মেহমানদারি লেগেই থাকতো। এভাবে এই পরিবারের যোগাযোগ এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে উসামার কাজে আসে। এই যোগাযোগের কিছু দৃষ্টান্তের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী সময়ে আফগান বিদ্রোহীদের নেতা বুরহানউদ্দিন রব্বানি ও

---

88 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 41.

89 Cherif Ouazai, "The bin Laden mystery: An investigation into the man who has defied America", Jeune Afrique, 7 September 1998.

90 Coll, The Bin Ladens, p. 107.

91 "Unattributed Biography of Osama bin Laden", Frontline Online, April 1999; Atwan, The Secret History of al-Qaeda, pp. 42–43.

আবদুর রাসুল সাইয়্যাফ। এছাড়া ছিলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ইসলামি দল জামায়াতে ইসলামির নেতা কাজী হোসাইন আহমাদ সহ আরও অনেকে। এমনসব মানুষেরা ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আগ্রাসনের আগ থেকেই উসামার দিব্যি পরিচিত ছিল।[92]

দেশ বিদেশের উচ্চ পর্যায়ের আলিমদের সাথে স্রেফ ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়াও উসামা বিন লাদেনের জীবনের সেইসব দিনগুলো তাঁর মনে আলিমদের জন্য এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে দিয়েছিল। বিশেষত মুসলিম সমাজব্যবস্থায় আলিমগণ যে অবদান রেখে থাকেন, তার কারণে। কুরআন এবং হাদিস - উভয়েই আলিমদেরকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তা হলো শাসকদেরকে সঠিক পথে ধরে রাখা। অবস্থা যা-ই হোক, আলিমরা ক্ষমতাসীনদেরকে সত্য জানাতে বাধ্য। আর নব্বইয়ের দশকের আগ পর্যন্ত উসামার চিন্তার মোটামোটি কেন্দ্রবিন্দুতে এমনটাই ছিল যে, সমস্ত আলিমরাই সম্মানের পাত্র আর তাদের মধ্যেও যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ভূমিগুলো প্রতিরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা হলেন সর্বোত্তম। এক সুদীর্ঘ সময় জুড়ে তিনি এমন বিশ্বাসই আঁকড়ে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাঁর এহেন বিশ্বাসে চিড় ধরে, তখন সেটার সাথে যেন আক্ষেপও যুক্ত হয়ে যায়।

উসামার বাবা আরও যে একটি মানসিকতা তাঁর ছেলের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন, তা হলো কথা এবং কাজের মিল রাখা; হোক তা পার্থিব কাজে কিংবা হোক আল্লাহর রাস্তায় বা উম্মাহর প্রতিরক্ষায়। জিহাদি চেতনার ক্ষেত্রে উসামা যাকে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করতেন, সেটা আর কেউ নন – তাঁর বাবা। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে উসামা বলেন, "আমার বাবা প্রায়ই বলতেন যে তিনি তাঁর ২৫ ছেলেকে জিহাদের জন্যই বড় করেছিলেন। তিনি ৪০ বছর যাবৎ খলিফা ইমাম মাহদির জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন।" ইমাম মাহদির জন্য তাঁর বাবা ১২ মিলিয়ন ডলার রেখে গিয়েছিলেন।[93]

ইসরাঈলের প্রতি মুহাম্মাদ বিন লাদেনের এক তীব্র ঘৃণা ছিল। উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মীর জানিয়েছিলেন, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর উসামার বাবা নাকি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন – কোম্পানির বুলডোজারগুলোকে ট্যাংকে রূপান্তর করা যায় কিনা। উসামা বিন লাদেন নিজেই হামিদ মীরকে এমন তথ্য দিয়েছিলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে হামিদ মীর

---

92 "Biography of Usamah bin Laden", Islamic Observation Center (Internet), 22 April 2000; "Unattributed Biography of Osama bin Laden", Frontline Online.

93 Mir, "Interview with Usama bin Ladin", Pakistan, 17 March 1997.

এই উপসংহারে এসেছিলেন যে মুহাম্মাদ বিন লাদেন ছিলেন "খুবই প্রবল মাত্রার ইসরাঈল-বিরোধী, ইহুদি-বিরোধী।"[94] মীর যদি ঠিকঠাক মনে করে থাকেন, তাহলে উসামার ফিলিস্তিনপন্থী চিন্তাধারাও তাঁর বাবার থেকেই অনুপ্রাণিত ছিল।

যদিও এই ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, তবে এখানে একটুখানি না বললেই নয়। আর তা হলো, তেরো শতকের সিরীয় আলিম তকিউদ্দিন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর (১২৬৩-১৩২৮) প্রতি যুবক উসামার গভীর শ্রদ্ধাবোধ। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বহুবার সশস্ত্র জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন এবং তৎকালীন খলিফার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সাথে মতবিরোধের কারণে জীবনের এক দীর্ঘ সময় কারাবরণও করেছিলেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ও মুহাম্মাদ বিন লাদেন প্রায় একই সুরে বলেছেন, *"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মাসজিদুল হারামের খেদমতকে এমন ব্যক্তির সমান মনে করছো, যে কিনা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে? তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়; আর আল্লাহ জালিম লোকদেরকে হিদায়াত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাঁদের মর্যাদাই আল্লাহর কাছে অধিক; আর তাঁরাই চূড়ান্ত সফল। তাঁদের রব্ব তাঁদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া, সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের, যেখানে তাঁদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি।"*[95][96]

---

94 Mir quoted in Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 7–8.

95 Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam (Princeton, N.J.: Markus Wiener, 1996), p. 46.

96 এগুলো আসলে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ কিংবা মুহাম্মাদ বিন লাদেন – কারও মনগড়া কথাবার্তা নয়। বরং এগুলো হলো পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরাহ তাওবাহের ১৯ থেকে ২১ নং আয়াতের তর্জমা। অর্থাৎ এই বক্তব্যের ব্যাপারে কোনো মুসলিম দাবিদারই দ্বিমত করতে পারে না।

স্বয়ং আল্লাহর আয়াতকে ইসলামের কোনো আলিম বা ব্যক্তিত্বের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরূপে উপস্থাপন করা হয়ে গিয়েছে। লেখক মাইকেল শইয়ার এই ব্যাপারটি হয়তো না জেনেই করেছেন। কিন্তু এত ডকুমেন্টিং, এত গবেষণার পরও পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াতকে চিনতে না পেরে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের চিন্তাধারা ভাবা সত্যিই অবাক করা। তাছাড়া রেফারেন্স হিসেবেও আনা হয়েছে রুডোলফ পিটার্সের (Rudolph Peters) একটি বই।

মুসলিম হিসেবে পশ্চিমা লেখকদের বই-পুস্তক পড়বার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলে যে স্বয়ং আল্লাহর আয়াত কিংবা রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিসকেও ভুল বোঝা হতে পারে (যেমন এখানে কুরআনের আয়াতকে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব চিন্তাধারা বলে মনে করা), সেদিকে ইঙ্গিত করতেই আল্লাহর ইচ্ছায় এই টিকা সংযোজন করা হলো। তথ্য বা ইলম গ্রহণে এমন সাবধানতা অবলম্বন সাধারণ কোনো বিষয় নয়, বরং এক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

উসামা তাঁর বাবার কাছ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটি পেয়েছেন, সেটা সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা – সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করে তা শক্ত করে আঁকড়ে থাকা। মুহাম্মাদ বিন লাদেন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে সেটাকে কেউ প্রশ্ন করার সাহস করতো না। আর উসামার ব্যাপারে নাজওয়া বিন লাদেন লিখেছেন, "শান্ত স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁকে কখনোই দুর্বল চিত্তের মানুষ মনে করেনি।"[97] কয়েক বছর আগে ইয়েমেনের সালাফি আলিম শাইখ আবদুল মাজিদ আল-জিন্দানি উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে "একজন সুন্নি শিক্ষক, যিনি ছিলেন সাহসী এবং অবিচল" বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে এত বছরেও "দ্বীন ইসলামের রাহে উসামার অবস্থানের রদবদল ঘটেনি।"[98]

---

97 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 8.

98 Sami Kulayb, "Interview with Shaykh Abd al-Majid al-Zindani", Al-Jazeera Satellite Television, 23 February 2007, and "Muslim duty is to put Bin Ladin's words into 'practice'—Yemeni Islamist", ABC.es, 11 October 2009.

উসামা ও তাঁর মা

উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে আলোচনা করা সকলেই উসামা ও তাঁর মা আলিয়া ঘানেমের হৃদ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে নিজের বড় সন্তান (উসামা) সম্পর্কে আলিয়ার শক্ত পক্ষপাতের কথাও বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। উসামার সৎ ভাই মুহাম্মাদ আল-আতাস বলেছেন যে উসামা তাঁর মাকে ভীষণ ভালবাসতেন। উসামার দ্বীনদারিতায় আলিয়ার গভীর প্রভাব ছিল। আলিয়া বলেন, "আমি ওর (উসামার) অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভালবাসা নিবদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলাম। আর চেয়েছিলাম পরিবার পরিজন ও শিক্ষকদের প্রতি ওর শ্রদ্ধা ও টান তৈরি করে দিতে। বলাই বাহুল্য, সেগুলো করতে আমার খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।" [99]

মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে উসামার জ্ঞানার্জনে আলিয়া ঘানেমের প্রভাব ছিল। তবে সেই প্রভাব ঠিক কতোটুকু, তা বলা দুষ্কর। তিনি ছিলেন সিরিয়ার সেক্যুলার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তবে তাঁর বংশ ছিল ইয়েমেনি। ঘানেম পরিবার থাকতো লাটাকিয়ায় – যেটা মূলত সমুদ্র তীরবর্তী এক শহর। আর সেখানকার তিন লক্ষ বাসিন্দার বেশিরভাগই হলো আলাউই ফিরকার। আলাউইদেরকে সুন্নিরা ঘৃণা করে। কিন্তু এরাই সিরিয়ার সরকার পরিচালনা করে আসছে। [100] ঘানেম পরিবার নিজেরা অবশ্য আলাউই হওয়া অস্বীকার করে। আর মুহাম্মাদ বিন লাদেনও নিঃসন্দেহে কোনো আলাউইকে তাঁর পরিবারে আনার মতো মানুষ ছিলেন না। তারপরও কিছু সমালোচনা ভেসে বেড়িয়েছিল যে উসামার মা নাকি সুন্নি ছিলেন না। আর উসামার কিছু সৌদি সমালোচক জোর গলায় বলেন যে উসামার মা আলাউই ছিলেন; আর সেকারণে মুহাম্মাদ বিন লাদেন নাকি আলিয়াকে বিয়ে করেননি; বরং "দাসী" হিসেবে রেখেছিলেন। [101] কিন্তু কোনোই সন্দেহ নেই যে এই ধরনের কথাবার্তা উসামার বংশধারাকে খাটো করার জন্যই বানানো হয়েছে। বিন লাদেন পরিবারে আলিয়া একঘরে

---

99 Khalid al-Batarfi, "Osama is very sweet, very kind, very considerate", Mail on Sunday (Internet version), 23 December 2001.

100 Michael Slackman, "Bin Laden's mother tried to stop him, Syrian kin say", Chicago Tribune, 13 November 2001, p. 5; and bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 4.

101 Randall, Osama, p. 57.

ধরনের কেউ ছিলেন বলে কোনোরকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেটা ছাড়াও স্টিভ কোলও এই ব্যাপারে বেশ শক্ত যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। আর কোলের মতো আমিও মনে করি, বিন লাদেন পরিবারে কখনোই আলিয়াকে কোনো অংশে খাটো করে দেখা হতো না। [102]

মুহাম্মাদ বিন লাদেনের অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে আলিয়া পুরোপুরি আলাদা ছিলেন। এমনকি পরবর্তীতে নিজ স্বামীর কাছে তালাক চাইতেও পিছপা হননি। [103] সৌদিতে থাকাকালীন সময়ে আলিয়া সৌদি নারীদের মতোই নিজেকে ঢেকে রাখতেন এবং সেভাবেই চলাফেরা করতেন। কিন্তু সিরিয়া, লেবানন কিংবা সৌদির বাইরে তিনি কিছুটা শিথিলতার সাথে পোশাক পরতেন। উসামার স্ত্রী নাজওয়া বলেন, "আলিয়া খালা সব দিক থেকেই অসাধারণ ছিলেন। যারাই তাঁর সাথে মিশতো, সবাই তাঁর আচার আচরণে অনেক অনুপ্রেরণা পেতো... ... [সিরিয়াতে] আমাদেরকে দেখতে যাওয়ার সময় তিনি ভালই ফ্যাশনেবল জামাকাপড় পরতেন।" [104] এই হিসেবে উসামা তাঁর মাকে দুটো ভিন্ন রূপে দেখেছিলেন – সৌদি রূপ এবং অন্তত আধা পশ্চিমা রূপ। এছাড়া ১৭ বছর পর্যন্ত উসামা গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর মা ও সৎ ভাইবোনদের সিরিয়া ভ্রমণেও সঙ্গ দিতেন। ফলে তাঁর সৌদির বাইরের বৈশ্বিক আবহাওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়ে গিয়েছিল। [105] আর এভাবে বাবার হালাকাগুলোর মতো গ্রীষ্মের ছুটিগুলোতেও উসামা মুসলিম বিশ্বের এমন এমন দৃশ্যপটের সাথে খাপ খাওয়াতে শিখেছিলেন, যা ছিল সৌদির সংস্কৃতি থেকে একেবারেই আলাদা।

ব্যক্তিজীবনের অভ্যাস, আচার আচরণ, সামাজিকতা ইত্যাদির বিবেচনায় উসামার মধ্যে তাঁর মা আলিয়ার প্রভাব ছিল তাঁর বাবার চেয়েও বেশি। উসামার ছেলে উমার লিখেছেন, "দাদা আমার বাবার ভিত্তি ঠিক করে দিয়ে দাদির ওপরই বড় করার দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন।" [106] তাই উসামা কীভাবে বেড়ে উঠেছিলেন, তা বুঝতে যে কথাটুকুই মোটামোটি যথেষ্ট হয়, তা হলো – মুহাম্মাদ বিন লাদেন ছক এঁকে দিয়েছিলেন আর আলিয়া

---

102 Coll, The Bin Ladens, p. 75.

103 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 167.

104 Ensor et al., "Bin Laden family believes Osama is alive."

105 Slackman, "Bin Laden's mother tried to stop him, Syrian kin say."

106 Samir Awwad, "Umar, son of bin Ladin, says during an important interview 'The Americans are not serious about finding my father,'" Al-Rayah (Internet version), 20 August 2008.

সেই ছক অনুযায়ীই ছেলেকে গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া আলিয়া দানশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। নাজওয়া উল্লেখ করেন, "তিনি (আলিয়া) কোনো পরিবারের কষ্টের কথা শোনামাত্রই গোপনে সাহায্য করতে শুরু করতেন।" [107] যুবক উসামার মধ্যেও এই গুণটি ছিল। তাঁর এক বন্ধু একবার বলেছিল, "ও যা-ই খরচ করতো, সবটাই করতো গরিবদের সাহায্যে।" সময় গড়াবার সাথে সাথে উসামার নীরব দানশীলতার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। [108]

107 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 8.

108 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 25; Bergen, The Osama Bin Laden I Know, p. 15.

উসামা ও বিন লাদেন পরিবার

২০০৮ সালের দিকে স্টিভ কোল উল্লেখ করেছিলেন যে উসামা "জনসম্মুখে কখনোই নিজ পরিবারকে গালমন্দ কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করেননি।" তিনি জোর গলায় এটাও বলেছিলেন যে, উসামার পরিবারের দিক থেকে তাঁর ব্যাপারে যেসব কথা কিংবা অভিযোগের সুর শোনা যেতো "সেগুলোও আদতে সৌদি সরকারের চাপের মুখে আসা বুলি ছাড়া কিছুই নয়।" [109] আর উসামা তো নিজ পরিবার থেকে পরিত্যাজ্য হয়েও উল্টো পরিবারের প্রশংসাই করেছেন। ২০০০ সালের আগস্টে পাকিস্তানের এক ম্যাগাজিনকে তিনি বলেন, "আমার পরিবার আমার জন্য দুআ করে। কোনোই সন্দেহ নেই যে তারা অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সেসব মোকাবেলার মতো সাহস দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।" [110]

এই বইটি লিখাকালীন সময়েও (২০১১) উসামা তাঁর পরিবারের সদস্যদের থেকে শুরু করে এক সময়ের ভাই-বন্ধু কারও সমালোচনা করেননি। যদিও তাদের এক বিরাট অংশ ঠিকই উসামার সমালোচক বনে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল, শাইখ সালমান আল-আওদাহ, খালিদ আল-বাতারফি, জামাল খাশোগি, আহমাদ বদীব, তাঁর শ্যালক মুহাম্মাদ জামাল খলিফা এবং তাঁর চতুর্থ ছেলে উমার বিন লাদেন। অবশ্য কেউ কেউ এমনও সন্দেহ করে থাকেন যে, উসামা নাকি বিশ্বাস করতেন নীতিভ্রষ্ট এই রাজতন্ত্রের পতন ঘটলে ইসলামি আদালতে সৌদ পরিবারের তো বিচার হতোই, সাথে তাঁর সাবেক ভাই-বন্ধুদেরও কাউকে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো।

উসামা তাঁর বিশাল পরিবার (যা কিনা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের স্ত্রী-সন্তান আর নাতি-নাতনিরা মিলে প্রায় ৬০০ জন) থেকে ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা ছাড়া বিপরীত কিছু পেয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। উসামার সৎ ভাই বলেছেন যে উসামা তাঁর পারিবারিক পরিবেশ উপভোগ করতেন। এমনকি (বাবার সাথে মায়ের তালাক হয়ে যাওয়ার পর) মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মুহাম্মাদ বিন আতাসের চার সন্তানের বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করতেও নাকি উসামা দারুণ উৎসাহী ছিলেন। কারমেন বিন লাদেন লিখেছেন, "উসামা তাঁর পরিবারের সাথে ভালই মিশে যেতে পেরেছিলেন। আমি পরিবারের কাউকে কখনও ফিসফিসিয়েও

---

109 Coll, The Bin Ladens, p. 13.

110 "Interview (written) with Usama bin Laden", Ghazi, August, 2000.

বলতে শুনিনি যে উসামার কোনো কথা-আচরণ অশ্রদ্ধাজনক হয়েছে, কিংবা তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।" [111] কারমেনের এই কথাগুলোয় পরবর্তীতে উসামার স্ত্রী নাজওয়ারও সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন যে ১৯৭৯ সালে আফগান জিহাদ শুরু হলে উসামার তৎপরতায় পরিবারের কেউই "তাঁর সেই রাজনৈতিক সচেতনতা কিংবা দ্বীনদারিতা নিয়ে ভ্রু কুঁচকায়নি।" [112] বিন লাদেন পরিবারে সবচেয়ে পশ্চিমা ছিলেন উসামার সৎ ভাই ইয়াসলাম। এমনকি তিনিও ২০০৬ সালের দিকে প্রকাশ্যে শপথ নিয়ে বলেছিলেন যে, উসামা কখনও আটক হয়ে গেলে তাঁর আইনি লড়াইয়ে সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। [113]

উসামা আর তাঁর পরিবারের ব্যাপারে একটি বিষয় হলো, উসামা তাঁর বাবার কোম্পানি থেকে এখনও (২০১১-তে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত) নিজের প্রাপ্য লভ্যাংশ পান কিনা – এই বিতর্ক। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে উসামার সৌদি নাগরিকত্ব বাতিল হওয়ার পর তৎকালীন পরিবার প্রধান বকর বিন লাদেন উসামার কার্যকলাপের প্রতি আফসোস ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি (গোটা পরিবারের হয়ে) উসামার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার লিখিত ঘোষণা দেন। [114] এর কিছু বছর পরেই এক প্রশ্নের উত্তরে উসামা নিজ পরিবারের সাথে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে, "রক্ত তো সবসময়ই পানির চেয়ে ঘন।" [115] পরে অবশ্য তিনি আরেক কথা বলে নিজ বক্তব্য ভারসাম্য করে দিয়েছিলেন; যেহেতু আগের কথার কারণে সৌদি প্রশাসনের প্রতি তাঁর পরিবারের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই পাকিস্তানি সাংবাদিক রহিমাহুল্লাহ ইউসুফজাইকে তিনি বলেছিলেন যে তিনি "পরিবারের ব্যবসা থেকে তাঁর অংশ পান না।" [116] তবে এই ব্যাপারে কারমেন বিন লাদেনের বক্তব্য উল্লেখ করার মতো। তাও খেয়াল করতে হবে কারমেন তাঁর স্বামী

---

111 Carmen bin Laden, Inside the Kingdom, pp. 70 and 72.

112 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 25.

113 Marianne Macdonald, "O Brother, where art thou?" Evening Standard, 26 May 2006.

114 Muhammad Saddiq, "Bin Laden family statement", Al-Sharq al-Awsat (Internet version), 15 September 2001.

115 Rahimullah Yusufzai, "In the way of Allah", Pakistan (Internet version), 15 June 1998.

116 Rahimullah Yusufzai, "I am not afraid of death", http://www.Newsweek.com, 4 January 2004.

ইয়াসলামের (উসামার সৎ ভাই) সাথে মারাত্মক পর্যায়ের ডিভোর্স যুদ্ধ করার পরও এমন কথা বলেছিলেন। ২০০৪ সালে কারমেন বলেছিলেন, "একজন বিন লাদেন কখনোই তাঁর ভাইদের থেকে ছিন্ন হওয়ার নয় – তা ব্যবসা কিংবা যেকোনো কিছুতেই হোক না কেন।" "আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় – বিন লাদেনরা উসামাকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছে।" কারমেন আরও বলেছিলেন, "ভাই যাই করুক না কেন, সে ভাই-ই থেকে যায়।" [117]

কারমেনের বক্তব্য যে আদতে বিন লাদেনদেরকে চাপে ফেলার উদ্দেশ্যে ছিল না, সেটা দেখাতে সাদ আল-ফকিহের বক্তব্যও উল্লেখ করছি। সাদ ছিলেন সৌদির ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের (সাহওয়া) লন্ডনভিত্তিক কার্যক্রমে উসামার একসময়ের সহযোদ্ধা। তিনি বলেন, "[ইসলামি] পরিবারগুলোর কাঠামোয় একটি চমৎকার ব্যাপার রয়েছে। আপনাকে নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।... বিন লাদেন পরিবারকে তো ওসব বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে [যে তারা উসামার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করেছে]। কিন্তু তারা আসলে উসামাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।... আমি এমনটা দাবি করছি না যে কথাগুলো একেবারে প্রত্যেক বিন লাদেনের ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অন্যের মালিকানাধীন অর্থ (এক্ষেত্রে বাবার ব্যবসা থেকে অর্জিত উসামার অংশ) ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কেননা সেটাকে তারা নিজেদের কাছে রেখে দেওয়াকে গর্হিত পাপ মনে করে। সম্পদ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতেই হবে।" [118]

---

117 Carmen bin Laden, Inside the Kingdom, pp. 133 and 200.

118 Interview with Sa'd al-Faqih", Frontline Online, April 1999.

স্কুল জীবন

মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সন্তানদের মধ্যে কেবল উসামাই পুরো পড়াশোনা আরবে করেছিলেন। ফলে কোনোরকম পাশ্চাত্য স্কুলিং কিংবা দীর্ঘ সময় পৃথিবী ভ্রমণের কোনো প্রভাব তাঁর ওপর পড়েনি। এই বিষয়টি কি তাহলে এটাই ইঙ্গিত করে যে তাঁর মানসিকতা কেবল ইসলামি মূলনীতিতেই গড়ে উঠেছিল? উত্তরটা হ্যাঁ, আবার না-ও। লেবানিজ এক স্কুলে অল্প কিছুদিন পড়ার খুবই ক্ষীণ সম্ভাবনাটা বাদে উসামা আরবের বাইরের কোনো স্কুলে পড়েননি ঠিক। কিন্তু তিনি কেবল ইসলাম ধর্মের ওপর পড়াশোনার জন্যই স্কুলে যাননি।

ছাত্র-জীবনেরই কোনো একটি সময়ে উসামার মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি ইতিহাসের ব্যাপারে তীব্র আগ্রহ জন্ম নেয়। সেই আগ্রহই একসময় তাঁর জ্ঞানের গভীরতার বিষয়ে পরিণত হয়। আর সেই আগ্রহ ও জ্ঞান একসময় তাঁর একাডেমিক পড়াশোনাকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর লিখা ও বক্তব্যের ব্যাপারে গভীরভাবে পড়াশোনা করা এক গবেষক উল্লেখ করেছিলেন, উসামা তাঁর কথাবার্তায় “মাথা ঘোরানো মাত্রায় কুরআন-সুন্নাহর এবং ইতিহাসের রেফারেন্স দেন।” আর উসামার কাজ নিয়ে প্রাথমিক মাত্রায় জ্ঞানার্জন করা যে কেউ একই উপসংহারে এসেই থামবে। [119]

উসামা বিন লাদেন তাঁর এই আন্দোলনকে ইসলামের ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলন মনে করেন না। বরং একে ইসলামের আবহমানকাল ধরে চলে আসা মূলধারার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা মনে করেই তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্ববর্তীদের থেকে প্রয়োগযোগ্য দলিল দিয়ে দেন। আর বলাই বাহুল্য, ইসলামি বিশ্বে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠিও এটাই (কুরআন-সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তীদের কথা-কাজ থেকে প্রয়োগযোগ্য দলিল আনা)। নবি মুহাম্মাদ সা.-এর যুদ্ধবিগ্রহ, কথা কিংবা কাজ থেকে উসামা যেসব দলিল দেন তা – আদৌ নিজেকে নবির সাথে তুলনা করার জন্য নয় – যেমনটা পশ্চিমের কিছু গোঁয়ার লেখকরা অবজ্ঞাভরে লিখে বেড়ায়। বরং তিনি নিজের কথা ও কাজের পক্ষে ইসলামি মাপকাঠি অনুসরণ করে উপযুক্ত দলিল আনেন, যাতে তিনি কী অর্জন করতে চাইছেন তা বোঝানো সম্ভব হয়। তাছাড়া ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা যেকোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের রাসূল মুহাম্মাদ

119 Bruce B. Lawrence, “In bin Laden’s words”, Chronicle of Higher Education (Internet version), 4 November 2005.

সা.-এর কাজকে নিজেদের জন্য আদর্শ মনে করে থাকে এবং তাঁর কাজের সাথে মিলে যাওয়া কাজকে তারা প্রশংসাযোগ্য মনে করে। কোনো মুমিনই এই ব্যাপারে দ্বিমত করবে না যে রাসূল সা. হলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সমস্ত মুসলিমদের আদর্শ। সবশেষে, উসামার কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি ইতিহাস থেকে দলিল দেওয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের অনেক আলিমরাও ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। এই ব্যাপারে ম্যালিস রুথভেন (Malis Ruthven) সত্য বলেছিলেন, "রাষ্ট্রের অর্থায়নে বেড়ে ওঠা এসব আলিমদের ফাতওয়ার সত্যিকার কোনো মর্যাদা নেই। মুহাম্মাদি আবেদনের (যে দলিল উসামা ব্যবহার করেন) সাথে এগুলোর কোনো তুলনাই চলে না। একদিকে মুহাম্মাদ সা. – মুসলিমদের বিশ্বাসে এমন একজন আদর্শ নেতা, যিনি ছিলেন একাধারে ধর্মীয় থেকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারক, আর আরেকদিকে দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা এসব মানুষ। (উসামার দেওয়া দলিলের পাশাপাশি তুলনা করলে) এরাই যেন ইসলামি মেজাজের সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।" [120]

উসামা বিন লাদেনের হাইস্কুল এবং কলেজ পর্যায়ের পড়াশোনার খুব একটি ডকুমেন্ট নেই। কিন্তু তা যাই হোক, যুবক বয়সের এক পর্যায়ে তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি ইতিহাসের ওপর আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং এসব নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করতে শুরু করেন। এভাবে সময় গড়াতে গড়াতে একসময় তিনি এসব বিষয় এবং এগুলোর প্রয়োগে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রাসূল সা.-এর জীবনী ছাড়াও মুসলিম জাতি [উম্মাহ] ও ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ববর্গ – যেমন রাসূলের সাহাবাগণ, ইমামগণ, ফকিহগণ; ইসলামের বিভিন্ন সামরিক ব্যক্তিত্ব যেমন – সাহাবি খালিদ বিন ওয়ালিদ রদি., নুরউদ্দিন জঙ্গি, এবং বিশেষ করে সালাহউদ্দিন আল-আইয়ুবির মতো ব্যক্তিত্বদেরকে উসামার মতাদর্শে ঘুরেফিরেই খুঁজে পাওয়া যায়। মার্ক লং (Mark Long) উল্লেখ করেছেন, বিশেষত যুদ্ধের ক্ষেত্রে উসামা বিন লাদেন "রাসূলের ইসলাম রক্ষার আদর্শকে সচেতনভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।" [121] ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, উসামা ইসলামের পূর্ববর্তী ইতিহাসের (এবং কুরআন-সুন্নাহর) ব্যাপারে দারুণ সচেতন এবং তিনি সফলতার

---

120 Malise Ruthven, "The eleventh of September and the Sudanese mahidya in the context of Ibn Khaldun's theory of Islamic history", International Affairs, Vol. 78, No. 2 (April 2002), p. 341.

121 Mark Long, "Ribat, al-Qaida and the Challenge for U.S. Foreign Policy", Middle East Journal, Vol. 63, No. 1 (Winter 2009), p. 36.

সাথেই তাঁর নিজের এবং আল-কায়েদার কর্মপন্থাকে উপযুক্ত দলিলের সাথে সামঞ্জস্য করে দেখিয়ে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, যুবকদেরকে জিহাদে আগ্রহী করে তোলার জন্য তিনি সালাহউদ্দিনের উদ্যমকে তাদের সামনে তুলে ধরতেন। ৯/১১-এর আক্রমণের ঠিক আগের সময়টার এক বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন,

> *“আজ সমস্ত মুসলিমরাই আরেকজন সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির অপেক্ষায় রয়েছে, যিনি ওদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) হাত থেকে এই পবিত্র ভূমিকে (জেরুজালেম) আবারও মুক্ত করবেন।*
>
> *আমি আপনাদের সবাইকেই এক একজন সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি মনে করি, যার হাতের দিগ্বিজয়ী তরবারি থেকে কুফফারদের রক্ত ঝড়ে পড়ে। আমি এমন একজন সালাহউদ্দিনের আগমনের আশা করি, যাকে দেখে আমাদের হৃদয়ে-মননে নবি সা.-এর যুদ্ধের কথা স্মরণ হয়ে যাবে।”* [122]

প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতার দিকে দেখলে, উসামা বিন লাদেন জেদ্দার স্বনামধন্য আস-সাগির মডেল স্কুলে পড়েছিলেন। এটি শুধু ছেলেদের জন্য একটি K-12 স্কুল [123]। এখানে সৌদির সব উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর সন্তানরা পড়াশোনা করে। এমনকি রাজ পরিবারের সন্তানরাও। এই স্কুলকে কিং ফয়সাল যুবরাজ থাকাকালীন সময়ে অর্থায়ন করেছিলেন। স্টিভ কোল লিখেছেন যে, আস-সাগির স্কুলটি ফয়সালের বিজ্ঞান ও পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। স্কুলটির (অর্থায়নের) উদ্দেশ্য ছিল “তরুণদেরকে রাজ্যের জন্য আধুনিক ধারার অর্থনীতির উপযোগী করে গড়ে তোলা।” [124]

উসামা বিন লাদেন ১৯৬৮ সালে এগারো বছর বয়সে এই স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর ক্লাসে প্রায় ৬০ জনের মতো ছাত্র ছিল। ১৯৭৬-এ উসামা এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। হিসেবে সেটা ছিল উসামার প্রথম বিয়ের দুই বছর পর। স্কুলে থাকাকালীন তিনি গণিত, ইতিহাস, ইংরেজি, ধর্ম, জীববিজ্ঞান, আরবি ও অন্যান্য সব চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে পড়াশোনা

---

122 Abdul Sattar, “Osama urges ummah to continue jihad”, The News (Internet version), 7 May 2001.

123 যেসব স্কুলে কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলে।

124 Steve Coll, “Young Osama”, New Yorker (Internet version), 12 December 2005.

করেছিলেন।[125] উসামা তাঁর স্কুল উপভোগ করতেন, স্কুলের সাথে কিং ফয়সালের সম্পৃক্ততা নিয়েও তিনি আনন্দিত ছিলেন। সত্য বলতে উসামা যে গুটিকয়েক সৌদি শাসকদের প্রশংসা করেছেন, তাদের মধ্যে কিং ফয়সাল ছিলেন একজন। স্কুলের জন্য তিনি "ব্রিটিশ স্টাইলে ইস্ত্রি করা শার্ট আর ছাইরঙ্গা ট্রাউজার পরতেও সঙ্কোচ করতেন না।" তাঁর স্ত্রী নাজওয়া স্মৃতিচারণ করেছিলেন যে, তিনি প্রতিদিন সকালে আগ্রহের সাথে স্কুলের জন্য প্রস্তুত হতেন। নিজ পোশাক আশাকের ব্যাপারে তিনি "দারুণ সচেতন ছিলেন।"[126]

আস-সাগিরে উসামার দুটো বিষয় মনোযোগ দেওয়ার মতো। এক হলো সেখানে তিনি কেমন মানের পড়াশোনা করেছেন। আর অপরটি হলো স্কুলের ছাত্র হিসেবে তাঁর আচার আচরণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উসামাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খাটো করে চিত্রায়ন করা হলো সৌদি ন্যারেটিভের ভিত্তি। আর আস-সাগিরে উসামার ছাত্রজীবন এবং সেখানে তাঁর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি তথ্য পাই পিটার বার্গেনের (Peter L. Bergen) লিখা অপরিহার্য একটি বই The Osama bin Laden I Know থেকে। লেখক বইটিতে আস-সাগিরে উসামার ইংরেজি শিক্ষক ব্রায়ান শায়লারের (Brian Fyfiled-Shaylar) একটি সাক্ষাৎকার উল্লেখ করেছেন। সেই সাক্ষাৎকারে শায়লার বলেছিলেন, "স্কুলটি আরবের পুরোনো অন্যসব কুরআনভিত্তিক মাদ্রাসার মতো ছিল না। এটির পুরোপুরি নিজস্ব এক ধাঁচ ছিল।"[127] এখানেই শেষ নয়। তিনি শিক্ষক হিসেবে ছাত্র উসামা বিন লাদেনের মূল্যায়ন করে যে চিত্র এঁকেছিলেন, সেই হিসেবে তাঁকে খাটো করে দেখা নিঃসন্দেহে ভ্রান্তি। শায়লারের স্মৃতিচারণে উসামা ছিলেন,

> *"অসাধারণ বিনয়ী... আমার বরং মনে হয় তিনি সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে একটু বেশিই বিনয়ী ছিলেন। হয়তো এর কারণ ছিল তাঁর লজ্জাশীলতা। শিক্ষক প্রশ্ন করলে সবাই যেখানে হাত তুলে 'আমাকে, আমাকে' বলে আগ বাড়াতো, সেখানে উসামা তা না করে মুখে আত্মবিশ্বাসী মুচকি হাসি নিয়ে বসে থাকতেন। অবশ্যই তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রায়ই সঠিক উত্তর দিতেন। কিন্তু নিজের জ্ঞান জাহির করতে আগ বাড়িয়ে কিছু করতেন না।*

---

125 Coll, "Young Osama"; bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 13, 19.

126 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 13, 19.

127 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 5.

উসামার ইংরেজি যে খুব অসাধারণ ছিল, তা নয়। (অন্যান্য বিষয়েও) ক্লাসের একেবারে সেরাদের কাতারেও ছিলেন না। আবার তলানির ছাত্রও ছিলেন না। কিন্তু এর মানে আবার এই নয় যে তিনি আরবদের হিসেবে মধ্যম মানের ছাত্র ছিলেন। এটা মাথায় রাখতে হবে যে, আস-সাগির পুরো দেশটির সেরা দুই স্কুলের একটি ছিল। অতএব এখানকার মধ্যম মানও হলো পুরো দেশের সেরা ৫০ জন ছাত্রদের একজন হওয়ার মতো। সহজ ভাষায়, উসামা আস-সাগিরের মধ্যে খুব উজ্জ্বল ছিলেন না ঠিক, কিন্তু বয়সের হিসেবে শিক্ষাদীক্ষায় তিনি রাজ্যসেরা পঞ্চাশ জনের মধ্যে থাকার মতোই মেধাবী ছিলেন।" [128]

উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং পশ্চিমে তাঁর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেই হিসেবে তাঁর ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বোধ হয় ছিল স্কুলের পরের সময়টায় তাঁর ধর্মীয় হালাকায় অংশ নেওয়া। যারাই উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে কলম ধরেছেন, তারাই একজন সিরিয়ান জিম শিক্ষকের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। তিনি সম্ভবত মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। আর তিনিই নাকি সেই হালাকা পরিচালনা করতেন। হালাকায় প্রথমে কুরআন আর তারপরই রাসূল সা.-এর হাদিস থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। [129] স্টিভ কোল অবশ্য সেই হালাকাকে অনেকটা আধাগুপ্ত সংগঠনের মতো করে চিত্রায়ন করেছেন যেখানে নাকি "উসামা সর্বপ্রথম সশস্ত্র জিহাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা লাভ করেন।" [130] এখানে দুটো পয়েন্ট না আনলেই নয়। প্রথমত, আস-সাগিরের কারিকুলামে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব কুরআন, হাদিস কিংবা ইসলামের সশস্ত্র জিহাদের ব্যাপারে ধারণার জন্য উসামার কোনো স্কুল-পরবর্তী সংগঠনের প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, উসামা নিয়মিত মসজিদে তো যেতেনই, তার ওপর আবার তাঁর পরিবারের মেহমানদারির কারণে পুরো মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত সব আলিম ও মুফতিদের সাথে তাঁর নিয়মিতই দেখা সাক্ষাৎ হতো। আর তাই এমন উপসংহার টানা নিতান্তই ভুল হবে যে তিনি স্রেফ ঐ স্কুল পরবর্তী হালাকা থেকেই "সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে কিছু ধারণা

---

128 Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 8–9.

129 Coll, The Bin Ladens, p. 146.

130 Coll, "Young Osama."

পেয়েছিলেন।” উপরে যে চারটি উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই উসামার এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল যে জিহাদ হলো সশস্ত্র ইবাদাত। কেননা কুরআন আর সুন্নাহতে জিহাদকে সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকা সহ বেশ কিছু পশ্চিমা প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকরা বলার চেষ্টা করে যে জিহাদ নাকি আসলে সামরিক কিছু না, বরং জিহাদ নাকি প্রত্যেক মুসলিমের স্বীয় প্রবৃত্তি এবং চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা (নফসের জিহাদ)। এই ব্যাপারটা পশ্চিমাদের মাথায় ঢুকেছে সৌদির কিছু দরবারি মুফতিদের কারণে, যারা সবসময় [বিশেষত ৯/১১-এর পরে] জিহাদকে এমন অসামরিক ধরনের (অন্তরের) ইবাদাত হিসেবে চিত্রায়নের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তো এইসমস্ত লোকেরা রাসূল সা.-এর একটি হাদিসের রেফারেন্স দেন, যেখানে তিনি সা. ছোট ও বড় জিহাদের কথা বলেছেন। সেই হাদিসে ‘বড় জিহাদ’ বলতে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াইকে আর ‘ছোট জিহাদ’ বলতে সামরিক কর্মকাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এগুলো একেবারেই অযৌক্তিক কথাবার্তা। কেননা প্রথমত, যে কুরআনকে স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতা জিবরিলের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে নাযিল করেছেন, তার যতো স্থানে জিহাদের উল্লেখ রয়েছে, তার সবটাতেই সামরিক যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে। [131] আর দ্বিতীয়ত, উল্লেখিত হাদিসটির সনদও খুব শক্তিশালী নয়। [132]

এত সবকিছু বলা শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে, উসামা বিন লাদেন জিহাদ সম্পর্কে যা কিছু জেনেছেন বা শিখেছেন, তা ইসলামে আদৌ গোপন বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং তিনি জিহাদের সেই রূপটিই শিখেছেন, যা কুরআন ও হাদিসের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই উল্লেখিত

---

131 Daniel Pipes, “Jihad through history”, New York Sun, 31 May 2005, http://www.danielpipes.org/2662/jihad-through-history

132 Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, pp. 116, 118. প্রফেসর পিটার্স উল্লেখ করেছেন যে অনেক ইসলামপন্থীই বিশ্বাস করে যে দরবারি মুসলিম এবং পাশ্চাত্য লেখকদের এই হাদিসকে ক্রমাগত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো ‘মুসলিমদের লড়াকু মনোবলকে দুর্বল করে দেওয়া’। এছাড়াও শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম অনেক খ্যাতিমান ইসলামি আলিমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যারা বলেছেন যে এই হাদিসটির মান দুর্বল হতে জাল সীমার মধ্যে। যেমন, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ লিখেছেন, “এই হাদিসের উৎস অজ্ঞাত এবং বর্ণনাকারী ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার কোনো ব্যক্তি নন। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হলো সবচেয়ে মহৎ কাজ, এমনকি সমগ্র মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।” দেখুন Shaykh Abdullah Azzam, “Join the caravan”, note 71.

হয়েছে। আর সেই রূপটি হলো সামরিক জিহাদ। এই ব্যাপারে বিন লাদেন একবার বলেছিলেন যে, যারা ইসলামের ওপর আক্রমণ এলে 'বর্শা ধরা' মুসলিমদের 'যৌক্তিক অধিকার' মনে করে না, তারা বিভ্রান্ত। তাঁর ভাষায়, "জিহাদ আমাদের শরিয়াহর অংশ আর এই উম্মাহ তার শত্রুদের সাথে এর প্রয়োগ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।" [133] উসামা বিন লাদেন ছাড়াও বেশিরভাগ মুসলিমরাই – হ্যাঁ শুধু তাঁর অনুসারীরাই নয়, বরং বেশিরভাগ মুসলিমরাই জিহাদ বলতে সামরিক যুদ্ধকেই বোঝে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেবল জিহাদ কখন, কীভাবে, কার বিরুদ্ধে করা হবে – এসব নিয়ে। আমার মতে, এটা পশ্চিমেরই ভুল যে তারা এই সহজ ও অখন্ডনীয় ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারেনি।

জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জন এস্পোসিতো (John Esposito) জিহাদের দুটো রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো কুরআনের বর্ণনানুযায়ী সামরিক কর্মকান্ড। আর অপরটি হলো ব্যক্তিগত বা সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা। আমেরিকায় যেমন ক্যান্সার, মাদক বা দারিদ্রতার বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা করে ক্যাম্পেইন চালানো হয়, অনেকটা তেমনই। হোক তা ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে। যদিও প্রফেসর এস্পোসিতো ইসলামে সামরিক জিহাদের ওজনকে কিছুটা হালকা করে চিত্রায়ন করেছেন, তবে তার উল্লেখিত শ্রেণিকরণ আমার কাছে সাধারণের বোঝার জন্য উপকারিই মনে হয়েছে। জিহাদের সামরিক রূপের পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, "আজকাল জিহাদ শব্দের দ্বারা (মুসলিমদের) অনেকেই ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা, পারিবারিক বা প্রতিবেশির দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা কিংবা সামাজিকভাবে মাদক, দারিদ্রতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াকে বোঝায়।" সাথে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের সামরিক যুদ্ধ কিংবা সামাজিক আন্দোলন – যেভাবেই হোক না কেন, "জিহাদ শব্দটা (মুসলিমদের জন্য) সবসময় ইতিবাচক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।" [134]

১৯৭৮ সালে উসামা বিন লাদেন অর্থনীতি, ব্যবসায় শিক্ষা ও ম্যানেজমেন্টের ওপর পড়াশোনা করতে জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। তিনি নাকি পরবর্তীতে ম্যানেজমেন্টের ওপর আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। [135] কিন্তু তিনি হয়তো তাঁর

---

133 Atwan, "Interview with Usama bin Ladin",27 November 1996.

134 John L. Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think (New York: Gallup Press, 2007), p. 19.

135 Coll, The Bin Ladens, p. 198.

কোর্সগুলো শেষ করেননি। আমি তাঁর কোর্সের বা গ্রেডের কোনো ডকুমেন্টসও পাইনি। দলিল প্রমাণের এমন অপ্রতুলতার কারণে তাঁর ব্যাপারে গতানুগতিক যে ধারণা করা হয়, তা হলো – উসামা তাঁর ইসলামি ভাবধারার শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আর তাদের মধ্যে নাকি জর্ডান, মিশর কিংবা সিরিয়া থেকে পালিয়ে আসা মুসলিম ব্রাদারহুডের বা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরাও ছিল। অনেক লেখক তো দাবি করেন, উসামা জর্ডানের শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং মিশরের মুহাম্মাদ কুতুবের কাছে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়েছিলেন। যেমন স্টিভ কোল লিখেছেন যে উসামা বিন লাদেন এই শাইখদের কাছ থেকে "বর্তমান যুগে ইসলামি জিহাদের বাধ্যবাধকতা এবং প্রয়োগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে দীক্ষা পেয়েছিলেন।" [136] যদিও এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; তাছাড়া উসামাও হয়তো কোনো না কোনো পাবলিক লেকচারে এই দুই শাইখের বক্তব্য শুনেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি যে তাঁদের কাছে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানার্জন করেছিলেন, সে ব্যাপারে কোনো সত্যিকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর স্ত্রী নাজওয়াও শুধু এতটুকুই বলতে পেরেছেন যে তার স্বামী "বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় ক্লাসগুলোয় বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।" [137]

এই ব্যাপারটা উল্লেখ না করলেই নয় – উসামা বিন লাদেন কখনোই শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম কিংবা মুহাম্মাদ কুতুব থেকে সরাসরি কিছু বর্ণনা করেননি। তাঁর শ্যালক জামাল খলিফা শুধু এটুকু বলেছিলেন যে, তিনি এবং উসামা দুজনেই নাকি সাইয়্যেদ কুতুবের প্রখ্যাত বই 'মাইলস্টোন' এবং 'ফি যিলালিল কুরআন' পড়েছিলেন। এছাড়া মুহাম্মাদ কুতুবের কাছ থেকে 'কীভাবে আমাদের সন্তানদেরকে শেখাতে হবে' তা শিখেছিলেন। [138] স্টিভ কোল দাবি করেন যে, উসামা সত্তরের দশকের শেষের দিকে মুহাম্মাদ কুতুবের 'যে বিষয়গুলোর সংশোধন প্রয়োজন' বইটি পড়েছিলেন, যেখানে মূলত নেককার নয়, এমন মুসলিম শাসকদেরকে ছুঁড়ে ফেলতে বলা হয়েছে। তবে উসামা বিন লাদেন প্রকাশ্যে মুহাম্মাদ কুতুবের এই বইটি সহ আরেকটি বই 'আমরা কি মুসলিম?' সবাইকে পড়তে বলেছিলেন। [139]

---

136 Coll, Ghost Wars, p. 85.

137 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 25.

138 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 19.

139 Coll, The Bin Ladens, p. 204; OBL, "Message to the Muslim nation", Islamic Studies and Research Center (Internet), 4 March 2004; and OBL, "Practical Steps to the Liberation of Palestine", Al-Sahab Media, 14 March 2009.

উসামা বিন লাদেনের সাথে আবার সৌদি শাইখ সফর আল-হাওয়ালিরও ভাল বন্ধুত্ব ছিল। আর সফর আল-হাওয়ালির থিসিসের শিক্ষক ছিলেন মুহাম্মাদ কুতুব। সেই সুবাদেও মুহাম্মাদ কুতুবের দ্বারা উসামা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[140] অর্থাৎ, কুতুব ভ্রাতাদ্বয় এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বইপত্র অধ্যয়ন করে উসামা বিন লাদেন মুসলিম হিসেবে নিজের এই দায়িত্ব সম্পর্কে ভালই জেনে গিয়েছিলেন যে – বেদ্বীন শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর এটা হলো ১৯৮৬-তে উসামার সাথে আইমান আজ-জাওয়াহিরির দেখা হওয়ারও আগেকার কথা। অথচ সৌদি ন্যারেটিভের ঘোল গিলে এখনও মাঝে মাঝে অনেকেই এমনটা আওড়ায় যে, ডা. জাওয়াহিরিই নাকি সর্বপ্রথম উসামাকে এসব শিখিয়েছিলেন।[141]

---

140 Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi movement", Studies in Conflict and Terrorism (Internet version), Vol. 29, No. 3 (May 2006).

141 Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 63 and 68–69.

কোটিপতি শ্রমিক

উসামা বিন লাদেনের নিজের দাবি অনুযায়ী, তিনি ছোটবেলা থেকেই তাঁর বাবার কোম্পানিতে সময় দিতেন। কোম্পানির অধীনে মক্কা, মদিনা, জেদ্দা ও তার আশেপাশের এলাকায় রাস্তা, সুরঙ্গ ইত্যাদি সহ নানারকম আধুনিক অবকাঠামো তৈরিতে তিনি সাহায্য করতেন। ১৯৯৭ সালে উসামা বলেছিলেন, "আমি অল্প বয়স থেকেই বাবার সাথে কাজ করতে শুরু করি। কন্সট্রাকশনের কাজ করতে গিয়েই আমি (রাস্তা বা সুরঙ্গের জন্য) পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর ওপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। এছাড়া আমি মসজিদে নববির সম্প্রসারণ প্রজেক্টেরও তত্ত্বাবধানে ছিলাম।" [142] উসামার কৈশোরের বেশ কয়েকজন বন্ধু এই দাবির সত্যায়ন করেছিলেন। একজনের ভাষ্যমতে, "তিনি তাঁর বাবার কন্সট্রাকশন কোম্পানিতে একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতেন। প্রচণ্ড গরমের সময়েও তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ট্রাক্টর পরিচালনার কাজ করতেন। সকাল আর দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় তিনি অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে মাটিতে বসেই খেতেন। [143] উসামার এই চিত্র ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আরেকজনও সত্যায়ন করেছেন। তিনি হলেন ওয়ালিদ আল-খতিব। মক্কায় কাজ চলাকালীন সময়ে ওয়ালিদ কিশোর উসামার কাজ তদারকি করতেন। স্টিভ কোলকে ওয়ালিদ বলেন, "উসামা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারেও দারুণ মনোযোগ দিতেন। তাঁর কারিগরি দক্ষতা ছিল অবাক করা... ... কারিগরি কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেগুলো তিনি নিজেই সমাধান করতে পছন্দ করতেন।" [144] আল-খতিব আরও উল্লেখ করেছেন যে, উসামা বিন লাদেন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভবনধ্বসের মতো জটিল সব ব্যাপার নিয়ে কাজ করতেন। এছাড়া কোনো স্থাপনা ধ্বংসের জন্য সেটির কাঠামোগত দুর্বলতম অংশ নিয়েও তাঁর পড়াশোনা ছিল। নিঃসন্দেহে তা এমন এক জ্ঞান, যা ২০০১-এর পরিকল্পনায় কাজে এসেছিল। [145] পরবর্তীতে উসামা যখন সর্বপ্রথম সুপারভাইজিংয়ের দায়িত্ব পান, তখন

---

142 Mir, "Interview with Osama bin Laden in Jalalabad", Pakistan, 18 March 1997; Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I; Khalid al-Batarfi, "Osama is very sweet, very kind, very considerate."

143 Khalid M. al-Batarfi, "Growing up with Osama: 2 youths took different paths", http://www.seatlletimes.nwsource.com, 6 January 2007.

144 Coll, The Bin Ladens, pp. 210–212.

145 Coll, The Bin Ladens, pp. 212 & 230.

তাঁকে এক বিশাল শ্রমিকদলের ব্যবস্থাপনা করতে হয়েছিল। সেই শ্রমিকদের মধ্যে মিশরীয়, ফিলিস্তিনি, কুয়েতি, জর্ডানি, বাংলাদেশি, ইয়েমেনি, পাকিস্তানিরা ছাড়াও আরও অনেক দেশের মানুষই ছিল। বলাই বাহুল্য, তিনি সফলতার সাথেই এই বিরাট দলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। স্কুলের পড়াশোনা আর বাবার কোম্পানির কাজ একত্রে চালানোর কারণে সময় গড়াতেই উসামা 'কাজপাগল' হিসেবে খ্যাত হয়ে যান। [146]

১৯৭৪ সালের দিকে তিনি তাঁর মামাতো বোন নাজওয়া ঘানেমকে বিয়ে করেন। আর ১৯৭৮-এর মধ্যেই এই দম্পতি দুইটি ছেলে সন্তানের অধিকারী হয়ে যান। [147] নাজওয়া লিখেন, "তিনি শ্রমিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব ভয়ঙ্কর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতেন। পাহাড়ের বুক খুঁড়ে রাস্তা বানানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়া ভারি মেশিন সহ সব বড় বড় যন্ত্রপাতি তিনি চালাতে জানতেন। মূলত রাস্তা বানানোর কাজই করতেন। কিন্তু প্রায়ই বলতেন যে তাঁর সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল সৌদির মরুতে পাহাড়ের শক্ত পাথর খুঁড়ে নিরাপদ টানেল বানানো।" [148]

কঠোর পরিশ্রম করা বিন লাদেন পরিবারের বৈশিষ্ট্য। আর উসামা এই বৈশিষ্ট্যে পরিবারের অনেককেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। খালিদ আল-বাতারফি বলেন, "বিন লাদেনরা এমনই। তাদের প্রত্যেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করতেন ঠিক। কিন্তু উসামা অন্যান্য বিন লাদেনদের কিছুটা ভিন্ন ছিলেন। তিনি কাজে নিজেই শরিক হয়ে যেতেন, নিজেই ট্রাক্টর চালাতেন, আর তাঁর বাবার মতো তিনিও শ্রমিকদের সাথে একসাথে বসে খেতেন। সারাটা দিন মাঠে কঠোর পরিশ্রম করতেন... বিন লাদেন কোম্পানির মক্কার কিছু প্রজেক্টে তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেখানে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কঠোর পরিশ্রম করতেন। পারিবারিক ও সামাজিক কাজে সময় দিতেন সন্ধ্যার পর। রাতের সলাত আদায় শেষে তিনি ঘুমিয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে (তাহাজ্জুদ) সলাত আদায় করতেন। এটা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক না। কিন্তু উসামা তাও করতেন স্রেফ নবি সা.-কে অনুসরণ করার জন্য। এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পরের দিন শুরু করতেন।" [149]

---

146 Tim Butcher, "My life in al-Qaeda, by bin Laden's bodyguard", http://www.telegraph.co.uk, 26 March 2008.

147 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 60.

148 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 4.

149 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 22. খালিদ আল-বাতারফি আরও বলেন, "উসামা বিন লাদেন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।" দেখুন Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 15.

উসামা বিন লাদেন তাঁর অবসর সময়ের কাজকর্মেও ছিলেন ক্লান্তিহীন, ঝুঁকিপ্রিয়। অল্প বয়স থেকেই তিনি ভলিবল, ফুটবল, সাঁতার, শিকার করা সহ বিভিন্ন খেলাধুলা পছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রী একবার বলেছিলেন যে, তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই তিনি অনেক লম্বা দূরত্ব হাঁটতে পছন্দ করতেন। এছাড়া তাঁর ছেলে উমার বলেন, "আমার বাবার গতির সাথে কেউই পেরে উঠতো না। যুবক বয়স থেকেই তিনি নিজেকে শারীরিকভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন। বাবা খুব সুঠাম দেহের অধিকারী না হলেও তাঁর মতো পরিশ্রমে কেউ অভ্যস্ত ছিল না।" [150] উসামার ছোটবেলার এক বন্ধু বলেছিলেন যে গ্রীষ্মের ছুটিগুলোয় তিনি সিরিয়া-তুর্কী বর্ডারে পর্বাতোরোহণ করতে পছন্দ করতেন। তাঁর বোনের ভাষ্যমতে, "সেসব জায়গায় উসামা খুবই ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ে উঠতেন। অতটা ঝুঁকি নেওয়া সাধারণ কারও জন্য প্রায় অসম্ভব।" [151] তিনি জেদ্দা থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত তাঁদের পারিবারিক ফার্ম আল-বাহরাতেও অনেক সময় কাটাতেন। সেখানে তিনি শিকার, কৃষিকাজ, ঘোড়া পালন সহ অনেক কিছুই করতেন। সেই ফার্মের একটি ঘোড়ার নাম রাখা হয়েছিল রাসূল সা.-এর এক সাহাবির যুদ্ধঘোড়ার নামে। এছাড়া মরুভূমিতে কোন গাড়ি কতো দ্রুত চলতে পারে, সেটা পরখ করে দেখার জন্য সেখানে তিনি বিভিন্ন গাড়িও চালাতেন। [152]

বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রকৃতি ও গ্রাম্যজীবনের প্রতি উসামা বিন লাদেনের ভালবাসা বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নাজওয়ার লিখায় এসেছিল যে বিয়ের পর প্রথম দিকে তিনি তার কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "জেদ্দা খুব দ্রুত বাড়ছে। শহরটা কেমন যেন ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে।" এছাড়াও শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের ছেলে হুজাইফা আশির দশকের শুরুর দিকের কথা স্মরণ করেছিলেন এভাবে, "উসামা শহরের হৈ হুল্লোড় থেকে দূরে থাকতে চাইতেন।" [153] এক সময় উসামার পরিবার ফার্মেই বেশি সময় কাটাতে থাকে। নাজওয়া বলেছিলেন, "আমি আমার স্বামীর চেয়ে প্রকৃতিপ্রেমী কাউকে দেখিনি... আল্লাহর সৃষ্ট সবকিছুর প্রতিই তাঁর ছিল অগাধ আকর্ষণ – একেবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘাস-পাতা কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণিও বাদ ছিল না।" আর তাঁর ছেলে উমার লিখেছিলেন, "বাবা বাইরের

---

150 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 9, 61.

151 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 14; bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 21.

152 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 20; ঘোড়ার নামের ব্যাপারে দেখুন Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 14, 17.

153 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 16; Sadha Umar, "The Event", LBC Satellite Television, 12 September 2004.

প্রকৃতি খুবই পছন্দ করতেন। ফার্মের জমিতে তিনি খুব যত্ন করে একটি বাগান করেছিলেন। তিনি সেখানে পাম সহ বিভিন্ন প্রজাতির শত শত গাছ লাগিয়েছিলেন। এছাড়াও বাবা এক ব্যয়বহুল মরুদ্যানও বানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রিডস সহ বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ চাষ করতেন। বাগানের কোনো সুন্দর গাছ, ফুল কিংবা তেজী ঘোড়াগুলোর কোনো একটির দিকে যখন বাবা তাকাতেন, তখন তাঁর চোখগুলো আনন্দে আর গর্বে ছলছল করে উঠতো।" [154]

শহরের চেয়ে গ্রামীণ পরিবেশের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস উসামা বিন লাদেনের চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রতিকূলতার মাঝে টিকে থাকাকেও গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন শহরের চেয়ে পাহাড়ের ভাঁজে সহজেই লুকানো যায়। অবশ্য তিনি এই বিশ্বাসও রাখতেন যে – কষ্ট সওয়া গ্রাম্য জীবন সমাজব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, বাইরের আক্রমণকে শহরের চেয়ে ভালভাবে প্রতিহত করতে পারে, পুরুষদের যুদ্ধস্পৃহাকে সংরক্ষণ করে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি মনে করতেন, গ্রামীণ পরিবেশ তাঁকে শহুরে সমাজের অবক্ষয় ঠেকিয়ে নতুনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায়, উসামা স্কুল কিংবা নিজের পড়াশোনার কোনো এক পর্যায়ে ইবনু খালদুনকে অধ্যায়ন করেছেন। ইবনু খালদুনের লিখায়-কাজে সামাজিক সংহতি, ঐক্য, সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। ইবনু খালদুন এমন পয়েন্টও এনেছিলেন যে, মুসলিমদের সামরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকলে তাঁরা রাসূল সা.-এর আনীত সত্যকে বিজয়ী করতে পারতো না।" ইবনু খালদুনের মতে শহুরে সমাজ দুর্বলতা, জালিম সরকারব্যবস্থা, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি ডেকে আনে। [155]

এখনও পর্যন্ত আমি যাকিছু পেয়েছি, সে অনুযায়ী উসামা বিন লাদেন ইবনে খালদুনকে একবারও উদ্ধৃত করেননি। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রা থেকে বোঝা যায়, ইবনু খালদুনের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামি সভ্যতার পুনরুত্থান হবে গ্রামীণ গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা থেকেই। উসামা শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করার

154 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 21-22, 43.

155 "Ibn Khaldun", http://www.oxfordislamicstudies.com; Malik Mufti, "Jihad as statecraft: Ibn Khaldun on the conduct of war and empire", History of Political Thought, Vol. 30, No. 3 (Autumn 2009), pp. 385–410; Goodman, "Ibn Khaldun and Thucydides"; and Akbar S. Ahmed, "Ibn Khaldun and anthropology: The failure of methodology in the post 9/11 world", Contemporary Sociology, Vol. 34, No. 6 (November 2005), pp. 591–596.

পেছনে কেবল তাঁর ধার্মিকতা কিংবা যোগ্যতাই একমাত্র কারণ ছিল না, বরং শাইখ আযযামের শহুরে পরিবেশকে উপেক্ষা করার নীতিও অন্যতম আরেকটি কারণ ছিল। উসামা বলেছিলেন, "শাইখ বেশিরভাগ মুসলিমদের কাছে চেনা সেই পরিবেশ ছেড়ে এসেছিলেন, যেখানে মসজিদ আর ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। এরপরই তিনি [দক্ষিণ এশিয়ার পাহাড়ীয় অঞ্চল থেকে] ইসলামি বিশ্বের মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।" আর আল-কায়েদা ও নিজের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "পাহাড়-পর্বতই হলো আমাদের সহজাত স্থান... আফগানিস্তান, ইয়েমেন এগুলোই আমাদের জন্য উপযুক্ত (ঘাঁটি)। এখানকার প্রকৃতি পাহাড়ে ঘেরা। এখানকার মানুষেরা সাদামাটা, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। আর এই প্রকৃতি যে কাউকেই এমন নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, যা সব ধরনের অপমান ও গ্লানি থেকে মুক্ত।" [156]

মানুষের মধ্যে জিহাদি চেতনা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও উসামা বিন লাদেনের চিন্তা ইবনু খালদুনের সাথে মিলে যায়। উসামা বলেন, "যুদ্ধ (জিহাদ) আমাদের দ্বীন এবং শরিয়াহর অংশ। আর সামরিক প্রশিক্ষণ (ইদাদ) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দায়িত্বস্বরূপ... মানুষের জন্য অস্ত্র সহজলভ্য হওয়া উচিত।" [157] যেকোনো ধরনের বিলাসিতার প্রতিও তাঁর ছিল তীব্র অনীহা। এমনকি এমনসব বিষয়ের প্রতিও যেগুলো কিনা এখন আর বিলাসি সামগ্রী নয়, বরং অনেকটা প্রয়োজনেই পরিণত হয়েছে বলা যায় যেমন: এসি, ঠান্ডা বরফ টুকরো, ট্যাপের পানি, টেলিভিশন ইত্যাদি। বিলাসিতার প্রতি তাঁর এমন তীব্র অনীহাও ইবনু খালদুনের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের দৃঢ়তা এবং তাঁর জীবনযাপন যে সেই দৃঢ়তারই প্রতিফলন ছিল, সেটা তাঁর আশেপাশের সবচেয়ে চেনাজানা মানুষরাই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। [158]

---

156 Ismail, "Interview with Usama bin Laden", 23 December 1998; Atwan, "Interview with Usama bin Laden", 27 November 1996.

157 Yusufzai, "Interview with Usama bin Laden",4 January 1999; Hamid Mir, "Interview with Usama bin Laden in Jalalabad",18 March 1997; and Usama bin Laden, "Message to the Muslim nation."

158 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, and Khalid al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, narrated by Abu Jandal, 11 parts", Al-Quds al-Arabi, 3 August 2004–29 March 2005.

বিলাসিতাকে যে তিনি একেবারে সহজাতভাবেই খারাপ মনে করতেন, তেমনটা কিন্তু নয়। বরং তিনি একে শারীরিক যতসব দুর্বলতা, বস্তুবাদ কিংবা অর্থের নেশা, আল্লাহর জন্য নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করার প্রবণতা ইত্যাদির উৎস মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, আল্লাহ সমস্ত মুসলিমকেই কোনো না কোনো সময়ে এমনসব পরীক্ষায় অবশ্যই ফেলেন, যাতে উত্তীর্ণ হতে নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসা বাঞ্চনীয়। [159] আমেরিকার বিলাসী জীবনযাত্রাকে উসামা বিন লাদেন (আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে) মুজাহিদদের জন্য একটি সুবিধা হিসেবে দেখতেন। সাংবাদিক আহমাদ যায়দানকে তিনি বলেছিলেন, "পশ্চিমাদের, বিশেষ করে আমেরিকানদের মন-মানসিকতা হলো বস্তুবাদী। ওরা বিলাসিতা আর শান্তশিষ্ট জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আফগানিস্তানের মতো একটি দেশে এসে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে ওদের বেগ পেতে হয়। আফগানিস্তান, এমনকি এর ম্যাপ সম্পর্কে কোনো সাধারণ ট্যাক্স দেনেওয়ালাকে বোঝাতে হলেও একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে অনেক সময় নিয়ে বোঝাতে হয়।" [160] রাসূল সা.-এর এক সাহাবি কা'ব বিন মালিক রদি. তাঁর খুব অল্প সময়ের খামখেয়ালির কারণে রাসূল সা.-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি – এই উদাহরণ এনে উসামা বিন লাদেন উপসংহার টানতেন যে তিনি, তাঁর পরিবার এবং আল-কায়েদার জন্য বিলাসিতায় ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে এই পাহাড়ে পর্বতে গাছের নিচে থাকাই বরং ভাল। [161]

উসামা বিন লাদেনের ওপর ইবনু খালদুনের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ম্যালিস রুথভেন লিখেছেন, "বিন লাদেন ও আল-কায়েদাকে যতটা ধ্বংসবাদী (nihilist) ভাবা হতো, তারা ঠিক তেমন নয়।... আধুনিক উপকরণের সন্নিবেশ ঘটলেও, আল-কায়েদার গাঠনিক এবং উদ্দেশ্যগত বিষয়গুলো ছয়শত বছরেরও বেশি সময় আগে ইবনু খালদুনের উল্লেখিত ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি ও পুনর্জাগরণের প্যাটার্নের সাথে অনেকটাই মিলে যায়।" [162]

---

159 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden.

160 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask, p. 39.

161 OBL, "Lecture: The hadith of Ka'ab ibn Malik concerning the Tabuk expedition", Al-Sahab Media, c. March 2006.

162 Ruthven, "The eleventh of September and the Sudanese mahdiya", p. 351.

আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সা. ও সাহাবাগণ

উসামার যুবক বয়সে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকাশ ঠিক কীভাবে কখন হয়েছিল, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করাই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন। তাঁর বাবা নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন আর অবশ্যই তিনি তাঁর সন্তানদেরকে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। তাই এটাই বোধ হয় যে, উসামার ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার কেন্দ্র তাঁর বাবাই ছিলেন। স্টিভ কোলের মতে মুহাম্মাদ বিন লাদেন ছিলেন এমন একজন মানুষ, "যিনি সন্তানদের মনে ইসলামি বিশ্বাসকে গেঁথে গিয়েছিলেন 'এক সীমান্তবিহীন পৃথিবীর জন্য' হিসেবে।" [163] এটাও সত্য বলেই মনে হয়, কেননা মুসলিমদের বিশ্বাসের একটি অংশ হলো আল্লাহ একসময় পুরো পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করে দিবেন। আর উসামাও বারবার বলতেন, "সীমান্তগুলো আদতে কিছুই না। সমগ্র পৃথিবীই আল্লাহর।" [164] কিন্তু ছেলের ধর্মীয় বিকাশে মুহাম্মাদ বিন লাদেনের অবদান কেবল কিছু তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ছেলেকে তিনি এই দীক্ষাও দিয়েছিলেন যে দ্বীনের রাহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর কথানুযায়ী তাঁকে কাজও করতে হবে। আর মুহাম্মাদ বিন লাদেন নিজেই কথা ও কাজের এমন চমৎকার সমন্বয় ছিলেন যে এই সময়ে তাঁর মতো দ্বিতীয় আরেকজন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি স্রেফ রাজ পরিবারের কিছু প্রাসাদ বানানোর ইঞ্জিনিয়ারই ছিলেন না, বরং সৌদি আরবকে আধুনিক করার ক্যাম্পেইনে যতো রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর, বন্দর, সামরিক ঘাঁটি সহ যতো ধরনের অবকাঠামো প্রয়োজন হতো, সেই সবকিছুরই কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থাকতো তাঁরই হাতে। উসামা বিন লাদেন তাঁর বাবার কাছে তাত্ত্বিক শিক্ষাটুকু তো পেয়েছিলেন ঠিকই, সাথে তাঁর বাবাকে দেখে এই দীক্ষাও পেয়েছিলেন যে আমল করা ছাড়া সেই শিক্ষা আদৌ যথেষ্ট নয়।

উসামা ইসলামি শিক্ষা পেয়েছিলেন আরবের অন্য দশটা ছেলের মতোই – ঘরে, স্কুলে আর মসজিদে। তাঁর বাবা মা তাঁকে সৌদিতে প্রচলিত প্রভাবশালী ওয়াহাবি ধারায় শিক্ষিত করেছিলেন। উসামা মূলত হাদিসের (কিংবা সুন্নাহর) ওপর বেশি অধ্যয়ন করেছিলেন। আর হাদিসকে ইসলামে কুরআনের পরেই স্থান দেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোয় তিনি কুরআনের তুলনায় হাদিস একটুখানি বেশিই উদ্ধৃত করতেন। কোনোই সন্দেহ নেই যে তিনি রাসূল

---

163 Coll, The Bin Ladens, p. 15.

164 "Text of Usama Bin Laden poster calls for holy war against U.S.", (Internet version), 19 August 1999.

সা.-কে ভালবাসতেন। রাসূল সা.-এর দেখানো পথে চলতে ভালবাসতেন। তাঁর কথা, আচরণ, যুক্তিতর্ক সবসময় এই প্রশ্নে এসে ঠেকতো যে, "একই রকম পরিস্থিতিতে রাসূল সা. কী করতেন?" স্টিভ কোল এব্যাপারে ঠিকই বলেছেন, "উসামা রাসূল সা.-কে পোশাক আশাকে পর্যন্ত অনুসরণ করতেন এবং একজন দ্বীনদার মুসলিমের জন্য সেটাকেই সর্বোত্তম আদর্শ মনে করতেন।" [165] (উসামার মতে) রাসূল সা. যে ক্ষেত্রে যেভাবে চলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের সেভাবেই তাঁকে অনুসরণ করা উচিত। উসামা বলতেন, "হাদিস তো মুসলিমদেরকে শেখানো হয় ঠিক। কিন্তু মুসলিম যুবদেরকে সাথে এই দীক্ষাও দেওয়া প্রয়োজন যে, অর্জিত জ্ঞানকে কাজে পরিণত করতে হবে। অন্যথায় এমন ইলম তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। অর্জিত ইলম ফলপ্রদ হয় যখন তা রাসূল সা.-এর দেখানো পন্থায় আমলে পরিণত করা হয়। তাহলেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো। আর সহিহ বুখারিতে তো এসেছেই যে, রাসূল সা.-কে যখন সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "সেই ব্যক্তি(র আমল), যে কিনা জান ও মাল সঁপে দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।" [166]

উসামা বিন লাদেন স্কুল ও ঘরের বাইরে ইসলামি দল এবং আলিমদের সাথে মিশতে শুরু করেছিলেন সত্তরের দশকের শুরুর দিকে। [167] একজন লেখকের দাবি অনুযায়ী সেই সময় তিনি অন্য যে কারও তুলনায় "উলামাদের সাথেই সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করতেন।" [168] আর উসামার মায়ের স্মৃতিচারণ এই ব্যাপারটির সত্যায়ন করে। ৯/১১-এর পর তাঁর মা বলেছিলেন, "উসামা ওর কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন হতে শুরু করেছিল। সাধারণভাবে বললে সে সমস্ত আরব আর মুসলিম বিশ্বের প্রতিই ক্ষুব্ধ ছিল, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ইস্যুতে। সে মনে করতো, মুসলিম যুবকদের যখন ইসলামের খেদমতের জন্য, মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাওয়া উচিত, তখন তারা ফালতু বিলাসিতায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। সে চেয়েছিল যাতে মুসলিমরা একত্রিত হয় এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করে। উসামা সবসময়ই দারুণ ধর্মপ্রাণ ছিল, কিন্তু

---

165 Coll, The Bin Ladens, p. 203.

166 OBL, "Lecture: The hadith of Ka'ab ibn Malik."

167 "Mujahid Usama bin Ladin talks exclusively to Nida'ul Islam about the new powder keg in the Middle East", Nida'ul Islam (Internet), 15 January 1997. জার্নালে উল্লেখ আছে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল 1996-এর অক্টোবর বা নভেম্বরে।

168 Ouazai, "The bin Laden mystery."

মধ্যমপন্থী। সে ফুটবল খেলতো, পিকনিকে যেতো, ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো এবং সামাজিকতা বজিয়ে চলতো। উসামার কৈশোরে ওকে নিয়ে আমার কখনও দুশ্চিন্তা করতে হয়নি।" [169]

ইসলামি বিশ্ব এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের উদ্বেগের বিষয়টি খালিদ আল-বাতারফিও উল্লেখ করেছেন। খালিদকে বিন লাদেন বলেছিলেন, "আমরা নতুন প্রজন্ম যদি নিজেদেরকে না বদলাই, আমরা যদি আরও বেশি শক্তিশালী, (দ্বীনি শিক্ষায়) শিক্ষিত ও আত্মত্যাগী না হই, তাহলে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা অসম্ভব।" [170] নাজওয়াও এই ব্যাপারে লিখেছিলেন যে তাঁর স্বামীর এই ব্যাপারটা তাঁদের বিয়ের পরও ছিল, "আমার স্বামী যতই পরিণত ও শিক্ষিত হচ্ছিলেন, বহির্বিশ্ব নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ও চিন্তা ততই প্রবল হয়ে উঠছিল।" [171]

আলিয়া এবং নাজওয়ার কাছ থেকে উসামা বিন লাদেনের যুবক বয়সের চিন্তাভাবনার তিনটি পয়েন্ট পাওয়া যায়, যেগুলো সময় গড়াবার পরও তাঁর সাথে রয়ে গিয়েছিল।

প্রথমত, যুবক বয়স থেকেই উসামা মুসলিম তরুণদেরকে এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন যেন তারা পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে প্রতিরক্ষা করে এবং মুসলিমদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ভূমিগুলো উদ্ধার করে। আফগান জিহাদে শরিক হওয়ার আগে থেকেই তিনি এমন ছিলেন। তাঁর মায়ের ভাষ্যমতে, তিনি বিশ্বাস করতেন যুবকদের দায়িত্ব হলো, "ইসলামের খেদমত করা এবং মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা।"

---

169 Al-Batarfi, "Osama is very sweet, very kind, very considerate." উসামা বিন লাদেন পরবর্তীতে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, "জিহাদের দিকে আহ্বানের কথা প্রথম আমার মাথায় আসে, যখন ইহুদিরা বাইতুল মাকদিসকে অসম্মানিত করছিল।" তিনি এখানে ১৯৭৯-এর যুদ্ধে ইসরাঈল কর্তৃক জেরুজালেম দখলের দিকে নির্দেশ করেছেন। দেখুন Mir, "Interview with Usama bin Ladin in Jalalabad", 18 March 1997.

170 Quoted in Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 15.

171 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 254. এই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "আমরা এখন জাতিসমূহের পতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, আর আমাদের শাসকরা নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) ভেলা হয়ে চলছে।" দেখুন OBL, "The wills of the heroes of the raids on New York and Washington", Al-Sahab Media, 11 September 2007.

ইসলামি সমাজের গোড়াপত্তনের সময়েও রাসূল সা.-এর অন্যতম দায়িত্ব ছিল জিহাদের জন্য মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। রুডোলফ পিটার্সের মতে, "জিহাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো মুসলিমদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করা।" [172] আর উসামা বিন লাদেন তাঁর তরুণ বয়স থেকে জিহাদে উদ্বুদ্ধকারীদেরও প্রধান হওয়ার দিকে এগিয়ে চলছিলেন।

দ্বিতীয়ত, উসামার মায়ের ভাষ্যে 'মুসলিম উম্মাহ' শব্দদ্বয় এই ইঙ্গিত দেয় যে কৈশোরের সময় থেকেই তিনি বৃহত্তর মুসলিম জাতির ব্যাপারে সজাগ এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। এছাড়া উসামা তাঁর বাবার থেকেও এই ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন; যেমনটা স্টিভ কোল উল্লেখ করেছেন – তাঁর বাবা কাঁটাতারহীন এক মুসলিম জাতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

তৃতীয়ত, উসামা বিন লাদেন সবসময়ই বলতেন যে, ইসলামের প্রতিরক্ষা করতে হলে মুসলিমদেরকে অবশ্যই ঐক্যে আসতে হবে। তিনি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাঁকে কষ্ট দেওয়া কিংবা তাঁকে পরিত্যাগ করা কারও বিরুদ্ধে (প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল বাদে) কখনোই কোনোরকম আক্রমণে যাননি। এই ব্যাপারটা কিছুক্ষণ পরেই আমি দেখাবো। মোদ্দাকথা হলো, উসামা বিন লাদেন তাঁর সাথে মতের অমিলের কারণে কাউকে তিরস্কার করতেন না। বরং সবসময়ই তিনি বলতেন যে, মুসলিমদের যারা যেমন ঘরানারই হোক না কেন, দিনশেষে তাদেরকে সাথে নিয়েই কাজ করতে হবে।

মুসলিমদের নির্দিষ্ট মত-পথের প্রতি গোঁড়ামির কারণে তিনি দুঃখপ্রকাশ করতেন। একইসাথে এই রোগের ঔষধ হিসেবে যেসব কথা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে, সেগুলো বলতেন। যেমন, কিছু ব্যাপারে ইখতিলাফ থাকা স্বাভাবিক; এগুলো যেন মুসলিমদেরকে আরও বড় শত্রুর মোকাবেলায় বাধা না দেয়... ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৩ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে ইরাকে হামলা শুরু হলে উসামা বিন লাদেন ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামপন্থীদের জন্য আমেরিকা জোটের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ইরাকি কমিউনিস্টদের সাথে মিলে যুদ্ধ করতেও কোনো সমস্যা নেই। মুসলিম বিশ্বে আল-কায়েদা এক অনন্য সংগঠন, কেননা এটি জাতীয়তা, ভাষা, ধর্মীয় ঘরানা, সংস্কৃতি সবকিছুর দিক থেকেই বৈচিত্র্যময়।

---

172 Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, p. 10.

খালিদ আল-বাতারফি তাঁর বন্ধুর সহনশীলতার এই ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছিলেন। আর এটা বিশেষ করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যারা উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে 'তাকফিরি' হওয়ার অপবাদ দেয়। সাংবাদিক জোনাথান র‍্যান্ডেলকে (Jonathan Randall) খালিদ আল-বাতারফি বলেছিলেন, "আমরা তাঁর মতো কঠিন দ্বীনদার মুসলিম ছিলাম না। কিন্তু তিনি কখনোই তাঁর মতাদর্শ আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। যেসব যুবকেরা সলাত আদায় করতো না, তিনি খুব সুন্দরভাবে তাদের মন জয় করতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি নিজেই উদাহরণ হয়ে দেখাতেন যে কীভাবে একজন ভাল মুসলিম হয়ে ওঠা যায়। আমাদেরকে মসজিদে যাবার তাগিদ দিতেন, বিশেষ করে ফজরের সময়। তিনি আশা করতেন – আমরা তাঁর দেখাদেখি (ভাল মুসলিম হতে) চেষ্টা করবো... যা করলে সর্বোত্তম। আর না পারলেও আপনি তাঁর কাছে ভাল বন্ধু হিসেবেই থাকতেন। তাঁর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, নীরব, আত্মবিশ্বাসী এবং প্রভাব বিস্তারকারী এক ক্যারিশমা।" [173]

যদিও শিক্ষাজীবনে উসামা বিন লাদেন যথেষ্ট ধর্মীয় জ্ঞানই অর্জন করেছিলেন, কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি কোনো আলিম ছিলেন না। আর তাঁর বক্তব্যগুলোতে নিজ মতের প্রতি কোনোরকম গোঁড়ামিও দেখা যেতো না; যেমনটা সাধারণত বেশিরভাগ পেশাদার আলিমদের বেলায় দেখা যায়। ইসলামের ওপর বিন লাদেনের জ্ঞানের ভিত্তি ছিল কুরআন-সুন্নাহ। একইসাথে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তাঁর পারিবারিক জীবন, উঠতি বয়সে আলিমদের সাথে মেলামেশা, ইসলামি ব্যবস্থা ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে তাঁর নিজস্ব অধ্যয়ন এবং এমনসব মানুষদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা, যারা ছিলেন রীতিমতো প্রশিক্ষিত আলিম - বিশেষ করে ফিলিস্তিনি আলিম শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে থাকা – এই সবকিছুই উসামা বিন লাদেনের ইসলামি জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। আমার আগের একটি বই Through Our Enemies' Eyes-এ আমি তো প্রায় নিশ্চয়তার সাথেই লিখেছিলাম যে উসামা, সাইয়্যেদ কুতুব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু সাইয়্যেদ কুতুব – যাকে সাধারণত 'ইসলামি মৌলবাদের জনক' হিসেবেই চেনা হয় – উসামার ওপর তাঁর তেমন প্রভাব তো ছিলই না; আদৌ কোনো প্রভাব ছিল কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। যদিও অনেকে এই ব্যাপারটা নিশ্চয়তার সাথেই বলে থাকেন যে উসামা কখনও না কখনও সাইয়্যেদ কুতুবের বই পড়েছিলেন এবং "(সাইয়্যেদ) কুতুবের মতাদর্শই উসামাকে পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছে" কিন্তু আমি এই ধারণার পক্ষে অকাট্য কোনো প্রমাণ

173 Randall, Osama, pp. 60–61.

পাইনি। [174] পশ্চিমের বিন লাদেন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেবল এক আইন অধ্যাপক খালেদ ফাদলকেই (Khaled Abou El Fadl) পেলাম যিনি ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। এতজনের মধ্যে কেবল তিনিই লিখেছেন যে উসামা বিন লাদেন "সাইয়্যেদ কুতুবের কথা তেমন কখনও উল্লেখই করেননি"। [175] আমি তো আরও এক ধাপ আগে গিয়ে বলবো যে, আমি উসামার কোনো একটি বক্তব্য বা বিবৃতিতে একটিবারও সাইয়্যেদ কুতুবের উল্লেখ দেখিনি। আমি বরং সালাফি আলিম হুসাইন বিন মাহমুদের সাথেই একমত যিনি লিখেছিলেন, "কেবল মূর্খরাই আল-কায়েদাকে শাইখ সাইয়্যেদ কুতুবের সাথে মেলায়" আর দাবি করে যে আল-কায়েদা নাকি ডা. জাওয়াহিরির 'মিশরীয় ইসলামি জিহাদ' সংগঠনটিরই পরবর্তী রূপ মাত্র। শাইখ হুসাইন এই ব্যাপারে স্পষ্ট করেছিলেন, "এগুলো সব মনগড়া ভুল ধারণা।" [176]

সব বাদ দিলেও, যেসমস্ত চিন্তাভাবনাকে সাইয়্যেদ কুতুবের দিকে ঘোরানো হয়, সেগুলো আদতে ইসলামে বহুকাল ধরেই চলে এসেছে। সাইয়্যেদ কুতুবকে প্রায়ই মুসলিম সমাজকে খাঁটি ইসলামের দিকে উদ্বুদ্ধ করার একজন অগ্রদূত হিসেবে দেখানো হয়। আর তিনিই নাকি প্রথম 'শরিয়াহ আইন দিয়ে শাসন না করা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সহিংস অবস্থান' নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই সাইয়্যেদ কুতুবের উদ্ভাবিত কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল মুহাম্মাদ সা. এবং তাঁর সাহাবাদের কথাই ধরা যাক। তাঁরা অবশ্যই নিজেদেরকে এমন অবস্থানেই দেখেছেন যে, আল্লাহর ওহীতে বলিয়ান হয়ে তাঁরা পুরো আরব উপদ্বীপের মানুষকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার দিকে ডাকছেন; এবং সবাইকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। রাসূল সা.-ই যে এই আহ্বানের অগ্রদূত, সেই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন নিজেই লিখেছেন, "আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সা. মক্কায় তেরো বছর যাবৎ দাওয়াহ দিয়েছেন। আর সেটার

---

174 Evan R. Goldstein, "How just is Islam's just war tradition?" Chronicle of Higher Education (Internet version), Vol. 54, No. 32 (11 April 2008).

175 Khaled Abou El Fadl, "The Crusader", Boston Review (Internet version), Vol. 31, No. 2 (March/April 2006).

176 Husayn bin Mahmud, "This is al-Qaeda (1)", Islamic Al-Fallujah Forums (Internet), 6 August 2009.

ফলাফল ছিল অল্প কয়কশত মুহাজিরিন। কিন্তু এই দলটিই যখন মদিনায় ছোট্ট একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে (জিহাদ করলো)... ক্রমান্বয়ে তা অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে নিয়ে এলো।" [177]

যেসমস্ত শাসকেরা ইসলামি আইনে শাসন করে না, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যে মুসলিমদের দায়িত্ব, এই মূলনীতি প্রথম স্পষ্ট করেছিলেন চৌদ্দ শতকের সিরীয় আলিম ইবনু তাইমিয়্যাহ। প্রায়ই তাঁকে সম্বোধন করা হয় 'শাইখুল ইসলাম' নামে, যা কেবল ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলিমদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ছিলেন সালাফি ধারার সূতিকাগারদের একজন, যেখানে কুরআন, হাদিস এবং মুসলিমদের প্রথম তিন প্রজন্ম তথা সালাফদের কথা ও আমলকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তো ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর সময়ে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা মঙ্গলদেরকে দেখলেন যে, তারা শরিয়াহ আইনের সাথে নিজস্ব আইন-কানুন জুড়ে দিয়েছে। মঙ্গলদের সেই মিশ্র ব্যবস্থাকে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে অনৈসলামিক ঘোষণা করেন। রুডোলফ পিটার্স লিখেছেন যে ইবনু তাইমিয়্যাহর দৃষ্টিতে, "এটিই তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করতে যথেষ্ট, যতোই তারা মুখে ঈমানের সাক্ষ্য দিক না কেন।" [178]

ইবনু তাইমিয়্যাহ প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে ইসলামের সাথে পৌত্তলিক বিধিনিষেধের সংমিশ্রণ করার কারণে "মঙ্গলরা কাফির হয়ে গিয়েছে এবং ফলস্বরূপ জিহাদের বৈধ টার্গেটে পরিণত হয়েছে।" [179] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ইসলামি শরিয়াহ দিয়ে শাসন না করা শাসকদেরকে কাফির বলার এই ব্যাপারে অগ্রবর্তী হওয়া হোক কিংবা অনৈসলামিক শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার ব্যাপারেই হোক – কোনোটিই সাইয়্যেদ কুতুবের নিজের উদ্ভাবিত নতুন কিছু ছিল না। বরং তা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি ফিকহে আবহমানকাল ধরেই ছিল। আর স্কুলে থাকাকালীন সময়ে এই প্রাথমিক উৎসগুলো থেকেই উসামা এইসব ব্যাপারে আগাগোড়া দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলেন।

উসামা বিন লাদেনের ওপর সাইয়্যেদ কুতুবের প্রভাব আরও ভালভাবে খতিয়ে দেখার জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন হলো, কেন তিনি সাইয়্যেদ কুতুবের মৌলিক চিন্তাগুলোর সব গ্রহণ করেননি? মিশরীয় ইসলামপন্থী সাইয়্যেদ কুতুব মনে করতেন, আজকের পৃথিবী

---

177 Ismail, "Interview with Usama bin Laden", 23 December 1998, pp. 7–8.

178 Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, pp. 7–8.

179 Christopher Henzel, "The origins of al-Qaeda's ideology: Implications for U.S. strategy", Parameters, Vol. 35 (Spring 2005), p. 71.

মুহাম্মাদ সা.-এর আগমনের পূর্বের ন্যায় অজ্ঞতার যুগে ফিরে গিয়েছে। ‘পৃথিবী’ বলতে তিনি পুরো বিশ্বকেই বোঝাতেন। আর মনে করতেন – অমুসলিমরা তো বটেই, মুসলিমদের মধ্যেও যারা ইসলামের আলোকে দ্বীনদার জীবনযাপন করছে না, তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছে। সাইয়্যেদ কুতুব ছিলেন তাকফিরি চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা। তাকফিরি চিন্তাধারা হলো এমন বিশ্বাস, যেখানে একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ব্যাপারে ভাল নাকি খারাপ – সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। আর যদি কেউ ভাল মুসলিম না হয়, তাহলে তাকে হত্যাও করতে পারে।[180] অথচ উসামা বিন লাদেন তাকফিরি চিন্তাধারাকে কখনোই গ্রহণ করেননি। যদিও তাঁর পশ্চিমা এমনকি মুসলিম সমালোচকরা সবসময়ই তাঁকে এই ট্যাগ দিতে চেষ্টা করে। এখনকার (২০১১) আমেরিকার আফগান নীতিমালাও এই ধারণার ওপরই ভিত্তি করে তৈরি। অথচ উসামা বিন লাদেন নিজেও অন্তত তিনবারের মতো তাকফিরিদের দ্বারা হত্যা প্রচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন।[181]

---

180 ‘তাকফির’ দ্বীন ইসলামের একটি বহুল পরিচিত প্রায়োগিক বিধান। তাওহিদ-শিরক, ঈমান-কুফর – এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে তাকফিরের বিধান ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে লেখক তাকফিরের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা কাফিরদের বোঝার জন্য সহজ হলেও বিশুদ্ধ নয়। তাকফিরের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য হকপন্থী আলিমদের স্বতন্ত্র কিতাবাদি অধ্যয়ন আবশ্যক।

লেখক এই প্যারায় এসে বলছেন যে সাইয়্যেদ কুতুব নাকি তাকফিরি চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা। অথচ এর আগের প্যারাতেই তিনি বললেন যে, সাইয়্যেদ কুতুব এই ব্যাপারগুলোর উদ্ভাবক ছিলেন না। বরং এই ব্যাপারগুলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি ফিকহে আবহমানকাল ধরেই ছিল। এমনকি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহও যে তাতারদের মিশ্র শরিয়াহর কারণে তাকফির করেছিলেন, সেই আলোচনাও লেখক করেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাতারদের ক্ষেত্রে ‘যে কারণে’ তাকফিরের বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, সেই একই কারণে একই বিধান সাইয়্যেদ কুতুব সমসাময়িক মুসলিম দাবিদার শাসকদের ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাহলে তিনি তাকফিরি চিন্তাধারার প্রবক্তা হলেন কীভাবে? এখানে এসে স্পষ্টতই লেখক স্ববিরোধী কথা লিখে ফেলেছেন। সত্য হলো, সাইয়্যেদ কুতুবের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের যে নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, সেটাকে অক্ষুণ্ন রেখে লেখক উসামা বিনা লাদেনকে সাইয়্যেদ কুতুব দ্বারা প্রভাবিত নন – এমনকিছু প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর তার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কালিও খরচ করেছেন। ফলস্বরূপ, সাইয়্যেদ কুতুবের ব্যাপারে পশ্চিমের প্রচলিত ধারণা থেকে লেখক নিজেও মুক্ত হতে পারেননি।

181 এখানে লেখকের বক্তব্য সঠিক হলেও পূর্ণ বাস্তবতার প্রতিফলনও নয়। তাকফিরিদের মধ্যে চরমপন্থী তাকফিরি যেমন রয়েছে, তেমনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মূলনীতির আলোকে সঠিক তাকফিরকারী মুজাহিদ দলও রয়েছেন। উসামা বিন লাদেন হত্যা প্রচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন চরমপন্থী তাকফিরিদের দ্বারা। এখানে লেখকের বিচ্যুতি হলো, তিনি মোটামোটি সব তাকফিরকেই এক রকম বাতিল ধরে নিয়ে সমস্ত তাকফিরিদেরকে এক কাতারে ফেলে দিয়েছেন। আর এরপর উসামা বিন লাদেনকে এ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। যেন তিনি উসামা বিন লাদেনকে কলঙ্কমুক্ত করতে নেমেছেন। অথচ ইসলামি শরিয়াহর আলোকে সঠিক তাকফির আদৌ কোনো দোষ কিংবা কলঙ্কের কিছু নয়। এই ব্যাপারে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত টিকা যোগ করা হয়েছে।

উসামা বিন লাদেনকে খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কখনোই সাইয়্যেদ কুতুবের সার্বজনীন যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করেননি। এমনকি তাঁর ঘোর শত্রু সৌদির রাজ পরিবারের ব্যাপারেও তিনি কখনও মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দেননি। বরং তিনি তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে ইসলামি আইনে বিচারের আওতায় আনার পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি সৌদ পরিবারকে তিনি এ বিষয়টিরও বিকল্প দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, “নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেওয়া তো মোটেও কঠিন কিছু না... যদি শাসকদের তা শোধরানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার সদিচ্ছা আসলেও থেকে থাকে। তাছাড়া তাদেরকে তো নতুন কোনো সমাধান উদ্ভাবন করতে হচ্ছে না। বরং তারা আল্লাহর দ্বীন - ইসলামে পূর্ণরূপে ফিরে গেলেই তো হচ্ছে। আর আমাদের (আল-কায়েদা) ব্যাপারে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জানেন যে, আমরা কেবল অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক সমস্ত নীতিকে আল্লাহ আর তাঁর রাসূল সা.-এর দেখানো পন্থায় সাজানো দেখতে চাই। সহজভাবে বললে বলা যায়, সবচেয়ে নিরাপদ এবং সুখী সমাপ্তি আসতে পারে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর দেখানো সরলপথে চলার মাধ্যমেই।”

এছাড়াও সাইয়্যেদ কুতুব বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রক্ষণাত্মক (দিফায়ি) জিহাদের প্রয়োজন নেই বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, মুসলিমদের এখন উচিত হলো পশ্চিমা শক্তি এবং মুসলিম বিশ্বের জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক (ইকদামি) যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ না পুরো পৃথিবী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’-এর পতাকাতলে চলে আসে। কিন্তু উসামা বিন লাদেন এই আক্রমণাত্মক জিহাদের নীতি গ্রহণ করেননি। ১৯৯৬ সালের আগস্টে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকে সবসময়ই উসামা এই ব্যাপারে কোনোরকম সংশয়ের অবকাশ রাখেননি। সবসময়ই তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তিনি জানেন, আল্লাহ তাআলা নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্যই কোনো এক সময়ে গোটা পৃথিবীকে ইসলামের ছায়াতলে আনবেন। কিন্তু সাথে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছিলেন যে, তিনি আক্রমণাত্মক জিহাদের ডাক দিতে আগ্রহী নন। বরং গত চৌদ্দ বছর ধরে (১৯৯৬-২০১০) বিবৃতির পর বিবৃতি, সাক্ষাৎকারের পর সাক্ষাৎকারে উসামা বিন লাদেন আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ডাকই দিয়ে গিয়েছেন – যাতে করে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার উপস্থিতি নিঃশেষ করা যায়, ইসরাঈলকে ধ্বংস করা যায়, শরিয়াহ দিয়ে শাসন না করা শাসকদেরকে উৎখাত করা যায় এবং যাতে ফিলিস্তিন, স্পেন, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, মিন্দানাও সহ একসময় মুসলিমদের অধিকারে থাকা অঞ্চলগুলোকে পুনরুদ্ধার করা যায়।

এখন এইসমস্ত লক্ষ্যকে পশ্চিমা পণ্ডিত বা মন্তব্যকারীরা নিজেদের মনগড়া সংজ্ঞানুযায়ী ‘আক্রমণাত্নক’ বললো নাকি কী বললো, তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কেননা ইসলামে জিহাদের মূলনীতি অনুসারে এইসবগুলো আত্নরক্ষামূলক (দিফায়ি) জিহাদের কাতারেই পড়ে। আর উসামা বিন লাদেনের এই আত্নরক্ষামূলক জিহাদের আদর্শ সবসময়ই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাসের সম্মুখসারির আলিমদের অবস্থান দ্বারা সিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে ২০০৩ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে ইরাক আক্রমণের পর থেকে উসামার এই আত্নরক্ষামূলক জিহাদের আদর্শের ব্যাপারে কোনোরকম সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। 182

উসামা বিন লাদেনের চিন্তাভাবনার ওপর সাইয়্যেদ কুতুবের প্রভাব কম থাকার কারণ কী হতে পারে? এই প্রশ্নের অনেকগুলো উত্তর রয়েছে। প্রথমত, উসামা ছিলেন সৌদি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বের হওয়া বান্দা। আর সৌদ পরিবারের যাবতীয় অস্বীকার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও আসলে তিনি সেই সিস্টেমেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের পূর্বসূরিদের (সালাফদের) বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য আলিমদেরকে কঠোরভাবে অধ্যয়ন করে বেড়ে উঠেছিলেন। এমনকি এখনও (২০১০-২০১১) তিনি দৃঢ়ভাবে এটাই

182 ইকদামি বা আক্রমণাত্মক জিহাদ: কাফিরদের রাষ্ট্রে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা কিংবা তাদের থেকে জিযিয়া কর আদায়ের জন্য যে জিহাদ পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় জিহাদ তলব / ইকদামি জিহাদ/ জিহাদ আল-ইহতিলাল/ আক্রমণাত্মক জিহাদ।

এই জিহাদের হুকুম হচ্ছে, এই জিহাদ ফারজে কিফায়া। মুসলিম রাস্ট্রপ্রধান বছরে অন্তত একবার এই ধরনের জিহাদ পরিচালনা করবেন। কিছু লোক আদায় করলে এই ফারজিয়্যাতের হক আদায় হয়ে যাবে।

দিফায়ি বা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ: মুসলিমদের ভূমিতে কাফিররা আক্রমণ করলে সেসকল কাফিরদেরকে প্রতিহত করা এবং মুসলিম বন্দী বা ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য যে জিহাদ পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় জিহাদ আদ-দিফা / দিফায়ি জিহাদ / আত্মরক্ষামূলক জিহাদ।

এই জিহাদের হুকুম হচ্ছে – এই জিহাদ ফারজে আইন। যদি কিছু লোক এই ফারজিয়্যাত আদায় করতে পারে অর্থাৎ ‘মুসলিম ভূমি ও বন্দীদের পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়’ তাহলে তা আর ফারজে আইন থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলিম কাফিরদের হাতে বন্দী থাকবে কিংবা কাফিরদের করায়ত্ত মুসলিম ভূমিসমূহ পুনরায় ইসলামের অধীনে নিয়ে আসা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জিহাদের হুকুম ফারজে আইন অবস্থায়। দিফায়ি জিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ফাতওয়া নিম্নরূপ -

“দিফায়ি জিহাদ হলো ইজ্জত ও দ্বীন রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। তা উম্মাহর ঐক্যমত্যে ফরজ। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ঈমান আনার পর আর নেই। তাই এতে কোনো শর্ত নেই। বরং সকলের জন্যই সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করা আবশ্যকীয়। ” [আল ফাতওয়াতুল কুবরা, আল-ইখতিয়ারাতুল ইলিমিয়াহ, কিতাবুল জিহাদ ৪ / ৬০৭]

আর এই সম্পর্কে গোটা উম্মাহর পূর্ববর্তী হকপন্থী আলিমগণ একইরকম মতই দিয়েছেন।

বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দ্বীনের সত্যিকার বাস্তবতা কেবল মূল উৎসেই পাওয়া সম্ভব। অপরদিকে সাইয়্যেদ কুতুব ছিলেন সুন্নি আলিম আবুল হাসান আল-আশআরির অনুসারী, যিনি কুরআন এবং সুন্নাহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সৌদিতে প্রচলিত আক্ষরিক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন না। সহজভাষায়, হাম্বালি মাযহাব প্রভাবিত সৌদি আরবের সালাফি ধারা আর সাইয়্যেদ কুতুবের অনুসৃত আলিম আবুল হাসান আল-আশআরির ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তফাৎ রয়েছে। আর সেটা সাইয়্যেদ কুতুবের দ্বারা উসামার প্রভাবিত না হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। [183] সহজভাষায় বললে, উসামা বিন লাদেন হয়তো সাইয়্যেদ কুতুবের ব্যাপারে সৌদির অফিসিয়াল অবস্থানই গ্রহণ করেছিলেন, যেটা হলো – কুতুব একজন তাকফিরি, একজন বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন মানুষ ছিলেন। এমনকি যিনি কুরআনের প্রচলিত (আক্ষরিক) ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছিলেন। [184] দ্বিতীয়ত, সাইয়্যেদ কুতুবকে গ্রহণ না করার এটিও আরেকটি কারণ হতে পারে যে, সাইয়্যেদ কুতুব কোনো আলিম ছিলেন না। তাঁর পড়াশোনা মূলত ছিল সাহিত্যের ওপর। আর আগেও উল্লেখ করেছি যে, উসামা সাইয়্যেদ কুতুবকে কখনও উল্লেখ না করলেও তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুবকে অনেকবারই উল্লেখ করেছেন। কারণ মুহাম্মাদ কুতুব একজন প্রাতিষ্ঠানিক আলিম ছিলেন।

---

183 সাইয়্যেদ কুতুব শেষ জীবনে আবুল হাসান আল-আশআরির অনুসারী ছিলেন কিনা, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আর শেষমেশ তাঁকে আশআরি ধরে নেওয়া হলেও এই ব্যাপারগুলো উসামা বিন লাদেনের কাছে বিশেষ কোনো ফ্যাক্টর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তালেবানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন, মোল্লা উমারকে বাইয়্যাত দিয়েছিলেন ও প্রশংসা করেছিলেন, শাইখ ইউনুস খালিসের প্রশংসা করেছিলেন ইত্যাদি। অথচ তাঁদের কেউই আকিদাহর ক্ষেত্রে উসামা বিন লাদেনের ন্যায় আক্ষরিক অর্থ করতেন না। ফিকহের ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিলেন হানাফি, যেখানে উসামা বিন লাদেন ছিলেন সালাফি ঘরানার। এই ব্যাপারে লেখক নিজেও পরবর্তীতে আলোচনা এনেছেন।
সাইয়্যেদ কুতবকে উসামা বিন লাদেনের উল্লেখ না করার কারণ আর যাই হোক, আকিদাহ কিংবা ফিকহের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী ইমামদের থেকে চলে আসা মতবিরোধ যে ছিল না, সেটা উসামা বিন লাদেনের কার্যক্রম থেকে সহজেই বোঝা যায়।

184 এখানে লেখক স্রেফ সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে এই ধারণা করেছেন। উসামা বিন লাদেন কখনোই সাইয়্যেদ কুতুবের ব্যাপারে এমন কোনো মন্তব্য আদৌ করেননি। এর ওপর উসামা বিন লাদেনের সরাসরি শিক্ষক শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম তাঁর বয়ানে, লিখায় সাইয়্যেদ কুতুবের আদর্শিক চিন্তাধারার অহরহ প্রশংসা করতেন। এমনকি পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেনের সহকর্মী ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরিও অহরহ সাইয়্যেদ কুতুব থেকে বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত করেছেন। এক্ষেত্রেও উসামা বিন লাদেন কখনও বাধা প্রদান করেননি কিংবা সতর্কও করেননি। তিনি স্রেফ নিজে দলিল পেশ করার সময় আরও পূর্বের যুগের ইমামদেরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।
এই ব্যাপারগুলো থেকে বোঝা যায় যে, উসামা বিন লাদেনও আর যাই হোক - সাইয়্যেদ কুতুব সম্পর্কে পশ্চিম কিংবা সৌদির অফিসিয়াল অবস্থানের সাথে একমত ছিলেন না।

মোটকথা সাইয়্যেদ কুতুব, উসামা বিন লাদেনের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন না।[185] এটি আরও পরিষ্কার হয় যখন আফগান জিহাদের পর ১৯৮৯ সালে উসামা আরবে এসে কিছু সালাফি আলিমদের সাথে সৌদি সংস্কারের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দেন।

তাছাড়া উসামা বিন লাদেনের নিজের লিখাতেও দেখা যায় যে, তিনি (সোভিয়েত জিহাদ পরবর্তী সময়ে) তখন সাইয়্যেদ কুতুব ধরনের বিপ্লবের চেয়ে এই ধরনের ধীরস্থির আন্দোলনের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

---

185 Bin Mahmud, "This is al-Qaeda (1)"; John L. Esposito, The Oxford History of Islam (New York: Oxford University Press, 1999, pp. 280–281.

উদীয়মান উসামা

বাইশ বছর বয়সে উসামা বিন লাদেন যখন আফগানিস্তানে যান তখন তিনি রীতিমতো অপরিপক্ক ছিলেন – সবাইকে সহজেই বিশ্বাস করে ফেলতেন। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের একজন যুবক। তাঁর মায়ের ভাষায়, “আশেপাশের সবার প্রতি বিনয়ী, শ্রদ্ধাশীল এবং উত্তম আচরণের অধিকারী।” [186] সেসময় তিনি এমন মানুষ ছিলেন, যিনি সরাসরি কারও বিরোধিতা কিংবা তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলতেন। সংঘর্ষকে সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক উপায় বলে মনে করতেন না। স্কুল কিংবা বাবার ব্যবসা, কোথাও কোনো ব্যাপারে ঝামেলা হলে তিনি শান্তিপূর্ণভাবেই সমাধান করার চেষ্টা করতেন। নাজওয়া লিখেন, “উসামা শান্ত এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছেলে ছিলেন। তাকে তাঁর কাজিনরা সবাই রহস্যময় ভাবলেও শান্ত স্বভাব আর ভাল আচরণের জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসতো।” [187] উসামা একদিকে তাঁর চিন্তা-কৌশলগুলো নিজের কাছেই রাখতেন। অপরদিকে এক অপার্থিব নীরবতা দিয়ে নতুন শত্রু বানানো হতে বেঁচে থাকতেন। আর পুরোনো শত্রুদেরকেও, বিশেষ করে ক্রমাগত বকবক করে যাওয়া পশ্চিমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিতেন। এমনকি দেখা যেতো, এভাবে তারা আজব সব উপসংহারে পৌঁছে গেছে।

১৯৭৯-এর মধ্যেই উসামা বিন লাদেনের ভেতর এমন এক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হতে থাকে, যা তাঁর পরবর্তী জীবনের রূপরেখা এঁকে দিয়েছিল: নেতৃত্বের গুণাবলি। খালিদ আল-বাতারফির ভাষায়, “উসামা ছিলেন স্বভাবসুলভ নেতা। তিনি সরাসরি আদেশ না দিয়ে নিজে উদাহরণ হয়ে নয়তো ইশারায় নেতৃত্ব দিতেন। স্রেফ নিজে উদাহরণ সৃষ্টি করে দিতেন আর আশা রাখতেন যে লোকেরা অনুসরণ করবে। আর তাতেই তারা তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করে দিতো। এমনকি তাঁর সাথে শতভাগ একমত না হলেও।” [188]

এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি স্রেফ আভিজাত্য দিয়েই ঠাসা ছিলেন না। স্রেফ একজন ‘বিন লাদেন’ হওয়ার কারণেই তিনি নিজেকে নেতাসুলভ মনে করতেন না। বরং পরবর্তীতে তিনি আরও বহুবার প্রমাণ করেছিলেন যে কোনো ব্যাপারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে

---

186 Al-Batarfi, “Osama is very sweet, very kind, very considerate.”

187 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 25.

188 Quoted in Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 14.

যোগ্য এবং দক্ষ না মনে করা পর্যন্ত তিনি অধীনস্থ থাকাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি হয়তো জন্মেছিল যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস থেকে। আর এভাবেই শেষমেশ তাঁর কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্বও চলে আসতো। প্রথম ইরাক যুদ্ধের (১৯৯০-১৯৯১) আগ পর্যন্ত আরবের প্রাতিষ্ঠানিক আলিমদের প্রতি উসামা বিন লাদেনের শ্রদ্ধা ও আস্থা বলা যায় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন সৌদি আরবের তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি – শাইখ আবদুল আজিজ বিন বায – আরবের ভূমিতে পশ্চিমা / খ্রিস্টান সেনাবাহিনীকে আসার অনুমতি দিলেন, তখন থেকেই এমন আলিমদের প্রতি বিন লাদেনের সেই আস্থাবোধ পুরোপুরি উল্টে যেতে শুরু করেছিল।

উম্মাহর মধ্যে বিস্তার লাভ করা পরাজিত মানসিকতা সম্পর্কে উসামা আগের থেকেই ধারণা রাখতেন; যে কারণে মুসলিমরা স্রেফ ফিলিস্তিন মুক্তির জন্যই নয়, বরং সাধারণভাবে পশ্চিমাদের মোকাবেলা করতেও পিছিয়ে যায়। এই ব্যাপারটি তাঁর মায়ের সেই কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় – উসামা নাকি মুসলিম যুবকদের ব্যাপারে কিছুটা হতাশ ছিলেন। কেননা তারা ফিলিস্তিনের বদলে নিজেদের সস্তা খেলতামাশা নিয়েই বরং ব্যস্ত থাকে। তাঁর সময়কার মুসলিম যুবকদেরকে প্রায়ই 'পরাজিত প্রজন্ম' বলে ডাকা হতো। কেননা তারা ইসরাঈলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলোর তিনবার আর হিন্দুরাষ্ট্র ভারতের কাছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের তিনবার পরাজয় হতে দেখেছিল।

মিশরীয় সাংবাদিক আইসাম দারাজ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের যুদ্ধ নিয়ে সবিস্তারে লিখালিখি করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, ১৯৬৭-এর আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর বিন লাদেন প্রজন্ম হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। পিটার বার্গেনের কাছে দারাজ বলেছিলেন, "এটা কেবলই সামরিক পরাজয় ছিল না। এটা যেন সভ্যতার পরাজয় বনে গিয়েছিল। আমরা যে এতটা পিছিয়ে ছিলাম, এতটা অথর্ব হয়ে ছিলাম, তা আমরা বুঝতেও পারিনি।" [189] উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সমমনাদের মতে এই পরাজয় এসেছিল কারণ "বেড়ে ওঠার সময় থেকেই আমাদের মাথায় আমেরিকার অস্ত্র ঠেকানো ছিল। আমাদের মা-শিশুদের দিকে অস্ত্র তাক করা ছিল।" [190] দারাজ যে মনে করতেন, মুসলিমদের

---

189 Quoted in Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 6–7.

190 John Miller, "Talking with terror's banker: An exclusive interview with Osama bin Laden", http:///www.ABCnews.com, 28 May 1998.

পরাজয় পশ্চিমের 'উন্নতি'-এর সংজ্ঞানুযায়ী তাদের 'অথর্ব' হওয়ার কারণে হয়েছিল – উসামা এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন। বরং উসামা মনে করতেন এমনটা হয়েছে মুসলিমরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী না চলার কারণে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিজয় নিহিত আছে কুরআন ও সুন্নাহে ফিরে যাবার মধ্যে, এবং মুসলিমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করার মধ্যে। এরপর সময় গড়াবার সাথে সাথে উসামা বিন লাদেন আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার পথে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মূলত মুসলিমরা বিদ্যমান অবস্থাকে নিয়তি বলে ধরে নেওয়া এবং তাদের দীর্ঘকালের পরাজিত মানসিকতা... তাও সেটা এমন দানবীয় পর্যায়ের, যেটা কিনা আফগানিস্তানে (সোভিয়েতদের) রেড আর্মির বিরুদ্ধে আনা বিজয়কেও গিলে ফেলেছিল।

শেষমেশ বলা যায়, উসামা বিন লাদেনের শিক্ষাদীক্ষা ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। সামনের সময়গুলোতে তাঁর যা যা প্রয়োজন ছিল, তিনি ঠিক সেই বিষয়গুলোই রপ্ত করে ফেলেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উসামার ব্যাপারে লিখালিখি করা অনেকেই বলতেন যে – পশ্চিমা শিক্ষা না পাওয়ায় উসামা বিশ্বের বৈচিত্র্য সম্পর্কে নাকি জানতেন না। এটা আংশিকভাবে সত্য ঠিক। কিন্তু যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তা তাঁকে সরাসরি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সিরিয়া ও মিশরের নির্বাসিত ইখওয়ান কর্মীরা ছিল; সিরিয়া ও লেবাননে তাঁর মায়ের আধা-সেক্যুলার পরিবার ও প্রতিবেশিরা ছিল; আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং মিশরের আল-আযহার সহ গোটা আরব বিশ্বের অসংখ্য আলিম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। এছাড়াও ছিল তাঁর বাবার কোম্পানির খেটে খাওয়া শ্রেণির মানুষ, যাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উসামা কাজ করেছিলেন।

উসামার বন্ধু খালিদ আল-বাতারফি তাঁর ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে, "উসামা সব মুসলিমদেরকে একভাবেই দেখতেন। তিনি স্রেফ ধনী ছেলেপেলেদের সাথেই চলতেন না। বরং তাঁর বন্ধুদের অনেকেই ছিল মধ্যবিত্ত এমনকি গরিব। এমনকি তিনি তো গরিব ঘরেই বিয়ে করেছিলেন।" [191] পরবর্তীতে উসামা যে জীবন বেছে নিয়েছিলেন, সেটার জন্য এর চেয়ে ভাল শিক্ষাদীক্ষা আর হয় না। আর ১৯৭৯-এর শেষের দিকে এসে তিনি তো রীতিমতো এক চরম মাত্রার পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে ফেলেন – আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

---

191 Randall, Osama, p. 61.

শিক্ষানবিশ, ১৯৭৯-১৯৮৯

যুগ যুগ পরে এসে ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগানদের বিজয় মুসলিম বিশ্বে কী ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অবশ্য গত কয়েকবছর ধরেই অনেকে আফগান যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে আমেরিকা, বিশেষ করে CIA-কে অভিযুক্ত করছে। তারা যুক্তি দেখাচ্ছে যে, CIA নাকি উসামা বিন লাদেনকে তৈরি করেছে, তারাই নাকি আজকের জিহাদি আন্দোলনকে গড়ে দিয়েছে। আর এর ফলস্বরূপ নাকি আমেরিকা আজকে নিজেই পিছন থেকে ছুরি খেয়ে চলেছে। তাই যুদ্ধবিগ্রহকে অসিলা বানিয়ে একাডেমিতে এখন অনেকেই রোনাল্ড রিগ্যানের বহির্বিশ্ব নীতির বিরোধিতা করে। এই বিষয়গুলো উসামা বিন লাদেনকে অধ্যয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ঠিক। কিন্তু সোভিয়েতের পতনে আমেরিকার তেমন কোনো ভূমিকাই নেই।

উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে লিখালিখি করা বেশিরভাগ লোকেরই কোনো ধারণাই নেই যে – সোভিয়েতের পরাজয় উসামার কাছে, ইসলামি আন্দোলনগুলোর কাছে, এমনকি সাধারণভাবে সমস্ত মুসলিমদের কাছেই কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আফগান কিংবা অনাফগান - সব মুসলিমরাই যখন বলে যে, আফগান যুদ্ধে পরাজয়ই সোভিয়েতের পতন ডেকে এনেছিল, তখন সেটা বাড়িয়ে বলছে মনে হলেও আসলে ব্যাপারটা সত্যি। সাথে এটাও সত্যি যে সেই বিজয়ে অনাফগানদের (আবদুল্লাহ আযযামের স্বেচ্ছাসেবী , আল-কায়েদা, ও অন্য গ্রুপগুলো) ভূমিকা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

অনুসন্ধানী সাংবাদিক ক্যামিল তাভিল (Camille Tawil) লিখেছেন, “আফগান যুদ্ধ বিজয়ে আফগান মুজাহিদদের তুলনায় আরবদের অবদান হলো সমুদ্রের মাঝে পানির ফোঁটার মতো।” [192] আমার মতে তিনি ঠিকই লিখেছেন। কিন্তু অবদানে কমবেশি হলেও সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয় ছিল গোটা বিশ্বের মুসলিমদের জন্যই ইসলামের এক বড় সামরিক বিজয়। অবশ্যই এটা গোঁড়া সেক্যুলার কিংবা পশ্চিমা মুসলিমরা বাদে। আর সেই বিজয় ছিল প্রায় কয়েক শতাব্দী পর মুসলিমদের জন্য এক উল্লেখযোগ্য অর্জন। এর মাধ্যমে তারা শতাব্দীকালের আতঙ্ক ও পরাজিত মানসিকতাকে কাটিয়ে ওঠার একটি উপলক্ষ্য পেয়েছিল।

---

192 Tawil, Brothers in Arms, p. 20.

এই বিজয় যে মুসলিমদের পরাজিত মানসিকতা একেবারে চূড়ান্তরূপে দূর করে দিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। বরং মুসলিমদের এমন মানসিকতা এখনও (২০১০-২০১১) উসামা বিন লাদেন সহ ইসলামি বিশ্বের নেতাদের জন্য এক বড় সমস্যা। কিন্তু এই বিজয় সেইসব মুসলিমদেরকে একটি ভিত্তি দিয়েছিল, যারা মুসলিমদেরকে সশস্ত্র জিহাদে অংশ নিয়ে মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে আল্লাহর শত্রুদেরকে হটানোর দিকে আহ্বান করতেন। মস্কো যখনই সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় – যা ছিল মূলত আফগান মুজাহিদদেরই অবদান – তখনই তা স্পষ্ট করে দেয় যে, মুসলিমদের ভূমিতে কোনো আগ্রাসী বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিমরা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ শুরু করতে পারে; এমনকি শেষমেশ বিজয়ীও হতে পারে।

শুরুর দিকে উসামা বিন লাদেন আফগান জিহাদের উদাহরণকেই তাঁর (আত্মরক্ষামূলক) জিহাদের উদাহরণ বানাতেন। এরপর ২০০৩-এ যখন আমেরিকার নেতৃত্বে ইরাকে আক্রমণ চালানো হলো, তখন আর আগের উদাহরণের প্রয়োজন হলো না। ইরাক আক্রমণ একেবারে অখণ্ডনীয়ভাবে কুরআনে বর্ণিত আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

আগমন

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উসামা বিন লাদেন যখন পাকিস্তান গিয়ে পৌঁছেন, তখন তাঁর নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে খুব ভাল ধারণা ছিল - তেমনটা নয়। প্রাথমিকভাবে শুধু এটুকুই তাঁর মাথায় ছিল যে তিনি আফগান মুসলিমদেরকে তাঁর সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন। তবে আফগান জিহাদে উসামার অংশগ্রহণ নিয়ে যে প্রশ্নটা অহরহ সামনে আসে, সেটা হলো তিনি ঠিক কখন পাকিস্তানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। আর এই ব্যাপারে উসামা নিজে বলেছিলেন যে, তিনি এক সলাতের সময় প্রথম সোভিয়েত আগ্রাসনের খবর পান। আর খবর পেয়েই ১৯৭৯-এর বছর ফুরোবার আগেই তিনি পাকিস্তানে পৌঁছে যান – এই হিসেবে সেটা ছিল সোভিয়েত আগ্রাসনের মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে। [193] [194]

নাজওয়ার বোন পরে জানিয়েছিলেন যে, উসামা খুব দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলেন, পরিবারকে ঘটা করে বিদায় বলার সুযোগও দেননি। [195] অর্থাৎ তিনি এই কয়েকদিন ভালই দৌড়ঝাঁপ করেছিলেন। কেননা সোভিয়েত আগ্রাসন শুরু হয়েছিল ২৬ ডিসেম্বর। সেই হিসেবে একই বছরের মধ্যেই পাকিস্তান পৌঁছে যাওয়ার অর্থ হলো এর মধ্যেই তিনি রওনা দেওয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা সাজিয়েছেন, পরিবারের দুআ নিয়েছেন, সৌদির গণ্যমান্য মুফতি এবং প্রশাসনের থেকে অনুমতি নিয়েছেন এবং সেখান থেকে করাচি আসার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছেন। আর এই ব্যাপারটা উসামা বিন লাদেনের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় বহন করে।

৯/১১-এর আগের সময়টায় সাংবাদিক আহমাদ যায়দানের আল-কায়েদা নেতাদের সাথে যোগাযোগের অনুমতি ছিল। তাঁর মতে, "উসামা সোভিয়েত আক্রমণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান পৌঁছে গিয়েছিলেন।" বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক থাকলেও এটিই সম্ভবত সবচেয়ে নির্ভুল মত। [196]

---

193 আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণ শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ২৪-২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে।

194 The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network, 2006.

195 Carmen bin Ladin, Inside the Kingdom, p. 126.

196 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

উসামা বিন লাদেন প্রথমে লাহোরে যান ও পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির তৎকালীন আমির কাজী হুসাইন আহমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জানান যে, "তিনি সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে চান।" [197] এই ব্যাপারে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই যে, কাজী হুসাইন আহমাদ সহ আফগান নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার কিংবা আবদুর রাসুল সাইয়্যাফের মতো নেতাদের কাছে উসামার অবাধ যাতায়াত ছিল। কেননা হজ সহ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উসামার বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেন ও তাঁর ছেলেরা নিজেদের প্রাসাদগুলোয় যে মেহমানদারির আয়োজন করতেন, সেই সুবাদেই বিন লাদেন পরিবারের সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিন লাদেনদের ধনসম্পদ, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট ধারণা ছিল। তাই এই ব্যাপারটাও অবাক করার মতো নয় যে, আফগান জিহাদে উসামার প্রথম দায়িত্ব ছিল সৌদি আরব সহ উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে বন্টন করে দেওয়া।

---

197 Abdal-Karim and al-Nur, "Interview with Saudi businessman Usama bin Ladin."

দানশীল এবং সৈন্যদলের প্রধান

পাকিস্তানে এসে পৌঁছানোর পর থেকে মোটামোটি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত উসামা বিন লাদেন পাকিস্তানি এবং আফগানিদের মধ্যকার মূল মূল খেলোয়াড়দেরকে খুঁজে বের করায় সময় ব্যয় করেছিলেন। আর এটা তিনি করেছিলেন পেশাওয়ার এবং ইসলামাবাদের আশেপাশে অবস্থান করে মুজাহিদ দলগুলোকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করার মাধ্যমে, এবং সেসময়ে সৌদির গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান প্রিন্স তুর্কির সাথে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে। স্টিভ কোল ও মেরি এনা ওয়েভারের (Mary Anne Weaver) দৃষ্টিভঙ্গি হলো উসামা বিন লাদেন ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত “মোটামোটি একজন অর্থসংগ্রাহক এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই সময় পার করেছিলেন।” আর অচিরেই তিনি “সেরা সৌদি যুবরাজ” হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এই কথাগুলো আপাতত ঠিকই আছে, কিন্তু এটুকুই পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।[198]

আরব উপসাগরের ওপার থেকে পাকিস্তানে উসামা বিন লাদেনের অর্থ আদান প্রদানের এই কাজ পরবর্তীতে আফগানের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত এনে দিয়েছিল। তাছাড়া এটা ছিল তাঁর নিজের জন্যও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তিনি খুব সহজেই উপসাগরীয় দেশগুলোর রাজপরিবার সহ অভিজাত ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে যেতেন। আর এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কেননা তিনি নিজেই তাদের একজন ছিলেন, এই পরিবারগুলোর ছেলেদের সাথেই তিনি একসময় খেলে-পড়ে বড় হয়েছিলেন। এছাড়া উসামা যে আফগানের শরনার্থীদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন করতেন, আহত মুজাহিদদেরকে হাসপাতাল ও তাদের পরিবারে গিয়ে খাবার, চকলেট, টাকাপয়সা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতেন – এই ব্যাপারটা মিলে যায় তাঁর বাবার কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য করার উপদেশের সাথে।[199]

কাজের সুবাদে পাকিস্তানি আলিম, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, জেনারেলরা ছাড়াও উসামা বিন লাদেনের সাথে আফগান মুজাহিদদের কমান্ডার, পশতুন গোত্রগুলোর প্রধান, এমনকি অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর আগে সৌদিতে বাবার কোম্পানির কাজে তিনি যে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের সাথে মিশেছিলেন, এটা ছিল তার চেয়েও বড় মাপের অভিজ্ঞতা। এভাবে তিনি মুসলিম বিশ্বের

---

198 Coll, The Bin Ladens, p. 251, and Weaver, “The Real bin Laden.”

199 Weaver, “The Real Bin Laden.”

সত্যিকার বৈচিত্র্য যেন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমস্ত মুসলিমরাই সৌদিদের মতো আচরণ করে না – এই উপলব্ধি, আর এর মধ্যে ধৈর্য্যের যে অসীম প্রণোদনা – এই বিষয়গুলোই পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেনের বিজয় এনে দিয়েছিল।

এই সময়টায় উসামা বিন লাদেন সৌদিদের সাথে মিলে কীভাবে কী কাজ করেছেন, সেটা যাচাই করা মুশকিল। প্রিন্স তুর্কি তো দাবি করেন যে, আফগান যুদ্ধের সময়কালে উসামা বিন লাদেনের সাথে নাকি তার স্রেফ অল্প দুয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর তিনি সৌদি ন্যারেটিভের মূলভাব বজায় রেখেই উসামাকে শান্ত, বন্ধুবৎসল, ভদ্র হিসেবেই বর্ণনা করেন। তার ভাষায়, "উসামা কথা বলতেন খুবই নম্রভাবে। কিন্তু ছিলেন বলিষ্ঠ জবানের মানুষ।" ৯/১১ পরবর্তী সময়ে প্রিন্স তুর্কি নিজের সমস্ত বিবৃতিতে এই ব্যাপারটা জোর দিয়ে বলতে ভুলতেন না যে, "উসামা বিন লাদেন কখনোই (সৌদি সরকারের) কোনো অফিসিয়াল পদে ছিলেন না।" [200]

তবে আমার ধারণা, প্রিন্স তুর্কির সাথে উসামার কাজের ব্যাপারে আমরা আরও সঠিক তথ্য পাবো General Intelligence Directorate (GID)-এর সাবেক স্টাফ প্রধান আহমাদ বদীবের কাছে। তার আরেক পরিচয় হলো তিনি ছিলেন উসামা বিন লাদেনের জেদ্দার স্কুলের প্রাক্তন বায়োলজি শিক্ষক। আর আহমাদ বদীবের বর্ণনানুযায়ী প্রিন্স তুর্কির সাথে উসামার যে সম্পর্ক বুঝে আসে, তাতে তাদের মধ্যে স্রেফ "অল্প দুয়েকবার" সাক্ষাৎ হয়নি, যেমনটা তুর্কি উল্লেখ করেছিলেন। বরং উসামার সাথে বহুবার তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল। [201] এছাড়াও বদীবের কাছ থেকে আরও জানা যায় যে, উসামা বিন লাদেন ইসলামাবাদে সৌদি দূতাবাসের সাথেও কাজ করেছিলেন; এছাড়া সৌদির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। বদীব উল্লেখ করেছিলেন যে, নায়েফ উসামাকে "ভাল জানতেন" আর তাঁর আফগানদেরকে সহায়তার উদ্যোগকে "প্রশংসা করতেন"। [202] এছাড়া GID থেকেও উসামা পরামর্শ নিতেন। তিনি তাঁর পারিবারিক ব্যবসার নির্মাণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র সরবরাহের রাস্তা

---

200 Jamal Khashoggi, "Interview with Prince Turki al-Faisal, part 4", Arab News (Internet version), 7 November 2001. এই সাক্ষাৎকার আসলে ছিল সৌদি ন্যারেটিভের এক চরিত্র আরেক চরিত্রের কাছে নেওয়া সাক্ষাৎকার। অবশ্য এদের মধ্যে প্রিন্স ছিল প্রধান চরিত্রদের একজন। এছাড়া দেখুন Coll, The Bin Ladens, p. 295.

201 Khashoggi, "Interview with Prince Turki al-Faisal, part 4."

202 Coll, Ghost Wars, pp. 87–88.

বানানো থেকে শুরু করে পাকিস্তানের দাতব্য সংস্থার জন্য বিভিন্ন ভবন, অস্থায়ী হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।[203] আহমাদ বদীবের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, "আমরা (GID) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম। তিনি তো আমাদের একজনই ছিলেন। আমরা যাই চাইতাম, তিনি তার সবই যথাযথভাবে করে চলছিলেন।" বদীবের ওপর উসামার ইতিবাচক প্রভাব ছিল। সেকারণেই বদীব বলেছিলেন, "তিনি আমার পছন্দের মানুষ ছিলেন আর তাঁকে আমি সৌদির একজন ভাল নাগরিক হিসেবেই জানতাম।"[204]

বদীব এই বিষয়টা ঠিক বলেছেন যে, তখনও উসামা বিন লাদেন তাঁর নিজ দেশ, সেখানকার ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ কিংবা প্রশাসনের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। যদিও সৌদির কিছু ব্যাপারে উসামা স্বস্তি পেতেন না। বিশেষ করে সৌদ পরিবারের নির্লজ্জ পরিমাণ দুর্নীতি, ১৯৭৯-তে ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে পবিত্র কাবা পুনর্দখল করতে গিয়ে ফরাসি সামরিক সদস্যদের সাহায্য নেওয়া কিংবা পবিত্র সীমানার ভেতর রক্তপাত জায়েজ বলা ফাতওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে উসামা ভালই অস্বস্তিতে ছিলেন।[205] আফগানিস্তানে তিনি সৌদির একজন অনুগত নাগরিক হয়েই রওনা দিয়েছিলেন, আর সংঘর্ষের পুরো সময় জুড়ে অনুগত হয়েই ছিলেন। এমনকি সেসময় তিনি সৌদ পরিবারের বিরুদ্ধে কোনোরকম অসম্মানও সহ্য করতেন না। উদাহরণস্বরূপ, লেবানিজ সাংবাদিক জামাল ইসমাঈল ১৯৮৬-এর দিকে বলেছিলেন, "কিং ফাহাদ যখন খ্রিস্টানদের ক্রুশের মতো দেখতে ব্রিটিশ সাজের এক মেডেল পরিধান করেছিলেন, তখন উসামা বিন লাদেনের অধীনস্থ সহযোদ্ধারা কিং ফাহাদকে কাফির ঘোষণা করতে চাইলে বিন লাদেন বাদ সাধেন।" ইসমাঈলের কথানুযায়ী, বিন লাদেন নাকি তখন বলেছিলেন, "এইসব ব্যাপারে আলাপ করারই কোনো প্রয়োজন নেই। নিজেদের অপারেশনে মনোযোগী হও। আমি এখানের সবাইকে এই ব্যাপারে কথা বলা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছি।"[206]

---

203 Coll, Ghost Wars, pp. 88; Coll, The Bin Ladens, p. 291.

204 Coll, Ghost Wars, pp. 87–88.

205 Yaroslav Trofimov, The Siege of Mecca.

206 Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 59–60. এই প্রসঙ্গে সৌদি রাজপরিবারের প্রতি উসামা বিন লাদেনের পরিবর্তিত মনোভাব ২০০১ সালে তাঁর নিজের ভাষাতেও দেখা যায়। একজন পাকিস্তানি সাংবাদিককে উসামা বলেছিলেন, "যখন উম্মাহ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিল, তখন মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধি (ব্যঙ্গাত্মক অর্থে) স্বীয় ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। তার গলায় ক্রুশ ঝুলতে দেখা গিয়েছিল।" দেখুন Abdul Sattar, "Usama urges ummah to continue jihad", Pakistan (Internet version), 7 May 2001.

এমন প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, সৌদি ন্যারেটিভের বর্ণিত ১৯৯০-৯১ পূর্ববর্তী উসামা বিন লাদেনের এক বিরাট অংশই সত্য ছিল। সেসময় উসামা ছিল সৌদি সিস্টেমের পোস্টার বয়। আবু মুসআব আস-সুরি তাঁর The Global Islamic Resistance Call বইয়ে লিখেন, "উসামা বিন লাদেন সহ সৌদি যুবকদের যারাই আফগানিস্তানে এসেছিলেন, তারা আসলে সৌদির সাহওয়া [ইসলামি সংস্কার আন্দোলন] দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই হিসেবে উসামা আর তাঁর আরব সহযোদ্ধাদের জন্য সৌদ রেজিমের আনুগত্য করাই ছিল স্বাভাবিক। আর সৌদির সরকারি আলিম ও মুফতিদের প্রতি তাদের সম্মানও ছিল খুবই স্বাভাবিক।" [207]

207 Lia, Architect of Global Jihad, p. 93.

শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের প্রভাব

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (১৯৪১-১৯৮৯) ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন। একসময় জর্ডান মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য হয়েছিলেন এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। মিশরের আল-আযহার ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি তাঁর পরিবার সহ সৌদি আরবে চলে যান এবং জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৮১ সালে তিনি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটির একটি পদে কাজ করতে শুরু করেন। সেখান থেকে ১৯৮৬-এর গ্রীষ্মে ইস্তফা দিয়ে তিনি পুরোপুরিভাবে আফগান জিহাদে মনোনিবেশ করেন। শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে একজন অগ্রবর্তী আলিম ছিলেন। এসময় তাঁর কলমে এমন সব লিখনী উঠে আসে, যা আধুনিক বিশ্বের জিহাদি আন্দোলনগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। [208] একজন বিশ্লেষক তাঁর সম্পর্কে লিখেন, "আবদুল্লাহ আযযাম সেইসব গুটিকয়েক আলিমদের একজন, যারা তাঁদের কথাকে কাজে রূপান্তরিত করেছিলেন।" [209]

উসামা বিন লাদেনের ওপর যে ছয়জন ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল, তাঁরা হলেন রাসূল মুহাম্মাদ সা., ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, সালাহউদ্দিন আল-আইয়্যুবি, উসামার বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেন, শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং তালিবানদের আমির মোল্লা উমার। তাঁদের এমন প্রভাবের এক সাধারণ কারণ আছে: প্রত্যেকেরই কথা আর কাজের মিল ছিল। উসামা বিন লাদেন নিজে লিখেছিলেন, "খুবই অল্প সংখ্যক আলিম (তাদের কথার সাথে কাজের মিল রেখে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেওয়ার) এই ফারজিয়্যাত আদায়ে এগিয়ে এসেছিলেন। উম্মাহর সম্মানিত আলিমগণের মধ্যে যে মানুষটি সত্যিকার

---

208 আবদুল্লাহ আযযাম সম্পর্কিত তথ্যগুলো তিনটি বই হতে নেওয়া হয়েছে – Andrew McGregor, "Jihad and the rifle alone: Abdullah Azzam and the Islamist Revolution", Journal of Conflict Studies (Internet version), Vol. 23, No. 2 (Fall 2003); Thomas Hagghammer, "Abdullah Azzam, Imam of the Jihad", in Gilles Kepel and Jean-Pierre Milelli, eds., Al-Qaeda in Its Own Words (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008), pp. 81–101; and Asaf Maliach, "Bin Ladin, Palestine, and al-Qaida's Operational Strategy", Middle Eastern Studies, Vol. 44, No. 3 (May 2008), pp. 353–375.

209 McGregor, "Jihad and the rifle alone."

অর্থেই বিষয়টি আমলে নিয়েছিলেন, তিনি হলেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম। আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর দুই ছেলেকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।" [210] পরবর্তী সময়ে উসামা সৌদির আলিমদেরকে এই কারণেও সমালোচনা করতেন যে, তারা যুবকদেরকে (সোভিয়েতের বিরুদ্ধে) জিহাদে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেও নিজেরা তাতে অংশীদার হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। উসামা বলতেন যে তারা ভীতসন্ত্রস্ত্র ছিলেন, এমনকি "রাশিয়ানদেরকে তারা অপরাজেয় মনে করতেন।" [211]

২০০৬ সালে উসামা লিখেন, "প্রায় বিশ বছর আগে... আমি আমাদের (সৌদি আরবের) আলিম এবং শাইখদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে ঘর থেকে বের হতে বলতাম, তাঁদেরকে আফগান জিহাদে শরিক হতে বলতাম। তাঁদের অনেকেই অনেক রকম অযুহাত পেশ করতেন... কারও কারও কথাবার্তা আমার এখনও মনে আছে। কেউ কেউ এমন বলেছিলেন যে, 'উসামা, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতে ভরপুর হয়ে এগিয়ে যাও। তুমি যা যা বলছো, সেটাই সত্য। সেটাই প্রকৃত পথ। কিন্তু দেখ বাবা, আমরা এই পথে অভ্যস্ত না! আমাদের অন্তরে ভয় হয়!' আসলে মানুষের অজানা বিষয়ই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। তারা (সৌদির তৎকালীন আলিমরা) জিহাদে অভ্যস্ত ছিলেন না কারণ এটা এমনই অবহেলিত ফারজিয়্যাত হয়ে ছিল, যে ব্যাপারে মানুষদের মধ্যে দায়িত্বশীলরাই (আলিমরা) যুগ যুগ ধরে পিছু হটে থেকেছেন।" [212]

উসামা বিন লাদেন হয়তো শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে আফগান যুদ্ধের আগে, তাঁর কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়েই সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। [213] আবদুল্লাহ আযযামের ছেলে হুজাইফা অবশ্য দাবি করেছিলেন যে, ১৯৮৪-এর হজ্জের মৌসুমে জেদ্দায় সর্বপ্রথম উসামা আর তাঁর বাবার সাক্ষাৎ হয়। আর তখন থেকেই তাঁরা খুব ভাল বন্ধুতে পরিণত হন। [214] তাঁদের সম্পর্ক গভীর ছিল, এমনকি অনেকে সেটাকে উচ্ছ্বাসবশত টেনে বাবা-ছেলের সম্পর্কের মতোও বর্ণনা করেন। কিন্তু এটাকে বরং গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বললেই সবচেয়ে জুতসই হয়। আবদুল্লাহ

---

210 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction to 'The battle of the Lion's Den, Afghanistan, 1987,' " in Shaykh Abdullah Azzam, The Lofty Mountain, 1st ed'

211 "No glory without jihad", Al-Ghurbah Establishment (Internet), 31 August 2009.

212 OBL, "Lecture: The hadith of Ka'ab ibn Malik."

213 Hagghammer, "Abdullah Azzam, imam of the jihad", p. 90.

214 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 26.

আযযামকে উসামা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, এমনকি প্রথমদিকে তাঁকে প্রশ্নাতীত ব্যক্তিত্বও ভাবতেন। কিন্তু তিনি কখনোই তাঁর শিক্ষকের একেবারে চূড়ান্ত অনুগত ভৃত্যেও পরিণত হননি। জীবনের প্রতিটি সময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন উসামার কিছু শেখার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি সেই ব্যাপারে অভিজ্ঞ মানুষদের শিষ্য বনে যেতে কার্পণ্য করতেন না – হোক সেটা কন্সট্রাকশন কাজে, সামরিক কর্মকাণ্ডে কিংবা সংগঠন তৈরিতে। কিন্তু এমন শিষ্যত্ব গ্রহণ কখনোই তাঁর দুর্বলতা কিংবা ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচায়ক ছিল না। বরং সেটাই ছিল কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিজেকে নেতৃত্বযোগ্য করে তুলতে উসামা বিন লাদেনের পন্থা। তাছাড়া যেসব ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় ছিল না, সেসব ক্ষেত্রের কাজে তিনি জড়াতেনও না। তাঁর সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের সহকর্মী শাইখ মূসা আল-কারনি ২০০৬ সালে বলেন, “উসামা এমন মানুষ ছিলেন, যিনি প্রভাবিত করতেন। সহজে প্রভাবিত হতেন না। আফগানিস্তানে জিহাদ করতে যাবার আগে অনেকেই তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিল; অনেকেই বলেছিল যেন তিনি নিজের দেশে থেকে যান, আর যেন বড়জোর আর্থিক সাহায্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। কিন্তু উসামা এতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি স্রেফ একজন অনুসারী হয়ে থাকতে চাননি, বরং একজন অগ্রদূত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো জড়তা কিংবা ভীরুতা ছিল না। উসামা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি মৃত্যুকে ভালবাসতেন, মৃত্যুকে খুঁজে ফিরতেন... শহীদ হতে চাইতেন।” [215]

---

215 Al-Dhiyabi, “Interview with Shaykh Musa al-Qarni, part 2.

মাকতাব আল-খাদামাত প্রতিষ্ঠা

১৯৮৪ সালের দিকে আবদুল্লাহ আযযাম, উসামা বিন লাদেন এবং আবদুল্লাহ আযযামের জামাতা আবদুল্লাহ আনাস মিলে 'মাকতাব আল-খাদামাত' (MK) কিংবা একটি 'সেবা সংস্থা' গড়ে তোলেন। শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে এর প্রধান হিসেবে রাখা হয়। কিন্তু উসামা বিন লাদেনই মূলত MK-এর পরিচালনার যাবতীয় খরচ বহন করতেন, যেটা বছরে ছিল প্রায় ৩,০০,০০০ ডলার (অর্থাৎ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি)।[216] এছাড়াও উসামা পেশাওয়ারে পঞ্চাশ-ষাটটা আরব পরিবারকে দেখভালের জন্য শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দিতেও সম্মত হয়েছিলেন। ঐসব আরব পরিবারের পুরুষেরা MK-এর বিভিন্ন কাজে পুরো সময় দিতো।[217] সংস্থাটির নেতারা – সামরিক প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক, যাতায়াত ইত্যাদির জন্য পৃথক বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্টও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে করে সংস্থার যাবতীয় কাজকর্ম সুচারুভাবে পরিচালনা করা যায়। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও কিছু লেখকদের মতে MK-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম নাকি ছিল অনেকটাই ছন্নছাড়া বিক্ষিপ্ত ধরনের। মিশরীয় সাংবাদিক আইসাম দারাজ বলেছেন যে, একপর্যায়ে MK-এর পরিচালনা উন্নত করতে উসামা বিন লাদেন পেশাওয়ারে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে নিয়েছিলেন। এছাড়া আফগানিস্তানে হওয়া যুদ্ধের কাছাকাছি থাকাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[218]

MK আসলে ছিল অলাভজনক ধরনের একটি বহুমুখী সংস্থা। এটি সর্বপ্রথমে আফগানিস্থানে এবং পাকিস্তানে কাজ শুরু করলেও সময়ের সাথে সাথে এর পরিধি পুরো মুসলিম বিশ্বে এমনকি ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্যন্তও পৌঁছে যায়। সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের শাখাগুলোর কাজ ছিল মূলত ফান্ড এবং জনবল সংগ্রহ করে আফগানিস্তানের সম্মুখ ময়দানে পৌঁছে দেওয়া। আর এটির পাকিস্তানের শাখাগুলোর কাজ ছিল বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীদেরকে বরণ করে নেওয়া এবং কোনো একটি কাজে নিযুক্ত করার আগ পর্যন্ত তাদের থাকা-খাওয়া ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া। স্বেচ্ছাসেবীদের কাউকে কাউকে সামরিক কাজে নিয়োগ দেওয়া হতো এবং প্রশিক্ষণের জন্য আফগানিস্তানের

---

216 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

217 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 39.

218 Isam Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan", in Shaykh Abdullah Azzam, The Lofty Mountain, 1st ed.

বিভিন্ন ময়দানে পাঠানো হতো। সহসাই তারা মূল বাহিনীতে জায়গা করে নিতো – বেশিরভাগ সময়েই সেটা হতো গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার কিংবা আবদুর রাসুল সাইয়্যাফের বাহিনীতে। অন্যদেরকে MK-এর বিভিন্ন স্তরের মানবতামূলক কর্মকান্ডে নিয়োগ দেওয়া হতো। সেসব কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল আহত মুজাহিদদের ক্লিনিকের স্টাফের দায়িত্ব, শরণার্থী ক্যাম্পগুলোয় থাকার জায়গা বানানো, তাদেরকে সেবা দেওয়া, বাচ্চাদের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। MK-এর যাবতীয় কর্মকান্ড সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা তিনজনকে পাকিস্তানে ঠিক কতোজন অনাফগান মুসলিম আসছে এবং তারা কোথায় কীভাবে রয়েছে – এইসমস্ত ব্যাপারে একেবারে স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছিল।

তাছাড়া আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেন MK-এর উপকরণ গোটা মুসলিম বিশ্বে আফগান জিহাদের প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা চালাতে এবং মুসলিমদের মানসপটে আফগান যুদ্ধকে সদা জাগ্রত করে রাখতেও ব্যবহার করেছিলেন। আবদুল্লাহ আযযাম নিজেই ছিলেন MK-এর আফগান প্রপাগান্ডার এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আর তিনি গোটা পৃথিবীর দর্শকদের জন্য প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করে সোভিয়েত বর্বরতার বিরুদ্ধে আফগানদের কষ্টগাঁথা বর্ণনা করেছিলেন, অর্থ জোগাড় করে এনেছিলেন এবং অসংখ্য যুবকদেরকে জিহাদে যুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া তিনি আফগানদের রক্ষণাত্নক (দিফায়ি) সেই যুদ্ধে প্রত্যেক মুসলিমের অংশগ্রহণই যে আবশ্যক (ফরযে আইন) হয়ে গিয়েছে, তার তাত্ত্বিক দলিল ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছিলেন। আবদুল্লাহ আযযাম আমেরিকা সহ বিশ্বের কোণায় কোণায় সফর করেছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে আমেরিকাতেই তিনি MK-এর বায়ান্নটা অফিস খুলে ফেলেছিলেন।[219] পরবর্তী সময়গুলোয় উসামা বিন লাদেন তাঁর ছেলেদেরকে বলতেন, "শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ক, পুরো পৃথিবী জুড়ে যিনি সভা সমাবেশ করে বেড়াতেন; আর আফগানিস্তানের জন্য অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে মুসলিম যুবকদেরকে নিয়োগ – সমস্তকিছু আঞ্জাম দিতেন।" উসামা তাদেরকে আরও বলতেন যে আবদুল্লাহ আযযাম ছিলেন এমন একজন মানুষ, যার কথা এবং কাজে কোনো অমিল ছিল না, "যুবকদেরকে জিহাদে নিযুক্ত করার সফর থেকে ফিরে তিনি নিজেই ময়দানে একেবারে সামনের সারিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।"[220]

---

219 McGregor, "Jihad and the rifle alone", and Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 32–33.

220 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 35.

এই ধরনের উদ্বুদ্ধকরণের কাজগুলো উসামা বিন লাদেন নিজেও করতেন। তবে তাঁর কার্যক্রমকে মোটামোটি পাকিস্তান এবং আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে দেখা যায়। এছাড়া আবদুল্লাহ আযযামের জনপ্রিয় 'আল-জিহাদ' নামক মাসিক ম্যাগাজিনের প্রকাশনা ও প্রচারণাতেও উসামা অর্থায়ন করে সাহায্য করেছিলেন। 'আল-জিহাদ' ম্যাগাজিনটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪-এর শেষের দিকে। আর এটি ছিল এর আগের ম্যাগাজিন 'আল-মুজাহিদ'-এর উত্তরসূরি। MK থেকে প্রতি মাসে 'আল-জিহাদ'-এর প্রায় সত্তর হাজার কপি প্রিন্ট করা হতো।[221] এটাই বোধ হয় ছিল সেই সময়, যখন থেকে উসামা বিন লাদেন আধুনিক মিডিয়া ব্যবহার করে মুজাহিদদেরকে সহায়তা করার ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসের সাথে তাঁর পূর্ব-পরিচিতির কারণে জিহাদের লক্ষ্য অর্জনে মিডিয়ার ভূমিকার ব্যাপারে তিনি ভালই অবগত ছিলেন।

পরবর্তীতে বছরের পর বছর ধরে উসামা বিন লাদেনকে তাঁর বন্ধু এবং শত্রু – উভয় দলের কাছ থেকেই তাঁর বাহ্যিক মিডিয়াপ্রীতির কারণে নানা কটু কথা শুনতে হয়েছিল। তাঁর মিডিয়া কার্যক্রম দেখে বাহ্যত মনে হতো তিনি লাইম-লাইটে থাকতে চান। কিন্তু এই ধরনের সমালোচনা আসলে ইসলামি ইতিহাসের জ্ঞান এবং ঐতিহ্য বিবর্জিত। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম পূর্ব যুগেও তো আরব বিশ্বে কাব্য কিংবা কবিতা ছিল জনপ্রিয় এবং সম্মানিত মিডিয়া মাধ্যম। আর ইসলাম আসার পর এই আবেদন আরও বেড়ে গিয়েছিল; কেননা কুরআন এবং সুন্নাহ – দুটোরই কাব্যিক মাধুর্য মুসলিম অমুসলিম সমস্ত আরবদেরকেই রীতিমতো বিমোহিত করে ফেলেছিল।[222] ইসলামি ইতিহাসের উপযুক্ত ছাত্র হওয়ায় আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেন মিডিয়াকে দেখেছিলেন রাসূল মুহাম্মাদ সা. এবং সালাহউদ্দিন আল-আইয়্যুবির দৃষ্টিতে।

রিচার্ড গ্যাব্রিয়েল (Richard Gabriel) লিখেন, "মুহাম্মাদ সা. অনিয়মিত মন ও মস্তিষ্কের জন্য মিডিয়া এবং প্রপাগান্ডার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের বার্তাগুলোকে প্রকাশ্য এবং ব্যাপক করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অধিকাংশ লেখাপড়া না জানা আরবে মুহাম্মাদ সা. সুকৌশলে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা বুনেছিলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদেরকে ভাড়া করে তিনি নিজের প্রশংসা করাতেন এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেন। যখন যে

---

221 Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 32–33.

222 "Journal to publish bin Laden's poetry", Australian Broadcasting Company News (Internet), 23 September 2008; Rick Salutin, "Why Osama is hooked on classics", http://www.theglobeandmail.com, 8 August 2008.

আসমানি ওহী পাবার দাবি তিনি করতেন, সাথে সাথেই তা সবার কাছে ছড়িয়ে দিতেন। নতুন (ইসলামি) ব্যবস্থার রূপরেখা এবং জান্নাতের ব্যাপার তাঁর অনুসারীদের কাছে জীবন্ত রাখতে তিনি সবসময় প্রকাশ্যেই থাকতেন। মূর্তি ও প্রকৃতি পূজারীদেরকে নিজের আনীত ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করতে বিভিন্ন গোত্রে, দলে মুহাম্মাদ সা. 'মিশনারি' পাঠাতেন। এই সুযোগে কখনও কখনও পূজারীদেরকে লিখতে পড়তেও শেখাতেন।" [223] [224]

ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও নুরউদ্দিন জঙ্গি এবং তাঁর উত্তরসূরি সালাহউদ্দিন আল-আইয়্যুবি রাসূল সা.-এর উদাহরণের ওপর আমল করে উন্নত মানের তথ্যজাল তৈরি করেছিলেন। আমিন মালুফ লিখেছেন, "নুরউদ্দিন তাঁর অভিযানগুলো পরিচালনার জন্য মনস্তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণার ব্যাপারটা ভাল রকমেই রপ্ত করেছিলেন।" নুরউদ্দিন অনেক আলিম এবং ধর্মীয় নেতাদেরকে তাঁর দলে ভিড়িয়ে সাধারণের মন জয় করে নিতেন। একই কারণে আরবের নেতৃবৃন্দও তাঁর সাথে যোগ দিতে বাধ্য হতো। মালুফের ভাষায়, "নুরউদ্দিন তাঁর প্রপাগান্ডা বাহিনীকে নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি কবিতা, চিঠি, বই লিখিয়ে নিতেন

---

223 Richard A. Gabriel, Muhammad. Islam's First Great General (Norman: University of Oklahoma Press, 2007), p. xxvi.

224 ওরিয়েন্টালিস্ট ইতিহাসবিদ রিচার্ড গ্যাব্রিয়েলের বক্তব্যে ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার মিশেলে জগাখিচুড়ি বক্তব্য এসেছে। এমনকি তার উপস্থাপনা তো রীতিমতো ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. সর্বদা আল্লাহর নির্দেশেই তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। ওহী পাবার প্রথমদিকে তো তিনি সা. প্রকাশ্যে দাওয়াতই দিতেন না। কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়েই তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এই বিষয়গুলো রিচার্ডের বক্তব্য 'অনিয়মিত মন ও মস্তিষ্কের জন্য মিডিয়া এবং প্রপাগান্ডার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন' কিংবা 'সুকৌশলে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা বুনেছিলেন' ইত্যাদি উপস্থাপনার সাথে সাংঘর্ষিক।

তাছাড়া সাহাবাদের মন আদৌ অনিয়মিত (রিচার্ডের ভাষায় uncommitted) ছিল না। মক্কায় ঈমান আনার পর তো সাহাবাদের ওপর চরম নির্যাতন নেমে এসেছিল, কিন্তু তাও তাঁরা ঈমান ধরে রেখেছিলেন। আর মদিনার আনসারি সাহাবারা তো শুরু থেকেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে নিজেদের জানমাল দিয়ে যুদ্ধ করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন। আর পুরো মাদানি জীবন জুড়ে সেই ওয়াদায় তাঁরা অবিচল ছিলেন। আর যাই হোক, সাহাবারা কস্মিনকালেও অনিয়মিত মনমস্তিষ্কের ছিলেন না। রদিআল্লাহু আনহুম।

তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ মিডিয়া কবিতার গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সা. বুঝতেন এবং সেজন্য কবিতা জানা সাহাবাদেরকে মিডিয়াযুদ্ধে ব্যবহারও করতেন। এর অসংখ্য প্রমাণ সীরাতে রয়েছে। কিন্তু এইসমস্ত ব্যাপার প্রমাণ করতে গিয়ে ওরিয়েন্টালিস্টদের বক্তব্যকে দলিল বানানো মানে হলো সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে উপস্থাপন। পশ্চিমা লেখকদের (এইক্ষেত্রে মাইকেল শইয়ার) কাছ থেকে ওরিয়েন্টালিস্টদের উদ্ধৃতি স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও সাধারণ মুসলিমদের উচিত এই ব্যাপারগুলোয় সাবধানতা অবলম্বন করা।

আর সেগুলো এমন এমন সময় বেছে প্রচার করতেন, যখন সেগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি ফায়দা লাভ করা যায়।" [225]

সালাহউদ্দিন এসে তাঁর জিহাদকেও সামরিক এবং মিডিয়া প্রপাগান্ডা – উভয়ক্ষেত্রেই জারি রেখেছিলেন। [226] উদাহরণস্বরূপ, ১১৮৭ সালের ২রা অক্টোবর – যে দিনটায় সালাহউদ্দিন জেরুজালেম দখলে নিয়েছিলেন, প্রফেসর জেফ্রি হিন্ডলির (Geoffrey Hindley) বর্ণনানুযায়ী সেই দিনেও নাকি "সুলতানের মন্ত্রিসভার লেখক ও মুফতিরা মুসলিম বিশ্বের কোণায় কোণায় (জেরুজালেম বিজয়ের) বার্তা লিখে পাঠানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছিলেন।" [227]

এবং পরিশেষে, আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেন তাঁদের সময়ে যে মাত্রার বিরোধী প্রপাগান্ডার শিকার হয়েছিলেন, তেমনটা রাসূল সা., নুরউদ্দিন কিংবা সালাহউদ্দিনও হননি। [228] তাই তাঁদেরকে "মুসলিম জাতির দখল হয়ে যাওয়া ভূমিগুলো উদ্ধার এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ" [229] চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সফল হতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সরকারি দালাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, তখনও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সরকারি মিডিয়া মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মিডিয়া প্রপাগান্ডা চালাতো। রিয়াদ থেকে কায়রো হয়ে আলজেরিয়া – মুসলিম বিশ্বের সমস্ত জায়গাতেই রাষ্ট্রায়ত্ত মিডিয়া, সেন্সরশিপ অফিস এবং আলিমদেরকে নিজেদের কড়ালগ্রস্ত করে শাসকেরা সবসময় সেসবই প্রচার করেছে, যা তাদের মর্জিমাফিক হয়। উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "এইসমস্ত মিডিয়া শাসকদের গুণগান করতে, উম্মাহকে ঘুম পাড়িয়ে

---

225 Amin Maalouf, The Crusades through Arab Eyes (New York: Schocken Books, 1984), pp.143–144.

226 Maalouf, The Crusades through Arab Eyes, p. 180.

227 Geoffrey Hindley, Saladin: Hero of Islam (Barnsley, UK: Pen and Sword Books, 1976), p. 11. নুরউদ্দিন তাঁর জিহাদকে সমর্থন করার জন্য প্রপাগান্ডা মেশিনকে কীভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন তা বর্ণনা করার জন্য প্রফেসর হিন্ডলি একটি পুরো অধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। দেখুন pp. 32–45.

228 ভিত্তিহীন পর্যায়ের কথা। আল্লাহর রাসূল সা., নুরউদ্দিন জঙ্গি এবং সালাহউদ্দিন আল-আইয়্যুবি – সকলেই নিজ নিজ সময়ের হিসেবে সর্বোচ্চ বিরোধী প্রপাগান্ডার সাথে লড়েছেন। মিডিয়া প্রপাগান্ডার মাত্রা কেবল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ দিয়ে মাপার কারণেই হয়তো এমন ভুল বক্তব্য এসেছে।

229 Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I.

রাখতে এবং (ইসলামের) শত্রুদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেই নিজেদের সব শক্তি ব্যয় করে।" [230] শুধু তাই নয়, উসামা পশ্চিমা মিডিয়াকে সবগুলোর চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী মনে করতেন, "আমেরিকা তো পুরো মিডিয়াকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। ওরা মিডিয়ার বিপুল পরিমাণ প্রভাবকে নিজেদের যখন যেভাবে খুশি কাজে লাগিয়ে একটি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার সক্ষমতা পেয়েছে।" [231] অতএব, আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেন উভয়েই জানতেন যে তাঁরাও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার না করলে আপামর মুসলিমদের কাছে তাঁদের বার্তা হয়তো কখনোই পৌঁছাবে না। আবদুল্লাহ আযযামকে তো ১৯৮৯-এর নভেম্বরে বোমা বিস্ফোরণ করে হত্যা করা হয়। ইন্টারনেটের যুগ এসেছিল তার পরে। আর ইন্টারনেট এসে উসামা বিন লাদেন সহ অন্যান্য ইসলামি নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন দেশের প্রশাসনের পেতে রাখা মিডিয়া-সেন্সরের ফাঁদ ছিঁড়ে ফেলার সুযোগ করে দেয়। অবশ্য বেশ কয়েকটি প্রশাসন, বিশেষ করে কায়রো আর রিয়াদ সর্বাত্নক চেষ্টা করে প্রশাসনবিরোধী প্রচারণার পথ রুদ্ধ করার সিস্টেম গড়ে তোলে। আর যারাই এমনসব প্রচারণায় অংশ নেয়, তাদেরকে চিহ্নিত করে নির্যাতন নিষ্পেষণ চালিয়ে দমন করে।

উসামা বিন লাদেন সেইসব আলিমদেরকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন, যারা আরবের জুলুমবাজ শাসকদের প্রশংসা করে খুতবাহ দিতো, জিহাদ বর্তমানে প্রযোজ্য না বলে বেড়াতো এবং মুজাহিদদেরকে হেয় করতো। এমনসব আলিমরা কিন্তু সবসময়ই ছিল, কিন্তু ইসলামি ইতিহাসের প্রথমদিকে গণমাধ্যমের অপ্রতুলতার কারণে তাদের বিকৃত বার্তা সবসময় সীমিত আকারেই থাকতো। উসামার ব্যাখ্যামতে, "কিন্তু আজকের যুগে তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে সেইসব বিকৃতি খুব সহজেই গোটা উম্মাহর কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর তাছাড়া আজকের মিডিয়া তো প্রত্যেক ঘরে ঘরেই প্রবেশ করে ফেলেছে... কেউই এর থেকে রক্ষা পায়নি।" [232] মিডিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে উসামা আসলে নিজের অবস্থান একেবারেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। [233] বরং সত্য হলো, সৌদি সরকার যে মাত্রায়

---

230 "Interview with Mujahid Usama bin Ladin", Nida'al Islam (Internet), 15 January 1997.

231 Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I.

232 "Speech by Usama bin Laden", Middle East Media Research Institute (MEMRI), Special Dispatch, No. 539, 18 July 2003.

233 অর্থাৎ, উসামা বিন লাদেন তাঁর মিডিয়ায় ফোকাস করা মানসিকতার কারণে যেসব সমালোচনা এসেছিল, সেসবের ব্যাপারে নিজের অবস্থান শুরু থেকেই স্পষ্ট করে রেখেছিলেন।

মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতো, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই উসামা বিন লাদেন মিডিয়া কার্যক্রমকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুদান থেকে সৌদির একজন আলিমের কাছে লিখা চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, বিদেশে আসার আগ পর্যন্ত তিনি সৌদির তথ্য বিকৃতির মাত্রা বুঝতে পারেননি। জেদ্দায় থাকতে তিনি সৌদ পরিবারের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেননি কারণ তাদের 'ধোঁকা' সম্পর্কে তাঁর তেমন ধারণাই আসলে ছিল না। সৌদদেরকে বাহ্যিকভাবে দেখে – শরিয়াহ আইনের কিয়দাংশ বাস্তবায়ন করছে, দুই পবিত্র ভূমির দেখভাল করছে, দাওয়াতি কাজ চালাচ্ছে – এমনটা মনে হলেও ওরা আসলে "নিজেদের সেক্যুলার রূপটা জনগণ থেকে সবসময়ই আড়ালে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সৌদিরাজের ধোঁকা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল আধুনিক মিডিয়াযন্ত্র এবং বড় বড় ইলমি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। এই দুইটি মাধ্যম সাধারণের মনে সৌদি প্রশাসনকে মুসলিমদের যোগ্য নেতৃত্ব, দ্বীনের রক্ষাকর্তা ইত্যাদি রূপে চিত্রায়ন করতে চেষ্টার কোনোপ্রকার কমতি রাখেনি। এই সমস্ত ধোঁয়াশার মধ্যে আমরা সৌদি প্রশাসনের আসল চেহারাটা কখনোই চিনতে পারিনি। জাজিরাতুল আরবে বসবাস করা যেকেউই আমাদের উল্লেখিত এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভাল বুঝতে পারবে।" [234]

উসামা বিন লাদেন MK-তে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন – বিশেষ করে আর্থিকভাবে। আর সেখানে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে শিক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে ছিল সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা এবং মিডিয়া যুদ্ধের যাবতীয় কৌশল রপ্ত করা। MK-এর মানবিক যেসব কার্যক্রম ছিল, যেমন – ক্লিনিক চালানো, শরণার্থীদের সেবা, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা – এগুলো বিন লাদেন পরবর্তীতে আল-কায়েদায় নিয়ে আসেননি। তিনি যে এইসমস্ত কার্যক্রমের বিরোধী ছিলেন, তা কিন্তু নয়। সৌদিতে, সুদানে, আফগানিস্তানে বরং তাঁর দানশীলতা, পরোপকারিতার কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই সমস্ত মানবিক কার্যক্রম উসামা বিন লাদেনের মূল উদ্দেশ্যের জন্য গৌণ ছিল।

এখানে দুটো প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা আল-কায়েদাকে একটি সামরিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অর্থাৎ এটা কেবল সামরিক কার্যক্রমেই ফোকাস করবে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনকে গোছানো এবং যথাসম্ভব গোপন রাখা। মানবিক কার্যক্রমে প্রচুর জনবল লাগে, সেগুলো প্রকাশ্যেই করতে হয় আর সত্যিই জিহাদের যুদ্ধকেন্দ্রিক কার্যক্রমে তা খুব অল্পই ফায়দা দেয়।

---

234 OBL to Shaykh Abd-al-Raheen al-Tahan, n.d.

আর দ্বিতীয়ত, এমন অনেক মানবিক সংগঠন ইতোমধ্যেই ছিল, যারা এই ধরনের কাজে আল-কায়েদার চেয়ে ঢের এগিয়ে ছিল। আর এসব ক্ষেত্রে উম্মাহ তো সেইসব সংগঠনের কাজ থেকেই ফায়দা পেতে পারে। সেখানে আল-কায়েদার আলাদাভাবে সময়, শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। সৌদি আরব, কুয়েত এবং আরব আমিরাতের বহু সরকারি-বেসরকারি দাতব্য সংস্থা প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং সাহায্য সহযোগিতার কাজ করে। এদের কার্যক্রমের একটি সাধারণ দিক হলো শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে এরা একেবারে বাল্টিমোর থেকে বসনিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত ইসলামের ওয়াহাবি কিংবা সালাফি ধারাকেই অনুসরণ করে থাকে।

যদিও এইসমস্ত রাষ্ট্র আর উসামা বিন লাদেন পরবর্তীতে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তখন থেকে শুরু করে... এমনকি আজও উভয়ের চিন্তা এখানে এসে মিলে যায় যে – দান সাদাকা মূলত 'জিহাদ ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ' কথাটা মনে গেঁথে দেওয়ার জন্যই। ঠিক যেমনটা মাইকেল ভ্লাহোস লিখেছেন, ইসলামি দাতব্য সংস্থা বিশেষ করে সৌদির অর্থায়ন করা গুলো, "বিশ্বের জায়গায় জায়গায় স্থানীয় ইসলামি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে... আরও অনেককে চরমপন্থী করে তুলেছে।" [235] [236]

---

235 Michael Vlahos, "The Muslim renovation and U.S. strategy", 27 April 2004.

236 মাইকেল শইয়ার এখানে এসে আরেকবার স্ববিরোধী কথা লিখলেন। এর আগে লেখক লিখেছেন যে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হয়। আবার এখানে এসে লিখলেন – বিশ্বব্যাপী সৌদির বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে 'জিহাদ ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ' ধরনের কথা মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য! আবার মাইকেল ভ্লাহোসেরও দলিল দিলেন। অথচ ৯/১১ পরবর্তী সময়ে সৌদির পশ্চিম-অনুগত অবস্থান নিয়ে লেখক ইতোমধ্যেই বহু আলোচনা করেছেন।

সত্য হলো, সৌদির যাবতীয় সিস্টেম এখন কেবল তাদের অনুগত 'নব্য সালাফি' শ্রেণিই তৈরি করে চলেছে, যারা সমস্ত ক্ষেত্রে বিশ্বের 'সালাফি জিহাদি' ধারার বিরুদ্ধে লেগে থাকে। সৌদির শিক্ষাব্যবস্থায় থাকার পরও যেসব সালাফিরা জিহাদি ধারার হয়ে যান, তারা স্বউদ্যোগেই যান। তাই সৌদির অর্থায়নের 'নব্য সালাফি' ব্যবস্থা জিহাদি আন্দোলন গড়ে তুলছে বা চরমপন্থী করে তুলছে বলা যায় না। বরং সৌদির অর্থায়ন শাসক অনুগত বসে থাকা এক 'নব্য সালাফি' প্রজন্ম গড়ে তুলছে বললেই অধিক সঠিক হয়।

আবদুল্লাহ আযযাম পরবর্তী জীবন

১৯৮৬-এর দিকে উসামা বিন লাদেন ধীরে ধীরে আবদুল্লাহ আযযাম থেকে দূরে সরতে থাকেন। যদিও তিনি MK-কে ১৯৮৮ পর্যন্ত ফান্ডিং দিয়ে গিয়েছিলেন। আফগান জিহাদে তাজিক কমান্ডার আহমাদ শাহ মাসউদের ভূমিকা কী হবে এবং কীভাবে আরবরা সহ অন্যান্য অনাফগান যোদ্ধাদেরকে পরিচালনা করা হবে, এইসমস্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করেই মূলত দূরত্বের সূত্রপাত হয়। [237] আবদুল্লাহ আযযাম ছিলেন আহমাদ শাহ মাসউদের একরকম ভক্তের মতো। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মাসউদ আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ একজন কমান্ডার, “ইসলামের নায়ক... এবং গোটা উম্মাহর জন্য আশার আলো।” [238] সেই সময় মাসউদের প্রতি উসামা বিন লাদেনের তেমন কোনো বিরাগ ছিল না। উসামার খুব ভাল বন্ধু আবু উবাইদাহ, যিনি পরবর্তীতে আল-কায়েদার সামরিক কমান্ডারও হয়েছিলেন, তিনি মাসউদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য আফগান যুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচররা ছিলেন ইউনুস খালিস, সাইয়্যাফ, হাক্কানি, হেকমতিয়ার এবং অন্যান্য পশতুন নেতারা। আবদুল্লাহ আযযামের সাথে উসামা বিন লাদেন একমত ছিলেন না মূলত আরব যোদ্ধাদের বেশিরভাগকেই মাসউদের বাহিনীতে পাঠানোর ব্যাপারে।

দ্বিতীয়ত, যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম চাইতেন অনাফগান যোদ্ধাদেরকে আফগান দলগুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে, বিশেষ করে হেকমতিয়ার, সাইয়্যাফ এবং খালিশের বাহিনীতে। শাইখ মূসা আল-কারনি স্মরণ করেছিলেন “পঁচানব্বই ভাগ আরব যোদ্ধাদেরকেই হেকমতিয়ার কিংবা সাইয়্যাফের বাহিনীতে বন্টন করে দেওয়া হতো। আর খুবই নগণ্য পরিমাণকে পাঠানো হতো ইউনুস খালিস এবং জালালউদ্দিন হাক্কানির বাহিনীতে।” [239] কিন্তু উসামা বিন লাদেন এই বিষয়টিকে দেখেছিলেন একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া হিসেবে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল আরব যোদ্ধাদেরকে একত্রে রেখে প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ করানো। এভাবে মূলত তিনি ঐসব যোদ্ধাদেরকে আফগান যুদ্ধশেষে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে ইসলামি আন্দোলনের

---

237 Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 48 and 62–63, and Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

238 Jamil al-Dhiyabi, “Interview with Shaykh Musa al-Qarni, part 1”, Al-Hayah (Internet version), 8 March 2006; and Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 93.

239 Al-Dhiyabi, “Interview with Shaykh Musa al-Qarni, part 1.”

জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই পরিকল্পনা আবদুল্লাহ আযযামের সাথে শেয়ার করেছিলেন কিন্তু তাঁকে এর গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হন। উভয়ে একে অপরের বন্ধুই ছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ আনাসের মতে, তাঁরা নিজেদের মতো আলাদা আলাদা পথে চলতে শুরু করেন। [240] [241] আনাস এটাও জানিয়েছিলেন যে, আবদুল্লাহ আযযামের সাথে উসামা বিন লাদেনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল নাকি ধীরে ধীরে। সেটা হঠাতের কোনো "খারাপ কিংবা অগ্রহণযোগ্য আচরণের মাধ্যমে হয়নি। আর উভয়েই নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য ঢেকে রাখতে সম্মত হয়েছিলেন।" তাছাড়া এমন মতপার্থক্যের পরও উসামা বিন লাদেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে "ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইমামদের একজন" বলেই মনে করতেন। তাঁকে একজন "মুজাহিদ দরদী আলিম" হিসেবেই শ্রদ্ধা করতেন। [242] [243]

---

240 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 48.

241 আবদুল্লাহ আনাসের মতামতের ব্যাপারে 'সাবেক সহকর্মী ন্যারেটিভ'-এ লেখক নিজেই আলোচনা করেছিলেন। শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মৃত্যুর পর উসামা বিন লাদেন এবং নিজের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলোকেই মূলত আনাস তার শ্বশুর আবদুল্লাহ আযযাম এবং বিন লাদেনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কেননা এই ধরনের মতপার্থক্যগুলোর প্রভাব এতটাও ছিল না, যেমনটা আনাসের বক্তব্য পড়ে মনে হয়। এমনকি আহমাদ শাহ মাসউদের ব্যাপারেও মৃত্যুর আগে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম ভিন্ন উপলব্ধি করেছিলেন বলে সাক্ষী পাওয়া যায়।

সেই হিসেবে আহমাদ শাহ মাসউদের আসল চেহারাও শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এই ব্যাপারেও উসামা বিন লাদেনের সাথে তিনি একমত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালীন অবস্থাতেই মাসউদের মূল চরিত্র ফাঁস হয়ে গেলে মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল বলে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম সেসময় মাসউদকে আপাতত ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেষদিকে তিনি নিজেই মাসউদকে প্রকাশ করে দিতে মনস্থির করেছিলেন। দেখুন Khalid al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 10."

242 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 48; OBL, "Remove the Apostate", Al-Sahab Media, 20 September 2007.

243 আবদুল্লাহ আনাসের এমন বক্তব্যের পর তো উসামা বিন লাদেন এবং শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মধ্যকার মতপার্থক্য আসলেও গুরুতর পর্যায়ের কিছু ছিল কিনা, সেই সন্দেহই ঘনীভূত হয়। তাছাড়া উসামা বিন লাদেনের সহকর্মী ও ছাত্রদের থেকে পরবর্তীতে এমন জানা যায় যে, প্রাথমিক দিকে আরব মুজাহিদদের নিয়ে মতপার্থক্য হলেও জাজি যুদ্ধের পর তা ঘুচে গিয়েছিল। জাজির পরে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম আলাদা আরব বাহিনীর ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের সাথে ঐক্যমত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাছাড়া খেয়াল করলে দেখা যায়, এই সমস্ত মতপার্থক্য ছিল জিহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্মকৌশল নির্ধারণের মতো ব্যাপারগুলো নিয়ে। আর এই ব্যাপারগুলোয় মতপার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্রেফ এগুলোকে কেন্দ্র করে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার গল্প অতিরঞ্জন ছাড়া কিছুই নয়। তাও সেটা বোনা হয়েছে সেই একজনের কথার ওপর ভিত্তি করে, যে কিনা শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মৃত্যুর পর নেতৃত্বের দিক থেকে উসামা বিন লাদেনের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

উসামা বিন লাদেন প্রকাশ্যে এই কথা বলেছিলেন যে, ১৯৮৬-৮৭ এর দিকে আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের পাহাড়ে আরব যোদ্ধাদের ইউনিট পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগেই, ট্রেনিং অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম “আমাদের কাছে নবীন যুবকদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন।” [244]

১৯৮৯-এ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম আর তাঁর দুই ছেলেকে হত্যার ঘটনা বিন লাদেন ঘটিয়েছিলেন – এমন কথার পক্ষে কিছু ফালতু গুজব ছাড়া সত্যিকার কোনো তথ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। [245]

---

244 Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I.

245 এমনকি শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের স্ত্রীও তাঁর স্বামী ও দুই সন্তানের শাহাদাতের পর উসামা বিন লাদেনের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আল-জাজিরার ডকুমেন্ট্রি ‘I knew bin Laden’-এ শাইখের স্ত্রীর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টা এসেছিল।

যোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার

উসামা বিন লাদেন যখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে গিয়ে কাজ করতে মনস্থির করেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি কনস্ট্রাকশনের কাজ দিয়ে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন যে সোভিয়েতদের বোমা বর্ষণের "বর্বরতা" দেখার পর তিনি সৌদি আরব থেকে কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি আফগানিস্তানে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনকি সেগুলোর মধ্যে বুলডোজার, লোডার, ডাম্প ট্রাক, ট্রেঞ্চ ডিগার সহ ভারী ভারী সব যন্ত্রপাতিও ছিল। ১৯৯৭-এ উসামা বিন লাদেন CNN-এর সাংবাদিক পিটার আর্নেটকে (Peter Arnett) বলেছিলেন, "আল্লাহর রহমতে আমরা অনেকগুলো সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলাম। সেগুলোর কিছু কিছুকে আমরা গুদাম বানিয়েছিলাম, আর বাকিগুলোয় বানিয়েছিলাম হাসপাতাল। তাছাড়াও আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ কিছু রাস্তাও বানিয়েছিলাম। সেই রাস্তাগুলোর একটি দিয়েই আজকে রাতে আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন।" [246]

এক সময়ের মুজাহিদ এবং পরবর্তীতে আল-কায়েদা নেতার শক্ত সমালোচক বনে যাওয়া হাশিম আল-মাক্কীও উসামা বিন লাদেনের এইসমস্ত কাজের প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে তিনি লিখেন, "এখন হয়তো সবাই-ই ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করেছে যে, পাহাড়ের মধ্যে গুহা কিংবা মাটির নিচে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে কীভাবে অনেক শক্তিশালী বিমান বাহিনীকেও ঘায়েল করে ফেলা যায়। অথচ এগুলো অল্প খরুচে, আদিকালের কৌশল। যুদ্ধের দুর্বল পক্ষকে সবসময় খননের ওপরেই জোর দিতে হয়। চীনা সমরবিদ Sun Tzu তো সেই দুই হাজার বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন, 'যদি তুমি দুর্বল হও, তবে মাটির গভীরে খনন করে ঢুকে যাও। আর যখন তুমি শক্তিশালী হয়ে ওঠো, তখন ঈগলের মতো উপর থেকে আক্রমণ করো।' " [247]

---

246 Peter Arnett, "Osama bin Laden: The interview", CNN, 12 May 1997.

এই ব্যাপারে আরও দেখুন – Rahimullah Yusufzai, "Osama bin Laden: Al-Qaeda", in Harenda Baweja, ed., Most Wanted Profiles of Terror (New Delhi: Lotus Collection, Roli Books, 2002), p. 22.

247 Muhammad al-Sahi'i, "Chatter on the World's Rooftop", Al-Sharq al-Awsat (Internet version), 29 October 2006.

উসামা বিন লাদেন নিজেই বর্ণনা করেছিলেন, সোভিয়েত আক্রমণের নিচে কন্সট্রাকশনের কাজ চালিয়ে যাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু তবুও তিনি তা চালিয়ে গিয়েছিলেন। [248] এটার এক ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। সাংবাদিক জন মিলার (John Miller) লিখেছেন যে ১৯৯৮-এর মে মাসে তিনি যখন বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নিতে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন, তখন নাকি "মুজাহিদরা সবাই এক যুবকের (উসামা) ব্যাপারে বলাবলি করছিল যে, সে নাকি ময়দানের একেবারে সামনে নিজেই বুলডোজার চালিয়ে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে।" [249]

এখানেও উসামা বিন লাদেন তাঁর চেয়ে দক্ষ মানুষের অধীনে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। সৌদি থেকে কন্সট্রাকশনের যন্ত্রপাতি পাকিস্তানে নিয়ে আসার সময় তিনি বাবার কোম্পানি থেকে আবদুল্লাহ সাদি নামে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এসেছিলেন। [250] তার পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা অনুযায়ীই উসামা বিন লাদেন কাজ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর ইঞ্জিনিয়াররা মিলে একাধারে পারিচিনার অঞ্চলে Islamic Union for the Liberation of Afghanistan (IULA)-এর নেতা সাইয়্যাফের প্রধান প্রধান প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে দিয়েছিলেন; খোস্ত অঞ্চলে জালালউদ্দিন হাক্কানির বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় গুহা, ট্রেঞ্চ, সুড়ঙ্গপথ, গোলাবারুদের জায়গা ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অন্তত চারটি মুজাহিদ ক্যাম্প তৈরি করে দিয়েছিলেন।[251] আর আহমাদ বদীবের তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, উসামা বিন লাদেন আর তাঁর ইঞ্জিনিয়াররা সৌদির গোয়েন্দা সংস্থার হয়েও পেশাওয়ারের ইসলামি দাতব্য সংস্থার কিছু ক্লিনিক নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে মুজাহিদদের ট্রাক যাতায়াতের জন্য কিছু রাস্তা নির্মাণের কাজও করেছিলেন। [252]

---

248 Arnett, "Osama bin Laden: The interview."

249 John Miller, "Greetings America. My name is Osama bin Laden. Now that I have your attention ...", Esquire, February 1999.

250 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 29.

251 "Biography of Usamah bin Laden"; Michael Scheuer, Through Our Enemies' Eyes. Osama bin Laden, Radical Islam, and the Future of America, rev. ed. (Dulles, Va.: Potomac Books, 2006), pp. 104–105; Asad, Warrior from Mecca, p. 31; and Coll, Ghost Wars, pp. 156–157.

252 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 62, and Coll, The Bin Ladens, pp. 88 and 291.

এইসমস্ত প্রজেক্টের কারণে উসামা বিন লাদেন পশতুন গোত্রগুলোর মধ্যে এক পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাও সেটা আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তের এপার ওপার উভয়দিকেই। আর এই ব্যাপারটিই পরবর্তীতে ২০০১ সালে তাঁকে পাকিস্তানে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া সেই পরিচিতি পরবর্তীতে আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশতুন গোত্রগুলোকে উসামা বিন লাদেন কিংবা তালেবানদের সাথে যোগ দেওয়ার পথও সহজ করে দিয়েছিল।

তৃণমূল যোদ্ধা থেকে নেতা

উসামার 'শুধুই আরব' (Arab Only) বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে একদিকে ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য তাঁর প্রশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। বিন লাদেন আরবের স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদেরকে আফগান কমান্ডারদের অধীনে বন্টন করে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন কেননা তাঁর দাবি ছিল যে, আফগানরা আরবদেরকে তখনও 'মেহমান' হিসেবেই আখ্যা দিয়ে যাচ্ছিল, আর আরবদেরকে নিজেদের সাথে যুদ্ধে না নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখছিল। আর তার ফলে আরবদের এমন কোনো প্রয়োজনীয় যুদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছিল না, যেগুলো পরবর্তী সময়ে কাজে আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আফগান কমান্ডাররা আরবদেরকে যুদ্ধের সময় নিতে চাইতেন না বেশ কিছু কারণে – আরবদের অনেকে তখনও আফগানদেরকে ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতো, আদেশ নিষেধ ঠিকমতো শুনতে চাইতো না আর যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়, শহীদ হয়ে যেতে চাইতো। তারা আসলে এক প্রকার ''মৃত্যুর জন্য দৌড়ে যেতো।'' তাই আফগান বাহিনীতে আরবদের অধিকাংশই ঝামেলার উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা নিজেদের এবং সতীর্থদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতো, বিঘ্নিত করতো সফল অপারেশন পরিচালনাও। IULA-এর নেতা কমান্ডার সানজুর বলেছিলেন, ''তারা (আরব যোদ্ধারা) শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। তারা স্রেফ শহীদ হয়ে যেতে চাইতো।'' [253] আফগানরা যে প্রয়োজনে আল্লাহর জন্য শহীদ হয়ে যেতে চাইতো না, তা কিন্তু নয়। তবে সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের সময় আফগানদের মধ্যে আত্মঘাতী (ইশতেহাদি) হামলার প্রচলন তেমন ছিল না। কিন্তু (৯/১১ পরবর্তী সময়ের) আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। [254]

'শুধুই আরব' বাহিনী গঠন করবার আগে তাদের ট্রেনিং, প্রয়োজনীয় সাপ্লাই এবং অপারেশন পরিচালনার জন্য উসামা বিন লাদেনের প্রয়োজন ছিল আফগানিস্তানের ভিতরে একটি ঘাঁটির। এই ব্যাপারে তিনি IULA-এর প্রধান আবদুর রাসুল সাইয়্যাফের শরণাপন্ন হন।

---

253 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

254 লেখক এই প্যারায় আরব যোদ্ধাদের যে মানসিকতা বর্ণনা করেছেন, তা অসত্য নয়। এই বিষয়টা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, শাইখ আবদুল্লাহ আযযামও তাঁর রিসালায় এই ব্যাপারে কড়া নাসিহা করেছিলেন। শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের 'সীরাত থেকে শিক্ষা' সংকলনের শেষদিকে এই ব্যাপারে শাইখের নাসিহা রয়েছে। তবে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং উসামা বিন লাদেনের প্রচেষ্টায় এমন অবস্থা পরবর্তীতে সংশোধনও হয়ে গিয়েছিল।

আফগান নেতাদের মধ্যে আবদুর রাসুল ছিলেন সৌদি প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সংস্থার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আইসাম দারাজ লিখেছিলেন যে, উসামা ১৯৮৪ সালের কোনো এক সময়ে সাইয়্যাফের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং IULA-এর আওতাধীন এলাকা – পাকতিয়া প্রদেশের জাজি পর্বতাঞ্চলে একটি 'শুধুই আরব' ক্যাম্প খোলার অনুমতি চান। সাইয়্যাফ রাজি হয়েছিলেন কিন্তু এর কারণ ঠিক ধরতে পারেননি। সেই ক্যাম্প নির্মাণের কাজ শুরু করতে করতে সময় ১৯৮৫-এর শেষ ভাগে গড়িয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'মাসাদাতুল আনসার' বা 'আল-মাসাদা'। ক্যাম্পের স্থান নির্বাচনে উসামা বিন লাদেনের ঝুঁকি নেওয়ার রুচিই ফুটে উঠেছিল। ক্যাম্পটি নির্মাণ করা হয়েছিল এক পাহাড়ের বুকে। এটা ঠিক যে ক্যাম্পের জায়গা থেকে নিচের সমতল ভূমিতে সোভিয়েত এবং আফগান কমিউনিস্ট সৈন্যদের ওপর নজর রাখা যেত। কিন্তু একই কারণে একবার আরবদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেলেই ক্যাম্পে সোভিয়েতদের গোলাবারুদ আর বিমানবাহিনীর তাণ্ডব নেমে আসার সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। [255]

উসামা বিন লাদেন তাঁর কনস্ট্রাকশনের ভারী যন্ত্রপাতি সব জাজিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা ক্যাম্প পর্যন্ত যাওয়ার একটি রাস্তা বানিয়ে নিয়েছিলেন, যাতে শীতকালেও যাতায়াত করা যায়। আর আরেকটি রাস্তা বানিয়েছিলেন, যেটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জালালাবাদের দিকে চলে যায়। [256] এরপর তারা মনোযোগী হয়েছিলেন ট্রেঞ্চ, গুহা, সুড়ঙ্গ এবং বিভিন্ন যুদ্ধস্পট, বিমান বিধ্বংসী স্পট খননে। এছাড়াও তারা সেখানে থাকার এবং বিভিন্ন রসদ রাখার গুদামও তৈরি করে নিয়েছিলেন। ১৯৮৬-এর ২৪ অক্টোবরে উসামা বিন লাদেন এবং আরও এগারো জন মিলে ক্যাম্পের প্রথম তাঁবু গাড়েন। সেই এগারো জনের মধ্যে এমন দুইজন মিশরীয় ছিলেন, যাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল – আবু উবাইদাহ আল-পানশিরি এবং আবু হাফস আল-মিশরি। সেই সময় থেকে ১৯৮৭-এর এপ্রিলের মধ্যেই ক্যাম্পে সাত থেকে আটটা ভবন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে যোদ্ধার সংখ্যা প্রায় সত্তরে গিয়ে ঠেকেছিল। [257] সময়ের সাথে সাথে কন্সট্রাকশনের কাজ যতো গুছিয়ে আসছিল, সেই সাথে আরব স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আবু উবাইদাহ কিংবা আবু হাফসের অধীনে সামরিক ট্রেনিংয়ের জন্যও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কিছু অংশকে

255 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

256 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 56; Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan"

257 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

পাকিস্তান সীমান্তের নিকটে সাইয়্যাফের ক্যাম্পেও পাঠানো হতো। এইসব স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধাদেরকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়েও ক্লাস করানো হতো। কারণ হিসেবে আল-মাসাদার একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক বলেছিলেন যে এর উদ্দেশ্য ছিল, "একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং নৈতিকতা সম্বলিত দল গড়ে তোলা।" [258]

একইসাথে নির্মাণকাজ এবং যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ – উভয়টাই চালিয়ে যাওয়া এক পর্যায়ে উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সাথে থাকা প্রশিক্ষকদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। আর কারণটা ছিল যোদ্ধারাই। অনেক ভালভাবে বোঝানো শোনানোর পরও তারা উসামা বিন লাদেনের জন্য সেই আফগান কমান্ডারদের সাথে করা ঝামেলাই আবার শুরু করেছিলেন। তারা যেকোনো মূল্যে শহীদ হয়ে যেতে চাইতো, আর যাকিছুই তাদের এই লক্ষ্যকে পিছিয়ে দিতো, তাতেই তারা একগুঁয়ে ধরনের অনীহা প্রকাশ করতো। উসামা বিন লাদেনের জন্য এই সমস্যার একটা ব্যবস্থা করা ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ; এমনকি বাবার কোম্পানিতে শ্রমিকদের দলকে নিয়ন্ত্রণ করবার চাইতেও।

কিন্তু যাই হোক, উসামা এই চ্যালেঞ্জও ভালভাবেই সামাল দিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আসা আরবদেরকে বহু কষ্টে বুঝ দিয়েছিলেন যে শত্রুর ওপর হামলা চালানোর আগে তাদেরকে ক্যাম্পের কাজ শেষ করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মিশরীয় সাংবাদিক আইসাম দারাজ সেটা উল্লেখ করেছিলেন, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan" শিরোনামে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে উসামা বিন লাদেন "তাঁর ভাইদেরকে সবরে দীক্ষিত করেছিলেন। যেহেতু তখনও কোনো যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না, তাই তাদেরকে তিনি ধৈর্য্যের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।" [259]

যুবকদের সেই প্রবল জযবা ঠেকানো ছাড়াও উসামা বিন লাদেন, আবু উবাইদাহ এবং আবু হাফসকে শিখতে হয়েছিল কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে সামাল দিতে হয়। যুবকদের দলে সৌদি এবং ইয়েমেনিরা বেশি থাকলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তর আফ্রিকান, কুর্দস, মিশরীয় এবং সুদানিও ছিল। তাছাড়া এইসব যুবকদের শিক্ষাগত স্তর ছিল ভিন্ন ভিন্ন – কেউ ছিল কলেজের, কেউ ছিল হাইস্কুল পর্যন্ত পড়া তো কেউ ছিল আধা শিক্ষিত। তাদের কাজের অভিজ্ঞতাও ছিল একেক রকম। কেউ ছিল

---

258 The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network, 2006.

259 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

ব্যবসায়ী, কেউ ছিল সেনাসদস্য, কেউ পুলিশসদস্য, কেউ দিনমজুর এমনকি কেউ কেউ ছিল ধনী পরিবারের সন্তান। একেক জনের জিহাদের প্রতি আকর্ষণ এবং দায়িত্ববোধেও ছিল একেক রকম। সেখানে এমন মানুষ ছিল, যারা আজোবধি আল-কায়েদা কিংবা অন্য কোনো ইসলামি সংগঠনের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আবার এমন মানুষও ছিল, যারা স্রেফ একটু রোমাঞ্চ নিতে এসেছিল, যারা শীত আসার আগেই বাড়ি চলে যেতে চাইতো।

এসবকিছু ছাড়াও, প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীর জন্য বাইরের একটি দেশে এসে খাপ খাওয়ানোও ছিল ভিন্ন ভিন্নরকম অভিজ্ঞতা – তাও অনেকের জন্য একেবারে প্রথমবার। স্থানীয়দের ভাষা না জানা থাকার কারণে তাদের কাজ এবং যুদ্ধগুলো ছিল একপ্রকার মানবীয় স্বস্তিশুন্য এবং কষ্টকর। বেশিরভাগের জন্যই এমন পর্যায়ের শারীরিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল, যেমনটা তারা আগে কখনও করেনি। এই যুবকদের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীদেরকে সর্বক্ষণই আফগান কমান্ডারদের সাথে শলা-পরামর্শ করতে হতো কিংবা বুঝ দিতে হতো। কেননা সেই কমান্ডারদের কেউ কেউ এই আরবদেরকে অপছন্দ করতো, মনে করতো যে এরা বেপরোয়া, কিছু না করেই শুধু শহীদ হতে ব্যাকুল, আর এদেরকে কিছু বোঝানোও যায় না। কিন্তু উসামা বিন লাদেন তাঁর সেই সময়ের দিনগুলোকে "জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়" বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু সেই সাথে হয়তো কিছুটা দুঃখ নিয়ে এটাও বলতেন, "যখন কেউ তার ভাইদের সাথে থাকে, তখন সে আরও বেশি সবরকারী হয়ে উঠতে পারে।" [260]

উসামা বিন লাদেনের 'শুধুই আরব' বাহিনী এর প্রথম অভিযান পরিচালনা করে ১৯৮৭ সালের ১৭ই আগস্ট। বাহিনীর কমান্ডে ছিলেন আবু উবাইদাহ আল-পানশিরি, তত্ত্বাবধানে ছিলেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম, তাঁর সহকারী শাইখ তামিম আল-আদনানি এবং IULA-এর নেতা সাইয়্যাফ। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত এবং পরিকল্পনার অভাবে এই অপারেশনটি ব্যর্থ হয়েছিল। ময়দানে তারা শত্রুপক্ষকে অপ্রত্যাশিত সব অবস্থানে আবিষ্কার করে আর

---

260 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

উসামা বিন লাদেনের এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যারা ধর্মীয় শিক্ষক এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বর্তমান সময়ের অন্যতম সম্মানিত সালাফি আলিম আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি।

দেখুন "Open interview with Shuyukh al-Islam members and the esteemed Shaykh Abu-Muhammad al-Maqdisi", Islamic al-Fallujah Forums (Internet), 28 October 2009.

গোলাবারুদ পূর্বনির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ফুরিয়ে ফেলে। [261] ক্যাম্প পাহারা দেওয়ার জন্য থেকে যাওয়া মুজাহিদরা সোভিয়েতদের থেকে ব্যাপক বিমান হামলা এবং গোলাবর্ষণের শিকার হয়। তাছাড়া মূল বাহিনীর পিছনের দিকের ব্যাকআপ দলেরও হয়েছিল একই দশা। [262]

মজার ব্যাপার হলো, আরবদের বাহিনীটি যখন শেষমেশ যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, উসামা বিন লাদেন তখন নিজের হাতে এর কমান্ডের দায়িত্ব নেননি। বরং আবু উবাইদাহ এবং আবু হাফসের ওপর ছেড়ে দেন। খালিদ আল-বাতারফি বলেছেন, উসামা সবসময়ই ছিলেন “একজন ভাল সৈনিক। তাঁকে যেকোনো জায়গায় পাঠান, সে সব নির্দেশই মেনে চলবে।” আর নিজের চোখে দেখা আইসাম দারাজ বলেছিলেন যে জাজিতে উসামা বিন লাদেন “একেবারে সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন।” [263] স্টিভ কোল বলেছেন, জাজির যুদ্ধে বিন লাদেন নিজের ওপর আসা দায়ভার থেকে ‘সম্মানজনকভাবেই’ মুক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন। [264]

---

261 Darraz, “Impressions of an Arab journalist in Afghanistan.”

262 The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network, 2006.

263 Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 13, 55.

264 Coll, The Bin Ladens, p. 302. এখানে স্টিভ কোলের বক্তব্য ইতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং আরও প্রচ্ছন্নভাবে লরেন্স রাইট স্পষ্ট অনুমানের ওপর মন্তব্য করেছেন যে, উসামা বিন লাদেনের নাকি সাহসিকতার অভাব ছিল এবং তিনি নাকি গোলাগুলি মুক্ত জায়গায় থাকতে চাইতেন। এটি অদ্ভুত, কারণ উসামা বিন লাদেনের পাশাপাশি যারা লড়াই করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় সর্বসম্মত সাক্ষ্য রয়েছে যে, তারা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে অবিস্মরণীয় ও নির্ভীক দেখেছেন। তিনি যে প্রায় সময়ই নিম্নরক্তচাপে ভুগতেন এবং তাঁর যে গ্লুকোজের প্রয়োজন হতো তা সত্য। তবে আমার জানা মতে তাঁর সহযোদ্ধাদের কেউই কখনও দাবি করেননি যে, সেটাকে তিনি লড়াই এড়িয়ে যাওয়ার কোনো ওজর হিসেবে আদৌ দেখিয়েছিলেন।

কোল এবং রাইটের ভুলের একটি কারণ হয়তো তাদের উৎস। উভয় লেখকই CIA-এর প্রাক্তন এক কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেন, যিনি রেকর্ডে লিখেছিলেন, “উসামা বিন লাদেন যুদ্ধের ময়দানে কোন বীর সেনা ছিলেন না।” কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই কর্মকর্তার বিবৃতির চেয়ে বেশি কিছু নয়, কারণ আমি (মাইকেল শইয়ার) নিশ্চিত করে বলতে পারি যে CIA-এর মূল ফাইলগুলোতে এমন কিছু নেই যা সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের সময় উসামা বিন লাদেনের কার্যক্রমকে নেতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করে। আসলে কয়েকজন প্রাক্তন সিনিয়র CIA কর্মকর্তা এবং অগণিত FBI কর্মকর্তারা স্টিভ কোল, লরেন্স রাইট এবং অন্যান্য অনেক লেখককে অসংখ্যবার ভুলভাল বুঝিয়েছিলেন। এটা এমন এক বাস্তবতা, যা ৯/১১ কমিশনের আর্কাইভগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলে অত্যন্ত বিব্রতকরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দেখুন Coll, The Bin Ladens, pp. 256, 377 and 381; Wright, The Looming Tower, pp. 100, 116 and 138; The CIA official’s comment is in Weaver, “The Real bin Laden.”

উসামা বিন লাদেনের সহযোগীদের স্মৃতিচারণও এই ব্যাপারটির সাক্ষ্য দেয়। ২০০৬-এর দিকে সৌদির অন্যতম একজন উসামা বিরোধী কণ্ঠ হয়ে ওঠা মূসা আল-কারনি বলেছিলেন, "প্রচন্ড যুদ্ধাবস্থার মধ্যেও আমি উসামাকে খুঁজে পেতাম। সে পালানোর কিংবা পিছু হটার মতো লোক ছিল না। এমনও পরিস্থিতি আসতো, যখন তাঁর সাথে কেবল দুই-তিনজন মুজাহিদ থাকতো। আর এই দুই-তিন জনকে নিয়েই সে মুজাহিদদের পুরো বাহিনী নিরাপদে পৌঁছানো পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ে সুরক্ষা দিয়ে যেত। দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে আঞ্জাম দিয়ে তবেই সে নিজে ফিরে আসতো।" [265] আইসাম দারাজ উপসংহার টেনেছিলেন এভাবে যে, যুদ্ধের শেষে উসামা বিন লাদেনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। "কারও কাছেই আর কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না যে, তিনিই এখন দলনেতা হবেন। আমি যুদ্ধে তাঁর কাছাকাছি ছিলাম, তাও অনেক মাস ধরেই। তিনি সত্যিই খুব সাহসী ছিলেন। আর একারণেই তিনি আফগান-আরব সবার কাছেই সম্মানিত ছিলেন।" [266]

১৭ই আগস্টে শুরু হওয়া সেই সংঘর্ষ জাজি এলাকায় প্রায় তিন সপ্তাহ ব্যাপী তুমুলভাবে চলেছিল। আরবরা সোভিয়েতদেরকে পুরোপুরি পরাজিত করতে পারেনি ঠিক, কিন্তু শত্রু পিছু হটা পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থান ঠিকই ধরে রেখেছিল। দিনশেষে উসামা বিন লাদেন আর তাঁর যোদ্ধারা এই লড়াই থেকে একদিকে আদর্শিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, অপরদিকে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী সময়গুলোয় উসামা বিন লাদেন বলতেন, মুসলিমরা একসময় গিয়ে জাজি সংঘর্ষে চোখ বুলাবে; আর উপলব্ধি করবে যে ছোট পরিসরের হলেও এটা ছিল ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধ। কেননা একটি সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্ষুদ্র এক বাহিনী তাঁদের অবস্থান ধরে রেখেছিল। উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে, আল্লাহ মুজাহিদদেরকে এমন এক যুদ্ধে রক্ষা করেছিলেন এবং পথ দেখিয়েছিলেন যেখানে "রীতিমতো গুহায় দিন কাটানো মুসলিমরা তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম এক পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিল।" [267] আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য মুহাম্মাদ সা.-এর সময়ে বদরে-খন্দকে মুসলিমদেরকে বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এনে দিয়েছিল। জাজিতে সেই সাহায্য যেন আবার ফিরে এসেছিল।

---

265 Jamil al-Dhiyabi, "Interview with Shaykh Musa al-Qarni, part 2."

266 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 55.

267 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction", p. 77.

জাজি যুদ্ধের পর, বিন লাদেন ইউনিটের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্তত এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। পরবর্তী দুই বছরেও আরবদের এই ইউনিট অবশ্যই আরও কিছু সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। কিন্তু ডজন ডজন কিংবা শ খানেক সংঘর্ষের যেসব কথা প্রচলিত আছে, তা অতিরঞ্জন ছাড়া কিছুই না। বিন লাদেন ইউনিটের সর্বশেষ যে যুদ্ধ লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটা ছিল জালালাবাদের আশেপাশে। আর সময়টা ছিল ১৯৮৯-এর বসন্তে, সোভিয়েতরা সম্পূর্ণরূপে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর। আফগানদের লিখা বইপত্রে এই যুদ্ধ বহুল আলোচিত এক বিষয়। কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই মূলত মুজাহিদরা যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদেরকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল কিনা – এটাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সেই যুদ্ধের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এই বইতে করা সম্ভব নয়। তাই আমি বরং সেখানে উসামা বিন লাদেন আর তাঁর যোদ্ধাদের কর্মকৌশল এবং সেখান থেকে তাঁদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকেই ফোকাস করবো।

আফগান মুজাহিদ এবং তাঁদের আরব মিত্রদের বেশিরভাগেরই সত্যিকার সামরিক লড়াইয়ের স্রেফ প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু জ্ঞান ছিল। তাঁরাই ১৯৮৯ সালের মার্চের শুরুর দিকে পাকিস্তানের সহায়তায় জালালাবাদে আক্রমণ শুরু করেছিল। শহরটিতে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সেই লড়াই স্থায়ী হয়েছিল প্রায় তিন মাস। মুজাহিদদের প্রাথমিক আক্রমণ বিফলে গেলে, সোভিয়েতরা গুটিয়ে যাবার পর প্রথমবারের মতো আফগানের কমিউনিস্ট বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা থেকে ফের ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু মুজাহিদরাও তাঁদের অবস্থান ধরে রাখে। এরপর তাঁরা আবারও আক্রমণে যায়। কিন্তু এটা একটি মারাত্মক ভুল হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। কেননা শহরের শক্ত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান (defensive positions) থেকে আফগান কমিউনিস্ট বাহিনী অরক্ষিত সমতল ভূমিতে থাকা মুজাহিদদের ওপর প্রলয়ঙ্কারী গোলাবর্ষণ করতে পারছিল।[268]

যুদ্ধ যখন শুরু হয়, উসামা বিন লাদেন তখন কেবল সৌদি আরব থেকে পেশাওয়ারে ফিরেছেন। ফিরে এসে মুহূর্তেই তিনি ময়দানে ছুটে যান। প্রথমে তিনি আরব বাহিনীর জন্য লজিস্টিক সাপোর্টে মনোযোগী হন – নিজের অর্থ দিয়ে পাকিস্তানে ত্রিশ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ কিনেন এবং সেগুলো ময়দানে পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও জালালাবাদে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণ করেন, ময়দানে মুজাহিদদের চলাচল ও গতি বাড়াতে গাড়ি এবং ছোট ছোট পিকআপ ট্রাক ক্রয় করে দেন। পরবর্তীতে যোদ্ধাদের

---

268 Darraz, “Impressions of an Arab journalist in Afghanistan.”

একজন ঐ গাড়িগুলোর অশেষ উপকারিতার কথা স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, "টয়োটা গাড়ি জিহাদের জন্য খুবই উপযোগী।" [269] এইসব ব্যবস্থা করার পর বিন লাদেন নিজেই ময়দানে নেমে যান। এমনকি শেষে পিছু হটার আগে বাহিনীকে কমান্ড করতে করতে জালালাবাদ এয়ারপোর্টের টার্মাকে [270] পর্যন্তও পৌঁছে গিয়েছিলেন। [271]

জালালাবাদে উসামা বিন লাদেন আহত হন। এর আগে জাজিতে, আর সেবার জালালাবাদে তিনি যে উপস্থিত সাহসিকতা এবং নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা নাঙ্গারহার প্রদেশের আফগান কমান্ডারদের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং হৃদ্যতা গড়ে দিয়েছিল। এছাড়া তাঁর কার্যক্রম সৌদিতেও তাঁকে সুপরিচিত করে তুলেছিলো। তাঁর বন্ধু ওয়াইল জুলাইদানের ভাষায়, "সবাই উসামাকে চিনতে শুরু করে।" [272]

আফগানরা জালালাবাদে খুব বাজেভাবে হেরে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল – শত্রুপক্ষের গোলাবারুদ ও বিমান বাহিনী আর মুজাহিদ কমান্ডারদের একে অপরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। পরাজয়ের জন্য এই দুটো কারণ সমানভাবেই দায়ী ছিল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল আরব, আফগান দুই দলই। যুদ্ধ চলাকালীনই উসামা বিন লাদেন আফগান যোদ্ধাদের সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করেন এবং তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন যে, জালালাবাদের লড়াইয়ে ১৭০-এরও বেশি আরব যোদ্ধা শহীদ হয়েছিল, আর তা ছিল সে সময় পর্যন্ত আরবদের সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি। [273] কিন্তু এটা বলার সাথে সাথে উসামা বিন লাদেন এই স্বীকৃতিও দিচ্ছিলেন যে, তেরো বছরের জিহাদে সব মিলিয়ে ৫০০-এরও কম আরব শহীদ হয়েছিল, যেখানে একই সময়কালে আফগানদের ক্ষেত্রে

---

269 Robert Fisk, "On finding Osama bin Laden", Independent (Internet version), 24 September 2005.

270 ইংরেজি tarmac - বিমানবন্দরের যে জায়গায় বিমান সাড়িবদ্ধভাবে পার্ক করে রাখা হয়।

271 The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network.

272 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 56; al-Dhiyabi, "Interview with Shaykh Musa al-Qarni, part 1."

273 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan"; Zaydan, Usama bin Ladin without Mask, p. 22.

সংখ্যাটা ছিল কয়েক লক্ষ। তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটার জয় এসেছিল আসলে "খালি পায়ের, গরিব আফগানদের আত্মত্যাগেই।" [274]

আফগান যুদ্ধে আরবদের তুলনামূলক কম ভূমিকার ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের সেই অকপট সত্যের স্বীকারোক্তি বজায় ছিল। ১৯৮৯ সালের একটি ভিডিও বার্তায় যখন তিনি মুসলিম যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, তখনও বলেছিলেন, "মুসলিম বিশ্বের সর্বমোট জনশক্তির তুলনায় জিহাদে যোগ দেওয়া বান্দাদের সংখ্যা এখনও একেবারেই নগণ্য।" [275] আরবদের সংখ্যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো কিংবা আফগানিস্তানের বিজয়কে 'আরবদের বিজয়' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার বদলে এভাবেই তিনি সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের বাস্তব একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সে যাই হোক, আফগানদের বিজয় এটারই বাস্তব প্রমাণ ছিল যে, নিষ্ঠাবান মুসলিমরা রীতিমতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে, তাও আবার তুলনামূলকভাবে নগণ্য সামরিক শক্তির অধিকারী হয়েও।

১৯৮৯-এর পর থেকে উসামা বিন লাদেন 'কাফিরদেরকে আদৌ হারানো সম্ভব কিনা' তা নিয়ে আর সময় নষ্ট করেননি; বরং 'কীভাবে কাফিরদেরকে হারানো যায়', সেই ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দেন। তাঁর এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের আফগান যুদ্ধলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মুসলিম জাতির চূড়ান্ত বিজয় আনা যায়, সেদিকে মনোনিবেশ করেন।

বিশ্বাস

যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল – উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান থেকে এই বিশ্বাস দৃঢ় করে ফেরেন যে, মুসলিমরা যথেষ্ট অধ্যবসায়ী হলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাঁর বিজয়ের ওয়াদা পরিপূর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর অল্প ধৈর্যের, আত্মবিশ্বাসহীন সাথীদেরকে বলেছিলেন, "হতাশাগ্রস্ত হবেন না ভাইয়েরা। হতাশ হয়ে যাওয়া গুনাহ।" [276] আফগানিস্তানে থাকতে তিনি বলতেন, "আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে রাশিয়ানদের থেকে হিফাজত করেছেন... আল্লাহর ওপর ভরসাই হলো আমাদের শক্তির মূল উৎস। এইসব ট্রেঞ্চ আর সুড়ঙ্গপথগুলো তো স্রেফ যথাসাধ্য সামরিক প্রচেষ্টা, যে ব্যাপারে

274 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction", p. 86.

275 The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network.

276 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

আল্লাহই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।"[277] কোনো সামরিক শক্তিই তো প্রত্যেক যুদ্ধ জেতে না। আর মুজাহিদদের সাময়িক পরাজয় তো স্রেফ আল্লাহর পক্ষ থেকে ধৈর্যের পরীক্ষা। ১৯৯৯-এর দিকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "ইতোপূর্বে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবর করার এবং তিনি যা নির্ধারণ করেছেন, তা-ই বরণ করে নেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। একজন সত্যিকার মুসলিম সাফল্যের সময় আল্লাহর শোকর করে, আর প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য্যধারণ করে।"[278]

প্রশিক্ষণ

উসামা বিন লাদেনের মনে গেঁথে গিয়েছিল যে – আফগানিস্তানে আরব ও আফগান মুজাহিদরা যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল, তার কারণ ছিল যথাযথ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অধৈর্য্য হয়ে যাওয়া। জাজি এবং জালালাবাদের ক্ষয়ক্ষতির পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রশিক্ষণ পূর্ণরূপে সমাপ্ত হওয়ার পরই কেবল মুজাহিদদেরকে অপারেশনে পাঠানো হবে। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে স্রেফ শাহাদাতের তামান্নার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে পেশাদারিত্বকে। তিনি যে তাঁর এইসমস্ত লক্ষ্য অর্জনও করেছিলেন, তা ১৯৯৮-এর পর থেকে আল-কায়েদার অপারেশনগুলো দেখলেই বুঝে আসে।[279] ২০০৭ সালে বিন লাদেন আফগান এবং ইরাকি মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আপনাদেরকে আপনাদের কাজে পারদর্শী হতে হবে। কেননা যে বিষয়টা মুসলিমদেরকে হতাশা এনে দেয় আর কাফিরদেরকে আনন্দিত করে তোলে, তা হলো অপারেশন বিফলে যাওয়া। আর সেটা হয় মূলত অপারেশনের আগে প্রস্তুতির কোনো না কোনো ক্ষেত্রে কমতি রয়ে যাওয়ার কারণে – হয়তো শত্রুর ওপর যথেষ্ট নজরদারি হয়নি; হয়তো অস্ত্রশস্ত্র কিংবা গোলাবারুদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অভ্যাস কিংবা যোগ্যতার কমতি হয়েছে; হয়তো গোলাবারুদেরই

---

277 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 59.

278 Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", 4 January 1999

279 ৯/১১ হামলার মান তো স্বতঃসিদ্ধ। তাছাড়া ইরাকে আল-কায়েদার বিদ্রোহী যোদ্ধাদের অতর্কিত যুদ্ধ দক্ষতার এক চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন Stephen Biddle, "Afghanistan and the future of warfare: Implications for army and defense policy" (Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2002). আর ৯/১১-এর আগে উসামা বিন লাদেনের আরব যোদ্ধাদের উচ্চ মান, যেমনটা তালেবান বনাম মাসউদ যুদ্ধে প্রদর্শিত হয়েছে, সে সম্পর্কে দেখুন – Roy Guttman, How We Missed the Story, pp. 188–190 and 218.

যথেষ্ট ক্ষমতা যাচাই করা হয়নি কিংবা এমনই কোনো একটি কারণে। আপনারা যখন একটি মাইনও পেতে রাখবেন, সেটাও এমনভাবে করবেন যাতে আমেরিকার অন্তত একজন সৈন্য বা গোয়েন্দা হলেও আহত কিংবা নিহত হয়।" [280]

অভিজ্ঞতা

আফগানিস্তানে উসামা বিন লাদেন শিখেছিলেন – কেউই সবগুলো লড়াই জেতে না। "একদিন আমরা জিতি তো আরেকদিন হারি।" [281] মানুষ ভুল করে করেই শেখে। এটি হলো বান্দাদেরকে শেখানোর জন্য আল্লাহর একটি পন্থা। জালালাবাদের যুদ্ধের পর আইসাম দারাজ স্মরণ করেছিলেন, "তিনি যুবকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন এই বলে 'এটা হতে পারে যে শত্রুরা মুজাহিদদের ওপর সাফল্য অর্জন করেছে আমাদেরই ভুলের কারণে। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর পরাজয় সত্ত্বেও আমাদের ভাইদের রকেট লঞ্চার, মর্টার এবং অন্যান্য গোলাবারুদ চালানোর অভিজ্ঞতা তো বেড়েছে।' " [282]

উসামা বিন লাদেনের এক সময়ের বডিগার্ড আবু জান্দাল, যিনি একসময় আল-কায়েদার সিনিয়র প্রশিক্ষকদের একজন ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, উসামা বিন লাদেন আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ যতটুকু সম্ভব কঠোর করতে চেয়েছিলেন। আফগানিস্তানে আল-কায়েদার আল-ফারুক ক্যাম্পের ব্যাপারে আবু জান্দাল বলেছিলেন, "... সুস্পষ্ট সামরিক মূলনীতির ভিত্তিতে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেটি ছিল এমন এক সামরিক কলেজ,

---

280 OBL, "Message to our people in Iraq." অবশ্য উসামা বিন লাদেন একই সাথে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর এমন পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণের দাবি অনেককে জিহাদকেই বিলম্ব করার অজুহাত দিতে পারে, কারণ প্রশিক্ষণ কখনোই নিখুঁত হয় না। তাই ১৯৯৮ সালে উসামা বিন লাদেন এটাও বলেছিলেন যে, জিহাদের জন্য অপরিহার্য জনশক্তি ও উপাদান পাওয়া গেলে, সাথে যতটা সম্ভব প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু প্রশিক্ষণ জিহাদ এড়ানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সহজে বোঝাতে তিনি বলেন, "অধ্যবসায় একটি মহৎ গুণ, কিন্তু যখন মুক্তিলাভের কোনো সুযোগ নেই তখন নয়। আর কূল-কিনারাহীন প্রস্তুতি জিহাদ শুরুর ক্ষেত্রেই বিলম্ব করে এবং শত্রুকে কেবল শক্তিশালী ও অপরাজেয় হতে সহায়তা করে।" অর্থাৎ প্রস্তুতি এবং অপারেশন শুরুর মধ্যে ভারসাম্য করতে হবে।

দেখুন Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I; OBL, "Abdallah's initiative—the great treason", 1 March 2003; and Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", 4 January 1999.

281 Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I.

282 Darraz, "Impressions of an Arab Journalist in Afghanistan."

যেখানকার ছাত্রদেরকে কয়েক স্তরের প্রশিক্ষণ অতিক্রম করে গ্র্যাজুয়েশন করে শেষমেশ কমান্ড পর্যায়ে আসতে হতো। আর সেই কমান্ডাররা যেকোনো জায়গার মুজাহিদদেরকে সামরিক নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী হয়ে যেত। এই সামরিক কলেজটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক পর্যায়ের। অর্থাৎ, আফগানিস্তানের জিহাদ সমাপ্ত হয়ে গেলে এখান থেকে বের হওয়া কমান্ডাররা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে সফলভাবে যুদ্ধ কিংবা সামরিক অপারেশন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। (সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ শেষে) অনেক যুবক আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, বার্মা সহ অন্যান্য অঞ্চলে যাবার মাধ্যমে উক্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। আল-কায়েদার সামরিক শাখা শুন্য থেকে পয়দা হয়নি। বরং তা ছিল পদ্ধতিগত সামরিক সুপ্রশিক্ষণ পাওয়া ক্যাডারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।" [283]

নিরাপত্তা

আফগান যুদ্ধের পর উসামা বিন লাদেনের পরিকল্পনায় নিরাপত্তার বিষয়টা ব্যাপক প্রাধান্য পায়। প্রায়ই তিনি নিরাপত্তা নিয়ে রাসূল সা.-এর আদেশের ব্যাপারে তাগিদ দিতেন। তাছাড়া আরব সরকারগুলোর – বিশেষত সৌদি আরবের – গোয়েন্দারা প্রায়ই মুজাহিদদের ক্যাম্পে (যোদ্ধা সেজে) অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতো। উসামা বিন লাদেন এটাকে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখতেন। তাই একদিকে তাঁর যোদ্ধাদেরকে তিনি এই উপদেশ দিতেন, "তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে।" আবার এইভাবেও সতর্ক করতেন যে, "মুজাহিদদের কাতারে প্রবেশ করে কোন্দল সৃষ্টি করা মুনাফিকদের ব্যাপারেও তোমাদেরকে সদা সাবধান থাকতে হবে।" [284] আজকে (২০১১) প্রায় দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে এখনও পশ্চিমা আর তাদের আরব মিত্ররা মিলে তাঁকে হত্যা করতে না পারা, এখনও আল-কায়েদাকে ধ্বংস করতে না পারা কিংবা সংগঠনটির মিডিয়া ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গুঁড়িয়ে দিতে না পারার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে সংগঠনের এবং কার্যক্রমের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের গোপনীয়তার মূলনীতির সার্থকতা।

---

283 Khalid al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, narrated by Abu Jandal, part 4", Al-Quds al-Arabi, 22 March 2005, p. 19.

284 OBL, "Message to our people in Iraq."

ধৈর্য্য

১৯৮৭ সালের জাজি যুদ্ধ থেকে ১৯৮৯-এর জালালাবাদ যুদ্ধের মধ্যকার সময়টায় উসামা বিন লাদেনের যোদ্ধাদের অভূতপূর্ব উন্নতির কারণ ছিল অভিজ্ঞতা এবং ধৈর্য্যশীল প্রশিক্ষণ। জালালাবাদের পর থেকে তো বলা যায়, ধৈর্য্যশক্তি আল-কায়েদার সিগনেচারে পরিণত হয়। বিন লাদেনের যুক্তিতে, ছোট ছোট হয়রানি করা অপারেশন "পরিচালনা করা তো সহজ", কিন্তু সেগুলো শত্রুকে পরাজিত করে না। আল-কায়েদা তাই বলতে শুরু করে 'মানসম্পন্ন অপারেশন'-এর কথা, যেগুলো শত্রুর ওপর সত্যিকার প্রভাব ফেলতে যথেষ্ট হবে। আর সেজন্য "অবশ্যই খুব ভাল মানের প্রস্তুতি আবশ্যক।" তাই উসামা বিন লাদেন শেষে এই উপসংহার টানতেন যে, "আমাদেরকে অবশ্যই যথেষ্ট ধৈর্য্যশীল এবং আল্লাহভীরু হতে হবে, কেননা এগুলোই বিজয়ের চাবিকাঠি।" [285]

অর্থনৈতিক পতন

উসামা বিন লাদেন মনে করতেন – সামরিক নয়, বরং মূলত অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছিল। তিনি লিখেছিলেন, "গর্বাচেভ তাদেরকে ব্যাখ্যা করেছিল যে আফগান যুদ্ধ রাশিয়ার অর্থনীতিতে খড়া এনে দিয়েছে। এমন একটি ব্যয়বহুল যুদ্ধের খরচ তারা আর বহন করতে চায়নি, যেটার সম্ভাব্য কোনো সমাপ্তিই দেখা যাচ্ছিল না।" এছাড়াও তিনি মনে করতেন সোভিয়েতের রেড আর্মি কেবল গোহারাই হেরেছিল, তা-ই নয়। সাথে সোভিয়েতের ওপর আফগান জিহাদের নিয়ে আসা অর্থনৈতিক খড়গ ওদের বস্তুবাদী কমিউনিস্ট আদর্শের ওপরও এক দারুণ আঘাত ছিল। [286] এই ব্যাপারটা আসলেও সত্য ছিল কিনা তার প্রমাণ না থাকলেও এমন বিশ্বাসই উসামা বিন লাদেনের সামরিক কৌশলকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা (গেরিলা যুদ্ধের) এই কৌশলে অটুট থাকবো যতদিন না আমেরিকা আল্লাহর ইচ্ছায় দেউলিয়া হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।" [287]

---

285 Atwan, "Interview with Osama bin Laden", 27 November 1996, and OBL, "Message to our people in Iraq."

286 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction", pp. 79, 86.

287 OBL, "Message to the American people", Al-Jazeera Satellite Television, 30 October 2004.

উসামা বিন লাদেন আরও যোগ করেছেন যে, আফগানিস্তানে আমেরিকা এবং সোভিয়েত আগ্রাসন তাদের নেতাদের একগুঁয়েমির দিক থেকে একইরকম। তিনি ২০০৭ সালে আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে এক বক্তব্যে বলেছিলেন,

"আমি আপনাদেরকে একটি সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর তা হলো – সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল কারণ ছিল তাদের নেতা ব্রেজনেভ। সে ছিল অনর্থক অহংকারী এবং সত্যকে স্বীকার করতে নারাজ। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের প্রথম বছর থেকেই রিপোর্টগুলো ইঙ্গিত দিয়েছিল যে সোভিয়েতরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, কিন্তু ব্রেজনেভ বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যাতে করে পরাজয়ের দায় তার নিজের ওপর গিয়ে না পড়ে। যদিও পরাজয় অস্বীকার করাটা সত্যের কোনো পরিবর্তন করে না, যতক্ষণ না বিজ্ঞ লোকেরা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। বরং এমন অস্বীকার সমস্যাকে আরও তিক্ত করে তোলে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ায়। আজকে আপনারা প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের একগুঁয়েমির মাধ্যমে প্রায় বিশ বছর আগে সোভিয়েতদের অবস্থার সাথে এক আকর্ষণীয় সাদৃশ্য দেখিয়ে চলেছেন।"[288]

ব্যবস্থাপনা

উসামা বিন লাদেন তাঁর পরিবারের কনস্ট্রাকশন ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা প্রথমে আল-মাসাদার যোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করতে কাজে লাগিয়েছিলেন। আর তারপর সেই অভিজ্ঞতা তিনি আল-কায়েদায় নিয়ে আসেন। সৌদি আরবে থাকাকালীন সময়ে উসামা বিন লাদেন সরাসরি মানুষদের সাথে নিয়ে কাজ করেছিলেন ঠিক। কিন্তু পরবর্তীতে (আল-মাসাদার এবং আল-কায়েদার ক্ষেত্রে এসে) তিনি মনস্থির করে নিয়েছিলেন, "আমরা তো আগে সৈন্য ছিলাম না, আমরা ছিলাম সাধারণ নাগরিক।" [289] তাই তিনি তাদেরকে কিছু সামরিক উপাদান মেশানো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালনা করেছিলেন। এই সেটআপের শুধু প্রয়োজন ছিল একজন দক্ষ ম্যানেজারের। সাংবাদিক আহমাদ যায়দান – যিনি বিন লাদেনকে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চিনতেন এবং তাঁর কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন – তিনি লিখেছেন যে, আফগান

---

288 'Message to Americans', Al-Fallujah Islamic Minbar (Internet), 8 Sep 2007.

289 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

যুদ্ধের সময়কালে উসামা বিন লাদেন পুরোদস্তুর একজন ব্যবসায়ীর মতো কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন। যায়দানের ভাষায়, "তিনি ছিলেন খুবই গোছালো ও হিসেবি।" [290]

রসদ

আফগানে একাধারে একজন দানশীল, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন যোদ্ধা হিসেবে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে উসামা বিন লাদেন বুঝতে পেরেছিলেন যে মুজাহিদরা প্রায় সবসময়ই তাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর "চাপের মধ্যে" থাকবে। আর তাই তাদের "নিরবচ্ছিন্নভাবে রসদ প্রয়োজন হবে।" তাঁর ভাষায়, "আপনাকে সঠিক সময়ে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নিশ্চিত করতে হবে। রকেট লঞ্চারের জন্য রকেটও লাগবে। আবার মৃতদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করতে হবে। আল্লাহ তাঁদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।" [291] "জান এবং মাল জিহাদের জন্য দুটো অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান" বিবেচনা করে বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরা আল-কায়েদাকে এমন এক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যেটা কিনা উক্ত দুই উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে পারে। [292] তাও সেটা একইসাথে তাদের নিজেদের জন্য; এবং বিশ্বব্যাপী যেসব ইসলামি জিহাদি আন্দোলনকে তারা সমর্থন করতে চায়, তাদের জন্যও। [293]

---

290 Bergen, The Osama bin Laden I Know, 53.

291 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan"; "Statement by al-Qaeda leader Osama bin Laden in 'First war of the century' program", Al-Jazeera Satellite Television, 27 December 2001.

292 জিহাদের উপকরণ হিসেবে 'জান' এবং 'মাল' এর ব্যাপার কুরআন সুন্নাহ দিয়েই প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, সূরাহ আস-সফের ১১ নং আয়াতের তাফসির দেখা যেতে পারে। তাই এই ব্যাপারটা উসামা বিন লাদেন কিংবা ইসলামপন্থীদের নতুন করে চিন্তা করে উদ্ভাবন করার মতো কিছু ছিল না।

293 আল-কায়েদার বর্তমান (২০১০-১১) আফগান যুদ্ধে লজিস্টিক সরবরাহের ওপর জোর দেওয়া এবং পেশাদারিত্বের বিষয়ে জানতে দেখুন Ahmad Zaydan, "Interview with Mustafa Abu al-Yazid, supervisor general of al-Qaeda in Afghanistan", Al-Jazeera Satellite Television, 8 June 2009. উল্লেখ্য, আল-কায়েদার ক্যারিয়ার ফাইন্যান্সার এবং রসদ সরবরাহকারী আবুল ইয়াজিদকে আফগানিস্তানে আল-কায়েদার একজন কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০০৯-এর জুনের এক সাক্ষাৎকারে আবুল ইয়াজিদ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। সেখানে তিনি কীভাবে আফগানিস্তানে আল-কায়েদার মূল ভূমিকা সামরিক যুদ্ধ থেকে পাল্টে মুজাহিদ দলগুলোকে রসদ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, পুনর্নিয়োগ, গোয়েন্দা-জড়োকরণ এবং মিডিয়া অপারেশনের দিকে পরিবর্তিত হয়েছিল এই ব্যাপারে বিস্তারিত ধারণা দিয়েছিলেন। আবুল ইয়াজিদ ২০১০ সালে আফগানিস্তানে শহীদ হন।

মিডিয়া

সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের শেষের দিকে আইসাম দারাজকে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে তিনি "ইসলামের রাহে মিডিয়া ব্যবহারের গুরুত্বের ব্যাপারে সংশয়হীন।" [294] এছাড়াও পরবর্তীতে তিনি (সোভিয়েত বিরোধী) আফগান জিহাদ নিয়ে সৌদির অফিসিয়াল মিডিয়াগুলোর শক্তিশালী প্রভাবের ব্যাপারেও স্মরণ করতেন। তিনি বলেছিলেন, "আরব রাষ্ট্রগুলোয় সৌদির সব অফিসিয়াল মিডিয়া তাদের দৈনিক পাঁচবারের ব্রডকাস্টে এই টপিক (সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ) ভালই কাভার করতো। মুজাহিদদের আত্নত্যাগ ও বীরত্বগাঁথা অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতো।" [295] উসামা বিন লাদেন মিডিয়াকে স্রেফ আরেকটা অর্থসংগ্রহের মাধ্যমই নয়, বরং সমস্ত বিশ্বের মুসলিমদেরকে জিহাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জানানোর এবং ইসলামের ওপর কোনোপ্রকার আক্রমণ আসা মাত্রই এই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে দেখতে শুরু করেন। ৯/১১-এর আগে মোল্লা উমারের কাছে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "এই ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে, এই শতাব্দীতে মিডিয়া যুদ্ধ হলো (যুদ্ধের) অন্যতম শক্তিশালী কৌশল। এমনকি এটা লড়াইয়ের প্রস্তুতির শতকরা নব্বই ভাগ পর্যন্তও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।" [296]

জিহাদ

উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরা আফগানিস্তান থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, শত্রুর আক্রমণ থেকে ইসলামকে হিফাজত করার একমাত্র অবলম্বন হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। বিন লাদেন জিজ্ঞেস করতেন, "কুমির কি অস্ত্রের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে?" [297] এই ব্যাপারটার কিয়দাংশ তিনি শিখেছিলেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম থেকে, যিনি লিখেছেন, "যারাই (সততার সাথে) আজকের মুসলিমদের অবস্থার দিকে তাকাবে, তারাই উপলব্ধি করবে যে আজকে মুসলিমদের এই করুণ পরিণতি হয়েছে জিহাদকে ত্যাগ

294 Darraz, "Impressions of an Arab journalist in Afghanistan."

295 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction", p. 84.

296 OBL to Mullah Omar, n.d. but before 9/11, AFGP-2002-600321, http://www.ctc.usma.edu.

297 OBL, "Message to the American people."

করার কারণেই।" [298] আর ব্যাপারটার বিরাট অংশই বিন লাদেন শিখেছিলেন বাস্তবতা থেকে – সোভিয়েতদের একদিকে তো কোনোপ্রকার সমঝোতা কিংবা চুক্তিতে কোনো আগ্রহই ছিল না। তার ওপর তারা আফগানিস্তান ছাড়তে চেয়েছিল কেবল বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না বলে, যুদ্ধের কারণে তাদের অর্থনীতির বারোটা বেজে গিয়েছিল বলে। উসামা বিন লাদেন বলতেন, "দখলদার কাফিরদের সাথে কোনোপ্রকার সমঝোতা হতে পারে না।... আর ওদেরকে প্রতিহত করবার জন্য জিহাদ ব্যতীত অন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করার মানে হলো এক দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া।" [299] মস্কোর সৈন্য অপসারণ থেকে আজোবধি (২০১০-২০১১) উসামা বিন লাদেন মুসলিমদেরকে এই ব্যাপারটাই উপলব্ধির তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন যে, মুসলিমদের পরিত্রাণ কেবল একটি পন্থাতেই রয়েছে: জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এমনকি ঐতিহাসিকভাবেও এটাই সত্য, উদাহরণস্বরূপ সালাহউদ্দিনের সময় স্মরণ করা যেতে পারে। [300] তাই ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান কিংবা সৌদি আরব – যেখানেই দখলদার কাফিররা (সামরিক বা রাজনৈতিক) আগ্রাসন চালাচ্ছে, সব জায়গার ঔষধ একটিই। উসামা লিখেন, "ইহুদি-খ্রিস্টানদের থাবায় পড়ে ফিলিস্তিন আর তার জনগণ আজকে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে অপরিমেয় দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। আর এই দুই শত্রুর কেউই কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ফিলিস্তিনকে সমঝোতা কিংবা চুক্তির মাধ্যমে বুঝে নেয়নি, বরং অস্ত্র আর ক্ষমতার জোরেই দখল করেছে। আর তা ফিরিয়ে আনার উপায়ও ঐ একটিই। লোহাকে লোহা দিয়েই কাটতে হবে।" [301]

---

298 Azzam, "Join the caravan."

299 OBL, "Message to the Muslim nation", Islamic Studies and Research Center (Internet), 30 October 2004.

300 OBL, "Message to the Muslim nation", Islamic Studies and Research Center (Internet), 30 October 2004.

301 OBL, "The way of salvation for Palestine", Al-Sahab Media, 21 March 2008.

আল-কায়েদা

খুবই হাস্যকর এবং অবাক করা হলেও একটি প্রশ্ন এখনও বিশ্বব্যাপী মানুষকে বলতে শোনা যায়। সেটা হলো, “আল-কায়েদার কি আসলেও অস্তিত্ব আছে?” আফগানিস্তান এবং ইরাকের ব্যাপারে বের হওয়া যাবতীয় ডকুমেন্ট, সংগঠনটি ত্যাগ করা জামাল আল-ফাদল এবং আবু জান্দালের সাক্ষ্য, উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীদের যাবতীয় কথা ও কাজ এবং তাদের ব্যাপারে মিডিয়ার সব কাভারেজ – এই সবকিছু সামনে রাখলে আল-কায়েদার অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা নিতান্ত মূর্খতা বলেই ধরা দেয়। কিন্তু তবুও ঘুরেফিরেই কিনা এই প্রশ্ন আসে। জেসন বুর্ক (Jason Burke) তার Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror বইয়ে আল-কায়েদার সম্পৃক্ত থাকা সম্ভাব্য প্রায় সবগুলো ঘটনা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে বললে অবশ্যই যেসমস্ত ঘটনার সাথে আল-কায়েদার নাম জড়ানো হয়, তার সবগুলোই আল-কায়েদার কাজ ছিল না। তাই এই ব্যাপারে জেসন ঠিকই বলেছেন বলা যায়। কিন্তু তিনি (প্রবীণ ন্যারেটিভ অনুসরণ করে) আল-কায়েদাকে আবহমানকাল ধরে চলে আসা স্রেফ আরেকটি সাধারণ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন, যা একেবারে ডাহা ভুল।

প্রশ্ন আসতে পারে – আরও কতো অ্যাকাডেমিক আল-কায়েদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছে? ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিসের ধর্মবিষয়ক অধ্যাপক ফ্ল্যাগ মিলার (Flagg Miller) নাকি “বিশ্বের সামনের সারির ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্বের” প্রায় ১৪৫৯ টি অডিওটেপ গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, “২০০১ সালের আগে আল-কায়েদা শব্দটির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দল বা সংগঠন বোঝানোর কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।” [302] সম্পাদক পিটার বার্গেন এই ধরনের কথাকে ‘ফালতু প্রলাপ’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মিলার আবার অগ্নিশর্মা হয়ে পিটারের সম্পাদনার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন যে, “পিটারের অতিমাত্রার সম্পাদনা এই ধরনের বিশ্লেষণধর্মী বইয়ের পথ রুদ্ধ করে দেয়।” [303] মিলারের গলাবাজি আর বেছে বেছে প্রমাণ ব্যবহার করা এটাই প্রমাণ করে যে, উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে অধ্যয়নে সামাজিক বিজ্ঞানের আসলে

302 Flagg Miller, “Al-Qaida as a ‘pragmatic base’: Contributions of area studies to sociolinguistics”, Language and Communications, Vol. 28 (2008), p. 388.

303 Miller, “Al-Qaida as a ‘pragmatic base’ ”

কী (নগণ্য) অবদান ছিল। আর সবশেষে 'ইসলামিজম' বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব জিল কেপল (Gilles Kepel) সাম্প্রতিক সময়ে লিখেছেন, আল-কায়েদা নাকি একটি "কাল্পনিক সংগঠন।" [304]

সত্যিই কি এর অস্তিত্ব আছে? আমার সোজাসাপ্টা উপসংহার হলো, অবশ্যই আল-কায়েদার অস্তিত্ব রয়েছে। এটি উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহযোদ্ধারা গড়েছিলেন এবং আজও এর কার্যক্রম চালু রয়েছে। আর আমি এটাও বিশ্বাস করি যে জেসন বুর্ক, ফ্ল্যাগ মিলার কিংবা জিল কেপলের মতো লোকেরা আল-কায়েদার অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি কারণ তারা পুরোনো ধাঁচের কোনো জঙ্গি সংগঠন খুঁজে ফিরছিল। অথচ আল-কায়েদা মোটেও সেরকম কিছু নয়। এমনকি এই সংগঠনটি স্টিভ কোল এবং লরেন্স রাইটের বর্ণিত "শহীদ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা গোঁড়া ধর্মগোষ্ঠী" কিংবা "মৃত্যু পূজারী" [305] ধরনের কিছুও না।

১৯৮৮-তে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠা করার সময় উসামা বিন লাদেন সহ সংগঠনটির অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী ছিল? প্রথমত, তারা আফগান যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পৃথিবীব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের ধারা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আফগান জিহাদের বহুজাতিক (মুসলিমদের অংশগ্রহণের) ধরনটা ছিল তুলনামূলকভাবে শেষ পর্যায়ে। আল-কায়েদার পথচলা শুরু হয়েছিল রেড আর্মির পরাজয়ের পর এই বহুজাতিক মুসলিমদের মধ্যে জিহাদি চেতনাকে জীবন্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে। প্রথমদিকে এই সংগঠনের কাজ ছিল বিভিন্ন মিডিয়া কার্যক্রম ও ছোট-বড় সামরিক অপারেশনের মাধ্যমে জিহাদে সহায়তা করা এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে সমমনা মুসলিমদেরকে প্রয়োজনীয় সমর্থন-সহযোগিতা দেওয়া। সর্বোপরি, আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল এমন এক 'ঘাঁটি' বা 'base' হওয়া, যেখান থেকে গোটা উম্মাহর মধ্যকার ইসলামি আন্দোলন সহ সম্ভাবনাময় অনুগতদেরকে সংগঠিত করা হবে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, অর্থায়ন করা হবে এবং সাধারণভাবে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হবে। উসামা বিন লাদেন নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন যে, আল-কায়েদা গড়া হয়েছিল মানুষের মধ্যে জিহাদকে "আল্লাহর ইবাদাতের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে।" [306] তিনি জোর দিয়ে বলতেন, এটা সমস্ত মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত একটি সংগঠন, শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু সাথে তিনি এটাও মানতেন যে, বর্তমান বিশ্বে এই

304 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

305 Coll, The Bin Ladens, p. 96, and Wright, The Looming Tower, p. 107.

306 "Exclusive Interview with Usama bin Ladin", Ummat, 28 September 2001, pp. 1, 7.

ব্যাপারটা করার চেয়ে বলা সহজ। তাঁর ভাষায়, মানুষ আজকাল ইসলামকে "সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করলেও বাস্তবে উম্মাহর বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অনেক বেশি।"[307] তাই তিনি খুবই তাগিদ দিয়ে বলতেন যে, এমন পার্থক্যগুলো অবশ্যই অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক হতে হবে কারণ "আল্লাহর চোখে গোত্র বর্ণ নির্বেশেষে সব মানুষই সমান। তিনি মানুষের মূল্যায়ন করেন তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এবং সৎ কাজের ভিত্তিতে।"[308] উসামা বিন লাদেন ঘোষণা করেছিলেন, "আল-কায়েদায় বর্ণ বা গোত্রের ভিত্তিতে কোনোরকম বৈষম্যের জায়গা নেই। আমরা একে অপরের সাথে তাকওয়া এবং আমলদারিতার ভিত্তিতে আচরণ করি... কারণ আমরা এক উম্মাহ, আমাদের কিবলাও একটিই।"[309]

এইসমস্ত লক্ষ্য পূরণে বিন লাদেন আল-কায়েদাকে গড়েছিলেন আফগানে তাঁর চিরচেনা সশস্ত্র দলগুলোর আদলেই। তৎকালীন বিশ্বের সব ইসলামি দলের মধ্যে আফগানের বাহিনীগুলোই ছিল সামরিকভাবে সবচেয়ে উন্নত। আর এগুলোর মধ্যে ছিল ইউনুস খালিসের হিযবে ইসলামি, জালালউদ্দিন হাক্কানির সশস্ত্র সংগঠন, আবদুর রাসুল সাইয়্যাফের ইসলামিক ইউনিয়ন এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামি। পশ্চিমা বিশ্লেষণগুলোয় যে একটি মূল পয়েন্ট সর্বদাই হারিয়ে যায়, সেটি হলো উসামা বিন লাদেন কিংবা তাঁর সহকর্মীদের কারও উদ্দেশ্যই কিন্তু 'একটি জঙ্গি বাহিনী গঠন করা' ছিল না। বরং তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন প্রস্তুত করা, যারা সবসময়ই নিজেদের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর আঘাত সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে।

আল-কায়েদা কি একটি বিদ্রোহী সংগঠন নাকি এক জঙ্গি বাহিনী? এখানে এই দুইটি আলাদা বিশেষণ স্রেফ ভিন্ন শব্দের খেল নয়, বরং এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে।

---

307 Kiyohito Kokita and Yuji Moronaga, "Terrorist asks writer to compile a biography—Testimony of Pakistanis who have met with bin Ladin", AERA, 8 October 2001, pp. 18–20.

308 "Statement by Usama bin Ladin", Al-Jazeera Satellite Television, 10 September 2003, and Muhammad al-Shafi'i, "New message from Bin Ladin ...", Al-Sharq al-Awsat (Internet version), 19 January 2003.

309 Abu Shiraz, "Interview with Usama bin Laden", Pakistan, 20 February 1999, p. 10; "Bin Laden to the scholars of Deoband", 27 March 2002, http://ctc.usma.edu, AFGP-2002-901188; and Atwan, "Interview with Usama bin Ladin", 27 November 1996.

একদিকে জঙ্গি সংগঠন হয় খুবই ক্ষুদ্র; খুবই গোপন; এদের লক্ষ্য থাকে প্রচারণা, বিজয় না; এরা কিছুটা ক্ষতিকর হয় ঠিক, কিন্তু একেবারে জাতীয় পর্যায়ের হুমকি হয় না; আর খানিক সামরিক মনোযোগ দিলেই এরা উবে যায়। অন্যদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন হয় তুলনায় অনেক বড়; তারা গোপনীয়তা আর মিডিয়া প্রপাগান্ডার একটি ভারসাম্য বজায় রাখে; তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে চূড়ান্ত বিজয়, এমনকি তাদের বিজয়ের সংজ্ঞাও থাকে সুনির্দিষ্ট; তারা জাতিরাষ্ট্রের জন্য সত্যিকারের হুমকিস্বরূপ হয় এবং তারা নিজেদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এতই দৃঢ় ও মনোযোগী হয় যে, না তারা সময়ের ব্যবধানে ক্ষয়ে যায়, না কিছু সামরিক সংঘর্ষেই তাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যায়। এর ওপর উসামা বিন লাদেন তাঁর এই সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। সেটা হলো – ইতিহাসের অধিকাংশ সংগ্রামকেই যেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট জমিনে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়, সেখানে আল-কায়েদা প্রথম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এক সশস্ত্র সংগ্রামের নাম।

সূচনালগ্নে সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদার মৌলিক চারটি উপাদান ছিল -

প্রথমটি হলো সামরিক উপাদান। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল একাকী কিংবা ছোট ছোট দল আকারে নিজ সৈন্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ-উপদেশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; যাতে কাশ্মির, তাজিকিস্তান, মিন্দানাও (এবং পরবর্তীতে চেচনিয়া) সহ যেসব অঞ্চলে ইসলামপন্থীরা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সেসব জায়গায় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা যায়। সামরিক উপাদানের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল আফগানিস্তানের ক্যাম্পগুলোয় অনাফগান মুসলিমদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক সরবরাহ করে যাওয়া। মজার ব্যাপার হলো, সংগঠনটি তখনও তার সৈন্যদেরকে নিজেদের প্রধান প্রধান টার্গেট তথা আমেরিকা, ইসরাঈল কিংবা আরব শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামিয়ে দেয়নি। ১৯৮৮-৮৯ সময়টায় আল-কায়েদা নিজের জন্য আলাদা করে যুদ্ধ চায়নি।

আল-কায়েদার দ্বিতীয় সাংগাঠনিক উপাদান ছিল অর্থসংগ্রহ, বাজেট নির্ধারণ ও বন্টন থেকে শুরু করে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যকলাপ। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও হিসেব নিকেশ রাখা, প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ বজায় রাখা ইত্যাদিও ছিল এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে যখন আল-কায়েদা অপারেশন শুরু

করে, সেই সময়ে আল-কায়েদার ১৫ জন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ৯ জনই নাকি ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (administrative specialist)।[310]

তৃতীয় উপাদানটি ছিল ধর্মীয় কার্যক্রম: কোনো ফাতওয়া দেওয়া, সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রশিক্ষণের (দারসের) ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আর চতুর্থ উপাদানটি ছিল মিডিয়া উইং। এটা গড়া হয়েছিল MK-এর মিডিয়া শাখার আদলে।

আর এই সবগুলো উপাদানের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি করা হতো একটি শুরা পরিষদের মাধ্যমে, যার প্রধান ছিলেন উসামা বিন লাদেন। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয় যে আল-কায়েদা তার নিজস্ব সামরিক অভিযান শুরু করবে। তাঁদের প্রথম অপারেশনটা ছিল ১৯৯২-এ ইয়েমেনের আদেনে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর ওপর হামলা। সেসময় আরও উচ্চ পর্যায়ের একটি সামরিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল আল-কায়েদার অপারেশনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সহায়তা প্রদান করা। সাংবাদিক খালিদ আল-হাম্মাদির কাছে আবু জান্দালের দেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে, "সেই কমিটির আরও দায়িত্ব ছিল প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ, পরিকল্পনা তৈরি করা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন ভূমির অপারেশনগুলো পরিচালনা করতেন স্ব স্ব ভূমির ব্যাপারে দক্ষ কমান্ডাররা।"[311]

সেই ১৯৮৮ থেকেই আল-কায়েদার অপারেশনের পন্থা মোটামোটি এক রকমই ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এর সামরিক উপাদানের কাজ মুসলিম বিশ্বের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠনগুলোকে স্রেফ উস্কে দেওয়া ছিল না, বরং এর কাজ ছিল তাদেরকে যথাসম্ভব হাতে-কলমে সাহায্য করা। মুসলিমদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা তো আল-কায়েদার প্রধানতম কাজ ঠিক আছে, কিন্তু এর সামরিক কাজ ছিল সশস্ত্র ইসলামি সংগঠনগুলোকে অর্থায়ন করা, উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সর্বোপরি দিকনির্দেশনা দেওয়া।

---

310 Tawil, Brothers in Arms, p. 29.

311 "Abu Jandal, Former Personal Bodyguard of Usama Bin Ladin and Leading al-Qaida Element in Yemen Reveals to Al-Quda Al-Arabi ... ", Al-Quds al-Arabi, 3 August 2004, p. 4.

সোভিয়েত বিরোধী জিহাদে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে, আফগানিস্তানে সামরিক কিংবা ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য আরবরা উঠে আসার সম্ভাবনাকে আফগানরা শুরুর দিকে ভালই নেতিবাচকভাবে নিয়েছিল। এই থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্বে স্ব স্ব অঞ্চলের মুসলিমদেরই রাখা হবে। এই নিয়মের পাশাপাশি এমন পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল যে, প্রয়োজন হলে আল-কায়েদার নিজস্ব যোদ্ধাদেরকে সেইসব অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতার জন্য পাঠানো হবে। এই ব্যাপারটা আল-কায়েদা অনেক সময় নিয়ে রপ্ত করেছিল। কিন্তু শেষমেশ যে আল-কায়েদা নেতৃত্ব ব্যাপারটা আসলেও রপ্ত করেছিলেন, সেটা আজকের আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সৌদি আরব, উত্তর ককেশাস, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, ফিলিস্তিন এবং সোমালিয়ার দিকে তাকালেই স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এই সবগুলো জায়গাতেই আল-কায়েদার অধীনস্থ ইসলামি সশস্ত্র বাহিনীগুলো স্থানীয় যোদ্ধা দিয়ে পূর্ণ। আর সেগুলো স্থানীয় নেতৃত্বের অধীনেই পরিচালিত হয়।

এই নিয়মের অন্যতম ব্যতিক্রম ছিল আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির অধীনে ইরাকের দায়িত্ব দেওয়া। পরবর্তীতে আলোচনা আসবে যে, কীভাবে যারকাউয়ির কিছু কার্যক্রম ৯/১১-এর পর প্রথমবারের মতো আল-কায়েদাকে রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিয়েছিল। আর আল-কায়েদা যে সেই ঘটনা থেকেও দারুণ শিক্ষা নিয়েছিল, তা যারকাউয়ির পরপরই তাঁর স্থানে আসা আবু হামযা আল-মুহাজিরের নিভৃত, আনুগত্যশীল এবং অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী কার্যকলাপ থেকে সহজেই আঁচ করা যায়।

উসামা বিন লাদেন যে আল-কায়েদাকে প্রাথমিকভাবে আফগানের সশস্ত্র দলগুলোর আদলেই সাজিয়েছিলেন, সেটা তাঁর ব্যাপারে অহরহ সেঁটে দেওয়া একটি অপবাদের নিরসন করে দেয়। আর সেটা হলো – তিনি নাকি দাবি করতেন 'তাঁর যোদ্ধারাই' সোভিয়েতদের রেড আর্মিকে পরাজিত করেছে। উসামা বিন লাদেনের সম্পর্কে কলম ধরা বেশিরভাগ লেখকই তাঁর ব্যাপারে এই অপবাদ দিয়ে থাকেন। আসলে এইসব লেখকরা এইসমস্ত বলে কয়ে উসামা বিন লাদেনকে একজন উড়ো কথার দাম্ভিক, কল্পনাবিলাসী হিসেবে চিত্রায়ন করতে চায়। যদি তিনি সত্যিই এমন কোনো দাবি করে থাকতেন, তাহলে আমিও তাঁর ব্যাপারে একই ধরনের কথাই বলতাম – কিন্তু তিনি কখনোই এমন দাবি করেননি। সোভিয়েতরা পরাজিত হওয়ার এত বছর পরে এসেও (২০১০-২০১১) উসামা বিন লাদেন মুজাহিদদের বিজয়ে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দেন আল্লাহকে, এরপর দেন আফগানদেরকে। আর যখনই তিনি আফগান যুদ্ধের প্রসঙ্গে 'আমরা' শব্দটা বলেছেন, প্রতিবারই সেটা সেখানকার সব 'মুসলিমদেরকে' বোঝাতেই বলেছেন।

উসামা বিন লাদেন এমনটা বলেন মূলত দুইটি কারণে। প্রথমত, কারণ এটিই সত্য; আফগানরাই মূলত রেড আর্মিকে তাড়িয়েছিল। আর কেউ এই ব্যাপারটার সাথে সাংঘর্ষিক কথাবার্তা বললে তো আফগানরাই সর্বপ্রথম বিরোধিতা করতো। আর আমার জ্ঞানে এখনও পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য আফগানদের কেউই এই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেনি। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতদের অনেকেই সেটা করে ফেলেছে। আর দ্বিতীয়ত, উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানকে দেখেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের পুনর্জাগরণের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে। এছাড়া আফগানরা যে নিজেদের বীরত্বগাঁথায় আরবরা সহ অন্যান্য অনাফগানদেরকে সাধ্যানুযায়ী অবদান রাখার সুযোগ করে দিয়েছিল, সেজন্য উসামা বিন লাদেন তাঁদের প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁকে এবং অন্যসব মুসলিমদেরকে আফগানদের যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে তাদের আফগানদেরকে ঢের বেশি প্রয়োজন। তিনি লিখেছিলেন,

"আফগান মুসলিমরা কেবল নিজেদের দেশই উদ্ধার করেনি, বরং পবিত্র ভূমিগুলো সহ আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর মুসলিমদেরও উদ্ধার করেছে (ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ এনে দিয়েছে)। রাশিয়ার আক্রমণের পর বিশ্বের মুসলিমরা যখন আফগানদের দিকে তাকালো, তখন তারা আফগানদেরকে দারুণ ঈমানদীপ্ত এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত দেখতে পেল। অথচ আফগানদের কাছে সম্বল হিসেবে সর্বসাকুল্যে আদিকালের কিছু রাইফেল ছিল, যেগুলো তাদের দাদা-পরদাদারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতো। এমনকি আফগানরা ওইসব রাইফেলের গোলাবারুদ কিনতে নিজেদের ভেড়াগুলোও বিক্রি করে দিয়েছিল... এইসমস্ত কারণেই, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ নেতৃত্বকে জিহাদের পতাকা উত্তোলনের তাওফিক দিয়ে দিলেন... আফগানরা সাম্প্রতিক সময়ে কুফরের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর আসা সবচেয়ে বড় ধরনের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল...

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁদেরকে তিনি সর্বোত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন... আল্লাহ তাআলার রহমতে আফগানিস্তানের বান্দারা এগিয়ে না এলে, আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোও হয়তো পর্যায়ক্রমে কমিউনিজমে আক্রান্ত হয়ে যেত।" [312]

---

312 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction", pp. 80–84.

বিজয় নিশ্চিতকরণ

জালালাবাদের পর উসামা বিন লাদেন আফগান মুজাহিদ দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মনোযোগী হন, যাতে করে বিজয় নিশ্চিত করা যায়। তিনি নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে মুজাহিদদের সাতটি প্রধান দলকে এমন এক ঐক্যজোটে আনার চেষ্টা করতে থাকেন, যেটা সম্ভব হলে আফগান কমিউনিস্টদেরকে পরাজিত করা যাবে, দেশব্যাপী রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং এক পর্যায়ে দেশ পরিচালনা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত দেখবো যে, এই ঐক্য অর্জনের প্রচেষ্টা ছিল এক নিদারুণ কষ্টের যাত্রা। কেননা, একদিকে তো যুদ্ধকালীন সময় থেকেই দলগুলোর মধ্যে একে অপরের প্রতি অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তার ওপর আবার আফগানের মূল ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সৌদি আরব এবং পাকিস্তান উভয়েরই আলাদা পছন্দ ছিল যথাক্রমে – সাইয়্যাফ এবং হেকমতিয়ার। প্রিন্স তুর্কি তথা রিয়াদ প্রশাসন বিশেষভাবে নিশ্চিত করতে চাইছিল যেন আহমাদ শাহ মাসউদ যতটা সম্ভব কম ক্ষমতা পায়। কেননা তারা ভয় করছিল, সে হয়তো পরবর্তীতে ইরানি শিয়াদের সাথে কাজ করবে আর আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়াতে ইরানের প্রভাববলয় তৈরি করে দিবে।

১৯৯১ সালের আগ পর্যন্ত উসামা বিন লাদেন এই সমস্ত দর কষাকষিতে কমবেশি উপস্থিত থাকতেন। এই ব্যাপারটায় তাঁর এত উৎসাহ ছিল কিশোর বয়সের সেই ধারণার কারণে – ইসলামের শত্রুদেরকে হারাতে হলে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।[313] কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরে বিন লাদেন আবিষ্কার করেন যে, এইসব ভিন্ন মতালম্বীদেরকে ‘ঐক্যবদ্ধ’ করার চেয়ে পরাশক্তি রাশিয়ার পতনই বরং আরও সহজসাধ্য ছিল।

313 OBL, “The way to foil plots”, Al-Sahab Media, 29 December 2007.

এক বিশ্বময় জিহাদের পথে

১৯৮৯ সালের মধ্যে আফগান জিহাদে উসামা বিন লাদেনের অভিজ্ঞতা কৈশোর থেকেই তাঁর মধ্যে থাকা 'সালাফি জিহাদি' মানসিকতাকে আরও দৃঢ় করে তোলে। আর তাঁর শত্রুদের কাছে তাঁকে এক অদ্বিতীয় প্রতিপক্ষে পরিণত করে। পরবর্তী প্রায় সাত বছর তিনি ইসলামের বিভিন্ন প্রকার শত্রুদের প্রয়োজনীয় শ্রেণিকরণ করেন।[314] উসামার মধ্যকার পরিবর্তন তাঁর মায়ের চোখে পড়েছিল। যখন তিনি প্রথমবার আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, আলিয়া সে সম্পর্কে লিখেছিলেন, "দুঃস্বপ্নের সূচনা।"[315] এমনকি পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরাও আলিয়ার মধ্যে নিজ ছেলের জন্য বেড়ে ওঠা ভয় ও শঙ্কা খেয়াল করেছিলেন। ২০০১ সালে আলিয়ার বোন লাইলা ঘানেম সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করেছিলেন এভাবে, "উসামার অভিযাত্রার প্রথমদিকে মা হিসেবে আলিয়া খুবই চিন্তিত ছিল। কিন্তু যখন সে ছেলের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়, তখন বলেছিল, 'আল্লাহ ওকে রক্ষা করুন।' "[316]

সোভিয়েত বিরোধী জিহাদ উসামা বিন লাদেনের কাছে কেমন অর্থবহ ছিল, আর সেটা সমস্ত মুসলিমদের কাছে কেমন অর্থবহ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন, সেই ব্যাপারে তিনি নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে উসামা বিন লাদেন বলেন,

> *"এমন একটি নিআমতের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। এটা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার নিআমত – ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ – এই যুগের মুসলিমরা যে দ্বীনি দায়িত্বের ব্যাপারে রীতিমতো ভুলে গিয়েছে। তাই এটা আল্লাহর অশেষ নিআমত যে এত বছরের গাফেলতির পর, ইসলামের পবিত্র ভূমিগুলো দখল হয়ে যাবার পর, মুসলিম নারীদেরকে বন্দি, মুসলিমদের ভূমি ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর হলেও আমরা শেষমেশ জিহাদে ফিরে যাচ্ছি। যেভাবে আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, আজকে আল্লাহর রহমতে সেভাবেই পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে। আল্লাহ*

---

314 অর্থাৎ দ্বীনের অভ্যন্তরীণ শত্রু, বাইরের শত্রু, মূল শত্রু – যাদেরকে সরাসরি প্রতিহত করতে হবে, গৌণ শত্রু – যাদের সাথে আপাতত সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে হবে ইত্যাদি শ্রেণিকরণ করেন।

315 Khalid al-Batarfi, "Osama is very sweet, very kind, very considerate."

316 Michael Slackman, "Bin Laden's mother tried to stop him, Syrian kin say."

তাআলা আমাদের মাঝে জিহাদকে ফিরিয়ে দিয়ে এত বছর ধরে তাঁর দ্বীনের প্রতি অবহেলার গুনাহ মোচনের সুযোগ করে দিলেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ সা. আর তাঁর সাহাবাদের মতোই আফগানিস্তানে জিহাদ করার তাওফিক দিলেন... পূর্ব কিংবা পশ্চিম – আমি আমার সমস্ত মুসলিম ভাইদেরকে আহ্বান করছি যেন তারা এখনই পদক্ষেপ নেন, তারা যেন যা কিছুতে ব্যস্ত হয়ে আছেন, সেসব ফেলে রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে এসে শরিক হন। এই পতাকা শ্রেষ্ঠ পতাকা। আর মুজাহিদরা হলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ...

আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আপনাদের ইবাদাতগুলো কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন মুমিনদের প্রতি আমাদের এই আহ্বানকে, যাতে করে তারা নিজেদের প্রতি সত্যবাদী হতে পারে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে এসে শরিক হতে পারে।" [317]

এই অল্প কিছু বাক্যেই উসামা বিন লাদেন এমন কয়েকটি বিষয়ের মূলভাব চিত্রায়ন করেছেন, যেগুলো পরবর্তীতে তাঁর চিন্তা ও কাজের প্রতিফলন ঘটায়। প্রথমত, তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে মুসলিমদের দুরাবস্থার দায় মুসলিমদেরই যারা কিনা "(জিহাদের) দ্বীনি দায়িত্বের ব্যাপারে রীতিমতো ভুলে গিয়েছে।" হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সোভিয়েতরা, ইহুদিরা, ইহুদি-রাষ্ট্রবাদীরা (জায়নিস্ট), পশ্চিমা খ্রিস্টানরা এবং আরব জালিমরা নিজ নিজ ঔপনিবেশিক কৌশল, সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক অবক্ষয় কিংবা পুতুল সরকারের মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু সেটা তারা করতে পেরেছে কেবল মুসলিমরা তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমল না করবার কারণে – জিহাদের মাধ্যমে উম্মাহকে প্রতিরক্ষা না করবার কারণে। বার্নার্ড লুইস বা তার মতো অন্যান্যরা যারা বলে বেড়ায় যে মুসলিমরা তাদের আজকের পরিণতির জন্য অন্যদেরকে দোষারোপ করে, উসামা বিন লাদেন কিন্তু মোটেও সেরকম ছিলেন না। বরং প্রথম থেকেই তাঁর বার্তা ছিল, "আল্লাহ তাঁদেরকেই সাহায্য করেন, যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে।" মুসলিমদের পরাজয়ের মানসিকতার ব্যাপারে বলার সময় বারবার তিনি এই ব্যাখ্যাতেই ফিরে যেতেন।

---

317 "The Arab Ansar in Afghanistan.

দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের পবিত্র ভূমি সহ যেসমস্ত অঞ্চল ইসলামের শত্রুরা দখল করে নিয়েছে, সেগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি জিহাদকে 'সমস্ত মুসলিমদের জন্য আবশ্যক ধর্মীয় দায়িত্ব' (ফারজে আইন) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উসামা বিন লাদেন কিন্তু মুসলিমদেরকে আক্রমণাত্নক (ইকদামি) জিহাদ করে ইসলামের জমিন বাড়ানোর জন্য ডাকছেন না। বরং তিনি যেসমস্ত ভূমি একসময় ইসলামের অধীনে ছিল, সেগুলোই পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ডাকছেন। মুসলিমদের জমিন এবং সম্মান যারা ভূলুণ্ঠিত করেছে, তাদেরকে সমান সমান প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার দিকে তিনি ডাকছেন।

তৃতীয়ত, যদিও সাধারণভাবে এটা দ্বিতীয় বিষয়টিরই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য – ফিলিস্তিন মুক্ত করা। যদিও উপরোক্ত কথায় তিনি একেবারে নাম ধরে ফিলিস্তিনের কথা বলেননি, কিন্তু এখানে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি 'ইসলামের পবিত্র ভূমি' বলতে মুসলিমদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জেরুজালেমকেই বুঝিয়েছেন। কেননা ১৯৮৮ সালে এই বক্তব্য দেওয়ার সময় মুসলিমদের তিনটি পবিত্র ভূমির মধ্যে একমাত্র জেরুজালেমই কাফিরদের দ্বারা দখলকৃত হিসেবে গণ্য হতো। (মক্কা মদিনার কথা বোঝানো হয়নি) কারণ ১৯৯০-এর আগস্টের আগে আমেরিকা সৌদি আরবে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেনি। প্রথম অধায়্যেই উল্লেখ করা হয়েছিল – সত্তরের দশকে ফিলিস্তিন এবং আল-আকসার চিন্তা তরুণ উসামার মনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে ছিল। আর এইসমস্ত ব্যাপার তাদের বিরুদ্ধেও প্রমাণ, যারা বলে বেড়ায় – উসামা বিন লাদেন নাকি ফিলিস্তিনের ব্যাপারে চিন্তিত হয়েছেন ৯/১১-এর পরে।

এবং চূড়ান্তভাবে, এই বক্তব্যের যে ব্যাপারটা পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেনের চিন্তা এবং প্রকাশ্য বক্তব্যগুলোয় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে, সেটা হলো ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বৈশ্বিক প্রকৃতি (global nature)। তাই যখন তিনি বললেন, "পূর্ব কিংবা পশ্চিম – আমি আমার সমস্ত মুসলিম ভাইদেরকে আহ্বান করছি" এর মাধ্যমে তিনি এটাই বোঝালেন যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিমদের বৈচিত্র্যের সাথে পরিপূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন; বিশেষ করে রেড আর্মির বিরুদ্ধে জিহাদে বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে আসা মুজাহিদদের সাথে কাজ করে। এভাবেই 'আল্লাহর শত্রুদেরকে' চূড়ান্তভাবে হারাবার জন্য এক বিশ্বময় চিন্তা লালন করে তিনি আফগানিস্তান ছেড়েছিলেন। তিনি এমন এক ময়দানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, যা নিজেই প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বময় বিস্তৃত। আর তাই বৈশ্বিক জিহাদ শুরু করার প্রয়োজনীয় উপাদানও তাঁর হাতের নাগালে চলে আসে।

যাযাবর, ১৯৮৯-১৯৯৬

জালালাবাদ থেকে সৌদি আরবে ফিরে উসামা বিন লাদেন আবিষ্কার করলেন যে, তিনি ভালই পরিচিত হয়ে উঠেছেন। নাজওয়া তাঁর স্বামীর ব্যাপারে লিখেছিলেন, "সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, ধনী বিন লাদেনদের এক সন্তান কিনা সত্যিই ময়দানে গিয়ে আহত এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছে।" ফিরে আসা এই নায়কের তখন বেশ চাহিদা – কেউ বক্তব্যের জন্য ডাকছে, তো কেউ ইন্টারভিউ নিতে চাইছে। [318] কিন্তু এই নতুন সেলিব্রেটি পরিচয় তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে বা তিনি এইসব ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন – এমন কোনোই প্রমাণ নেই।

সৌদিতে ফিরে এসে তিনি পুনরায় বিন লাদেন কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। সেসময় তিনি তায়িফ এবং আভা সহ সৌদি আরবের পূর্বদিকের অঞ্চলে রাস্তা, সুড়ঙ্গ, বিল্ডিং ইত্যাদি নির্মাণে মনোযোগী হন। [319] এই সময়টায় উসামা বিন লাদেন স্রেফ নির্মাণ শ্রমিকদের পরিচালকই ছিলেন না। এসময় তিনি সৌদি কর্মকর্তা আর কোম্পানির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলাতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন। এছাড়াও সৌদি রাজ্যের বিভিন্ন প্রজেক্টে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে প্রয়োজনে ইংরেজিতে (তাও ভাল মানের) কথা বলেও সমন্বয় করে নিতেন। [320]

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতরা চলে যাওয়ার পর আফগানদের মধ্যকার একতা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় উসামা বিন লাদেনকে প্রিন্স তুর্কি একেবারেই সাহায্য করেনি। একারণে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেও নাজওয়ার ভাষায় তিনি "তখনও সৌদির প্রতি, সৌদিরাজের প্রতি একজন আনুগত্যশীল হিসেবেই ছিলেন।" এমনকি উসামা বিন লাদেন নিজেই পরবর্তীতে বলেছিলেন, "এই (সৌদি) প্রশাসন ইসলামের পতাকাতলে যাত্রা শুরু করেছিল। আর সেই পতাকা সামনে রাখার কারণেই সেখানকার সাধারণ মানুষ সৌদি পরিবারকে ক্ষমতা গ্রহণে সাহায্য করেছিল।" [321]

---

318 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 33, and Yusufzai, "Osama bin Laden: Al-Qaeda", p. 22.

319 Fisk, "On finding Osama."

320 Randall, Osama, p. 64.

321 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 82, and Robert Fisk, "Interview with Saudi dissident Usama bin Ladin", Independent, 10 July 1996, p. 14.

যাই হোক, উসামা বিন লাদেনের মতো একজন অনুগত সৌদি সালাফি যুবকের জন্য দেশে ফিরে আসাটা সব মিলিয়ে এক এলোমেলো মিশ্র অভিজ্ঞতাই ছিল। আফগানিস্তানে নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় একই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে যখন দক্ষিণ ইয়েমেনের আরেক মার্কসবাদী রেজিমকে উৎখাত করতে ইয়েমেনিদেরকে সাহায্য করতে গেলেন, তখন পুরোই উল্টো এক চিত্রের মুখোমুখি হলেন। আফগান যুদ্ধের ব্যাপারে যেসব সৌদি কর্মকর্তা এমনকি আলিমরাও তাঁর প্রশংসায় ভেসে গিয়েছিল, এবার তারাই কিনা তাঁর ঘোরতর বিরোধিতা শুরু করে দিলো।[322]

১৯৯১ সালে তারিক আল-ফাদলি এবং জামাল আল-হাদি নামের দুইজন আফগান-যুদ্ধ ফেরত ইয়েমেনির সাথে উসামা বিন লাদেন একত্রে কাজ করেছিলেন। তিনি ইয়েমেনে মুজাহিদদের দুইটি প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেছিলেন – একটি ছিল উত্তর ইয়েমেনের পর্বতাঞ্চলে সদাহ শহরের নিকটে, অপরটি ছিল দক্ষিণ ইয়েমেনের আবিয়ান প্রদেশে।[323] এসময়টায় উসামা বিন লাদেন নিজে ইয়েমেনে বেশ কয়েকবার ভ্রমণও করেছিলেন – বিশেষ করে সানা, আবিয়ান এবং শাবওয়াহতে। সেখানে তিনি মুসলিমদেরকে ইয়েমেনের সোশ্যালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে নানা বক্তব্য রাখতেন।[324] পরবর্তীতে উসামা বলেছিলেন যে সৌদি কর্মকর্তারা তাঁকে সেসব কার্যক্রম বন্ধ করতে বলেছিল কিন্তু "আমরা সোশ্যালিস্ট পার্টির নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে সেখানকার মুজাহিদদেরকে 'সহায়তা' অব্যাহত রেখেছিলাম।"[325] এখানে 'সহায়তা' শব্দটা (ছিল হিকমাহ) তিনি শ্রুতিমধুর হওয়ার জনই ব্যবহার করেছিলেন। কেননা এই সহায়তা আসলে ছিল ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪-এর মধ্যে ইয়েমেনের বেশ কয়েকজন সোশ্যালিস্ট নেতাদেরকে পরপর গুপ্তহত্যা।[326]

---

322 Coll, Ghost Wars, p. 221; al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 8", p. 17.

323 Bergen, Holy War, Inc., pp. 172–173.

324 Bergen, Holy War, Inc., pp. 172–173; তারিক আল-ফাদলি স্টিভ কোলকে বলেছিলেন যে, ইয়েমেনে ইসলামি আন্দোলনের মূল ব্যক্তিত্বই ছিলেন উসামা বিন লাদেন। ফাদলির ভাষায়, "তিনিই সবকিছুর অর্থায়ন করেছিলেন" দেখুন Steve Coll, The Bin Ladens, p. 374.

325 Atwan, "Interview with Usama bin Ladin", 27 November 1996.

326 Scheuer, Through Our Enemies' Eyes, p. 122.

এদিকে সৌদিতে, উসামা বিন লাদেন সেখানকার শান্তিপূর্ণ ইসলামি সংস্কার (সাহওয়া) আন্দোলনের আলিম এবং সমর্থকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলেন। সেই আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল মূলত প্রশাসনের যাবতীয় দুর্নীতির অবসান করে সৌদিকে পরিপূর্ণ ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। একেবারে স্পষ্ট করে বললে উসামা বিন লাদেন শাইখ সালমান আল-আওদাহ এবং সফর-আল-হাওয়ালির সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন।

১৯৯১-এর মে মাসে সাহওয়ার নেতৃত্ব থেকে কিং ফাহাদের কাছে একটি 'দাবিদাওয়ার ঘোষণাপত্র' (Declaration of Demands) পাঠানো হয়। এরপর ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বরে তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি বিন বাযের কাছে পাঠানো হয় 'উপদেশের স্মারকলিপি' (Memorandum of Advice)। কিন্তু উভয় প্রাপকের কেউই সেই চিঠিগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে নেয়নি, বরং উভয়ের কাছ থেকেই সেগুলোর কঠোর জবাবের ফলে সৌদির মধ্যকার ধর্মীয় দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়।[327] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে সৌদি সরকার সাহওয়ার আলিমদের ওপর চড়াও হয়। সালমান আল-আওদাহ এবং সফর আল-হাওয়ালি সহ আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। নির্মম ব্যাপারটা ছিল, সৌদি সরকারের এমন ধরপাকড় মামলা-হামলা সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শরিক অনেককেই একেবারে চুপ করিয়ে দেয়। ফলে সেই আন্দোলনে যে শুন্যস্থান তৈরি হয়, তা পূরণ হতে থাকে তুলনামূলক কঠোর পন্থা অবলম্বনকারীদের দ্বারা।[328] উসামা বিন লাদেন যখন এই আন্দোলনের জন্য আরও বেশি স্পষ্ট এবং কঠোর সমালোচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন, তখনও তিনি সালমান আল-আওদাহ, সফর আল-হাওয়ালি আর তাদের সহকর্মীদেরকেই আন্দোলনের পুরো কৃতিত্ব দিতেন। সেইসাথে এটাও স্পষ্ট রাখতেন যে, তিনি এই ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন কেবল তাঁদেরকে আটকে রাখার কারণেই।[329]

---

327 R. Hrair Dekmejian, "The Rise of Political Islam in Saudi Arabia", Middle East Journal, Vol. 48, No. 4 (Autumn 1994), pp. 633–635.

328 Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi movement."

329 সালমান আল-আওদাহ এবং সফর আল-হাওয়ালির প্রতি উসামা বিন লাদেনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী থাকে। উদাহরণস্বরূপ, Advice and Reform Committee Communiques (ARC) কর্তৃক প্রকাশিত ওয়েস্ট পয়েন্টের নির্বাচিত বিবৃতিতে দশটি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে উসামা বিন লাদেন এই দুই আলিমকে সৌদি জাগরণের নেতা এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। দেখুন – Advice and Reform Committee Communiques, http://ctc.usma.edu, AFGP-2002–003345.

পরবর্তীতে (১৯৯৯ সালে) যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন থেকে সফর আল-হাওয়ালি সব ব্যাপারেই অনেকটা নীরবতা অবলম্বন করতে শুরু করেন। অবশ্য ৯/১১-এর পর এই হামলাকে বৈধ বলে তিনি একটি ফাতওয়া দিয়েছিলেন।[330] কিন্তু সালমান আল-আওদাহ পর্যায়ক্রমে নিজের অবস্থান প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এভাবে তিনি অধ্যাপনা এবং মিডিয়া সহ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ভরপুর আকর্ষনীয় সব পদ প্রস্তুত পেয়ে যান। এমনকি পরবর্তীতে এক পর্যায়ে (২০০১ সালের পর) তিনি উসামা বিন লাদেনেরও সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[331]

সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার সময় (১৯৯০-এর আগে) উসামা বিন লাদেন ব্যক্তিগতভাবে সৌদির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ সহ কয়েকজন কর্মকর্তার কাছে ইরাকের সাদ্দাম হোসেইনের ব্যাপারে সতর্ক করে চিঠি পাঠাতেন। সেইসব চিঠিতে সৌদি আরবের জন্য সাদ্দামের ইরাক যে ক্রমেই একটি হুমকি হয়ে উঠছিল, সে ব্যাপারে তিনি আগ

---

330 Long, “Ribat, al-Qaida, and the Cahllenge for U.S. Foreign Policy”, p. 42.

331 শাইখ সালমান আল-আওদাহ প্রথমে সৌদি বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৪ সালে সৌদিতে কারাবরণের পর প্ররোচিত হয়ে স্পষ্টতই সৌদিদের প্রতি নমনীয় হয়ে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় এই কারণেই ১৯৯৯ সালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এই বই লিখার সময়কালে (২০১১) উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে তিনি রিয়াদ ন্যারেটিভের একজন অন্যতম চরিত্র ছিলেন। সৌদি সরকারের প্রতি নরমপন্থী হওয়ার প্রমাণ হিসেবে একদিকে তো তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অবস্থান প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এর ওপর প্রশ্ন আসে ‘এক সময়ের শাসক বিরোধী কারাবন্দিকে একই প্রশাসন কেনই বা সরকারি টেলিভিশন প্রোগ্রাম, ওয়েবসাইট ইত্যাদি পরিচালনা করতে দিবে?’

এছাড়া ২০০৭ সালে এমডিসি (মিডল ইস্ট ব্রডকাস্টিং সেন্টার) টিভি মিডিয়ায় শাইখ আওদাহ প্রকাশ্যে বলেছিলেন, “হে ভাই উসামা, কতো রক্ত ঝড়েছে? কতো নিরাপরাধ লোক, শিশু, বৃদ্ধ, নারীদেরকে হত্যা করা হয়েছে আল-কায়েদার নামে? তুমি কি এই শতসহস্র মানুষের বোঝা কাঁধে নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে খুশি হবে?” আরও দেখুন – Shaykh Salman al-Awdah, “Letter to Usama bin Ladin”, IslamToday (Internet), 17 September 2007.

এছাড়া ৯/১১-এর আক্রমণের ব্যাপারেও শাইখ আওদাহর সমালোচনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে শাইখ সালমান আল-আওদাহকে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে রিয়াদ ন্যারেটিভের উল্লেখযোগ্য একজন চরিত্র হিসেবেই গণ্য করা হয়। সহজভাবে বললে, ১৯৯৯-এ শাইখ আওদাহকে সৌদি সরকার ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী প্রায় দেড় যুগ ধরে নিজেদের মতো ব্যবহার করে নেয়। কিন্তু এরপর ২০১৭ সালে ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমানের সময়ে সৌদি-কাতার দ্বন্দ্ব তুঙ্গে থাকার সময় তিনি পুনরায় আটক হন। সেই সময় সৌদি-কাতার ইস্যুতে সৌদির অন্যান্য দরবারি আলিমদের সাথে শাইখ আওদাহকেও সৌদির পক্ষ নিতে বলা হলে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এসমস্ত কারণেই সৌদি প্রশাসন তাঁকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করে। এমনকি ২০১৮ সালে রাষ্ট্রপক্ষ তাঁকে তাজির হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার জন্যও আবেদন করেছিল। এখনও (২০২১) পর্যন্ত তিনি সৌদির কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

থেকেই সতর্ক করতেন। তাঁর প্রবল ধারণা ছিল – সাদ্দাম একসময় সৌদি আরবে আক্রমণ চালাবে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের কাছ থেকে তিনি অসন্তোষজনক উত্তর পান। কিন্তু এই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন এতই নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর ভাষায়, "এক পর্যায়ে তিনি প্রকাশ্যে সবাইকে সতর্ক করতে শুরু করেন যে, ইরাকি বাহিনী কুয়েত সীমান্ত হয়ে এখানে আক্রমণ করতে পারে।" উমার বিন লাদেনের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী তাঁর বাবা সাদ্দাম হোসেইনকে কখনোই ভাল হিসেবে দেখেননি, বরং সাদ্দামকে তিনি সবসময়ই কাফিরই বলতেন। আর বলতেন যে, "এত শক্তিশালী বাহিনীর এমন নেতা কখনও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না।" [332] উসামা বিন লাদেনের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয় যখন ১৯৯০ সালের আগস্টে সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করে বসে। আর তার গতিপ্রকৃতি দেখে এটাও বোঝা যায় যে, সে অবিলম্বে সৌদিতেও প্রবেশ করবে। এই ঘটনার সাথে সাথেই উসামা সৌদির জন্য নিজের পক্ষ থেকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। সেসময় সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রিন্স সুলতানের মাধ্যমে তিনি সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্যের আবেদন জানান। তাঁর প্রস্তাব ছিল, নিজেদের কোম্পানির সমস্ত হাল্কা-ভারি সরঞ্জাম ব্যবহার করে তিনি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন এবং তাঁর আফগান ফেরত অভিজ্ঞ বাহিনীকে ময়দানে নামাবেন। কিন্তু সৌদি রাজ পরিবার তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করে। পশ্চিমা বাহিনীকে আরবের ভূমিতে জায়গা দিতে তারা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ফাতওয়াও প্রস্তুত করে ফেলে।

উসামা বিন লাদেন সৌদির এহেন সিদ্ধান্তে দারুণ মর্মাহত হন। যেখানে "আশির দশকের শুরু" থেকেই তিনি বলে আসছিলেন যে ইসলামের পরবর্তী বড় যুদ্ধটা হবে আমেরিকার বিরুদ্ধে, সেখানে কিং ফাহাদ কিনা ওয়াশিংটনের কাছেই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্মভূমিতে সেনা পাঠানোর আবেদন করলেন। [333] উসামা রাজ পরিবারে তাঁর চেনা পরিচিতদেরকে আবারও সতর্ক করলেন যে আমেরিকার বাহিনী একবার আরব উপদ্বীপে পা ফেলতে পারলে সহজে যাবে না। তাঁর সাহওয়ার সঙ্গী শাইখ সফর আল-হাওয়ালি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছিলেন। শাইখ হাওয়ালি তাঁর নিজের এবং উসামার মত একই উল্লেখ করে বলেছিলেন, "এটা বিশ্ব বনাম ইরাক নয়। এটা হলো পশ্চিম বনাম ইসলাম... (ইসলামের) প্রধান শত্রু ইরাক নয়, বরং পশ্চিম।" [334]

---

332 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 73, 79.

333 Bergen, Holy War, Inc., p. 64.

334 Coll, Ghost Wars, p. 229.

উসামা বিন লাদেনের মনের ক্ষতকে আরও গভীর করে দিয়ে "ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৌদি বাহিনী" জেদ্দার কাছে তাঁর ফার্মে আক্রমণ চালায় এবং সেখানে কর্মরত প্রায় একশত জন আফগান ফেরত মুজাহিদদের থেকে সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে নিরস্ত্র করে ফেলে। উসামার ছেলের বর্ণনামতে, তাঁর বাবা "এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি কথাও বলতে পারছিলেন না।" তিনি তখনও পর্যন্ত ভাল জানা প্রিন্স আবদুল্লাহকে রেগেমেগে কল করে জানতে চান, কেন এমন রেইড দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে আবদুল্লাহ নাকি এর কারণ অনুসন্ধান করে জানানোর ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু সেই ওয়াদা অপূর্ণই রয়ে যায়।[335]

রাগ দমিয়ে নিজের দেওয়া প্রস্তাব নাকচ হওয়া মেনে নিলেও উসামা বিন লাদেন মানতে পারছিলেন না – কীভাবে সৌদ পরিবার আর তাদের গ্র্যান্ড মুফতি ইসলামের পবিত্র ভূমিতে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্মভূমিতে কাফির সৈন্যদেরকে স্বাগত জানাতে পারলো।[336][337] এই ব্যাপারে পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেন স্মৃতিচারণ করেছিলেন, "আমার লোকেরা সহ অধিকাংশ সৌদি মুসলিমই এমন ফাতওয়া দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিল। কেননা এটা এমন কিছু মানুষদের (সৌদির আলিম) কাছ থেকে এসেছিল, যাদের প্রতি এতকাল তাদের

---

335 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 83, 84.

336 Scheuer, Through Our Enemies' Eyes, pp. 123–124.

337 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওয়াসিয়্যাত ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুশরিকদেরকে আরবের জমিন থেকে বের করে দেওয়া। আর সেটা পূর্ণ করেছিলেন আমিরুল মুমিনিন উমার ইবনু খাত্তাব রদি.।

হাদিসে এসেছে, ইবনু আব্বাস রদি. থেকে বর্ণিত, নবি সা. (ইন্তিকালের সময়) তিনটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "মুশরিকদের আরবভূমি হতে বের করে দিবে, তোমরা রাষ্ট্রদূতদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে যেমনটা আমি তাদের সাথে করে থাকি।"

রাবী বলেন, ইবন আব্বাস রদি. তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে চুপ থাকেন। অথবা তিনি বলেন, আমি তা ভুলে গিয়েছি। [সুনানে আবু দাউদ ৩০২৯, সহিহ; অনুরূপ হাদিস: সহিহুল বুখারি ৪৪৩১]

উমার ইবন খাত্তাব রদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-কে এরূপ বলতে শুনেছেন, "আমি ইয়াহুদি ও নাসারাদের অবশ্যই আরবভূমি হতে বের করে দেব এবং এখানে মুসলিম ছাড়া আর কেউ থাকবে না।" [সুনানে আবু দাউদ ৩০৩০, তিরমিযি ১৬০৭ সহিহ]

আর আরব ভূমি বলতে যে বিস্তৃত জমিন বোঝানো হয়, তা হাদিসের ভাষায় –

ইবনু আবদিল আযিয রদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আরবভূমি 'ওয়াদী-কুররা' হতে ইয়েমেনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইরাক হতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।" [সুনানে আবু দাউদ ৩০৩৩, সহিহ]

পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। তাই এই বিস্ময় পুরোপুরি কেটে যেতে একটু সময় লেগেছিল।" [338] [339] এর জবাবে বিন লাদেন সৌদির বয়োজ্যেষ্ঠ আলিমদেরকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন: কীভাবে আপনারা আমেরিকান কাফিরদেরকে এই ভূমিতে প্রবেশের ফাতওয়া দিতে পারলেন। এটা তো জায়েজ নেই।" [340] সেসময় সাহওয়ার আলিমদেরকে তিনি এর বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেও আহ্বান জানিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি একই ব্যাপারে সৌদি শাইখ উসাইমিনের একটি ফাতওয়াকেও সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেখানে শাইখ উসাইমিন মূলত পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম – বিশেষত আরব উপদ্বীপের মুসলিমদের জন্য 'আগ্রাসী শত্রুকে' যথাসম্ভব প্রতিহত করা ফরজ আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই ফাতওয়াতে আমেরিকানদেরকে 'আগ্রাসী' হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছিল। [341] উসামা বিন লাদেন শাইখ উসাইমিনের সেই ফাতওয়া দিয়ে সৌদি যুবকদেরকে আফগানিস্তানে গিয়ে আধাসামরিক প্রশিক্ষণ নিতেও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। আর "মোটামোটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৌদিই সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।" [342]

কিন্তু দিনশেষে সেসবের কিছুই কাজে আসেনি; আরবের ভূমিতে আমেরিকার আগমন ঠেকানো যায় নি। সেই সাথে দক্ষিণ ইয়েমেনের নাস্তিক মার্কসবাদী রেজিমকে উৎখাতের ক্যাম্পেইনেও সৌদির রাজ পরিবার এবং এর দরবারি আলিমরা শেষ পর্যন্ত তাদেরই সঙ্গ দিয়ে গিয়েছিল, যাদেরকে বিন লাদেনের মতো শিক্ষিত-তরুণ সৌদিভক্তরাও কেবল আল্লাহর শত্রু হিসেবেই জানতেন।

রিয়াদের এই যে সব দ্বন্দ্বময় অবস্থান – আফগানিস্তানের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, কিন্তু ইয়েমেনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রদান; আরবের ভূমিতে পশ্চিমা সামরিক বাহিনীকে আহ্বান জানানো; সাহওয়ার আলিমদেরকে গ্রেপ্তার; তাজিকিস্তান, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে যুদ্ধফেরত মুজাহিদদেরকে বিনা কারণে আটক করা; সংস্কারবাদী আলিমদেরকে জেলমুক্তি, মোটা বেতন, পদমর্যাদা ইত্যাদির

---

338 Atwan, "Interview with Usama bin Ladin."

339 এই বিস্ময় পুরোপুরি কেটে যেতে সহায়তাপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন উসামা বিন লাদেনের আফগান সহযোদ্ধা আইমান আজ-জাওয়াহিরি সহ অন্যান্য মিশরীয় সহযোদ্ধারা।

340 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 8", p. 17.

341 এছাড়া সেসময় সৌদির অল্পসংখ্যক আলিম আমেরিকাকে জায়গা দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুহাদ্দিস নাসিরউদ্দিন আলবানি।

342 Atwan, The Secret History of al-Qaeda p. 46.

লোভ দেখিয়ে তাদেরকে নিজেদের অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং প্রশাসনের সাথে একাত্ম করে ফেলা – দূর থেকে দেখলে এইসমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ছিল সৌদি একনায়কতন্ত্রের পতনের সূচনা। অবশ্য এখানে উল্লেখ করার কারণ মূলত এই ঘটনাগুলো উসামা বিন লাদেনের ওপর কতোটা প্রভাব ফেলেছিল, সেদিকটায় ফোকাস করা। তার চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, সৌদি সরকার এবং সরকারপন্থী আলিমদের দ্বারা এমন বিশ্বাসঘাতক আচরণের অনুভূতি শুধু উসামা বিন লাদেনের একার ছিল না। আর এই মানুষেরা নিজেদের আদর্শের তাড়না থেকেই কাজ শুরু করে দেয়।

উসামা বিন লাদেনের এক সময়ের বডিগার্ড আবু জান্দাল প্রশ্ন রেখেছিল, ‘‘কোন ব্যাপারটা (সৌদি) যুবকদেরকে নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে সৌদির ভূমিতেই বোমাবাজি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? আমি বিশ্বাস করি এর মূল কারণ ছিল এই যুবকদের প্রতি সৌদি সরকারের অথর্ব নীতি। আল-মুহাইয়্যা কমপ্লেক্সে বোমা মারা ছেলেগুলো তো তাদের ইন্টারনেটে প্রকাশ করা অডিওটেপে স্পষ্টই বলেছিল যে – তারা (পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে) জিহাদে যোগ দিয়েছিল রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়েই। তাছাড়া শাইখ সা’দ আল-বুরাইক, শাইখ আইয আল-কারনি, শাইখ সালমান আল-আওদাহ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য মাশায়েখদের প্রত্যক্ষ উদ্বুদ্ধকরণের কারণেই তারা জিহাদে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাষ্ট্রই কিনা তাদেরকে ধরপাকড় শুরু করে দিয়েছিল, আর শাইখরাও তাদেরকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। শাইখ সা’দ আল-বুরাইক আর শাইখ আইয আল-কারনি তো এই যুবকদেরকে কথায় কথায় যতো প্রকার আক্রমণও শুরু করে দিয়েছিল। অথচ ঐ যুবকেরা ছিল তাদেরই লেকচার, খুতবাহ, দারস এবং হালাকার ফসল।’’ [343]

কিন্তু এতকিছুর পরও, আগেই দেখিয়েছি যে সৌদি ন্যারেটিভকে পশ্চিমা লেখকরা গোগ্রাসে গিলে থাকেন। স্টিভ কোল তার Ghost Wars বইতে উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করেছেন পুরোপুরিই খলিল এবং প্রিন্স তুর্কির সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে, যারা একেবারে স্পষ্টভাবেই সৌদির পক্ষের লোক। তারা উসামা বিন লাদেনকে বর্ণনা করেছেন – উদ্ধত, দাম্ভিক, হুমকি ধামকি প্রবণ হিসেবে, আলিম এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ হিসেবে। তাদের অভিযোগ ছিল, উসামা বিন লাদেন নাকি তাঁর নেতৃত্বে খুব অল্পসংখ্যক মুজাহিদ দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং কিং ফাহাদের সাথে

343 Al-Hammadi, “Al-Qaeda from within, part 8”, p. 17.

সাক্ষাতের দাবি করে বসেছিলেন। অথচ উসামার এহেন চিত্রায়ন তাঁর ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যের সাথেই মেলে না; আগের বা পরের কারও বর্ণনার সাথেই না।[344]

তাছাড়া স্টিভ কোল যেকোনো ধরনের ভিন্নমত সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়ে খলিল-তুর্কির বয়ানকে রীতিমতো ওহীর মতো সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে উসামা যে কুয়েতের ওপর ইরাকের আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন, তাও সম্পূর্ণরূপে গোপন করা হয়েছে। সৌদ পরিবারের দুই ভক্তের গালগপ্প সবিস্তারে বর্ণনা করার পর স্টিভ কোল প্রিন্স তুর্কির বয়ানে এক সময়ের ভদ্র সৌদি যুবকের চরমপন্থী হয়ে যাওয়ার বর্ণনা দেন। সহজ কথায় তিনি পুরোপুরি সৌদি ন্যারেটিভে ঢুকে যান। প্রিন্স তুর্কি তো প্রায় কান্না কান্না ভাব করে বলেছিলেন, "উসামা বিন লাদেন একজন শান্ত, শান্তিপ্রিয়, ভদ্র মানুষ থেকে এমন এক মানুষ বনে যান, যিনি মনে করতে শুরু করেছিলেন যে তিনি বিশাল বাহিনী জড়ো করে, নেতৃত্ব দিয়ে ইরাককে স্বাধীন করে ফেলতে পারবেন। এটা ছিল তাঁর অহংকার এবং দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ।"[345]

উসামা বিন লাদেনের প্রস্তাবের বিষয়ে আরও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাটি হলো, উসামা বিন লাদেন এবং আমেরিকা – উভয়কেই সৌদি প্রশাসন নিজেদের দলে রাখার চেষ্টা করেছিল। ২০০১ সালে পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মীরকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে, কুয়েত থেকে সাদ্দামকে উচ্ছেদের আমেরিকা-সৌদি জোটের প্রচেষ্টাকে জনসমক্ষে সমর্থন করার জন্য সৌদি প্রশাসন তাঁকে অনুরোধ করেছিল; কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান।[346] আর উসামা বিন লাদেনের এই বক্তব্যটি সৌদির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করলে একেবারে খাপে খাপ মিলে যায়। সৌদিরা বুঝেশুনেই হাজার হাজার সশস্ত্র এবং প্রশিক্ষিত মুজাহিদ বাহিনীকে দেশে আনতে চায়নি; কারণ ইরাক পরাজিত হওয়ার পর সৌদি প্রশাসনের সাথে মুজাহিদরা কী করতো? সৌদি প্রশাসন নিজেরাই যেহেতু পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ বাস্তবায়ন করে না, আর তা নিয়ে সেসময় ইতোমধ্যেই সাহওয়া আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছিল, তাই সৌদি প্রশাসন উসামা বিন লাদেনের মুজাহিদ বাহিনীকে রাজ্যে প্রবেশে সম্মত হয়নি। কিন্তু তবুও সৌদি চেয়েছিল এমন একজন ব্যক্তিত্বকে পাশে রেখে তাদের এবং আমেরিকার মধ্যকার মৈত্রীর প্রতি

---

344 Coll, Ghost Wars, pp. 221–223.

345 Coll, Ghost Wars, p. 223. Mir, "My last question to Osama bin Laden."

346 Mir, "My last question to Osama bin Laden."

সমর্থন আদায় করে নেওয়া। কেননা তা রাজ্যের সাধারণ মুসলিমদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতো। কেননা উসামা বিন লাদেনকে সৌদির বহু দ্বীনদার ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সমর্থন করতো এবং তাঁকে ইসলামের একজন সমরনায়ক হিসেবে শ্রদ্ধা করতো। পশ্চিমের অনেক লেখকেরই তো উসামা বিন লাদেনের চিন্তাভাবনা এবং বুদ্ধি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অথচ সেসময় তাঁকে নিয়ে সৌদির 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার' পরিকল্পনা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন এবং নাকচও করে দিয়েছিলেন।

অবশেষে উসামা বিন লাদেন সৌদি আরব ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান – তাঁর ভাইদের মাধ্যমে সৌদি কর্মকর্তাদেরকে তিনি কোনোরকমে বুঝ দিয়েছিলেন যে, অন্তত ফিরে আসার শর্তে তাঁকে ভ্রমণ করতে দেওয়া হোক। কিন্তু পাকিস্তান পৌঁছে যাবার পর তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর ফিরে আসার কোনোই ইচ্ছে নেই। স্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "নাজওয়া, সৌদিতে একটা প্লেটও রেখে আসবে না।" [347]

উসামা বিন লাদেন কীভাবে তাঁর পাসপোর্ট সহ ভ্রমণের অন্যান্য কাগজপত্র হাতে পেয়েছিলেন, তা নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প প্রচলিত আছে। তবে আমি ২০০২ সালে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম সেটার মতো গ্রহণযোগ্য কিছুই পাইনি। উসামার এক বা একাধিক ভাই সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাদেরকে রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন যেন তাদের ভাই উসামাকে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়া হয়; তিনি তাঁর ব্যবসায়িক কাজে পাকিস্তানে যাবেন এবং কাজ শেষে ফিরেও আসবেন। ২০০২ সাল থেকে আবু জান্দালও উসামা বিন লাদেনের ভ্রমণের ব্যাপারে মোটামোটি একইরকম তথ্যই জানিয়েছেন, "সৌদি আরব থেকে একবার মাত্র বের হতে এবং ফিরে আসতে শাইখ উসামাকে এককালীন পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই পাসপোর্টটি সৌদি আরব থেকে চূড়ান্ত প্রস্থানের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং কখনোই ফেরেননি। রাজপরিবারের কিছু সদস্যের সাথে পারিবারিক যোগাযোগের কারণেই তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।" অবশেষে উসামা বিন লাদেন তাঁর ভাইদের কাছে সৌদিতে ফিরবেন বলে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়েও চিঠি দিয়েছিলেন। [348]

---

347 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 92.

348 Scheuer, Through Our Enemies' Eyes, p. 128, and al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

শান্তির দূত

উসামা বিন লাদেন পেশাওয়ারে ফিরে যান এবং সেখানে প্রায় এক বছরের মতো অবস্থান করেন। এই সময়টায় তিনি আফগান বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর মধ্যে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠছিল, তা প্রশমন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের সময়কালে শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে বিভিন্ন সেবা সংস্থায় যেসকল আরবরা কাজ করতো, তাদের অনেকেই তখনও পাকিস্তানে ছিল। উসামা বিন লাদেন তাদেরকে সাথে নিয়ে এগোতে থাকেন – বিশেষ করে ওয়াইল জুলাইদান নামের এক সৌদির সাথে একসাথে কাজ করতে থাকেন। ওয়াইল পেশাওয়ারের আশেপাশের একটি ইসলামি দাতব্য সংস্থা পরিচালনার কাজ করতেন। সেই সময়গুলোর কথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, “আমরা বিবাদ থামানোর জন্য আফগান নেতাদের কাছে যেতাম। কেননা ঐ সময়ে আফগান নেতাদের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ছিল। আমরা আফগানের নেতাদের সাথে দেখা করে করে তাদেরকে শান্ত হতে বলতাম।” [349]

কিন্তু তাদের এত পরিশ্রমের ফলাফল ছিল শুন্য। কেননা সেখানে উসামা বিন লাদেন আর তাঁর সহকর্মীরা আসলে প্রিন্স তুর্কি এবং পাকিস্তানিদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছিলেন। অনেকটা ‘শান্তির দূত’-এর মতো বিন লাদেন চাইছিলেন সবার মধ্যে বোঝাপড়ার চুক্তি করতে, একে অপরের ঘোরতর শত্রু – হেকমতিয়ার আর মাসউদের মধ্যে সমঝোতা করাতে। তিনি চাইছিলেন যেন কোনোভাবেই আফগান প্রশাসনে কোনো কমিউনিস্ট এসে না বসে (এই ব্যাপারে কিছুক্ষণ পরেই আরও বিস্তারিত আসছে)। ওদিকে আফগানের মূল ক্ষমতার জন্য সৌদি আরব আর পাকিস্তান উভয়েরই আলাদা পছন্দ ছিল যথাক্রমে – সাইয়্যাফ এবং হেকমতিয়ার। [350] লরেন্স রাইট দাবি করেন যে, এই অধ্যায় থেকেই নাকি উসামা বিন লাদেন এবং প্রিন্স তুর্কি একে অপরের ‘ঘোরতর শত্রু’ বনে যান। কিন্তু এই দাবি অপরিপক্ক বলেই মনে হয়। [351] এই ঘোরতর শত্রুতা শুরু হয়েছিল আরও পরে গিয়ে। আর সেটার ট্রিগার ছিল প্রিন্স তুর্কির মনিব – সৌদির রাজ পরিবারকে উসামা বিন লাদেনের প্রকাশ্যে সমালোচনা।

---

349 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 104.

350 Coll, Ghost Wars, p. 236; Mir, “Interview with Osama bin Laden”, 18 March 1997; Wright, The Looming Tower, p. 161.

351 Wright, The Looming Tower, p. 162.

তবে পশ্চিমের কাছে উসামার সৌদির প্রতি বিদ্বেষের চেয়ে ব্রিটেন এবং আমেরিকার প্রতি তাঁর বিদ্বেষই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন তো এটা রীতিমতো সত্য ধরে নেওয়া হয় যে, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতরা চলে যাবার পর ওয়াশিংটন সহ গোটা পশ্চিমও আফগানদেরকে ত্যাগ করেছিল। অথচ বাস্তবতা হলো, এই কথা একেবারেই ভুয়া। ১৯৮৯-এ রেড আর্মির সর্বশেষ সদস্যটি চলে যাওয়া থেকে শুরু করে ১৯৯২-এ আফগান কমিউনিস্টদেরও চূড়ান্ত পতন পর্যন্ত – পুরো সময় জুড়েই আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি এবং জাতিসংঘ কাবুলে নিজেদের পছন্দমতো সরকার প্রতিষ্ঠার জোর চেষ্টা চালিয়েছিল। তারা এমন লোকদের দিয়ে সরকার গঠনের পাঁয়তারা করছিল, যেখানে আফগানদের সমস্ত দলের প্রতিনিধি থাকবে – কেবলমাত্র কোনোপ্রকার ইসলামপন্থী কিংবা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা কেউ সেখানে থাকবে না।

উদাহরণস্বরূপ, ওয়াশিংটন সেখানে এক পর্যায়ে তিন জন কূতনীতিক এবং একজন বিশেষ দূত নিযুক্ত করেছিল। তাদের মূল কাজ ছিল আফগানিস্তানে এমন এক প্রশাসন গঠনের জন্য কাজ করা যেখানে খুবই ঠাটবাটওয়ালা, ইংরেজি বলা, সেক্যুলার, বুদ্ধিজীবী আফগান থেকে শুরু করে একসময়ের কমিউনিস্ট নেতা এমনকি কমিউনিস্টদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহরাও থাকবে। এছাড়াও সেখানে আফগানদের পদচ্যুত রাজার সমর্থক; সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে পুরো যুদ্ধের সময় আমেরিকা, ইউরোপ, ইরান কিংবা ভারতে টাকাপয়সা কামানোতে ব্যস্ত থাকা আফগানদেরও বিবেচনা করা হচ্ছিল। সহজ ভাষায় বললে, সোভিয়েতদের তাড়াতে হাতে একে-৪৭ উঠিয়ে নেওয়া মানুষগুলো ছাড়া অন্য যে কাউকে আনতেই পশ্চিম যথাসাধ্য তদবির চালিয়ে যাচ্ছিল।

আসলে আফগানিস্তানে সোভিয়েত পরবর্তী সময়ে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল এটাই – যারা নিজেরা জীবন বাজি রেখে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওদের তাড়িয়েছিল, তারা চোখের সামনে দেখছিল যে তাদের ছিনিয়ে আনা বিজয়কে পশ্চিমারা সেইসব নামমাত্র মুসলিমদের কাছে তুলে দিচ্ছিল, যারা কিনা পুরো যুদ্ধটাই শুয়ে বসে কাটিয়েছিল। [352] এই কারণে রিয়াদ আর ইসলামাবাদের কাছেও অস্ত্রওয়ালা ইসলামপন্থীদের সমর্থন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। যেকোনোভাবে তারাও কাবুলে এমন পশ্চিমপন্থী সরকার রুখতে চাইছিল, যারা পরবর্তীতে সৌদিবিরোধী বা

---

352 একই কারণে উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরাও চাইছিলেন যেন আফগানে ফের কোনো পশ্চিমবান্ধব প্রশাসন না আসে।

পাকিস্তান-বিরোধীদের সাথে আঁতাত করার সমূহ সম্ভাবনা রাখতো। এই বই লিখার সময়কালে অর্থাৎ, ২০১০-১১ সালে সৌদি আরব আর পাকিস্তান আফগানিস্তানের কার্জাই সরকার নিয়ে একইরকম সমস্যার মুখে পড়েছিল। কেননা কার্জাই প্রশাসনও সৌদি আর পাকিস্তানের চাহিদার প্রতি ছিল নির্লিপ্ত। আর কার্জাই প্রশাসনের ভিতও গড়ে দিয়েছিল আমেরিকা এবং ন্যাটো। [353]

এই প্রেক্ষাপট মাথায় রাখলে, সোভিয়েত চলে যাবার পর 'আফগানিস্তানকে পশ্চিমও ত্যাগ করেছিল' – এমন গল্প যুদ্ধে সত্যিই অংশ নেওয়া যে কারও দ্বারা খারিজ হওয়া দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক। ইসলামিক ইউনিয়নের প্রধান আবদুর রাসুল সাইয়্যাফ বলেছিলেন, "(আফগান কমিউনিস্টদের পতনের পর) আমেরিকা এবং ইউরোপের তত্ত্বাবধানে রাশিয়া সহ অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী শক্তিগুলো এমনসব আফগানদের খুঁজে বের করছিল, যারা এখানে অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলবে।" [354] আর সাইয়্যাফ যতোগুলো শত্রুর নাম নিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে আমেরিকাকেই উসামা বিন লাদেন সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছিলেন। পরবর্তীতে বিন লাদেন বলেছিলেন, "আমরা সেই ১৯৭৯ থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি। আর তখন কিনা আমেরিকা আমাদেরকে ঐ একই কমিউনিস্টদের সাথেই কাজ করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। আসলে আমেরিকার নৈতিকতা বলে কিছু নেই। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমেরিকা সমস্ত নৈতিকতা বিসর্জন দিতে পারে।" [355]

সোভিয়েত-জিহাদ পরবর্তী সময়ে মুজাহিদদের নিজেদের মধ্যকার বিপর্যয় উসামা বিন লাদেনের পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনায় গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদি এক প্রভাব ফেলেছিল। আফগানদের মধ্যে যখন ফাটল ধরলো, বিন লাদেন সেখান থেকে এই উপসংহারে উপনীত হলেন যে, যেকোনো সামরিক বিজয়ের পরপর খুব দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র না দাঁড় করালে, বিশেষ করে যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সবাইকে দিয়ে প্রশাসন গঠন না করে ফেললে

353 এমনকি আরও এক দশক পরে ২০২০-২১ এ এসেও আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার বিদায় নেওয়ার কালে আফগানিস্তানের প্রশাসন নিয়ে আমেরিকা সহ গোটা পশ্চিম সেই পুরোনো তদবির চালিয়েছে। সোভিয়েতরা চলে যাবার পর আফগানিস্তানে আমেরিকা পশ্চিমবান্ধব সরকার বসিয়ে দিতে চেয়েছিল, ২০২০-২১ এ নিজেরা চলে যাওয়ার সময়ও গণতন্ত্র ইন্সটল করে দিতে চেয়েছে। এভাবে আফগানিস্তান নিয়ে পশ্চিমের সেই পুরোনো চক্রান্তের ইতিহাস যেন বারবার ফিরে এসেছে।

354 Asad, Warrior from Mecca, p. 27.

355 Mir, "Interview with Usama bin Laden", 18 March 1997, and Shiraz, "Interview with Usama bin Ladin", 20 February 1999, p. 10.

সেই বিজয় সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উসামা বিন লাদেন পরবর্তীতে এটাও বলেছিলেন – মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা সহাবস্থান করে যুদ্ধ করতে পারে, এমনকি বিজয়ও আনতে পারে; ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং গোত্রের আফগানদের সাথে থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এমনটিই শিক্ষা পেয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কাফির শত্রুর ক্ষমতা অল্প ঐক্যের মধ্যেও কাজ এগিয়ে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে দেয়। কিন্তু এভাবে শেষমেশ বিজয় এলেও সেটাকে কোনো দৃঢ়তায় রূপ দেওয়া যায় না, যদি না যুদ্ধের পরও একই বা আরও বেশি মাত্রার ঐক্য উপস্থিত থাকে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আফগানিস্তানের সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে সবাই নিজেদের মতো ঢিলেঢালা অবসর নিয়ে নিয়েছিল। আর এটাই আধা ঐক্যের সম্ভাবনাকেও নষ্ট করে দেয়; এমনকি এক পর্যায়ে গিয়ে প্রত্যেক দল নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারে লিপ্ত হয়ে যায়। বিন লাদেন লিখেছিলেন, “আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতদের বিদায়ের প্রায় সাথে সাথেই আফগানের দলগুলোর মধ্যে লড়াই বেঁধে গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য ছিল। ইসলামে রাজনৈতিক বিরোধগুলোর মধ্যে যেগুলো মুসলিমদেরকে শুধু বিভক্তই করে দেয়, সেগুলো আদতে খারাপ বলেই বিবেচিত। আর এমন বিরোধগুলোর মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। বিরোধগুলো নিয়ে হয়তো শত্রুকে কোনোরকমে হারানো সম্ভব, কিন্তু সেগুলো সাথে নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না।” [356]

তাই এরপর থেকে, যুদ্ধকালীন সময়েই যথেষ্ট পরিমাণ ঐক্য নিশ্চিত করা এবং যুদ্ধশেষে দ্রুত কার্যক্ষম সরকার প্রস্তুত করা উসামা বিন লাদেনের চিন্তা এবং পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরে পরিণত হয়। আর তাঁর মধ্যে এই ব্যাপারটা প্রতিফলিত হয়েছিল – ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-এর মধ্যে সুদানি প্রশাসন আর তাদের স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বন্দ্ব মিটমাট করে দেওয়ার প্রচেষ্টায়, ১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে মোল্লা উমার, হেকমতিয়ার এবং সাইয়্যাফের মধ্যে সহাবস্থান করাবার প্রচেষ্টায় এবং, একেবারে বিশেষভাবে বললে, ২০০৩-এর পর ইরাক এবং সোমালিয়াতে মুজাহিদদের সমন্বিত আন্দোলনে তাঁর ভূমিকায়।

356 Usama bin Muhammad bin Laden, “Introduction”, p. 82.

সুদানের ঠিকানায় থিতু হওয়া

সুদান থেকে উসামা বিন লাদেন আল-কায়েদাকে আমেরিকার ওপর যুদ্ধ প্রসারণের জন্য প্রস্তুত করেন। এর শুরু হয়েছিল ১৯৯২-এ ইয়েমেনে আমেরিকার বাহিনীর ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে। আর ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সোমালিয়ার আমেরিকা বিরোধী শক্তিগুলোকে আল-কায়েদার সহায়তার মধ্য দিয়ে এর ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। এছাড়াও তিনি বাণিজ্যিকভাবে কন্সট্রাকশন কাজ এবং কৃষিজ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জনেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কিছু সম্পদ জমিয়ে রাখা, যেন কারও প্রয়োজন হলেই প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়া ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF)-এর নেতা হাসান আত-তুরাবির কথা। তাকে উসামা বিন লাদেন সাহায্য করেছিলেন মূলত ব্যক্তিগত ধার দিয়ে; এবং সৌদি সহ অন্যসব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে এই গরিব রাষ্ট্রে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়ে। উসামা বিন লাদেন নিজের ব্যবসা দিয়েই আল-কায়েদার খরচ, দলের নতুন কর্মীদের খরচ এবং আফগানিস্তানে যুদ্ধ করা অনাফগানদের পরিবারের খরচ চালাতেন। এভাবে যখন তাঁর অর্থনৈতিক কার্যের পরিধি বাড়তে থাকে, তখন এক পর্যায়ে তিনি তাঁর সহকর্মীদেরকে 'আফ্রিকার শিং' [357] নামে পরিচিত পূর্বাঞ্চলীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। সেসময় তিনি তাদেরকে একইসাথে নিজের ব্যবসা এবং আল-কায়েদার উপস্থিতির জন্য উপযুক্ত অঞ্চল খোঁজ করা – উভয় ধরনের দায়িত্ব দিয়েই পাঠাতেন।

সুদানে এসে ইসলামি বিশ্বের বৈচিত্র্য সম্পর্কে উসামা বিন লাদেনের উপলব্ধি আরও বেশি গভীর হয়; এমনকি সৌদি আরবে বাবার কোম্পানি কিংবা আফগানিস্তানের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপলব্ধির চেয়েও বেশি। খার্তুমেও [358] তিনি সামরিক এবং বাণিজ্যিক অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে এমন এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা ছিল পূর্বের সমস্ত বাহিনীর তুলনায় বড়। যুবক বয়সে বাবার কোম্পানির হয়ে কাজ করবার সময় অর্থনৈতিক

---

357 আফ্রিকার শিং বা ইংরেজিতে Horn of Africa বলা হয় আফ্রিকার পূর্বতম অঞ্চলকে। এটি ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, জিবুতি এবং সোমালিয়া নিয়ে গঠিত। সোমালিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে শিঙের আকারে আরব সাগরে প্রসারিত হয়েছে বলে অঞ্চলটির এরকম নামকরণ হয়েছে।

358 খার্তুম হলো সুদানের রাজধানী এবং দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সেইসাথে এটি খার্তুম প্রদেশেরও রাজধানী।

পুরো ঝুঁকিই কিন্তু ছিল কোম্পানির ঘাড়ে। আর আফগানিস্তানে তাঁর ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব তুলনামূলক বেশি ছিল ঠিক, এমনকি কিছু অপারেশনের অর্থায়নও তিনি নিজেই করেছিলেন; কিন্তু তবুও সিংহভাগ অপারেশনের খরচ সমস্ত ডোনারদের থেকে প্রাপ্ত সমন্বিত খাত থেকেই করা হতো। অপরদিকে সুদানে এসে প্রথমবারের মতো সফলতার সবটুকু কৃতিত্ব কিংবা ব্যর্থতার সবটুকু দায়ভার উসামা বিন লাদেনের নিজের ঘাড়ে এসে পড়ে। সার্বিকভাবে সেই অভিজ্ঞতা খুবই কঠিন, হতাশাজনক এবং দারিদ্র্যময় ছিল। কিন্তু একদিকে তা বিন লাদেনকে নেতৃত্বে অভ্যস্ত করে তুলেছিল; তিনি প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং বিপর্যয়ের সময় সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখার গুণ অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে তা যৌবনের নিষ্পাপ সরলতার অবসান ঘটিয়েছিল, বিশেষ করে তাঁর মধ্য থেকে চোখ বন্ধ করে ইসলামের সমস্ত আলিমদেরকে বিশ্বাস করার ঝোঁক চলে যায়। সুদানের বছরগুলো উসামা বিন লাদেনের সম্ভাব্য টার্গেট সহ রাজনৈতিক, সামরিক এবং মিডিয়া অপারেশন তথা কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছিল। আর এখনও সেগুলো অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে।

জীবন যখন সুদানে

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে উসামা বিন লাদেন তাঁর স্ত্রী সন্তান এবং তাঁর অনুসারীদের একাংশের জন্য খার্তুমে স্থায়ী বসতির ব্যবস্থা করতে শুরু করেন। খার্তুমের প্রান্তে মোটামোটি উন্নত শহরতলি আল-রিয়াদের একই রাস্তায় অবস্থিত বেশ কিছু বাড়িকে থাকার এবং সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। আর সেই বাড়িগুলোর মধ্যে অন্তত একটিকে গেস্ট হাউজ হিসেবে রাখা হয়েছিল, যাতে সুদানের বাহির থেকে – বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব এবং ইউরোপ থেকে নিয়মিত ভ্রমণে আসা অতিথিদের থাকার বন্দোবস্ত হয়। [359] খার্তুমে উসামা বিন লাদেন তাঁর বড় ছেলেকে এক স্কুলে দিয়ে দেন; নাজওয়ার ভাষায় সেটি ছিল "খুবই ভাল মানের একটি স্কুল"। সেই সাথে তিনি নিজের সব ছেলেদের জন্যই বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস এবং অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে শেখানোর জন্য ঘরে খুবই উচ্চশিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন। [360] ক্রমেই সুদানকে এবং সুদানের মানুষদেরকে বিন লাদেনের ভাল লেগে যায়। এমনকি কিছু কাব্যে তিনি খার্তুমকে নিজের প্রিয় শহর বলেও উল্লেখ করেছিলেন। [361]

উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে তাঁর সুদানের প্রতিবেশিদের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রায় একই রকম। তারা তাঁকে একজন দয়ালু, ভদ্র এবং সাদামাটা জীবনযাপনকারী হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি কথা বলতেন কম, প্রতিবেশিদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ সদ্ভাব বজিয়ে রাখতেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কাছের একটি মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। সেই দিনগুলোর ব্যাপারে এক মুসল্লি পরবর্তীতে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, "আমরা তাঁকে সবসময়ই মসজিদে দেখতে পেতাম। তাঁর স্বাভাবিক বেশভূষা থেকেই প্রতীয়মান হতো যে তিনি একজন দ্বীনদার মানুষ।" [362] সুদানে তাঁর বাগানের মালি ছিলেন মাহজুব আল-আরাদি নামের

---

359 "Part one of a series of reports on bin Ladin's life in Sudan", Al-Quds al-Arabi (Internet version), 24 November 2001; Januulah Hashimzada, "I will continue jihad against infidels, Usama bin Ladin", Wahdat, 27 March 2001, p. 5; and bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 111.

360 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 95 and 111.

361 Hashimzada, "I will continue jihad against infidels."

362 "Bin Ladin loved Sudan, adored its people, adjusted to their customs; his life in Sudan was simple", Al-Quds al-Arabi (Internet version), 26 November 2001.

একজন স্থানীয়। তিনি আল-কুদস আল-আরাবিকে ২০০১ সালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বিন লাদেন অতিথিদের চলে যাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া খাবার থেকে খেতেন, রাসূল সা.-এর কথানুযায়ী সেটাকে তিনি বরকতময় মনে করতেন।" মাহজুব আরও বলেছিলেন যে, ভোরের দিকে তিনি অফিসে যেতেন। তারপর যেতেন গেস্ট হাউজে; সেখানে সকাল ৮-৯ টা পর্যন্ত থেকে ঘরে ফিরে যেতেন। [363]

এতটা সন্তর্পণে চলাফেরা করার পরও সুদানেই উসামা বিন লাদেনের ওপর প্রথম বড় ধরনের হামলা হয়। 'আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ' নামের একটি তাকফিরি দল বিন লাদেনের বাড়িতে তাঁর এবং তাঁর বড় ছেলে আবদুল্লাহর ওপর আক্রমণ চালায়। এই দলটি মনে করতো, উসামা বিন লাদেন "যথেষ্ট মুসলিম ছিলেন না।" সেই ঘটনার ব্যাপারে কিছু বছর পর তিনি নিজেই বলেছিলেন,

"আমরা অতিথি ভাইদের সাথে প্রতিদিন বিকাল ৫ টার দিকে একবার দেখা করতাম। কিন্তু সেদিন আল্লাহই জানেন, কেন যেন আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়েই আমি গেস্ট হাউজের দিক থেকে এক রাশ গোলাগোলির আওয়াজ পেলাম। কিছু গুলি আমার দিকেও ছোঁড়া হলো। তাই আমি দ্রুত আমার অস্ত্র তুলে নিলাম এবং ঘটনা কী দেখার জন্য গেস্ট হাউজের পাশেই একটি জায়গায় অবস্থান নিলাম। আমি আমার বড় ছেলেকেও একটি অস্ত্র দিয়ে বাড়িটার মধ্যে একটি জায়গায় অবস্থান নিতে দেখিয়ে দিলাম।

আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো কোনো বড় ধরনের সশস্ত্র বাহিনী হামলা চালিয়েছে। আর আমরা লড়বার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। পরে আবিষ্কার করলাম যে, আক্রমণটা করা হয়েছিল আসলে গেস্ট রুমে। সেখানে তিন যুবক দ্রুত ঢুকে আমি যেখানে বসতাম, সেদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে অতিথিদের একজন পেটে, একজন উরুতে এবং আরেকজন পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। সুদানের সিকিউরিটি ফোর্সের একটি দল কাছেই ছিল। তাদের সাথে আক্রমণকারী যুবকদের সংঘর্ষ হয়; আর তাতে যুবকদের দুইজন নিহত ও একজন আহত হয়।" [364]

363 "Part one of a series of reports on bin Ladin's life in Sudan."

364 Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 135; Abdel Bari Atwan, "Interview with Usamah bin Ladin", 27 November 1996, p. 5.

পরবর্তীতে, উসামা বিন লাদেন খার্তুমের আস-সাওরাহ মসজিদে আছেন ধরে নিয়েও অন্যান্য তাকফিরি দল তাঁকে হত্যাচেষ্টা করেছিল।[365] [366] আক্রমণকারীরা বেশকিছু মুসল্লিদেরকে হত্যা করেছিল, কিন্তু উসামা বিন লাদেন তখন সেখানে ছিলেন না। এরপর তাঁর ওপর তাকফিরিদের আরেকটি আক্রমণ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে তিনি আফগানিস্তানে ফিরে গেলে। বিন লাদেনের প্রতি তাকফিরিদের এত এত ঘৃণা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে আল-কায়েদা অভিজ্ঞদের স্বনামধন্য অনেকেই তাঁকে, আল-কায়েদাকে এবং তালেবানদেরকেই তাকফিরি মানসিকতার বলে থাকে।[367]

---

365 Abdel Bari Atwan, “Interview with Usamah bin Ladin”, 27 November 1996, p. 5.

366 উসামা বিন লাদেন সেই মসজিদেই নিয়মিত সলাত আদায় করতেন বলেই সেখানে হত্যাচেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে আফগান মুজাহিদদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, সেই হামলার দিন তিনি মারাত্মক অসুস্থ থাকায় মসজিদে যেতে পারেননি। আল-কায়েদা সহ আফগান তালেবান মুজাহিদদের অধিকাংশই এই ঘটনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা এবং সাহায্য বিবেচনা করেন।

367 এই ব্যাপারে ২য় অধ্যায়ে একটি টিকা যোগ করা হয়েছিল। এখানে আবারও উল্লেখ করা হলো: উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা কিংবা তালেবান – কাউকেই ঢালাওভাবে ‘তাকফিরি’ ট্যাগ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা সঠিক পদক্ষেপ নয়। বরং তাঁদের তাকফির এবং এর প্রয়োগ ইসলামি শরিয়াহর মূলনীতি অনুযায়ী সঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা বিবেচনা করে দেখাই হলো সঠিক পদক্ষেপ।

যেসব পশ্চিমা কিংবা মুসলিম সমালোচকদেরকে লেখক খণ্ডন করতে চাইছেন, তারা উসামা বিন লাদেন কিংবা আল-কায়েদাকে তাকফিরি বলার কারণ মূলত মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন না করা শাসকদেরকে করা তাকফির, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তায় লিপ্তদেরকে তাকফির ইত্যাদি। এমন তাকফির শরিয়াহর আলোকে আদৌ চরমপন্থা কিংবা নতুন উদ্ভাবিত কিছু নয়। কিন্তু পশ্চিমারা সহ সমস্ত শাসকপন্থী ইরজায়ি ও মুরজিয়ারা এসব ক্ষেত্রেই চরমপন্থী অর্থে ‘তাকফিরি’ ট্যাগ দেয় বলে লেখক ব্যাপারটা খন্ডন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে ‘তাকফির’ মাত্রই যেন তিনি চরমপন্থী তাকফির ধরে নিয়েছেন, যা বিশুদ্ধ নয়।

সবচেয়ে বিশুদ্ধ হয় এভাবে বললে – উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা তাকফির করে ঠিক, কিন্তু তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মূলনীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ তাকফির। তা চরমপন্থী তাকফির নয়, যেমনটা পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ, শাসকপন্থী মুরিজিয়ারা কিংবা ইরজায়িরা বুঝিয়ে থাকে।

সুদানের ব্যবসাসমূহ

উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে তিনি ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম সুদানে গিয়েছিলেন "অঞ্চলটির কৃষিজ উর্বরতা এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য।" আর পরবর্তীতে ১৯৯১-এর শেষের দিকে যখন আবার সুদান যান, তখন সেখানে কৃষিজ প্রজেক্ট এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ উভয় ধরনের কাজেই মনোযোগী হন।[368] এগুলোর মাধ্যমে তাঁর অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল হাতে সম্পদের পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া। এই ব্যাপারে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সাথী বলেছিলেন, "তিনি নিজ সম্পদ এবং ব্যবসা-বিনিয়োগের ব্যাপ্তি যথাসম্ভব বাড়ানোতে মনোযোগ দিয়েছিলেন।"[369] তিনি বেশ কয়েক ধরনের ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন – কিছু ছিল আমদানি-রপ্তানি-কেন্দ্রিক, কিছু ছিল কন্সট্রাকশন-কেন্দ্রিক। সুদানে কন্সট্রাকশনের সবচেয়ে বড় কোম্পানির নাম দিয়েছিলেন Al-Hijrah for Construction and Development. সেখানে প্রায় ছয়শ থেকে সাতশ লোককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যারা বিন লাদেনের হয়ে কাজ করতো। উসামার সেই কোম্পানিই সুদানের বন্দরকে খার্তুমের সাথে সংযুক্ত করা প্রখ্যাত 'চ্যালেঞ্জ রোড' নামের ৫০০ মাইলের (৮০০ কিলোমিটারের বেশি) হাইওয়ে তৈরি করেছিল। সেই কোম্পানির অধীনে সুদানের বন্দর নগরের নতুন বিমানবন্দর এবং কিছু বাঁধও তৈরি করা হয়েছিল।[370] এছাড়াও এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৌদিকে তিনি সুদানে বিনিয়োগ করার জন্য রাজি করিয়েছিলেন।[371] সেসময়ও তিনি সৌদি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বের করে আনতে পারছিলেন; কোম্পানি থেকে কনস্ট্রাকশনের ভারী গাড়ি-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়ে আসতে পারছিলেন। ১৯৯৪-এ কিং ফাহাদ তাঁকে সৌদি নাগরিকত্ব থেকে বহিষ্কার করা পর্যন্ত এরকমই অব্যাহত ছিল।[372]

---

368 Abdal-Karim and al-Nur, "Interview with Saudi Businessman Usama bin Ladin", p 4.

369 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

370 Mark Huband, Brutal Truths, Fragile Myths: Power Politics and Western Adventurism in the Arab World (Boulder, Colo.: Westview, 2004), p. 79; Fisk, "On fi nding Osama"; and al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

371 "Biography of Usamah bin Laden", Islamic Observation Center (Internet), 22 April 2000.

372 "Bin Ladin loved Sudan."

সুদানে থাকাকালীন সময়ে উসামা বিন লাদেন নিজের ব্যক্তিগত মনোযোগ সবচেয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন কৃষিতে। লরেন্স রাইট লিখেছিলেন, “তাঁর কল্পনা জুড়ে ছিল কৃষিকাজ।” [373] দক্ষিণ-পূর্ব সুদানের দামাজিন অঞ্চলে উসামা বিন লাদেনের এক বিরাট কৃষিখামার ছিল। তাঁর কিছু নির্মাণ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে সুদান প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে জমি প্রদান করা হয়েছিল। আর তাঁর খামারটা ছিল সেই জমিতেই। সেখানে তিনি গরু, মহিষ, ঘোড়া পালতেন; গম, সয়াবিন সহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ফলাতেন। সুদানের বন্দরের কাছাকাছি তিনি একটি লবণের খামারও করেছিলেন। [374] সৌদি আরবের সময়গুলোর মতোই উসামা বিন লাদেন শহর থেকে দূরে থাকা বেশি উপভোগ করতেন। নাজওয়া স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, “একবার তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সূর্যমুখী উৎপাদন করতে গিয়ে তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করছিলেন। তখন ফার্মে জন্মানো বিরাট বিরাট সূর্যমুখী ফুলগুলো সবাইকে দেখানোতেই আমার স্বামী সবচেয়ে আনন্দবোধ করতেন।” [375]

---

373 Wright, The Looming Tower, p. 168.

374 Coll, The Bin Ladens, p. 398.

375 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 96–97.

আল-কায়েদার ক্রমবিকাশ

আল-কায়েদার বেশিরভাগ সদস্যকেই উসামা বিন লাদেন সুদানে নিয়ে এসেছিলেন। আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অন্যান্য বিষয়াদি দেখভালের জন্য খুব অল্পসংখ্যক লোকজন সেখানে রেখে আসা হয়েছিল। সুদানে তাঁর মিলিটারি লেফটেন্যান্ট ছিলেন তাঁর সবসময়ের মিলিটারি কমান্ডার আবু উবাইদাহ আল-পানশিরি এবং পানশিরির ডেপুটি আবু হাফস আল-মিশরি; উভয়েই ছিলেন মিশরীয়। একদিকে উসামা বিন লাদেন ব্যবসা বাণিজ্য দেখছিলেন, তুরাবি আর তার প্রশাসনের সাথে বোঝাপড়া করছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বে তাঁর যোগাযোগ বৃদ্ধি করছিলেন। অপরদিকে আবু উবাইদাহ এবং আবু হাফস মিলে সুদানে নিয়ে আসা আল-কায়েদা সদস্যদেরকে উসামার জমিজমাতে নতুন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন।[376] আবু উবাইদাহ এবং আবু হাফস সুদানের মিলিশিয়া বাহিনীর সাথেও কাজ করেছিলেন। এছাড়া সুদানের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান সালাহ আবদুল্লাহর সাথেও তাঁদের ভাল পরিচয় ছিল। সালাহের কাছ থেকে তাঁরা আফ্রিকা সহ বহির্বিশ্বের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিতেন।[377] উসামা বিন লাদেন এই দুইজনকে সোমালিয়াতে একটি পরিদর্শন মিশনেও পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবু উবাইদাহ আল-পানশিরিকে ইরিত্রিয়ার ইসলামি সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগের জন্যও পাঠানো হয়েছিল; দায়িত্ব ছিল সেখানকার 'জামায়াতে জিহাদ' দলটির জন্য অর্থ পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে বেশকিছু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তুলতে সাহায্য করা।[378]

সোমালিয়াতে আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘের Restore Hope অপারেশন চলাকালীন সময়ে সেখানে আল-কায়েদার কার্যকলাপ কীরূপ ছিল, তা নিয়ে যেন বিতর্কের শেষ নেই। এই ক্ষেত্রে একেবারে 'অনেক কিছুই করেছিল' থেকে শুরু করে 'অল্প' এমনকি 'কিছুই

---

376 Huband, Brutal Truths, Fragile Myths, p. 77.

377 "Part one of a series of reports on bin Ladin's life in Sudan", and John Prendergast and Don Cheadle, "Lose this friendship with bin Laden crony in Sudan", Houston Chronicle (Internet version), 20 February 2006.

378 Huband, Brutal Truths, Fragile Myths, p. 78; "Bin Ladin loved Sudan"; and Muhammad Salah, "Ali al-Rashidi: The Egyptian policeman who paved the way for 'Afghan Arabs' in Africa and prepared them to take revenge against the Americans", Al-Hayah, 30 September 1998, pp. 1, 6.

করেনি' বলেও ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে সত্য বোধ হয় এটাই যে, সোমালিয়া সংঘর্ষে উসামা বিন লাদেনের আফগান-আরব বাহিনীর কিছুটা ভূমিকা ছিল। আমেরিকা-জাতিসংঘের যৌথ মিশন শুরু হওয়ার আগেই বিন লাদেন সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তুলেছিলেন। সুদান, সৌদি আরব কিংবা ইয়েমেন থেকে আল-কায়েদার সদস্যদেরকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে তারা সোমালিয়ার এই ক্যাম্পগুলোতে এসে উঠতো। আবু জান্দাল ব্যাখ্যা করেছিলেন, "আরব উপদ্বীপের কাছাকাছি অবস্থিত সোমালিয়াকে তারা নিজেদের জন্য শক্তিশালী ঘাঁটি বানাতে চেয়েছিলেন। কেননা আল-কায়েদার ভাইদের পরবর্তীতে এক সময়ে গোটা আরব উপদ্বীপ স্বাধীন করবার ইচ্ছা ছিল। তাছাড়া সোমালিয়াতে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব হলে সেটা আমেরিকাকে ঠেকাতেও ব্যবহার করা যেত। কেননা আমেরিকা তো সুযোগ পেলে নিশ্চিতভাবেই 'আফ্রিকার শিং' দখল করতে এগোতো।" [379] ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৪-এর মধ্যে আল-কায়েদার সৈন্যরা সোমালীয় যোদ্ধাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটাকে অল্পই বলা চলে। [380]

আসলে এগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল উসামা বিন লাদেন আর তাঁর দুই লেফটেন্যান্ট সেখানে আমেরিকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে কী শিখেছিলেন। আমেরিকার ব্যাপারে

---

379 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, narrated by Abu Jandal, parts 3 and 9", Al-Quds al-Arabi, 21 March 2005, p. 19, and 28 March 2005, p. 21.

380 লেখক শুরুতে উল্লেখ করেছেন যে, সোমালিয়াতে আল-কায়েদার কার্যকলাপের পরিধি মতবিরোধপূর্ণ। আর শেষে নিজের মতও দিয়েছেন যে তা 'অল্পই বলা চলে'। কিন্তু এই ব্যাপারে মুজাহিদ সমর্থকদের উপসংহার ভিন্ন। সোমালিয়াতে যুদ্ধে আমেরিকার মূল কৌশল ছিল তাদের Black Hawk হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করা। সেই সময় আল-কায়েদার যোদ্ধারা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎই এক নতুন যুদ্ধকৌশল আবিষ্কার করে। আর তা হলো আরপিজি বা রকেট লঞ্চার দিয়ে কোনোরকমে হেলিকপ্টারের লেজ ধ্বংস করা গেলে তা ভূপাতিত হয়ে যায়। হেলিকপ্টারের আরোহীরা বন্দি কিংবা নিহত হয়, সেই সাথে মূল্যবান হেলিকপ্টারের পেছনে শত্রুর ঢালা সমস্ত অর্থ নিমিষেই মাটিতে মিশে যায়। পরবর্তীতে এই কৌশল আয়ত্ত করেই আল-কায়েদার যোদ্ধারা নিজেদেরকে এবং স্থানীয় সোমালীয় যোদ্ধাদেরকে গড়ে তুলেছিল এবং আমেরিকাকে পরাজিত করেছিল।

সোমালিয়াতে আল-কায়েদা এই কৌশল এতই ব্যবহার করেছিল যে পরবর্তী সময়ে এটা আল-কায়েদার একটি সিগনেচার রণকৌশল হিসেবেও পরিচিত হয়েছিল। এমনকি হলিউড সোমালিয়ার এমন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে Black Hawk Down নামে সিনেমাও বানিয়েছিল। কিন্তু অবশ্যই সেখানে তারা নিজেদের মতো করেই গল্প বলেছে। সেটা যাই হোক, তুলনামূলক অল্প ব্যাপ্তির যুদ্ধে এমন প্রভাব বিস্তারকারী কার্যকলাপকে 'অল্প বলা চলে' বলে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

বিন লাদেনের বিশ্বাস আবু জান্দাল খুব অল্পভাষায় গুছিয়ে বলেছিলেন, "আমেরিকার সৈন্যরা হলো কাগজের বাঘ। কয়েকবার আঘাত এলেই ওরা মৃতদেহগুলো টানতে টানতে পালিয়ে যায়। আমেরিকার বহরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। কিন্তু ওদের 'পুরুষ' নেই।" [381]

সংগঠনের বিস্তার এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আল-কায়েদার সদস্যরা আফ্রিকা সহ গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ জারি রেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯২ সালে কেনিয়ার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উসামা বিন লাদেন তাঁর আফগান যুদ্ধের সঙ্গী খালিদ ফাওয়াজকে নাইরোবিতে পাঠিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতাতেই শহরটিতে অবস্থিত আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্কারী হামলা হয়েছিল। সেই হামলার প্রস্তুতির উপরের ছদ্মবেশ হিসেবে ১৯৯৩ সালেই ফাওয়াজ সেখানে 'আসমা' নামের একটি আমদানি-রপ্তানির কোম্পানি খুলে বসেছিলেন। [382] ১৯৯৪-এ কিছু কাজের জন্য ফাওয়াজকে বিন লাদেন লন্ডনে পাঠান। আর নাইরোবিতে ফাওয়াজের স্থলাভিষিক্ত করা হয় আরেক আফগান ফেরত যোদ্ধা ওয়াদি আল-হাজীকে। [383] আল-কায়েদার আক্রমণের পরিকল্পনা, "মেইল এবং ফ্যাক্স মেশিনের মাধ্যমে" এনকোডেড ম্যাসেজ আদান-প্রদান ইত্যাদিতে উসামা বিন লাদেনের অভিজ্ঞ লোক ছিলেন ওয়ালি খান আমিন শাহ। এই ওয়ালি খান আবার ফিলিপাইনে কাজ করেছিলেন রামযি ইউসুফের সাথে, যিনি ছিলেন ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলার মূল রচয়িতা। ওয়ালি খান এবং রামযি ইউসুফ মিলে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন এবং ম্যানিলায় পোপ ২য় জন পলের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় রুটে চলাচলকারী আমেরিকার বিমানগুলোতে হামলার পরিকল্পনা এবং ফিলিপাইনের ইসলামপন্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলার কাজ করেছিলেন।" [384]

---

381 Huband, Brutal Truths, Fragile Myths, p. 81; Mir, "Interview with Usama bin Ladin", 18 March 1997; and al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

382 Huband, Brutal Truths, Fragile Myths, p. 78; and al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

383 Khalid al-Hammadi, "Interview with Abu Jandal, former personal bodyguard of Usama bin Ladin", Al-Quds al-Arabi, 3 August 2006, p. 4; and Scheuer, Through Our Enemies' Eyes, p. 139.

384 Miller, "Greetings America. My name is Osama bin Laden", and Simon Reeve, The New Jackals: Ramzi Yousef, Osama bin Laden, and the Future of Terrorism (Boston: Northeastern University Press, 1999), pp. 71–93.

সুদানে উসামা বিন লাদেনের সাথে Egyptian Islamic Jihad (EIJ)-এর নেতা আইমান আজ-জাওয়াহিরির ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল – বিন লাদেনের সাথে ডা. জাওয়াহিরির প্রথম পরিচয় হয়েছিল আফগান জিহাদে। সেসময় উভয়ই শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সাথে কাজ করতেন। সেসময় আইমান আজ-জাওয়াহিরি পুরোপুরি মিশরকেন্দ্রিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আর উসামা বিন লাদেনের ওপর তাঁর তেমন প্রভাবও ছিল না। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি অনেকেই দাবি করেন যে, ডা. জাওয়াহিরি নাকি কৌশলে EIJ-এর সদস্য আল-পানশিরি ও আল-মিশরিকে প্রথমে বিন লাদেনের কাছের সার্কেলে এবং পরে আল-কায়েদার অংশ বানান। আর এভাবে নাকি তিনি নিজের জন্য বিন লাদেনের কাছে পৌঁছাবার পথ সুগম করেন; এমনকি এক পর্যায়ে “উসামা বিন লাদেনের মস্তিষ্ক” হয়ে ওঠেন। অথচ নিছক ধারণা ছাড়া এসমস্ত কথাবার্তার কোনো প্রমাণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, আবু উবাইদাহ আল-পানশিরি এবং আবু হাফস আল-মিশরির এমন কোনো আচরণই পাওয়া যায় না যেটা দিয়ে বলে দেওয়া যায় যে, তারা উসামা বিন লাদেনের প্রতি পুরোপুরি আনুগত্যশীল ছিলেন না; কিংবা তারা ডা. জাওয়াহিরির হয়ে তাঁর আল-কায়েদায় প্রবেশের পথ সুগম করছেন। এমনকি উসামা বিন লাদেনের নিজস্ব চিন্তাচেতনায় ডা. জাওয়াহিরির গভীর প্রভাব ছিল বলেও যথেষ্ট প্রমাণ নেই। বরং সমস্ত প্রমাণ এর বিপরীতটাই নির্দেশ করে। এটাও যে আসলে সৌদির বানানো ‘খারাপ মিশরীয়দের পাল্লায় পড়ে সহজ সরল সৌদি যুবকের নষ্ট হয়ে যাওয়া’ গল্পের একটি অংশ, তা বুঝতে এত বেগ পেতে হয় না।

সৌদির বোনা গল্প সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে লরেন্স রাইটের The Looming Tower বইতে। লরেন্স রাইট তার বইতে সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগির একটি গল্প এনেছেন। আর তা হলো জামাল খাশোগিকে নাকি বিন লাদেন পরিবারের পক্ষ থেকে সুদানে পাঠানো হয়েছিল যেন উসামার একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে আসা হয়। তো তারা চেয়েছিল যেন তাদের পরিবারের ছেলেকে চিত্রায়ন করা হয় যুদ্ধক্লান্ত, হতাশ এবং সহিংসতা ছেড়ে দিয়ে কেবল ক্ষেত খামার নিয়ে ব্যস্ত সহজ সরল হিসেবে। কেননা “সেটা (সৌদি) সরকারের প্রতি স্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত দিতো যে তিনি তাদের (জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার) শর্তগুলো মেনে নিয়েছেন।” লরেন্স রাইট লিখেছেন, “খাশোগির সাথে বেশ কয়েকবার মিটিংয়ের পর উসামা বিন লাদেন তাঁর সাথে একদিন রাতের খাবারে যোগ দেন। তখন উসামা ‘মদিনাকে কতোটা মিস করেন, সেখানে ফিরে যেতে কতোটা আকুল হয়ে আছেন’ সেইসব কষ্টের

কথা বলে চলছিলেন।" [385] তাই খাশোগি নাকি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে তিনি সৌদি সরকারকে খুশি করার মতো একটি সাক্ষাৎকার নিতে পারবেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। লরেন্স রাইটের ভাষায়,

> *"এমন সময় কেউ একজন উসামার কাছে এসে তাঁর কানে কানে কিছু একটা বললো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর উদ্যানের দিকে চলে গেলেন। সেখানে খাশোগি অস্পষ্টভাবে দুই তিনজনকে মিশরীয় টানে আলাপ করতে দেখেন। মিনিট পাঁচেক পর উসামা ফিরে এলে খাশোগি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন (তিনি জিহাদ ত্যাগ করবেন কিনা)। এবার উসামা বিন লাদেন জিজ্ঞাসা করলেন, "বিনিময়ে আমি কী পাব?" একথা শুনে খাশোগি তাজ্জব বনে গেলেন। উসামা এর আগে কখনোই নিজ স্বার্থের জন্য এভাবে রাজনীতিবিদের মতো কথাবার্তা বলেননি। "আমি আসলে জানি না। আমি তো সৌদি সরকারের হয়ে এখানে আসিনি।" বলে খাশোগি দুর্বলতা স্বীকার করে নিলেন। সেটা শুনে উসামা বিন লাদেন মুচকি হেসে বললেন, "তা ঠিক আছে। কিন্তু এমন একটি পদক্ষেপ অনেক হিসেব নিকেশ করেই নিতে হবে।" এরপর তিনি (বিন লাদেন) কিছু শর্ত দিলেন: তাঁকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দিতে হবে, আরবের ভূমি থেকে আমেরিকার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে নেওয়ার স্পষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করতে হবে। খাশোগির মনে হতে থাকলো যে তাঁর বন্ধু বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।"* [386]

এতটুকুতেই আপনারা সৌদি ন্যারেটিভের মোটামোটি একটি পূর্ণ চিত্র পেয়ে যাবেন। একজন ভাল কিন্তু কিছু ভুল করা সৌদির (উসামা) কাছে আরেকজন ভাল সৌদি লোক (খাশোগি) গেল এবং তাঁকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে ফেরার সুযোগ দিলো। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবং যারপরনাই অখুশি উসামা যে মুহূর্তে প্রায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তখনই রহস্যময় এক লোক এসে বাগানে 'মিশরীয় টানের আরবি' বলা (আইমান আজ-জাওয়াহিরি, আবু হাফস এবং আবু উবাইদাহ) লোকদের সাথে আলাপ করতে ডেকে নিয়ে গেল। পরে যখন উসামা খাবার টেবিলে ফিরে এলেন, তখন কিনা তিনি একেবারে ভিন্ন

---

385 Wright, The Looming Tower, p. 199.

386 Wright, The Looming Tower, p. 199.

মানুষ! যেন একেবারে অবাধ্য এমনকি মানসিক ভারসাম্যহীন। খাশোগির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে যেন তিনি মিশরীয়দের দেখানো সর্বনাশের পথে হাঁটলেন!

লরেন্স রাইটের বইয়ের এই অংশটুকু পড়ে আমার কাছে মার্ক টোয়েনের সেই মন্তব্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এক উপন্যাসের কাহিনীতে ঘটনাক্রমে এক কামানের গোলার অসম্ভব দূরত্ব অতিক্রম করার পর, সেখানকার একটি চরিত্রের দ্বারা সেই গোলা কোত্থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেটাও নিখুঁতভাবে বের করে ফেলার উদ্ভট কথাবার্তা লিখা হয়েছিল। তো এই পুরো ব্যাপারটা উল্লেখ করে মার্ক টোয়েন শুধুমাত্র একটি ছোট্ট মন্তব্যই করেছিলেন, "ব্যাপারটা একটু বেশিই মিলে গেল না?" [387]

387 যে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, তা সত্য হলেও সেটা ছিল খুবই সাধারণ এক ঘটনা। কেননা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে সহযোদ্ধাদের সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করা খুবই সাধারণ এক ব্যাপার।

রাসূলুল্লাহ সা. অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন। উসামা বিন লাদেনও একই বিষয়েই আমল করেছিলেন মাত্র। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনাটিকেই সৌদি ন্যারেটিভের অন্যতম চরিত্র জামাল খাশোগি আর সেটার প্রচারক লরেন্স রাইট মিলে যেভাবে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করে নিজেদের 'মিশরীয়দের দ্বারা ভাল যুবকটির ব্রেইনওয়াশ' ন্যারেটিভের দলিল বানিয়ে ফেলেছেন, তা অবাস্তব এবং হাস্যকর পর্যায়ের।

সহযোদ্ধাদের সাথে উসামা বিন লাদেনের পরামর্শের ঘটনা সত্য হলেও আর যাই হোক 'ব্রেইনওয়াশ' ধরনের কিছু ছিল না, যেমনটা সৌদি ন্যারেটিভে উঠেপড়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

সৌদির সংস্কারবাদীদের সমর্থন

সৌদি আরব থেকে উসামা বিন লাদেনের বিদায়ের মাধ্যমেই যে তিনি সেখানকার ইসলামি সংস্কার আন্দোলন থেকে নিজের সমর্থন উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। ১৯৮৯ কিংবা তারও আগে থেকেই এই আন্দোলনের সদস্যদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। একদিকে আফগান জিহাদে এই আন্দোলনের সদস্যদের সমর্থন এবং সহযোগিতা ছিল; অপরদিকে সংস্কারবাদীদের পক্ষ থেকে কিং ফাহাদ এবং গ্র্যান্ড মুফতির কাছে যথাক্রমে পাঠানো দুটো চিঠি – 'দাবিদাওয়ার ঘোষণাপত্র' এবং 'উপদেশের স্মারকলিপি'র প্রতি উসামারও পূর্ণ সমর্থন ছিল। এই উদ্যোগগুলোকে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "সদয়, স্বচ্ছ এবং সৎ পদক্ষেপ"। তিনি নিজেও সৌদিরাজকে শরিয়াহ আইনে ফিরে যেতে, দুর্নীতির সমাপ্তি টানতে এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে মনোযোগী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই সাথে আহ্বান জানিয়েছিলেন ইয়েমেন থেকে শুরু করে ফিলিস্তিন এবং বলকান পর্যন্ত ইসলামি ইস্যুগুলোয় শত্রুর ভূমিকা ছেড়ে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। সাহওয়া আন্দোলনের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিগুলোকে তিনি ইসলামি শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, আর কারণ হিসেবে বলেছিলেন শাসকদেরকে নাসিহা দেওয়া "ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।" [388]

ইসলামি সংস্কারের দিকে সৌদির ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে উসামা বিন লাদেন ১৯৯৪-এর প্রথমদিকে Advice and Reform Committee (ARC) গঠন করেন। ARC-এর প্রকাশ্য অফিস লন্ডনে রাখা হলেও এর সমস্ত প্রজ্ঞাপন, ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা হতো সুদানে। ১৯৯৩-১৯৯৪ সময়কালে সংস্কার আন্দোলনের আলিম ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওপর সৌদি প্রশাসনের বর্বর আচরণই মূলত উসামা বিন লাদেনের ARC গঠনের ট্রিগার হিসেবে কাজ করেছিল। যতো সময় গড়াচ্ছিল, আন্দোলন সমর্থকদের ওপর দমন নিপীড়ন আর বর্বরতা বেড়েই চলছিল। আর যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে – গণহারে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে বিন লাদেনের দুজন শ্রদ্ধাভাজন আলিম – সালমান আল-আওদাহ এবং সফর আল-হাওয়ালিও ছিলেন। আন্দোলনের সামনের সারির নেতাকর্মীদেরকে আটক করে ফেলার পর উসামা বিন লাদেন তাঁদের স্থলে প্রকাশ্যে কথা বলতে এগিয়ে আসেন। এমনকি ARC-এর অফিস পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর বন্ধু খালিদ

---

388 ARC, 12 April 1994.

আল-ফাওয়াজকে নাইরোবি থেকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন; এবং নিজে সুদান থেকে সেটার সমস্ত বক্তব্য-প্রকাশনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। এর মাধ্যমে উসামা বিন লাদেন (বাইরে থেকেও) তাঁর বার্তা একেবারে সৌদিরাজ্যের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর সফল কৌশলের প্রমাণ বহন করে। সৌদি প্রশাসনের প্রতি তাঁর বার্তা ছিল দরদী আলিমদের থেকে পরামর্শ নেওয়ার। এই ব্যাপারে হাল ধরার কারণ হিসেবে তিনি লিখেছিলেন যে, ARC গঠন করা হয়েছিল "আমাদের আরব উপদ্বীপের ভাইদের সাথে পরামর্শ করেই।" [389] আল-কুদস আল-আরাবিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "সৌদি প্রশাসন যখন আলিমদের ওপর জুলুম শুরু করলো, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদগুলো থেকে তাঁদেরকে বহিষ্কার করলো, এমনকি তাঁদের লিখা বক্তব্য প্রচারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করলো, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম – (সৌদি) প্রশাসন তাঁদের জবান বন্ধ করিয়ে দিলে আমিই সৎকাজের উপদেশ এবং খারাপ কাজের নিন্দা করতে শুরু করবো। আর এটা তো সৌদিতে নিষিদ্ধই করা হয়েছিল।" [390]

ARC একেবারে সৌদ পরিবারের আচরণ থেকে শুরু করে সৌদির অর্থনৈতিক, অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে লিখিত বিবৃতি দিতে শুরু করেছিল। সেগুলোতে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সালের গবেষণা-পরিসংখ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এই সমস্ত ইস্যুগুলো ছাড়াও ঐ বিবৃতিগুলোতে রাজ পরিবারকে টার্গেট করে উসামা বিন লাদেনের ক্রমবর্ধমান সমালোচনাও স্থান পেতো। এমনকি এক সময়ে কিং ফাহাদকে অনৈসলামিক ঘোষণা করা সহ, রাজ পরিবার এবং সৌদির ধর্মীয় সমাজের প্রকাশ্য নিন্দাও সেসব বিবৃতিতে স্থান পেতে থাকে। আর অবশ্যই সেগুলো রাজ পরিবারের চোখে পড়ছিল – তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছিল 'নিজেদের ইসলামবিদ্বেষের উপর অটল-একগুঁয়ে' হিসেবে। কিন্তু (এমন প্রকাশ্য নিন্দা সত্ত্বেও অহিংস) সংস্কারবাদী আলিমগণ সেসময় এই বিবৃতিগুলো সমর্থন করেছিলেন। [391]

যাই হোক, এই বিবৃতিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এগুলোই আমাদের জন্য প্রথম উসামা বিন লাদেনের নিজস্ব চিন্তাভাবনার বিস্তারিত লিখিত রূপ। এছাড়াও সেগুলোর দিকে (আমেরিকার) মনোযোগী হওয়া বাঞ্চনীয় কারণ উসামা বিন লাদেন সেসবে প্রচ্ছন্নভাবে

389 ARC, 12 April 1994.

390 Atwan, "Interview with Usama bin Laden", 27 November 1996.

391 ARC, "Higher Committee for Harm!" 15 October 1994.

উল্লেখ করে দিয়েছিলেন যে – তিনি আল-কায়েদাকে প্রচলিত জঙ্গিবাহিনী হিসেবে রাখবেন না। সংজ্ঞানুসারে প্রচলিত জঙ্গিবাহিনী নিজ শত্রুর প্রতি আক্রমণাত্মক হলেও জাতীয় পর্যায়ের হুমকি হয় না। বিবৃতিগুলো প্রমাণ করে যে উসামা বিন লাদেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন – তিনি এবং আল-কায়েদা মুসলিমদেরকে দখলদার-জুলুমবাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় আনতে সাহায্য করবেন; তারা আবু নিদাল, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি কিংবা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের মতো শত্রুকে স্রেফ এদিকে ওদিকে জ্বালাতন করা জঙ্গিবাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না।

ARC-এর বিবৃতিগুলোই উসামা বিন লাদেনের পরবর্তী সব প্রকাশ্য বক্তব্য এবং গোপন পরিকল্পনার মোটামোটি একটি স্পষ্ট রূপরেখা গড়ে দিয়েছিল। সেগুলোর প্রথম ফোকাস ছিল সৌদ পরিবারের সীমাহীন দুর্নীতি, এবং বিশেষ করে তেলসম্পদ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে না পারার ব্যর্থতা। 'ভাল প্রশাসন' বলতে উসামা বিন লাদেনের গভীর এবং স্থায়ী বুঝ কী ছিল, তা এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। ARC-এর বিবৃতিগুলোর পরবর্তী ফোকাস ছিল সৌদি প্রশাসন এবং এর সংস্কার চাওয়া তরুণ আলিমদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ। সংস্কারপন্থীরা স্রেফ রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন চাইছিল; কিন্তু তাদেরকে যেভাবে পারা যায় দমন করা হচ্ছিল। আর তৃতীয় যে ব্যাপারটা ফোকাসে ছিল, তা হলো সৌদির পররাষ্ট্রনীতি। সৌদি প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতিকে উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর ARC সহকর্মীরা কেবল অনৈসলামিকই নয়, বরং ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। [392]

ARC-এর বিবৃতিতে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে, সৌদি আরবের ভঙ্গুর অর্থনীতির কারণ হলো সরকারি লোকদের "ব্যক্তিগত অপচয় করার মানসিকতা" যারা কিনা "দেশের অর্থ এবং সম্পদের সিংহভাগই নিজেদের পেটপূজো করতে ঢেলে দেয়।" [393] রাজ পরিবারের সদস্যরা নিজেদের জোর খাটিয়ে সরকারি বিভিন্ন খাত থেকে, বিশেষ করে

392 এর পরের বেশ কিছু প্যারা জুড়ে লেখক ARC-এর বিবৃতিতে উসামা বিন লাদেনের বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি কখনও সরাসরি বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আবার কখনও নিজের ভাষায় উসামা বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তাই বর্ণনা পড়ে সেগুলোকে লেখকের নিজের অবস্থান ভেবে বসলে ভুল হবে।

393 ARC, 12 April 1994, and ARC, "Do not have vile actions in your religion", 16 September 1994.

"সামরিক খাতে ঢালা বিপুল পরিমাণ অর্থ থেকে" নিজেদের জন্য গ্রাস করে নিয়েছিল।[394] উসামা বিন লাদেনের মতে, "সামরিক খাত আসলে প্রভাবশালী প্রিন্সদের ইচ্ছেমতো আয়ের উৎস" ছাড়া আর কিছুই না। এর ওপর এই খাতে ব্যয় যে কেবল বিপুল পরিমাণ ছিল তাই নয়; বরং তা সৌদির সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুত করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯০-১৯৯১ সালে রাজ্যকে সাদ্দামের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে আমেরিকা এবং পশ্চিমাদের দ্বারস্থ হওয়া লেগেছিল।[395] শুধু তাই নয়, সৌদ পরিবারের সদস্যরা এতটাই অর্থলোভী যে, তারা বসনিয়ার ত্রাণের জন্য সৌদির সাধারণ নাগরিকদের দেওয়া অর্থও নিজেদের অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়েছিল; আর তারপর "দাতব্য সংস্থাগুলোকে বিলীন করে দিয়ে" সেই স্থানে "রাজ পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং ফাউন্ডেশন" গড়ে তুলেছিল।[396] এই সমস্ত অপরাধের জন্য বিবৃতিগুলোয় রাজ পরিবার বিশেষ করে কিং ফাহাদ, প্রিন্স সুলতান, প্রিন্স নায়েফ এবং রিয়াদের গভর্নরকে দায়ী করা হয়।[397] এই লোকগুলোই জনগণের সম্পদ লুট করার নেতৃত্ব দিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়।[398]

রাজ পরিবারের সীমাহীন লোভ এবং দুর্নীতি পুরো দেশটাকেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়; একজন সাধারণ সৌদির জন্য জীবনযাত্রা হয়ে উঠে "নিকৃষ্ট ছা-পোষা মানের"। সরকারি সামাজিক উদ্যোগগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, বিশেষ করে জনগণ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় সরকারিভাবে খাবার পানির প্রয়োজনীয় সরবরাহ না থাকার কারণে। অথচ পানি "জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান।"[399] এর ওপর রাজ পরিবারের লোকদের মাত্রাছাড়া অপব্যয় "খাদ্য, ঔষধ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল।" রিয়াদ প্রশাসন জাতীয় ঋণের বোঝা ভারী করে চলছিল। আর সেটার সুদ ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছিল বেকারত্বের হার, যা "দেশের কলেজ গ্রাজুয়েট এবং যুবকদেরকে প্রায় দশক ধরে পিষে মারছিল।"[400]

---

394 ARC, 12 April 1994.

395 ARC, "An open message to King Fahd", 3 August 1995.

396 ARC, "Prince Salman and the Ramadan alms", 12 February 1995.

397 ARC, 3 August 1995.

398 ARC, "Prince Sultan and the aviation commissions", 11 July 1995.

399 ARC, 12 April 1994.

400 ARC, 11 July 1995.

কিং ফাহাদকে সম্বোধন করে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "সমস্যার গোড়া হলো – আপনি এবং আপনার প্রশাসন তাওহিদের জন্য অপরিহার্য বিষয়াদি এবং এর ফারজিয়্যাত থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছেন... আপনি আর আপনার প্রশাসন প্রবৃত্তিতাড়িত মানবরচিত আইন প্রণয়ন করেছেন এবং তা দিয়েই শাসন করে আসছেন..." [401] মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করা "আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করার শামিল। এইসব আইন হারামকে হালাল (এবং হালালকে হারাম) ঘোষণা করে।" উদাহরণস্বরূপ, সুদকে বৈধ করা হয়েছে অথচ তা "এক জঘন্যতম কবিরাহ গুনাহ।" [402] তিনি আরও লিখেছিলেন যে, এইসমস্ত ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা হলো মানবরচিত আইন বিলুপ্ত করে পরিপূর্ণ শরিয়াহভিত্তিক শাসনে ফিরে যাওয়া। (মানবরচিত আইন প্রণয়নের) প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র এটাই।

এছাড়াও উসামা বিন লাদেন সৌদির তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি বিন বাযকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন যে, কেন সৌদি পরিপূর্ণ ইসলামি আইনে ফিরে যাচ্ছে না? এরপর নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, কেননা বিন বায এবং তাঁর সহচররা মিলে শাসককে খুশি রাখার জন্য সত্যকে বিকৃত করে ফাতওয়া দিতেন। [403] এহেন কাজ রাষ্ট্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে আর প্রশাসনের আলিমদের প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি করে। বিন বাযকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিন লাদেন বলেছিলেন যে, এটা তো এক ভয়াবহ পরিস্থিতি; কেননা আলিমদের প্রতি সর্বসাধারণের আনুগত্য "তাঁদের দ্বারা হক হিফাজত থাকার ওয়াদা রক্ষার" সাথে সম্পর্কিত। [404] আল্লাহর দ্বীনের অবক্ষয়ের সূচনা হয় খারাপ শাসক এবং খারাপ আলিমদের সমন্বয়ে; আর সৌদ পরিবার তো রীতিমতো দাজ্জাল। [405] উসামা বিন লাদেন তাই গ্র্যান্ড মুফতির প্রতি আবেদন রাখেন যেন তিনি "আল্লাহকে ভয় করেন এবং ওইসব জালিম ও দুষ্কৃতকারী শাসকদের থেকে দূরত্ব বজিয়ে রাখেন, যারা কাজেকর্মে আল্লাহ আর তাঁর রাসূল সা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।" [406]

---

401 ARC, 3 August 1995.

402 ARC, "Open letter to Shaykh bin Baz on the invalidity of his fatwa on peace with the Jews", 29 December 1994.

403 ARC, "The second letter to Shaykh bin Baz", 29 January 1995.

404 ARC, "Scholars are the Prophet's successors", 6 May 1995.

405 ARC, 16 September 1994; ARC, "Scholars are the Prophet's successors", 6 May 1995.

406 ARC, 29 December 1994.

ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের আলিমদের ওপর সৌদি প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা এবং নির্যাতনের দরুণ ARC-ও রাজ পরিবার এবং সরকারি আলিমদের ওপর আক্রমণ দ্বিগুণ করে দেয়। ১৯৯৪-এর মাঝামাঝি সময়ে উসামা বিন লাদেন সংস্কারবাদীদের গ্রেপ্তার এবং আটককে "সাধারণ মানুষকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে কিং ফাহাদের নীতি" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে সবচেয়ে জঘন্যতম গ্রেপ্তার ছিল "দুইজন শ্রদ্ধেয় আলিমকে গ্রেপ্তার" – শাইখ সালমান আল-আওদাহ এবং শাইখ সফর আল-হাওয়ালি। [407] এই ঘটনাকে তিনি উল্লেখ করেছিলেন "দিনারের গোলাম এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিক্রি করে দেওয়া লোকদের এক নিকৃষ্ট অপরাধ" হিসেবে। [408] উসামা বিন লাদেন এমনও অভিযোগ করেছিলেন যে, আমেরিকা "মুসলিমদেরকে দমিয়ে ইহুদিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবেই" কিং ফাহাদকে আদেশ দিয়েছিল যেন "(সরকার বিরোধী) গণ্যমান্য আলিম এবং দাঈদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।" [409]

সৌদ পরিবারের কার্যকলাপ যতটা না খারাপ ছিল, তার চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল রাজ্যের সরকারি আলিমদের নীরবতা। বিন লাদেন রেগেমেগে লিখেছিলেন, "আপনাদের তো আপনাদের আলিম ভাইদের পাশে দাঁড়াবার কথা ছিল।" কিন্তু যখন সৌদ পরিবার "উম্মার শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুজাহিদ আলিমদেরকে" গ্রেপ্তার করছিল, তখন সরকারি আলিমরা কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করেছিল। [410] উসামা বিন লাদেন প্রথমদিকে বিন বাযকে ছেড়ে কথা বলছিলেন কেননা তিনি গ্রেপ্তারকৃত আলিমদের পক্ষাবলম্বন করে কিছু কথা বলেছিলেন। কিন্তু যখন বিন বায সেইসব গ্রেপ্তারকে বৈধ ঘোষণা করে ফাতওয়া দিলেন, বিন লাদেন তখন আর গ্র্যান্ড মুফতি এবং তাঁর সহকর্মীদেরকে ছাড় দিলেন না; কেননা তারা দ্বীনের ওপর "দুনিয়াবি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন"। রাসূল সা.-এর সত্যিকার ওয়ারিশদের দায়িত্ব হলো "প্রকাশ্যে হক বর্ণনা করা এবং কাফির-জালিম শাসকদেরকে পরোয়া না করা"; কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাসূলের সত্যিকার ওয়ারিশ হওয়া থেকেও যোজন

---

407 ARC, "Saudi Arabia unveils its war against Islam and its scholars", 12 September 1994.

408 ARC, "Quran scholars in the face of despotism", 19 July 1994; ARC, "Saudi Arabia unveils its war against Islam and its scholars", 12 September 1994.

409 ARC, 19 July 1994, and ARC, "Saudi Arabia continues its war against Islam and its scholars", 9 March 1995.

410 ARC, 16 March 1994.

যোজন দূরে সরে গিয়েছেন।[411] হামলা এবং গ্রেপ্তার শুরু হওয়ার পর উসামা বিন লাদেন সৌদ পরিবারকে যেভাবে বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে", একইভাবে (বিন বাযের ফাতওয়ার পর) তিনি বিন বায এবং তাঁর সমমনা আলিমদেরকে বলেন যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গিয়েছে।[412]

উসামা বিন লাদেন লিখেন, "আমরা উক্ত অবস্থানে থাকা আলিম এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না, যারা কিনা একটি বিবৃতি দিয়ে হলেও জুলুমের শিকার বান্দাদের পাশে দাঁড়াতে পারতেন।"[413] তাই এইসমস্ত সরকারি আলিমদেরকে সৌদ পরিবারের মতোই দ্বীনের মিসকিন হিসেবেই গণ্য করা হবে, কেননা "সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য সৃষ্টির প্রতি কোনো আনুগত্য নেই।"[414] [415]

অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি ছাড়াও সংস্কারপন্থী আলিমদেরকে গ্রেপ্তার এবং প্রশাসনে থাকা আলিমদেরকে পোষ্য বানিয়ে ফেলার কারণে উসামা বিন লাদেন সৌদ পরিবারের কঠোর সমালোচনা করেন।[416] এরপর তাঁর সমালোচনার মোড় ঘুরে যায় রিয়াদের পররাষ্ট্রনীতি এবং যেসমস্ত আলিমরা তা সমর্থন করতেন তাদের, বিশেষ করে শাইখ বিন বাযের দিকে। ১৯৯৫ সালের আগস্টে কিং ফাহাদকে বিন লাদেন বলেন, "আপনার প্রশাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটা পশ্চিমা ক্রুসেডার রাষ্ট্র এবং মুসলিমদের ওপর চড়াও হওয়া জালিম শাসকদের স্বার্থ রক্ষা করে চলে। এটা প্রমাণের জন্য খুব একটি কষ্টও করতে হবে না।"[417] একের পর এক বিবৃতিতে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্রন্টের ব্যাপারে বিন লাদেন রিয়াদের পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন।

---

411 ARC, 6 May 1995.

412 ARC, 12 September 1994.

413 ARC communiqué, untitled, undated.

414 এখানে 'অবাধ্য' বলতে ঈমান থেকে বের করে দেয়, এমন কুফরের ওপর অটল থাকা বোঝানো হচ্ছে। যেমন: আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করা কিংবা আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা ইত্যাদি।

415 ARC, "The Saudi regime and the repeated tragedies of the pilgrims", 16 April 1997, and ARC communiqué, untitled, undated.

416 ARC, 6 May 1995 and ARC, 15 October 1994.

417 ARC, 3 August 1995.

ইয়েমেন

উসামা বিন লাদেন লিখেছিলেন, “ইয়েমেনেই প্রথম সৌদি প্রশাসন ইসলামের শত্রুদেরকে সমর্থন করার বাজে অভ্যাসটি গড়ে তুলেছে।” ইয়েমেনের নাস্তিক্যবাদী সোশ্যালিস্ট পার্টি সেখানকার মুসলিমদেরকে রীতিমতো দাস বানিয়ে রেখেছিল, নিরীহ উলামাদেরকে হত্যা করেছিল এবং সর্বস্তরে ইরতিদাদ (দ্বীন থেকে বের করে দেওয়া কার্যকলাপ) এবং দুর্নীতিতে সয়লাব করে দিয়েছিল। তাই সেখানকার সাধারণ মুসলিমরা স্থানীয় উলামাদের নেতৃত্বে সেই নাস্তিক্যবাদী প্রশাসনের পতন ঘটাতে আন্দোলন করছিল। উসামা বিন লাদেন লিখেন, “আশ্চর্যজনক হলেও সৌদ পরিবারের লোকেরা বিশেষ করে কিং ফাহাদ এবং প্রিন্স সুলতান – মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের সোশ্যালিস্ট পার্টিকে সমর্থন করেছিল। সৌদির মতো ইয়েমেনেও রিয়াদ আর তার দরবারি আলিমরা নাস্তিক্যবাদীদের সমর্থন যুগিয়ে ইসলামি জাগরণকে পিষে মারতে চেয়েছিল।” [418]

জাতিসংঘ

ARC-এর বিবৃতিগুলোয় জাতিসংঘের প্রতি মনোযোগ ছিল তুলনামূলক সীমিত। কিন্তু যেটুকু ছিল, তা-ই মোটামোটি পরবর্তী সময়ে এই সংস্থা সম্পর্কে উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার চিন্তার একটি ধারণা দিয়ে দিয়েছিল। বিন লাদেন স্পষ্টই বলেছিলেন, “জাতিসংঘ আদতে ইসলাম এবং মুসলিমদের উত্থানকে ঠেকাতে ক্রুসেডারদের একটি উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতিসংঘের বাস্তবতা মুসলিমদের কাছে শুরু থেকেই পরিষ্কার ছিল, কিন্তু তবুও সৌদি প্রশাসন ক্রুসেডারদের এই সংঘকে ফিলিস্তিন এমনকি এর চেয়েও স্পর্শকাতর ময়দানে সাহায্য করে এসেছে। বলকানে সৌদি আরব জাতিসংঘের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করার ফলে বসনিয়ান মুসলিমদেরকে সার্বিয়ান দানবদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। (কিছুদিন পরপরই) এমন ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, জাতিসংঘের মুখোশ সামনে রেখে পশ্চিম মানবাধিকার আর সমানাধিকারের যেসব বুলি ফেরি করে বেড়ায়, মুসলিমদের বেলায় সেগুলো মৃত স্লোগান ছাড়া আর কিছুই নয়। ARC তাই উপসংহার টেনেছিল যে, “জাতিসংঘকে সাহায্য সমর্থন করে সৌদি প্রশাসনও

---

418 ARC, “Saudi Arabia supports the communists in Yemen”, 7 June 1994, and ARC, 29 December 1994.

নিজেদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আরেকটি সেক্যুলার সরকার হিসেবেই প্রমাণ করেছে... আর সেক্যুলারিজম তো নাস্তিকতায় গিয়েই ঠেকে।" [419]

আমেরিকা

কিং ফাহাদকে উদ্দেশ্য করে উসামা বিন লাদেন বলেন, "বাস্তবে সৌদি আরব তো আমেরিকার আইনের অধীনে আমেরিকার আরেকটি আশ্রিত রাজ্য ছাড়া কিছুই না।" [420] ১৯৯০ সালে আমেরিকা সহ পশ্চিমা বাহিনী গিয়ে সৌদিতে ঘাঁটি বানাবার পর তিনি লিখেন, রিয়াদ প্রশাসন "আজ আরবকে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি দিয়ে পূর্ণ করেছে", অথচ "আমেরিকা আর তার মিত্ররা দেশের অর্থ ও সম্পদ যেভাবে পারে লুটপাট করে।" [421] এছাড়াও কিং ফাহাদকে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, "আমাদের (সৌদিদের) কি জানার অধিকার আছে না – কেন ওরা এত লম্বা সময় থেকে গেল?" [422] উসামা বিন লাদেন স্পষ্টভাবে বলেন – ফাহাদ, তার মন্ত্রী আর তাদের আলিমরা মিলে কাফিরদেরকে আরবের মাটিতে এনেছে এমন এক "হঠকারি" ফাতওয়ার ওপর ভর দিয়ে, যেটা "উম্মাহর সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে।" [423] এমন সিদ্ধান্তের ফলে রিয়াদ আমেরিকার অনুগত সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে (আর ফলস্বরূপ): "যখনই ইসলামের সাথে পশ্চিমা স্বার্থের সংঘর্ষ হয়েছে, তখনই আপনারা পশ্চিমা স্বার্থের পক্ষাবলম্বন করেছেন।" বিশেষ করে এমনটাই হয়ে এসেছে ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, ইয়েমেন এবং সুদানে। বিন লাদেন দাবি করেন, "পশ্চিমা এবং ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো বাইরে থেকে আপনাদের নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে। আর আপনারাও পশ্চিমা কাফির রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ নিয়ে ইসলামি স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে যান।" তিনি জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার যদি এটাই না হয়ে থাকে, তাহলে রিয়াদ তার আলিমরা মিলে কেন সৌদি যুবকদেরকে আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাগাদা দিল, কিন্তু সেই একই কাজে ইয়েমেনে বাধা দিল? তাঁর মতে, এর উত্তর হলো – আমেরিকা চেয়েছিল সোভিয়েত আর আফগান কমিউনিস্টদেরকে হত্যা করা হোক, কিন্তু ইয়েমেনের

---

419 ARC, 11 August 1995; ARC, 12 September 1994; ARC, 29 January 1995.

420 ARC, 3 August 1995.

421 ARC, 19 July 1994, and ARC, 16 April 1997.

422 ARC, 3 August 1995.

423 ARC, 29 December 1994.

মার্ক্সিস্ট রেজিম বহাল তবিয়তে থাকুক।[424] উসামা বিন লাদেনের উপসংহারে, এই ধরনের (পশ্চিমবান্ধব) পররাষ্ট্রনীতি সৌদ পরিবারের ইসলামি গ্রহণযোগ্যতা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।[425]

ফিলিস্তিন

এসম্পর্কে উসামা বিন লাদেন বলেন, "এটা হলো সমস্ত ইসলামি ইস্যুর মায়ের মতো।"[426] আর মুসলিমদের এই পবিত্র ভূমিতে আগ্রাসন চালানো ইহুদিদের সাথেই কিনা সৌদি রাজ পরিবার আর তাদের আলিমরা সম্পর্ক গড়ার হঠকারিতা করেছে।[427] শাইখ বিন বায দখলদার ইহুদিদের সাথে শান্তিচুক্তির অনুমোদন দিয়ে ফাতওয়া দিয়েছিলেন। উসামা বিন লাদেন সেই ফাতওয়ার সমালোচনা করে বলেছিলেন, "এটা আসলে ছিল জালিম কাপুরুষ আরবদের জন্য ইসরাঈলের কাছে মাথা নত হওয়ার বৈধতা।" এছাড়া উসামা আরও বলেন যে, বিন বাযের সেই ফাতওয়া ছিল ফিলিস্তিনের ব্যাপারে তাঁর আগের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা পূর্বে তাঁর ফাতওয়া ছিল – জেরুজালেম পুনরুদ্ধার এবং "দখলদার বিদেশি ইহুদিরা যে যেখান থেকেই এসেছে, সম্পূর্ণ ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত" জিহাদের ডাক।[428] সেখানেও শেষ না, বিন বাযের পরবর্তী ফাতওয়া হয়েছে "বৃহত্তর ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আরেক ধাপ এগিয়ে দেওয়া, যেটা নীলনদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত... এককথায় আরব উপদ্বীপের এক বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত হতে চায়।"[429] উসামা বিন লাদেন লিখেন, "এই ফাতওয়ার মাধ্যমে বিন বায প্রমাণ করলেন যে তিনি ১৯৯০-এ মক্কা মদিনাকে আমেরিকার আগ্রাসনে ঠেলে দিয়েই খুশি থাকতে পারেননি, বরং এখন তিনি ফিলিস্তিনের আগ্রাসী ইহুদিদের কাছে আল আকসাকে তুলে দিতেও আগ্রহী।"[430] এছাড়া তিনি আরও

---

424 ARC, 3 August 1995.

425 ARC, 11 August 1995, and ARC, 7 June 1994.

426 ARC, 11 August 1995.

427 ARC, 29 December 1994.

428 ARC, 29 December 1994.

429 ARC, 29 January 1995.

430 ARC, 16 April 1997.

লিখেন, ‘‘ইহুদিদের কাছে আত্মসমর্পণমূলক যে শান্তিচুক্তিতে’’ রিয়াদ স্বাক্ষর করেছিল তা ‘‘ছিল উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর এবং বাস্তবতা বিবর্জিত।’’ তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘‘(সমর) বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কে এমন কথা বলেছিল যে – বিলিয়ন (শতকোটি) সংখ্যক মুসলিমরা পৃথিবীর এত সুবিশাল সম্পদ এবং এত এত কৌশলগত অঞ্চলের অধিকারী হয়েও ফিলিস্তিনে কেবল ৫ মিলিয়ন (পঞ্চাশ লক্ষ) ইহুদিকে হারাতে পারবে না?’’ [431]

এই বিবৃতিগুলোতে উসামা বিন লাদেন এটা একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তিনি জিহাদ ছেড়ে দেওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলেন। তাছাড়া এটাও স্পষ্ট করেছিলেন যে, তিনি আরব উপদ্বীপে আমেরিকার অবস্থানের বাইরেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আসলে সত্য হলো, উসামা তাঁর ভবিষ্যত যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিরও একটি ম্যাপ দিয়ে দেন। অবশ্য তখনও হয়তো তিনি চূড়ান্তরূপে স্পষ্ট করেননি যে, কোন টার্গেটকে আগে আঘাত করবেন – সৌদদেরকে, গোটা পশ্চিমকে নাকি আমেরিকাকে। তবে সৌদদের ওপর ওয়াশিংটনের হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণের দিকে তাঁর মনোযোগ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আমেরিকাকে তিনি একইসাথে কাছের এবং দূরের শত্রু হিসেবে দেখেছিলেন; এমন শত্রু – যাদের আধিপত্যকে সমস্ত বিশ্বের মুসলিমরাই মনেপ্রাণে নিজেদের জমিন থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। তাছাড়া উসামা বিন লাদেন স্পষ্টই নিজের সংকটসীমা [432] অতিক্রম করে ফেলেছিলেন। প্রকাশ্যে সৌদি রাজ পরিবারকে অভিযুক্ত করে; কিং ফাহাদ, গ্র্যান্ড মুফতি বিন বায এবং অন্যান্য রাজসদস্য ও আলিমদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে; এবং সর্বোপরি তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত উল্লেখ করে যেন তিনি নিজে আল্লাহর পক্ষাবলম্বন করবার কথা ঘোষণা করলেন। আর এসবের মাধ্যমে তিনি স্থায়ীভাবেই জিহাদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। ARC-এর বিবৃতিগুলো এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সেসময় থেকেই উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার মূল প্রেরণায় এই বিশ্বাস ছিল যে – ইসলাম অভ্যন্তরীণভাবে (স্থানীয়ভাবে) মুরতাদ প্রশাসন এবং বাহ্যিকভাবে (আন্তর্জাতিকভাবে) আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার ও ইহুদিদের আক্রমণের শিকার। তাই একমাত্র উপযুক্ত জবাব হলো আত্মরক্ষামূলক (দিফায়ি) জিহাদ। আজও আল-কায়েদা সেই একই প্রেরণায় উজ্জীবিত।

---

431 ARC, 29 December 1994, and ARC, 29 January 1995.

432 যে সীমা অতিক্রম করলে আর ফিরে যাওয়ার অবকাশ থাকে না।

কঠোরতর মনোভাব

লরেন্স রাইটের কাজগুলো দাবি করে যে, সুদানে থাকাকালীন সময়ে উসামা বিন লাদেন নাকি জিহাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন; তিনি নাকি একেবারে সাধারণ একজন গৃহী এবং ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। লরেন্সের ভাষায়, বিন লাদেন নাকি "স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি আর যুদ্ধ চান না। তিনি আল-কায়েদা চিরতরে ত্যাগ করে পুরোদস্তুর একজন খামারি হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।" এমনকি লরেন্স রাইট এমনও দাবি করেছে যে, বিন লাদেন নাকি কোনো কোনো শুক্রবারের জুমুআর সময় "খার্তুমের প্রধান মসজিদে খুতবাহ দিতেন আর মুসলিমদেরকে (সহিংসতা বিহীন) শান্তির দিকে আহ্বান করতেন।" [433]

অথচ ARC-এর বিবৃতিগুলোয় কিন্তু জিহাদ পরিত্যাগের কোনো লক্ষণই পাওয়া যায় না। তার ওপর ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে ARC গঠনের ঠিক প্রাক্কালে আল-কুদস আল-আরাবিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "পশ্চিম তো মুসলিমদের আত্মরক্ষার অধিকারই মেনে নিতে পারে না। আফগানিস্তানে আমাদের (আল-কায়েদার) অবস্থানের কারণে ইসলামের শত্রুদের একাংশ সেখানকার মুসলিমদের (তালেবান) সাথে আমাদের সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। পুরো বিশ্বই তো আজ বসনিয়া এবং দখলকৃত ফিলিস্তিনের ওপর চালানো নির্যাতন এবং বর্বরতা উপেক্ষা করে চলতে চায়। অথচ যখনই মুসলিমরা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে উদ্যত হয়, তখনই তাদেরকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী আখ্যা দিতে দেরি হয় না। তারা চায় যেন মুসলিমরা দুর্বল এবং নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করতে অক্ষম অবস্থায় থাকে। তাছাড়া আমরা এটাও জানি যে, কূটনৈতিকদের মধ্যে পরস্পর

---

433 Wright, The Looming Tower, p. 169.

উসামা বিন লাদেন খার্তুমে যে মসজিদটিতে সলাত আদায় করতেন, সেখানকার ইমাম অবশ্য বলেছিলেন যে বিন লাদেন কখনোই ইমামতি করেননি কিংবা খুতবাহও দেননি। শাইখ আবদুল গাফফার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, "তিনি দিনে পাঁচবার মসজিদে আসতেন। আর সবসময়ই খুব শান্তভাবেই আসতেন। তিনি ছিলেন খুব... খুবই শালীন এবং খুবই বিজ্ঞ একজন মানুষ। এবং সত্যিই একজন ভাল মুসলিম। আমি তাঁকে মসজিদে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেবল তাঁর সলাত আদায় করতে আসতেন; এর চেয়ে বেশি কিছু না... একজন ভাল মুসলিম! একেবারে শতভাগ, বুঝলেন তো?" দেখুন Bergen, The Osama bin Laden I Know, pp. 132–133.

যোগাযোগ রয়েছে; আর তারা সবাই আমাদের সাথে আমাদের ভাইদের যোগাযোগ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এতকিছুর পরও মুসলিমদের মধ্যে ঈমানি ভ্রাতৃত্ব জারি রয়েছে।" [434]

লরেন্স রাইট আরও দাবি করেন যে, উসামা বিন লাদেনকে জিহাদ থেকে চূড়ান্ত অবসর নেওয়ার একমাত্র অন্তরায় নাকি ছিল আরব উপদ্বীপে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি। [435] কিন্তু উপরের দলিল প্রমাণের আলোকে এটাও মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। উসামা বিন লাদেনের মনোযোগ বরং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই ছিল। আর সেটার একটি কারণ ছিল সুদানের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ। এই যোগযোগের কারণে সেখানকার আশেপাশের – বিশেষ করে আরব উপদ্বীপ, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর এবং মাগরিবের সমস্ত খবরাখবর ছিল তাঁর নখদর্পণে। [436] আর আরেকটি কারণ ছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুদানে উসামা বিন লাদেনের কাছে অতিথি হওয়া কিংবা তুরাবির Arab Islamic People's Congress-এ যোগ দিতে আসা অসংখ্য আলিমগণ। আবদুল বারি আতওয়ানকে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "সেইসব সাক্ষাৎ সুদানের দিনগুলোকে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ করে তুলেছিল।" [437] সুদানের প্রশাসন তথা ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF) সেসকল মুজাহিদদেরকেও স্বাগত জানিয়েছিল, যারা নিজেদের দেশে ফিরে গেলে কারাবরণ কিংবা মৃত্যুদন্ড পাবার শঙ্কা ছিল। [438] এভাবে আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের মুজাহিদরা সুদানে নিজেদের জন্য একটি ঠিকানা খুঁজে পায়। আর উসামা বিন লাদেনও এই নির্বাসিতদের সাথে আফগানিস্তান ও আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল-কায়েদা সদস্যদের এনে যুক্ত করেন; আর তাদেরকে "চাকরি, বেতন এবং ঘর" প্রদান করেন। [439]

---

434 Abdal-Karim and al-Nur, "Interview with Saudi businessman Usama bin Ladin." 106. Tawil, Brothers in Arms, p. 101.

435 Wright, The Looming Tower, p. 169.

436 Tawil, Brothers in Arms, p. 101.

437 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 48.

438 সুদানের NIF তথা হাসান আত-তুরাবির প্রশাসনের হঠকারিতার ঘটনা সামনেই আসছে। তাই এটুকু পড়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান রইলো।

439 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 49. সুদানে থাকার সময়কালে আলজেরিয়া, লিবিয়া এবং মিশর থেকে আসা ইসলামপন্থী বিদ্রোহী দলগুলোর সাথে উসামা বিন লাদেনের সম্পর্কের দুর্দান্ত এবং যুগান্তকারী বিশ্লেষণের জন্য দেখুন Tawil, Brothers in Arms.

তাছাড়াও সেসময় তিনি আল-কায়েদাকে বিশেষজ্ঞ আলিম এবং পরামর্শকদের দ্বারা শক্তিশালী করেছিলেন। ARC-এর প্রথম বিবৃতিতে তিনি সৌদির কিছু "ভাই এবং আলিমদের" সুদানে পৌঁছানোর কথা উল্লেখ করেছিলেন। একইসাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, "তাঁরা ইলমসম্পন্ন উপদেশ দিবেন এবং সমস্ত খারাপ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন।" [440] অবশেষে, ১৯৯৫-এ বলকান অঞ্চলে ডেটন চুক্তি [441] স্বাক্ষরিত হলে উসামা বিন লাদেন বসনিয়ার কিছু মুজাহিদদেরকে সুদানে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করেছিলেন। [442]

খার্তুমে থাকাকালীন সময়ে উসামা বিন লাদেন আমেরিকার ওপর হামলা জোরদার করার দিকেও মনোযোগী হন। ইয়েমেন আর সোমালিয়ার সংঘর্ষ আরব উপদ্বীপ থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। বিন লাদেনের মনে তখনও রাসূল সা.-এর মৃত্যুশয্যায় সেই হাদিস চিরভাস্বর, যেখানে তিনি আরবভূমি থেকে কাফির-মুশরিকদেরকে বের করে দিতে ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন। দূরের এবং কাছের শত্রুর মধ্যে ইসলামে সাধারণভাবে কাছের শত্রুকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়। আর আরবের ভূমিতে আমেরিকার বাহিনীর উপস্থিতি এই শ্রেণিবিভাগকে কিছুটা ঝাপসা করে দিয়েছিল। সাংবাদিক আহমাদ যায়দান লিখেছিলেন যে, সুদানে উসামা বিন লাদেন ইচ্ছে করেই " 'সবচেয়ে কাছের শত্রু'র ধারণাকে এড়িয়ে গিয়ে প্রধান এবং স্পষ্ট শত্রুকে (আমেরিকার) সংজ্ঞায়িত করেন।" ফলস্বরূপ তিনি এমন এক শত্রু চিহ্নিত করেন যে কিনা একইসাথে কাছের এবং দূরের শত্রু; এবং এর মাধ্যমে তিনি জিহাদি দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শত্রু চিহ্নিতকরণকে মুছে দেন। উদাহরণস্বরূপ, আইমান আজ-জাওয়াহিরির প্রথম দিকের পরিকল্পনা ছিল কাছের শত্রুকে (মিশরকেন্দ্রিক) আগে মোকাবেলা করা। [443]

---

440 ARC, 14 September 1994.

441 নব্বই দশকের শুরুর দিকে শুরু হওয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মধ্যকার যুদ্ধ ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপ অঞ্চলে হওয়া সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এতে প্রায় এক লাখ মানুষ নিহত এবং ২০ লাখের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে বসনিয়ার মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানি, প্রিজন ক্যাম্প, মুসলিমদের গণহত্যা সহ অসংখ্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়।

অবশেষে ১৯৯৫ সালে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এক 'অসম' শান্তিচুক্তির হাত ধরে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৫ সালের ১লা নভেম্বর আমেরিকার ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের ডেটনে অবস্থিত রাইট প্যাটারসন বিমানবাহিনীর দপ্তরে। এরপর একই বছরের ১৪ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সের প্যারিসে স্বাক্ষরিত হয়। এটাই ইতিহাসে ডেটন চুক্তি, প্যারিস প্রটোকল বা ডেটন প্যারিস চুক্তি নামে পরিচিত।

442 Scheuer, Through Our Enemies' Eyes, p. 152.

443 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask, pp. 6–7.

আল-কায়েদার প্রয়াত সামরিক কমান্ডার আবু হাফস আল-মিশরি আবদুল বারি আতওয়ানকে বলেছিলেন যে, ১৯৯৪-এ উসামা বিন লাদেন সামরিক এবং ARC-এর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় করতে শুরু করেন। আল-মিশরির ভাষায়, "আরব উপদ্বীপে আমেরিকার সামরিক, প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক টার্গেটসমূহে সফলভাবে অপারেশন চালানোর জন্য তিনি একটি শক্তিশালী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক সংগঠন গড়তে শুরু করেন।" [444] আল-মিশরির কথার সত্যতা স্পষ্ট হয় – ARC-এর সেই সময়কার বিবৃতিগুলোয় আমেরিকার তীব্র সমালোচনা থেকে; এবং ১৯৯৫-এর নভেম্বরে আল-কায়েদার ইন্ধনে সৌদি আরবে আমেরিকার সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা থেকে। তাছাড়া আবু জান্দাল দাবি করেছিলেন, উসামা বিন লাদেন নাকি শুরুর দিকে সুদান থেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছিলেন; এই দাবিও আল-মিশরির বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। [445]

আর এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সামনে রাখলে, যে কারও এমনটা ভাবতেও কষ্ট হবে যে, উসামা বিন লাদেন সুদানে থাকাকালীন সময়ে তাঁর মুজাহিদ ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে সত্যের সবচেয়ে কাছকাছি যায় ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক হিউব্যান্ডের উপসংহার, "বিন লাদেন সবসময়ই চেয়েছিলেন সুদানের রাজনৈতিক মহলে অনুপ্রবেশ করে দেশটিকে জিহাদ পরিচালনার ঘাঁটি (launching pad for jihad) হিসেবে ব্যবহার করতে।" [446]

---

444 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 49.

445 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

446 Huband, Brutal Truths, Fragile Myths, p. 75.

বোকা বনে যাওয়া, অতঃপর প্রস্থান

উসামা বিন লাদেন সুদানে পৌঁছেছিলেন ৩২ বছর বয়সে। কিন্তু সেসময়ই তাঁর যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা অনেক মানুষের সারা জীবনেও হয় না। এরই মধ্যে তিনি এমন এক জীবন কাটিয়েছিলেন যেখানে ছিল – রাজ পরিবার এবং ইসলামের গণ্যমান্য আলিমগণের সাথে নিত্য উঠাবসা করা এক দ্বীনদার কোটিপতির সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠা; মালিক হয়েও কোম্পানিতে শ্রমিকের মতো খাটুনি করার অভিজ্ঞতা; কন্সট্রাকশনের বিরাট সব প্রজেক্ট সামলানো, বিয়ে এবং সন্তানাদির পরিবার চালানো; যোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জীবন বিপন্ন করে সম্মুখসমরে লড়াই করা; অস্ত্র হাতে নিজে এবং পরে নিজ বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়া, আহত হওয়া; বীরের বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং পরিশেষে সেদেশেরই প্রশাসনের হঠকারিতার শিকার হয়ে নির্বাসনের জীবন বেছে নেওয়া। এই সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে যে কারও কাছে ১৯৯২-এর উসামা বিন লাদেনকে একজন অভিজ্ঞ, পরিপক্ক ও দৃঢ় চরিত্রের বান্দা হিসেবেই প্রতীয়মান হবে। আর তিনি তা ছিলেনও বটে; কিন্তু একটি ক্ষুদ্র বিপজ্জনক ব্যতিক্রম ছাড়া। আর তা হলো – তখনও তিনি ইসলামের (বেশিরভাগ) আলিমদেরকে নিখাদ নিঃস্বার্থ হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। [447]

সুদান প্রশাসনের তৎকালীন প্রধান ড. হাসান আত-তুরাবির কাছে মুসলিম-অমুসলিম অনেকেই আগে-পরে ধোঁকা খেয়েছিল। তাই উসামা বিন লাদেন তার কাছে ধোঁকা খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমও ছিলেন না, আবার শেষজনও ছিলেন না। লন্ডনের কিংস কলেজ এবং সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা তুরাবি ছিলেন একজন মেধাবী, বহুভাষী পণ্ডিত যে

---

447 এখানে লেখকের উপস্থাপনের ভুল হয়েছে। সাধারণভাবে আলিমদের প্রতি আস্থা রাখা কোনো দুর্বলতা নয়। ইসলামে আলিমদেরকে যে পরিমাণ সম্মান দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই আলিমদের প্রতি দ্বীনদার মুসলিম মাত্রই আলাদা ভালবাসা কাজ করে। তাছাড়া মুসলিমদের কারও বিরুদ্ধে আগে থেকে প্রমাণ না থাকলে শুরুতেই সন্দেহ করার কিংবা খারাপ ভাবার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। এসমস্ত কারণেই উসামা বিন লাদেন কোনো আলিমের থেকে স্পষ্ট গোমরাহি কিংবা কর্তব্যবিমুখতা চোখে না পড়লে তাদেরকে শুরুতেই সন্দেহের চোখে দেখতেন না। তাছাড়া হাসান আত-তুরাবি ইসলামের আবহমান ধারার আলিমও ছিল না, যার সম্পর্কে লেখক মূলত এই কথাটি লিখেছেন।

এখানে এভাবে বলা যায় যে, উসামা বিন লাদেনের মানুষ চিনতে আরেকবার ভুল হয়েছিল। তিনি সুদানের নেতা হাসান আত-তুরাবির ফাঁকা বুলি বিশ্বাস করে বহুদূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে এই সম্পর্কে লেখক আরও আলাপ করেছেন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটি থেকে সাধারণভাবে ‘আলিমদের প্রতি বিশ্বাস রাখাটাই দুর্বলতা’ বলে দেওয়া হলো হেইস্টি জেনারেলাইজেশন এবং বলা বাহুল্য – বেইনসাফি।

কিনা 'আফ্রিকার শিং' হয়ে পুরো বিশ্বে ইসলাম কায়েমের কথা বলে বেড়াতো। এমন কথাবার্তা উসামা বিন লাদেনের জন্য অবশ্যই সুমধুর সুরের মতোই ছিল। আর তা কিছু কালের জন্য হলেও তাঁকে তুরাবির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি থেকে দূরে রেখেছিল। কেননা তুরাবি আসলে তো ছিল একজন মিথ্যাবাদী, স্বার্থান্বেষী, বুলিসর্বস্ব ভন্ড। সে উসামা বিন লাদেনকে যে হিসেবে দেখেছিল, পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই মতে সেটা হলো "প্রয়োজন মেটানোর চলন্ত একজন ব্যাংক।" [448] বিন লাদেনের সুদান আগমন উপলক্ষ্যে তুরাবি "এক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করে উষ্ণ অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিল।" সেই অনুষ্ঠানে তুরাবি উসামা বিন লাদেনকে ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF)-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং উপদেষ্টা হিসেবে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিনিময়ে উসামা বিন লাদেন ধন্যবাদের সাথে সাথে সেই অনুষ্ঠানে বসেই ৫০ লক্ষ ডলার দান করে দেন। [449] বিন লাদেনের ছেলে উমারের দাবি অনুযায়ী তার বাবা অল্প সময়ের মধ্যেই "সেই গরিব রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আধুনিকায়নের জন্য উঠেপড়ে লাগেন।" [450] এই লক্ষ্য আসলে ছিল এক কল্পনাবিলাস। আর উসামা বিন লাদেন সেই অভ্যর্থনায় যেটুকু অনুদান দিয়েছিলেন, সেটাও আসলে ছিল তাঁর কাছ থেকে তুরাবির টাকা খসানোর সূচনা মাত্র।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উসামা বিন লাদেন সুদানে নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন; এবং একইসাথে তিনি তুরাবির ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের (বুলিসর্বস্ব) প্রচেষ্টায় বিরাট বিরাট অনুদান দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিন লাদেনের এক বন্ধু বলেছিলেন যে, তিনি ভেবেছিলেন সুদান সত্যিই একটি ইসলামি রাষ্ট্র হবে, আর "তিনি তাতে নিজের ব্যবসা থেকে শুরু করে কন্সট্রাকশন সেবা, আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অভিজাত মহলে পরিচিতি – সবকিছু দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে যাবেন।" [451]

সুদানে আসার পরপরই সেখানে আগে থেকে বসবাসরত আফগান-আরবদের যত্নআত্তির জন্য উসামা বিন লাদেন NIF-কে (অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ৫০ লক্ষ ডলার বাদে) ২০ লক্ষ ডলার প্রদান করেন। এরপর প্রশাসনকে জরুরি ভিত্তিতে গম আমদানির জন্যও বিশাল অঙ্কের ধার দেন। এমনকি পরবর্তীতে গ্যাস, হেলিকপ্টার এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্র কেনার

---

448 "Part one of a series of reports on bin Ladin's life in Sudan"; Asad, Warrior from Mecca, p. 48.

449 "Part one of a series of reports on bin Ladin's life in Sudan."

450 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 113.

451 "Bin Ladin loved Sudan."

দায়িত্বও উসামা বিন লাদেন নিজে নিয়ে নিয়েছিলেন। বেশ কয়েকবার সুদানের সমস্ত তুলা কিনে নেওয়ারও ওয়াদা করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে সেগুলো বাইরে রপ্তানি করে খরচ যুগিয়েছিলেন। তাঁর কন্সট্রাকশন সেবা সুদানের গুরুত্বপূর্ণ সব হাইওয়ে বানিয়ে দিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে একটির ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আলোচনা এসেছে – যেটার দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫০ মাইল। এছাড়া তিনি সুদানের বিমানবন্দর তৈরিতেও সহায়তা করেছিলেন; এমনকি এর জন্য নিজের থেকে আলাদা করে ২৫ লক্ষ ডলার খরচ করেছিলেন। NIF-এর জন্য করা যাবতীয় নির্মাণ কাজের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল সুদানের পূর্বাঞ্চলের বিশাল পরিমাণ জমি দিয়ে; সেগুলোর একটি ছিল দশ লক্ষ একরেরও বেশি। সেখানে উসামা বিন লাদেন গবাদি পশু পালতেন; তিল, সয়াবিন ইত্যাদি ছাড়াও তাঁর অসাধারণ সেই সূর্যমুখী ফলাতেন। [452]

এটা বললে মোটেও বাড়িয়ে বলা হয় না যে, উসামা বিন লাদেন থেকে হাসান আত-তুরাবি যতটুকু সম্ভব খসিয়ে নিয়েছিল। দীর্ঘদিন সেটা তুরাবি প্রশাসনের অন্তত খুড়িয়ে চলার জন্য তো যথেষ্টই ছিল। উসামা বিন লাদেনের নিজস্ব বিনিয়োগ প্রায় সবই জলে যায়। তুরাবি এবং সুদানের (তৎকালীন) রাষ্ট্রপতি উমার আল-বাশির আমেরিকা এবং জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচতে উসামা বিন লাদেনকে যথাদ্রুত দেশ ছাড়তে বলে। ফলে তাঁকে যে বিশাল পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোও যেন মুহূর্তেই ধূলো হয়ে যায়। দ্রুত সুদান থেকে প্রস্থানের সময় আর্থিকভাবে উসামা বিন লাদেন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন। তিনি তাঁর সমস্ত ব্যবসা, জমি, বাড়ি ছাড়াও নির্মাণ ও কৃষিতে ব্যবহৃত সব ভারী যন্ত্রপাতি একেবারে পানির দামে কিংবা বিনামূল্যে ছেড়ে দিয়ে আসেন। এর ওপর তাঁর দেওয়া ধার তুরাবি প্রশাসন ফেরত দিয়েছিল বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সহজ ভাষায় বললে, উসামা বিন লাদেন খুব ভালভাবেই তুরাবির কাছে ধোঁকা খেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে এসে লরেন্স রাইট ঠিকই বলেছেন, সুদানে তাঁর সমস্ত সম্পদ "একপ্রকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।" [453] তাই তিনি যখন আফগানিস্তানে পৌঁছান, তখন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ একেবারেই কমে গিয়েছিল। জোনাথান র‍্যান্ডেলের ভাষ্য অনুযায়ী, পরবর্তী সময়ে তুরাবি উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে ঠাট্টা করতো আর বলতো, "উসামা তো শুধু সবসময় জিহাদ জিহাদ করতো।" [454]

---

452 Cherif Ouazai, "The bin Laden Mystery"; "Bin Ladin loved Sudan."

453 Wright, The Looming Tower, p. 224.

454 Randall, Osama: The Making of a Terrorist

উসামা বিন লাদেন অবশ্য কখনোই প্রকাশ্যে তুরাবির বিশ্বাসঘাতক আচরণের সমালোচনা করেননি। ARC-এর বিবৃতিগুলোর প্রভাবের ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আবদুল বারি আতওয়ানকে তিনি বলেছিলেন, "সুদান প্রশাসনের একেবারে শীর্ষস্থানীয়রা আমাকে তাদের কঠিন অবস্থা এবং বিশেষ করে সৌদির চাপের ব্যাপারে অবগত করলো। তারা আমাকে আর কোনো বিবৃতি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিল। যেদিন তারা আমাকে এমন কথা বলেছিল, সেদিন থেকে আবারও আমি এমন ভূমির খোঁজ শুরু করে দিই – যা সত্যকে ধারণ করতে পারবে।" [455] সুদানের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন কমবেশি নীরবতাই অবলম্বন করেছিলেন। শুধু এটুকু বলেছিলেন যে, সুদান আসলে "শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারেনি।" সেইসাথে হাসান আত-তুরাবি এবং উমার আল-বাশিরকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, আমেরিকা আর সৌদির ওয়াদার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। [456] এরপর ১৯৯৭ সালে গিয়ে তিনি বলেন, "আমেরিকা সুদানকে ওয়াদা করেছিল যে, আমাকে তাড়িয়ে দিলে বিনিময়ে তারা সুদানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে দিবে... কিন্তু সুদান কখনোই আর সেই দিন দেখেনি।" [457]

কিন্তু এগুলো একপাশে রাখলে, উসামা বিন লাদেন সুদানের নেতৃবৃন্দের সাথে আন্তরিক সম্পর্কই বজায় রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৮-এ সুদানের ভাইস প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলে উসামা বিন লাদেন প্রেসিডেন্ট উমার আল-বাশিরের কাছে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, "এই দুঃখজনক ঘটনা এমন এক সময়ে এলো, যখন আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার সম্প্রদায় আমাদের সুদানের দিকে এবং মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ের (ফিলিস্তিন) দিকে উদ্ভ্রান্তের মতো ধেয়ে যাচ্ছে।" [458]

তাড়াহুড়োর মধ্যে হলেও, সুদান ছেড়ে যেতে উসামা বিন লাদেন পুরোপুরি অপ্রস্তুতও ছিলেন না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল, তিনি আফগানিস্তানে আল-কায়েদা সদস্যদের

---

455 Atwan, "Interview with Usamah bin Ladin."

456 Atwan, "Interview with Usamah bin Ladin."

457 Mir, "Interview with Osama bin Laden in Jalalabad", 18 March 1997. অবশ্য আবদুল বারি আতওয়ানের সাথে কথোপকথনে উসামা বিন লাদেন তুরাবি প্রশাসনকে "অনৈসলামিক এবং বিশ্বাসঘাতক" বলেছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানি সাংবাদিক জানুলাহ হাশিমজাদাও একই ধরনের তথ্য দিয়েছিলেন। দেখুন Atwan, The Secret history of al-Qaeda, p. 31, and Hashimzada, "I will continue jihad against infidels."

458 "Rebels say attack on Juba imminent", Al-Quds Al-Arabi, 19 Feb 1998, p. 1.

দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু রেখে গিয়েছিলেন।[459] সেখানে সোভিয়েত বিরোধী জিহাদ পরবর্তী সময়ে আফগানদের ক্ষমতা অধিগ্রহণের ব্যর্থতা ছিল স্পষ্ট। উসামা বিন লাদেন এটা নিয়ে চরমভাবে বিব্রত হয়ে থাকলেও আফগান নেতাদের কাউকেই তিনি প্রকাশ্যে সমালোচনা করেননি। আল-কুদস আল-আরাবিকে তিনি বলেছিলেন, "১৯৮৫ থেকে আফগানিস্তানে আমরা কেবল আমাদের ভাইদেরকে সাহায্য করতেই মনোযোগী ছিলাম। মুসলিমদের আত্মরক্ষা এবং দ্বীনের হেফাজত করতে অগ্রসর হওয়া যে কারও সাথেই আমরা কাজ করতে প্রস্তুত। আফগানের (মুসলিম) কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধেই আমাদের কোনো বিরোধ নেই।"[460]

তাছাড়া উসামা বিন লাদেন কখনোই এমন দাবি করেননি যে আফগানিস্তানে সোভিয়েতকে আরব মুজাহিদরা পরাজিত করেছে। বরং মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন, "যার কৃতিত্ব তাকেই দেওয়া উচিত।" এরপর আফগানিস্তানের সাতটি জিহাদি জামায়াতের সবগুলোর নেতাদেরকেই তিনি অভিনন্দন জানাতেন। কেননা তারা সবাই "জিহাদের পতাকার ওজন বহন করেছিলেন।"[461] আর যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে – আরবদেরকে কৃতিত্ব দেওয়ার ব্যাপারটা তিনি শুধু অসত্যই মনে করতেন না; বরং তিনি এটাও জানতেন যে, এই ধরনের মিথ্যা কৃতিত্ব দাবি করলে সবার আগে আফগানরাই এর ঘোর বিরোধিতা করে বসতো।[462]

উসামা বিন লাদেনের নিজের উপসংহার ছিল, "আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমরা আবারও খোরাসানের জমিনে এসে পৌঁছেছি।" এছাড়াও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি এবং আল-কায়েদা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরও শক্তিশালী হয়েছেন, "আমরা এমন এক অপরাজেয় জমিনে এসে পৌঁছেছি, যেটার নিজস্ব নিরাপত্তা এবং গৌরব রয়েছে; আমাদের ভাইয়েরা নিজেদের দেশে যেসব অপমান এবং নির্যাতনের শিকার হয়, এই জমিন সেসব থেকে মুক্ত।"[463]

---

459 Rahimullah Yusafzai, "World's most wanted terrorist: An interview with Osama bin Laden", www.abcnews.com, 4 January 1999.

460 Abdal-Karim and al-Nur, "Interview with Saudi businessman Usama bin Ladin."

461 Usama bin Ladin, "Introduction."

462 রেড আর্মিকে পরাজিত করার কৃতিত্ব উসামা বিন লাদেন আরবদেরকে দেন – এই ব্যাপারটা দাবি করা অনেক অনেক পশ্চিমা লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন হলো জোনাথান র‍্যান্ডেল এবং লরেন্স রাইট। দেখুন Randall. Osama, p. 11, এবং Wright, The Looming Tower, p. 145.

463 Atwan, "Interview with Usamah bin Ladin."

সমন্বয়ক, ১৯৯৬-২০০১

উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে ফিরে আসেন ১৯৯৬ সালের ১৮ই মে। একটি ছোট জেটপ্লেনে করে তিনি জালালাবাদ বিমানবন্দরে এসে নামেন। পরবর্তী কয়েকদিনে তাঁর স্ত্রী-সন্তানরা ছাড়াও অনেক আরব মুজাহিদ এসে পৌঁছান। রেড আর্মির বিরুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের এক সময়ের সহযোদ্ধা আফগানের "পুরোনো মুজাহিদরা" তাদের সবাইকেই স্বাগত জানায়। ইসলামিক ইউনিয়নের কমান্ডার সানজুর আশির দশকের মাঝামাঝিতে আরব মুজাহিদদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, তাদেরকে দিয়ে কোনো ফায়দা নেই; তারা কেবল "মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতা করে"। সেই কমান্ডার সানজুর বিমানবন্দরে উসামা বিন লাদেনকে নিতে এসেছিলেন। এছাড়াও এসেছিলেন হিযবে ইসলামি-খালিসের অভিজ্ঞ কমান্ডার এবং ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ। আফগানিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রব্বানি এবং প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার উভয়েই বিন লাদেনের ফিরে আসার অনুমোদন দিয়েছিলেন।

কিন্তু উসামা বিন লাদেন তাঁর ফিরে আসার পিছনে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিয়েছিলেন শাইখ ইউনুস খালিসকে; কেননা আফগানের বড় নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সোভিয়েত পরবর্তী গৃহযুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকেছিলেন। উসামা বিন লাদেন লিখেন, "আল্লাহ শাইখ মুহাম্মাদ ইউনুস খালিসকে এই মতবিরোধ এবং অন্তর্কোন্দল থেকে মুক্ত রেখে সম্মানিত করেছেন। আরবরা যখন আফগানিস্তান ছেড়ে যায়, তখন আফগানরা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শাইখ ইউনুস খালিস তাঁদেরকে (আরবদেরকে) পুনরায় স্বাগত জানান।" [464] আবু জান্দালের মতে সেই উষ্ণ অভ্যর্থনা ছিল "সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগানদেরকে শাইখ উসামার অবদান ও সাহায্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।" [465]

যে হৃদ্যতা এবং সম্মান আফগানরা উসামা বিন লাদেনকে দিয়েছিল, সেটা তাৎপর্যপূর্ণ। আর তা একইসাথে বোধ হয় এই ব্যাপারটারও ইঙ্গিত যে, তালেবান হোক বা অন্য কেউ হোক, আফগান-পশতুনদের কেউই বিন লাদেনকে তাঁর শত্রুর কাছে তুলে দিতো না। আল-কায়েদার সমরবিদ আবু মুসআব আস-সুরি, উসামা বিন লাদেনের আগমনের সময় সেখানে

---

464 Usama bin Muhammad bin Laden, "Introduction."

465 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে সে ব্যাপারে লিখেন, "এক বৈঠকে আলোচনাকালে আমি ইউনুস খালিস থেকে অসাধারণ কিছু কথা শুনেছিলাম। গম্ভীর কিন্তু সুদক্ষ আরবিতে তিনি আবু আবদুল্লাহ (উসামা বিন লাদেন)-কে বললেন, 'আমার অধীনে আমি ছাড়া কেউ নেই। আর এটা আমার কাছে খুবই প্রিয়। কিন্তু আপনি আমার কাছে এর চেয়েও মূল্যবান। আর আপনার ভাল থাকা আমার নিজের ভাল থাকার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আমাদের মেহমান। আর তাই কেউ আপনাকে আঁচর দিতেও দেওয়া হবে না। তালেবানদের সাথে যদি কিছু হয়, তাহলে আমাকে বলবেন। যদিও তারা আপনার কাছে পৌঁছাবার পর আমার পক্ষে করার মতো খুব অল্প পথই খোলা থাকবে, কিন্তু আমি আমার সাধ্যের সবটুকুই করবো।' " [466]

কিন্তু ইউনুস খালিসের আসলে তালেবানকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিছুদিন পরই ১৯৯৬-এর জুলাইয়ে মোল্লা উমারের বাহিনী যখন জালালাবাদ দখল করলো, সে সম্পর্কে আবু মুসআব আস-সুরি লিখেছিলেন যে, তালেবানের উচ্চপদস্থরা (শাইখ ইউনুস খালিসের মতো) উসামা বিন লাদেনকে নিরাপত্তা দেওয়ার একইরকম প্রতিজ্ঞা করেছিল। অথচ তারা তখনও বিন লাদেনকে কেবল খ্যাতির কারণে চিনতো। এর ওপর যেহেতু তাঁকে তারা নিজেরা আফগানিস্তানে আমন্ত্রণ করেনি; তাই তাঁর দায়িত্ব নেওয়া তাদের প্রতি বাধ্যতামূলকও ছিল না। আবু মুসআব আস-সুরির তথ্য অনুযায়ী, তালেবানরা যখন জালালাবাদে প্রবেশ করেছিল, উসামা বিন লাদেন তখন সেই শহরেই অবস্থান করছিলেন। আস-সুরি লিখেন, "আর আমি নিজে তালেবান এবং আরব মুজাহিদদের মধ্যকার একটি বৈঠকের সাক্ষী হই। আমি সেখানে শাইখ আবু আবদুল্লাহ (উসামা বিন লাদেন)-এর একজন অতিথি হিসেবে অবস্থান করছিলাম।

এক পর্যায়ে তালেবানদের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ এলেন। তাদের মধ্যে একজন মন্ত্রী এবং একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাও ছিলেন। একজন বললেন, 'আপনারা হলেন মুহাজিরিন আর আমরা হলাম আপনাদের আনসার' কথাটুকু বলতেই বক্তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

বৈঠকের শেষেরদিকে মন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনারা শুধু আমাদের মেহমানই নন, আমরা আপনাদের খাদেম। বরং আমরা তো আপনাদের চলার পথেরও খাদেম।' " [467]

---

466 Abu Musab al-Suri, "A drama of faith and jihad: The Mujahedin (Arabs-al-Qaida) and Ansar (Afghans-Taleban)", OSC Summary, 16–17 October 2009.

467 Abu Musab al-Suri, "A drama of faith and jihad"

পুরোনো ঠিকানায়

১৯৯৬ সালের মে মাসে উসামা বিন লাদেন নানগারহর প্রদেশে জালালাবাদের কাছাকাছি থাকা শুরু করেন। পরবর্তী বছরের মে-তে কান্দাহারে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি, তাঁর পরিবার এবং আল-কায়েদার সদস্যরা ছোট ছোট বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে থাকতেন। সর্বপ্রথম তারা জালালাবাদে সোভিয়েত বাহিনীর এক সময়ের ব্যবহৃত একটি বড় গেস্টহাউজে উঠেছিলেন। এরপর একে একে (আরব মুজাহিদরা আফগানিস্তানে আসার ফলে) সদস্যসংখ্যা যখন বাড়তে থাকে, তখন তারা ইউনুস খালিসের অধীনে হাদ্দা ফার্ম নামের এক সামরিক কম্পাউন্ডেও বেশ কিছুদিন থেকেছিলেন। এবং সবশেষে তারা তোরা-বোরা পর্বতের সেইসব ক্যাম্পে চলে যান, যেগুলোকে মুজাহিদরা সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের সময় গড়েছিলেন। [468]

এই পুরো বছর জুড়ে, আহমাদ সাঈদ খাদর নামের একজন মিশরীয় কানাডিয়ান (মৃত্যু: ২০০৩) তাঁর পরিবার নিয়ে উসামা বিন লাদেনের কাছাকাছিই থেকেছিলেন। খাদরের স্ত্রী মাহা এবং তার সন্তানদের মতে, বিন লাদেন পরিবার অল্পকিছু কঠোর নিয়মকানুন বাদে ভালই মিশুক ছিল। আর এই পুরো সময়টায় উসামা বিন লাদেন একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করেছিলেন – একইসাথে একজন পারিবারিক মানুষ এবং আল-কায়েদা প্রধান হিসেবে সুন্দর ভারসাম্যের সাথেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। খাদরের দ্বিতীয় ছেলে আবদুর রহমানের স্মৃতি অনুযায়ী, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মাঝে মাঝে উসামা বিন লাদেনের 'সমস্যা' হতো, "অর্থনৈতিক সমস্যা, বোঝেনই তো।" ছেলেরা সবসময় বাবার কথায় রাজি থাকতো না (এটা ওটা আবদার করতো)। "সব মিলিয়ে বললে দিনশেষে উসামা বিন লাদেন ছিলেন – একজন বাবা এবং একজন অতি সাধারণ মানুষ।" [469]

আবদুর রহমান খাদরের ভাষ্য উমার বিন লাদেনের বর্ণনার সাথেও মিলে যায়। উমার বলেন, "আফগানিস্তানে ফেরার পর আব্বা জীবনের প্রথমবার অর্থশূন্য হয়ে পড়েছিলেন।" উমার আরও জানিয়েছিলেন যে, সুদানে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সৌদি প্রশাসন কর্তৃক তার বাবার

---

468 bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 172.

469 Rauf Tahir, "Persecutions instead of comforts", Fact, 1–31 October 2007, and "Al-Qaeda family: At home with Osama bin Laden", CBC News Online, 3 March 2004.

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করার ফলেই তিনি প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন।[470] কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে উমারের বর্ণনা একটু অতিরঞ্জিতই মনে হয়। কেননা সেসময় মাসউদের বিরুদ্ধে তালেবানের যুদ্ধে আল-কায়েদার উল্লেখযোগ্য অবদান; আল-কায়েদার আফগান ক্যাম্পগুলোয় যোদ্ধাদের তুমুল প্রশিক্ষণ; পূর্ব আফ্রিকা, এডেন এবং আমেরিকায় হামলার জন্য অর্থায়ন; মিডিয়া কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি; এবং আল-কায়েদার যোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের জন্য অস্ত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় ভরনপোষণ ইত্যাদি ইঙ্গিত করে যে সেসময় আল-কায়েদা নেতার আর্থিক অবস্থা ততটাও খারাপ ছিল না। তবে এটা হতে পারে যে, উসামা বিন লাদেন সেসময় থেকে নিজ পরিবারের জন্য খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে এনেছিলেন। আর এই ব্যাপারে আরও প্রমাণ সামনেই আসছে।

খাদর পরিবার উসামা বিন লাদেনের যে চিত্র এঁকেছিলেন সেটা তাঁর যৌবনের, প্রথমবার আফগানিস্তানের এবং সুদানের সময়কার চিত্রের সাথে খুব ভালভাবে মিলে যায়। আবদুর রহমান বলেন, "উসামা বিন লাদেন প্রতিদিন সলাতের (সম্ভবত ইশার ওয়াক্তের) পর অন্তত দুই ঘন্টা ছেলেদেরকে সময় দেওয়া খুবই গুরুত্বের সাথে নিতেন। এই সময়টা তাঁরা একসাথে বসে কোনো না কোনো বই পড়তেন। বই যে একেবারে নিরেট ধর্মীয় হতে হবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। উসামা বিন লাদেন আরবি কবিতা খুবই পছন্দ করতেন। তাই ছেলেদেরকে তিনি কবিতা পড়তে, মুখস্ত করতে এবং লিখতে উৎসাহিত করতেন। প্রতিদিন তাঁরা আলাদা আলাদা বই পড়তেন – কখনও কবিতার বই, কখনও ইতিহাস, কখনও ভাষা কিংবা ব্যাকরণ, আবার কখনও ধর্মীয় বই... ... ও হ্যাঁ, (এছাড়া) তিনি ভলিবল খেলতে এবং ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসতেন। আর তিনি এগুলো নিয়মিত করতেনও। আসলে মানুষের মাঝে তিনি 'উসামা বিন লাদন' ছিলেন না (যে রূপে তাঁকে পুরো বিশ্ব চেনে)। বরং তিনি ছিলেন স্রেফ উসামা – যার আশেপাশে বাচ্চারাও খেলতো, গিয়ে তাঁর সাথে হাত মেলাতো। তিনি কখনও বাচ্চাদের সাথে ভলিবল খেলতেন, আবার কখনও ঘোড়াদৌড়ের প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি ছিলেন নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ।"[471]

---

470 bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 215 and 223.

471 "Al-Qaeda family: At home with Osama bin Laden", CBC News Online, 3 March 2004. সুদানের মতো আফগানিস্তানেও আরব শিক্ষকদের মাধ্যমে উসামা বিন লাদেন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন তাঁর ছেলেদের গণিত, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো আধুনিক বিষয়গুলোতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান গড়ে ওঠে। দেখুন "The West at War: Bin Laden's Son [Abdullah]: Dad has become invisible; always on his guard", Sunday Mirror (Internet), 14 Oct 2001.

উসামা বিন লাদেন তাঁর দুনিয়াবিমুখতা কিন্তু কখনোই ছেড়ে দেননি। আবদুর রহমানের ভাষায়, "তিনি বরফ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন (এটাকে তিনি বিলাসিতা মনে করতেন)। আসলে তিনি তাঁর আশেপাশের সবাইকেই বরফ ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।" এমনকি তিনি অতিমাত্রায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেও নাকি বারণ করতেন। তাঁর ভয় হতো যে এগুলো মানুষের স্বভাব নষ্ট করে দেয়, "যদিও তিনি জানতেন যে মানুষের বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।" এছাড়া তিনি গরু ও ঘোড়া পালতেন এবং চাইতেন যেন তাঁর পরিবার এবং তাঁর অনুসারীরা সদা প্রস্তুত থাকে, "যেন তারা যেকোনো অবস্থায় টিকে থাকতে পারে।" আবদুর রহমান বলেছিল যে, উসামা বিন লাদেনের জন্য তিনি নিজে, তাঁর পরিবার কিংবা তাঁরা কোথায় থাকছেন – এসবকিছুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'আদর্শ'। আবদুর রহমান নাকি উসামা বিন লাদেনকে বলতে শুনেছিলেন, "আমি যেকোনো স্থানে থাকতে পারব, প্রয়োজনে যেকোনো পরিবেশে যেতে আমি রাজি।" [472] আবদুর রহমানের ভাই আবদুল্লাহর কথায় উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে খাদর পরিবারের মোটামোটি সারমর্ম দাঁড়িয়ে যায়। আর তা হলো, তিনি ছিলেন "অনেকটা সাদাসিধে সন্যাসীর মতো।... আমি তাঁকে খুবই শান্ত একজন মানুষ হিসেবেই দেখেছি।" [473]

১৯৯৭ সালের মে মাসে উসামা বিন লাদেনকে মোল্লা উমার তালেবানদের রাজধানী কান্দাহারে এসে থাকার আহ্বান জানান। বিন লাদেন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরিবার, কয়েকজন লেফটেন্যান্ট এবং কিছু যোদ্ধাদেরকে নিয়ে কান্দাহারে চলে যান। তবে খাদর পরিবার সহ অন্যান্যদেরকে তিনি জালালাবাদ এবং কাবুলে থাকার নির্দেশ দেন। [474] কান্দাহারে তিনি আরও বেশি ব্যস্ত সময় কাটাতে শুরু করেন। এসময় তিনি তাঁর আল-কায়েদার সদস্যদেরকে আফগানিস্তানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

---

472 Al-Qaeda family: At home with Osama bin Laden", CBC News Online, 3 March 2004.

473 "Documentary on life with bin Laden", http://www.chinadaily.com, 7 March 2004. আবদুল্লাহর মা মাহা উল্লেখ করেছিলেন যে কেন মুসলিম বিশ্বের অনেকেই উসামা বিন লাদেনকে রবিন হুড হিসেবে দেখেছে। মাহা বলেন, "আমি বিন লাদেন আর তাঁর পরিবারকে খুব শ্রদ্ধা করতাম কারণ আমি জানতাম তাঁরা খুব... খুবই ধনী ছিলেন কিন্তু তবুও তাঁরা একেবারেই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। মানে তাদের তুলনায় বলতে গেলে আমি ছিলাম রাণীর মতোই; কারণ আমার বাসায় তো অন্তত পানি এবং বিদ্যুতের ব্যাবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁদের সেটাও ছিল না।" দেখুন – "Al-Qaeda family: At home with Osama bin Laden", CBC News Online.

474 Andrew Duffy, "Radicalized in Ottawa", Ottawa Citizen (Internet version), 11 May 2008.

রেখেছিলেন। একইসাথে খোস্ত, কান্দাহার, হেলমান্দ এবং নানগারহর প্রদেশের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আল-কায়েদার যোদ্ধা ছিল। [475]

সুদানের মতো এখানেও উসামা বিন লাদেন স্রেফ সামরিক এবং সাংগাঠনিক কাজে বুঁদ হয়ে না থেকে সাধারণ আফগানদের সাথেও যথেষ্ট সময় কাটাতে থাকেন – কান্দাহারে মোল্লা উমারের সাথে মসজিদে সলাত আদায় করতেন, কাবুলের হাসপাতালে আহত তালেবান এবং আল-কায়েদার যোদ্ধাদেরকে নিয়মিত দেখতে যেতেন ইত্যাদি। [476] পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদার সদস্যদের দ্বারা আমেরিকার অ্যাম্বেসিতে হামলার জবাবে ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট (অর্থাৎ পরদিনই) আমেরিকা আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ক্রুজ মিসাইল আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই আক্রমণের পরে উসামা বিন লাদেনের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য অনেকটাই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও কাবুলের হাসপাতালে আহত মুজাহিদদেরকে তাঁর দেখতে যাওয়া বিন্দুমাত্র কমেছিল না। [477]

এছাড়া কান্দাহারে যাওয়ার পরও বিন লাদেনের কিছু ব্যাপার ছিল অপরিবর্তিত। তাঁর বডিগার্ড আবু জান্দাল উল্লেখ করেছিলেন, "পৌঁছাবার পর, মোল্লা উমার তাঁকে (বিন লাদেনকে) থাকবার জন্য যেকোনো একটি জায়গা বেছে নিতে বললেন – একটি ছিল বিদ্যুৎ কোম্পানির হাজিং কমপ্লেক্স, যেখানে সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা ছিল। অপরটা ছিল কান্দাহার বিমানবন্দরের হাউজিং কমপ্লেক্স, সেটার তেমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। তিনি বিমানবন্দরের হাউজিংকেই বেছে নিয়েছিলেন, কেননা তিনি চাইতেন যেন তাঁর অনুসারীরা এই দুনিয়ার জীবন একেবারে সাদামাটা-মিতব্যয়ী হয়ে কাটায়। শাইখ উসামা বিন লাদেন মাঝে মাঝেই বলতেন, 'আমরা একটি সাদামাটা জীবন চাই।' " [478]

---

475 "Bin Ladin building new bases in Kandahar area", Sunday Telegraph (Internet version), 4 October 1998; Rahimullah Yusufzai, "Myth and Man", Newsline, 1 September, 1998; Ahmad Muwaffaq Zaydan, "Bin Ladin is in 'Tora Bora' south of Jalalabad", Al-Hayah, 17 February 1999, p. 16.

476 "Laden makes first appearance in Kandahar", News, 11 April 1998, p. 12, and Aimal Khan, "Usama bin Ladin steps up public appearances in Kabul", Frontier Post, 7 September 1999, p. 12.

477 "Usama bin Ladin steps up public appearances in Kabul."

478 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 5", and bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 208–209.

২০০০ সালের ২৫-শে জুলাই আমাল আস-সাদাহ নামের আঠারো বয়স্ক একজন ইয়েমেনি নারীর সাথে উসামার পঞ্চম বারের মতো বিয়ে হয়। [479] [480] উসামা বিন লাদেন এবং পাত্রীর পরিবারের মধ্যেই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আবু জান্দাল ইয়েমেনে গিয়ে পাত্রীর পরিবারকে মোহরানা, বিয়ের অনুষ্ঠান এবং যাওয়া-আসার খরচ বাবদ মোট পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে এসেছিলেন। [481] বিয়ের কিছুদিন পর উসামা বিন লাদেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, আফগানিস্তান তাঁর সন্তানদের বেড়ে ওঠার জন্য খুবই আদর্শ জায়গা। তিনি বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা, আমার সন্তানেরা জিহাদের পরিবেশের মধ্যে বড় হবে এবং ইসলামকে এর সত্যিকার মেজাজে গ্রহণ করবে। বিশ্বাস করুন, স্ত্রী-সন্তানেরা সংগ্রামের সঙ্গী হলে জীবন খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।" [482]

আফগানিস্তানে উসামা বিন লাদেন সুদানের চেয়েও বেশিবার হত্যা প্রচেষ্টার শিকার হন। জালালাবাদের কাছাকাছি থাকাকালীন সময়ে তাঁর ওপর কয়েকবার আনাড়ি হামলা করা হয়েছিল। সেগুলোকে সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার হামলা বলে ধারণা করা হয়। এরকম একটি হামলার পরেই মূলত মোল্লা উমার তাঁকে কান্দাহারে চলে আসতে বলেছিলেন, যাতে তালেবানরা তাঁদেরকে আরও ভাল সুরক্ষা দিতে পারে।

---

479 Taysir Alwani, "Bin Ladin weds Yemeni girl in simple ceremony in the presence of his supporters", Al-Quds al-Arabi (Internet version), 1 August 2000.

480 ইসলামে একত্রে সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখা জায়েজ। আমাল আস-সাদাহের সাথে বিয়ে পঞ্চম হলেও এর আগে উসামা বিন লাদেনের এক স্ত্রীর সাথে (২য় বিবাহকৃত) বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। তাই বিয়ের সময় ইসলামি রীতিতে আমাল আস-সাদাহ আদতে ছিলেন তাঁর চতুর্থ স্ত্রী। এছাড়া উসামা বিন লাদেনের প্রথম বিবাহকৃত স্ত্রী নাজওয়া ঘানেমের সাথেও ২০০১ সালের ৯/১১-এর আগেই বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে আমৃত্যু তাঁর স্ত্রী ছিলেন তিনজন। উসামা বিন লাদেনের স্ত্রীরা ছিলেন যথাক্রমে নাজওয়া ঘানেম (বিয়ে: ১৯৭৪, বিচ্ছেদ: ২০০১), খাদিজা শরিফ (বিয়ে: ১৯৮৩, বিচ্ছেদ: ১৯৯০) খাইরিয়াহ সাবের (বিয়ে: ১৯৮৫, উসামার আমৃত্যু স্ত্রী), সিহাম সাবের (বিয়ে: ১৯৮৭, উসামার আমৃত্যু স্ত্রী) এবং আমাল আস-সাদাহ (বিয়ে: ২০০০, উসামার আমৃত্যু স্ত্রী)।

481 Al-Hammadi, "Interview with Abu Jandal"

482 "Interview (written) with Usama bin Ladin", Ghazi, 20 August 2000. এই সাক্ষাৎকারেই উসামা বিন লাদেন নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সৌদিতে অবস্থানরত তাঁর পরিবারের প্রকাশ্য বক্তব্য এবং সৌদি সরকারের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে সমালোচনা করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, "আমার ব্যক্তিগত জীবন সবসময় মুসলিম হিসেবে আমার দায়িত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আর আমি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার পরিবারকে এই বিষয় বোঝার সক্ষমতা দিয়েছেন। আমার পরিবারের সদস্যরা আমার জন্য দুআ করছেন এবং কোনোই সন্দেহ নেই যে তারা আমার জন্য অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সব কিছু মোকাবেলা করার সাহস দিয়েছেন।"

কিন্তু অবস্থান পরিবর্তনের পরও বিন লাদেনকে হত্যাচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়নি। পাকিস্তানি সাংবাদিক রহিমুল্লাহ ইউসুফজাইয়ের তথ্যমতে, ১৯৯৮-এর আগস্টে খোস্তে আমেরিকার মিসাইল আক্রমণের পর পর "সৌদি সরকারের অর্থায়নে আসা তিনজন ব্যক্তি"-কে বিন লাদেনের ওপর আক্রমণ করতে পারার আগেই তালেবানরা আটক করেছিল। স্বয়ং উসামা বিন লাদেন এবং ডা. জাওয়াহিরির সাথে কথা বলে ইউসুফজাই জানতে পেরেছিলেন যে, সেই তিনজনের দলটির প্রধান ছিল সিদ্দিক আহমাদ – যে কিনা তুর্কিস্তান থেকে সৌদিতে অভিবাসী হিসেবে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরিবারকে সরাসরি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। বরং সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা থেকে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, সে বিন লাদেনকে হত্যা করতে পারলেই তাদেরকে সৌদির নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এ কাজের জন্য তাকে দশ লক্ষ সৌদি রিয়েলও দেওয়া হয়েছিল। উসামা বিন লাদেন ইউসুফজাইকে বলেন, সিদ্দিক স্বীকার করেছিল যে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল রিয়াদের তৎকালীন গভর্নর এবং কিং ফাহাদের ভাই – সালমান বিন আবদুল আযীয[483]।[484]

এরপর ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে, আল-কায়েদার গোয়েন্দা অফিসারদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তালেবান যোদ্ধারা একজন সৌদি এবং তিনজন পাকিস্তানিকে আটক করেছিল, যারা কিনা "ধনী উসামা বিন লাদেন"-কে হত্যা করতে পরিকল্পনা করেছিল। তালেবানরা সৌদি লোকটিকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল; পকিস্তানিদেরকে কী করা হয়েছিল, তা ধোঁয়াশাতেই থেকে যায়।[485] এছাড়া পরে ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে, তালেবান সিকিউরিটি ফোর্স উসামাকে হত্যার আরেকটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সেবার তালেবান সিকিউরিটির ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় চারজন লোক একটি জিপ চালিয়ে কান্দাহারে প্রবেশের সময় চেকপয়েন্টে তালেবানের কাছে ধরা খায়। গাড়িতে তালেবানরা অস্ত্র এবং গোলাবারুদ পায়। তালেবানদের দেওয়া তথ্যানুসারে, এই প্রচেষ্টাকারীরা সবাই ছিল তাজিক। আর তারা স্বীকার

---

483 সালমান বিন আবদুল আযীয সৌদি আরবের বর্তমান রাজা (মে, ২০২১)। তিনি ২০১২ সালে ক্রাউন প্রিন্স ঘোষিত হয়েছিলেন। নানা ঘটনাপ্রবাহের পর ২০১৫ সালে সৌদি আরবের রাজা হন। এরপর ২০১৭ সালে তার ছেলে মুহাম্মাদ বিন সালমানকে ক্রাউন প্রিন্স বানানো হয়।

484 Rahimullah Yusufzai, "Taleban foil attempt on bin Ladin's life by Saudis", News, 26 December 1998, and "U.S. aid for Ahmed Shah Massoud against Usamah", Jang, 29 December 1998, p. 10.

485 Ahmad Zaydan, "Taleban execute young Saudi for performing hostile activities against bin Ladin", Al-Hayah, 5 October 1998, p. 1, and Yusafzai, "World's most wanted terrorist."

করেছিল যে, তাদেরকে আহমাদ শাহ মাসউদ পাঠিয়েছিল; তারা এমনকি এটাও বলেছিল যে, কান্দাহার শহরে তাদের কিছু গোয়েন্দাদের থেকে তারা তথ্য পেতো। [486]

এবং পরিশেষে, ফিলিস্তিনি সাংবাদিক জামাল আবদুল লতিফ ইসমাঈল স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ১৯৯৮-এ কান্দাহারে উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর পর ১৯৯৯ সালে সৌদির গোয়েন্দা সংস্থা তার সাথে যোগাযোগ করে। তারা উসামার সাথে তার পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় একটি ছোট্ট সিগন্যালিং ডিভাইস সাথে রাখার বিনিময়ে ঘুষ দিতে চেয়েছিল। ইসমাঈল সৌদিদের সেই প্রস্তাব নাকচ করে বলেছিলেন যে, তার আল-কায়েদার নেতার সাথে মৃত্যুবরণের কোনোই ইচ্ছে নেই। তাছাড়া তিনি নাকি চাননি তাঁর সন্তানরা তাকে "এমন নীচু এবং খারাপ একজন মানুষ" হিসেবে মনে রাখুক, যে কিনা উসামা বিন লাদেনকে হত্যায় সাহায্য করেছে। [487]

উসামা বিন লাদেনকে আরও কয়েকবার হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে ঐ একই তাকফিরিরা, যারা খার্তুমে তাঁকে এবং তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে টার্গেট করে হামলা করেছিল। Sunday Times-এর এক আর্টিকেল অনুযায়ী, ১৯৯৯ সালের মার্চে তাকফিরি দলটির নেতারা মিলে পেশাওয়ারে উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে বৈঠকে বসে এবং "মুরতাদ হয়ে যাওয়া লোকটিকে হত্যা করবার" ফাতওয়া দেয়; আর তার পরপরই মূলত বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার সদস্যদেরকে হত্যা করবার "ক্যাম্পেইন শুরু করে"। [488] তারা "উসামা বিন লাদেনকে একজন অমুসলিম এবং আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও দাবি করা হয় যে, তিনি নাকি "তাঁর মনিব আমেরিকার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণেই"

---

486 "Taleban forces foil attempt to assassinate bin Ladin, uncover hireling network in Kandahar and Peshawar", Al-Quds al-Arabi (Internet version), 29 July 1999.

487 Ismail, Bin-Ladin, Al-Jazeera, and I.

488 Aimal Khan, "Arab radicals declare Usama a non-Muslim", Frontier Post, 10 March 1999, p.1, এবং Cathy Scott-Clark and Adrian Levy, "Rebel cult in blood feud with 'infidel' bin Laden", Sunday Times (Internet version), 18 July 2009.

উভয় আর্টিকেলে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৯-এর বসন্তে ঐ একই তাকফিরি দল শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের নাতি হারিসকে অপহরণ করে এবং মুক্তিপণ দাবি করেছিল। উভয় সাংবাদিকই রিপোর্ট করেন, 'কেউ একজন' ছেলেটিকে মুক্ত করার জন্য বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করেছিলেন। পরবর্তীতে অপহরণকারীদের নেতাকে কপালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত উদ্ধার করা হয়েছিল। এখান থেকে এটা অনুমান করা সহজ যে শাইখ আযযামের প্রতি উসামা বিন লাদেনের হৃদ্যতার জন্যই আল-কায়েদা এই উদ্ধার এবং হত্যার কাজ করেছিল।

আফগানিস্তানে অবস্থান করছেন।” [489] পাকিস্তানি পুলিশ কর্মকর্তাদের দাবি অনুযায়ী, তাকফিরিরা উসামা বিন লাদেনকে টার্গেট করে কমপক্ষে তিনবার হামলা করেছিল; এছাড়াও তাকফিরি এবং আল-কায়েদা সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকবার গোলাগোলি হয়েছিল। [490] যদিও এই হত্যা প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু এগুলো উসামা বিন লাদেনের প্রতি তাকফিরিদের ঘৃণার প্রমাণ বহন করে। আর এই ব্যাপারটা ওইসব পশ্চিমা পন্ডিতদের কথার সাথে যায় না, যারা কিনা তাঁকে, আল-কায়েদাকে এবং কখনও তালেবানদেরকেও তাকফিরি বলে বেড়ায়। [491]

পরিশেষে, আফগানিস্তানে দ্বিতীয়বার আসা বিন লাদেনের ব্যাপারে আরেকটি যে ভুল ধারণা পশ্চিম গিলেছে - বিশেষ করে পশ্চিমের সরকার, মিডিয়া এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গিলেছে, সেটা হলো তাঁর শরীরের সুস্থতার ব্যাপারে উল্টোপাল্টা তথ্য। [492] আসলে পশ্চিম মনে মনে আশা করছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো দুই বার যুদ্ধ ঘোষণা করা এই লোকটা কোনো একটা অসুখ হয়ে স্বাভাবিকভাবেই মারা যাক, যাতে তাদেরকে কোনোরকম মিলিটারি অপারেশনের ঝুঁকি নিতে না হয়। আর এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম বেশকিছু জঞ্জাল পাকিয়েছিল – কিডনির রোগ থেকে শুরু করে মারফান’স সিনড্রোম – যেগুলোর কারণে উসামা বিন লাদেন নাকি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলছিলেন। এসবের মধ্যে কিডনির রোগ ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। গুজব রটেছে যে, তিনি নাকি লুকিয়ে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির কোনো এক সামরিক হাসপাতাল কিংবা দুবাইয়ের আমেরিকান এক হাসাপাতালে কিডনির ডায়ালাইসিসের জন্য গিয়েছিলেন। এমনও গালগল্প রয়েছে যে তিনি নাকি নিজের জীবন বাঁচিয়ে রাখতে আফগান পর্বতে তাঁর ঘাঁটিতে কিডনি ডায়ালাইসিসের বহনযোগ্য মেশিন নিয়ে গিয়েছিলেন।

---

489 Khan, “Arab radicals declare Usama a non-Muslim”; Scott-Clark and Levy, “Rebel cult in blood feud with ‘infidel’ bin Laden.”

490 Scott-Clark and Levy, “Rebel cult in blood feud with ‘infidel’ bin Laden.”

491 তাকফির সংক্রান্ত ১৬৮ নং পৃষ্ঠার 367 টিকা দ্রষ্টব্য।

492 উসামা বিন লাদেনের শরীরের প্রেশার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এইটুকু ছাড়া উসামার শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে মুসলিমদের কাছ থেকে আর কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বরং সব তথ্য তাঁর কঠোর পরিশ্রমী এবং শক্তসামর্থ্য শরীরের দিকেই ইঙ্গিত করে।

একে তো এইসব কথাবার্তার কোনো প্রমাণই নেই। এর ওপরে উসামা বিন লাদেন স্বয়ং বলেছিলেন, "আমার শরীর পুরোপুরি সুস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ।"[493] অন্যদের বক্তব্যও এই কথারই প্রমাণ দেয়। উমার বিন লাদেন বলেছিল, আফগানের পাহাড়ে-পর্বতে "কঠিন সব ট্রেকিং করাই ছিল আমার বাবার সবচেয়ে পছন্দের কাজগুলোর একটি।" আবু জান্দালের ভাষ্য অনুযায়ী, উসামা বিন লাদেনের "শারীরিক গঠন যেন ছিল লোহায় গড়া।... বিশেষ করে ৯/১১-এর আগে তিনি প্রচুর ব্যায়াম করতেন। সকালে পড়াশোনা এবং অধ্যয়ন করতেন। আর বিকেলে যেদিনই হাতে সময় পেতেন – নিজের একে-৪৭ চালনা, ঘোড়া দাপিয়ে বেড়ানো, ভলিবল খেলা ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। তাঁর যে উচ্চতা, ভলিবলে নেটের কাছাকাছি দাঁড়ালে তাঁকে হারানো ছিল প্রায় অসম্ভব। নিজের ঘোড়াটিও অবলীলায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ছোটাতে পারতেন। জীবনে একবারই – ২০০০ সালে – ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় পাঁজরের হাড় বেশ কয়েকটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রতি শুক্রবারে ফুটবল খেলার আয়োজন করতেন। আর অবশ্যই নিজে খেলতেন সেন্টার-ফরওয়ার্ডে।"[494]

---

493 Ismail, Bin Ladin, Al-Jazeera, and I.

494 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 173, and Porzio, "BinLadin: I will tell you about the super-terrorist seen from up close", Panorama, 11 February 2010, pp. 86–92.

উসামা বিন লাদেন উপসংহার টেনেছিলেন যে, ওয়াশিংটন এবং এর মিত্ররা তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক গুজব ছড়ায় "আমাদের সাথে সহানুভূতি পোষণকারী মুসলিমদের মনোবল দুর্বল করে দিতে"... "অথবা আমেরিকানদের উসামা-ভীতি প্রশমন করতে আর বোঝাতে যে সে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" তিনি আরও বলেন, "যাই হোক না কেন, এই ধরনের অপপ্রচার দেখিয়ে দেয়, আমেরিকার নেতারা এখনও যে বিষয়টি বোঝে না, তা হলো – একজন উসামার ওপর কিছুই নির্ভর করে না... বরং ১.২৫ বিলিয়ন মুসলিম ইহুদি ও খ্রিস্টান সন্ত্রাসীদেরকে আল্লাহর এই প্রাচীন ঘর (মক্কাকে) নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দিবে না।" দেখুন – Ismail, Bin Ladin, Al-Jazeera, and I.

যুদ্ধ ঘোষণা

১৯৯৬ সালের ২৩ আগস্টে উসামা বিন লাদেন যে আমেরিকার বিরুদ্ধে (২য় বার) যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সেটা লন্ডনভিত্তিক পত্রিকা আল-কুদস আল-আরাবিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও খবরটি সৌদি আরবে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য ২রা সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যভিত্তিক সৌদিবিদ্বেষী ওয়েবসাইট 'আল-ইসলাহ'-তেও তা প্রকাশ করা হয়েছিল। [495] এই বিবৃতিতে 'ইসলামের মূল শত্রুদেরকে পরাজিত করা কেন এত কঠিন হয়ে আছে' – এই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের মূল্যায়নে এক ভাল রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৪-১৯৯৬ পর্যন্ত ARC-এর যে বিবৃতিগুলোর ব্যাপারে ইতোমধ্যে আলোচনা এসেছে, সেগুলোয় উসামা বিন লাদেনের মূল ফোকাস ছিল সৌদি রাজ পরিবারের দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং অনৈসলামিক আচরণ – বিশেষ করে সৌদির পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে যাবতীয় অনাচারের আমূল পরিবর্তন আনা। অবশ্যই বিবৃতিগুলোতে তিনি রিয়াদের উক্ত অবস্থার জন্য আমেরিকাকে দায়ী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর টার্গেট স্পষ্টভাবেই সৌদি প্রশাসনই ছিল।

১৯৯৬-এর আগস্টের যুদ্ধঘোষণা তাই এটিই দেখিয়ে দেয় যে, উসামা বিন লাদেন তাঁর অবস্থান পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। [496] এই ঘোষণারও এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে তিনি সৌদি প্রশাসনকে দুর্নীতিবাজ এবং অনৈসলামিক বলেছেন, কিন্তু একইসাথে উপসংহার টেনেছেন যে, সৌদি প্রশাসন ছাড়াও মুসলিমবিশ্বের 'বড় শত্রু ইসরাঈল' কিংবা মিশর, আলজেরিয়া, জর্ডান সহ অন্যান্য দেশগুলোর জালিম শাসকেরা মুসলিমদের ওপর জুলুম অব্যাহত রাখতে পারছে একমাত্র আমেরিকার কাছ থেকে আর্থিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা পাবার কারণেই। এভাবে আমেরিকার দিকে মনোযোগ পুনরায় নিবদ্ধ করে তিনি বছরখানেক আগের বলা সিদ্ধান্তেই ফিরে যান। আর তা হলো – সৌদিতে আল-কায়েদার মূল টার্গেট আমেরিকান আগ্রাসীদের বিরুদ্ধেই হওয়া উচিত, "'স্পন্সরকারী, যাকে

---

495 Usama bin Laden, "Declaration of war against the United States", Al-Quds al-Arabi, 23 August 1996.

496 উসামা বিন লাদেন নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেননি। বরং তিনি মূল শত্রুর দিকে পুনরায় ফোকাস করেছিলেন মাত্র। ARC-এর বিবৃতিগুলোয় তাঁর ফোকাস উল্লেখযোগ্যভাবে সৌদি প্রশাসনের দিকে ছিল বলে লেখক এখানে উসামা বিন লাদেনের টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করার কথা বলেছেন। কিন্তু বিন লাদেন সেই আশির দশক থেকেই মনে করতেন যে, ইসলামের পরবর্তী বড় যুদ্ধটা হবে আমেরিকার বিরুদ্ধেই। দেখুন Bergen, Holy War, Inc., p. 64.

স্পন্সর করা হচ্ছে সে নয়”। কেননা যাই হোক, সৌদি প্রশাসন ঘুরেফিরে “আমেরিকার ছায়াতে” থেকেকেই কাজ করে। [497] ১৯৯৬-এর সেই ঘোষণার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অন্য জায়গায় ইতোমধ্যেই করা হয়েছে; [498] তবে ‘কেন শত্রুর দুর্বলতম স্থান শনাক্ত করে সেখানে আঘাত করাই সবচেয়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত’ – সেটা নিজ ছেলের কাছে উসামা বিন লাদেনের সাদাসিধে ব্যাখ্যাতে মোটামোটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আগেই বলে রাখা ভাল, যদিও এখানে তিনি ইসরাঈলের আগে আমেরিকাকে আক্রমণের কারণ ব্যাখ্যা করছিলেন, কিন্তু একই যুক্তি মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর জালিম শাসকদের আগে আমেরিকাকে টার্গেট বানানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ছেলে উমার বিন লাদেন তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, কেন আমেরিকার আগে ইসরাঈলকে টার্গেট বানানো হলো না, যখন ইসরাঈল “আমাদের কাছেই অবস্থিত ছোট্ট একটা রাষ্ট্র”, অপরদিকে আমেরিকা “আমাদের থেকে বহু দূরের বিরাট এক রাষ্ট্র।”

উমার বলেন, আমার বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করলেন, “উমার, একটি দুই চাকাওয়ালা সাইকেল কল্পনা করো। এর একটি চাকা স্টিলের তৈরি, অপরটা কাঠের তৈরি। এখন তুমি যদি সাইকেলটাকে গুড়িয়ে দিতে চাও, তাহলে তুমি কি কাঠের চাকাটা ধ্বংস করবে, নাকি স্টিলেরটা?”

আমি জবাবে বললাম, “অবশ্যই কাঠেরটাই ধ্বংস করবো।”

“তুমি ঠিক বলেছো। মনে রাখবে: আমেরিকা আর ইসরাঈল হলো এই বাইসাইকেলের দুইটা চাকার মতো। এখানে কাঠের চাকা হলো আমেরিকা। আর স্টিলের চাকাটা হলো ইসরাঈল। শোনো উমার, এই দুইয়ের মধ্যে ইসরাঈল শক্তিশালী। সেনাপতি কি কখনও যুদ্ধে শক্তিশালী অংশে আক্রমণ চালায়? না, বরং সে শত্রুর দুর্বলতম অংশে মনোযোগ দেয়। আমেরিকানরা হলো দুর্বল। আর দুর্বলতম অংশতেই আগে আক্রমণ চালানো সর্বোত্তম। একবার যখন আমরা দুর্বল কাঠের চাকাটা খুলে নিতে পারব, স্টিলের চাকা একা একাই পড়ে যাবে।”

---

497 Arnett, “Osama bin Laden: The interview”, and ARC, 7 May 1998; and Catherine Herridge and Justin Fishel, “N. Carolina man appears to be top editor of Al-Qaeda Magazine, U.S. offi cials say”, http:///www.foxnews.com, July 19, 2010.

498 Scheuer, Through Our Enemies’ Eyes, pp. 10–14 and 46–50, এছাড়া দেখা যেতে পারে Bergen, The Osama bin Laden I Know; Atwan, The Secret History of al-Qaeda.

আব্বা আমার হাঁটুতে থাবা দিয়ে বললেন, "প্রথমে আমরা আমেরিকার পতন ঘটাব। আর এই পতন বলতে আমি ওদেরকে সামরিকভাবে হারানোর কথা বলছি না। বরং আমরা ওদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে থাকব, যতক্ষণ না ওদের বাজারগুলোয় ধ্বস নামে। এটা যখন সম্ভব হবে, তখন ওরা ইসরাঈলকে আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। কেননা তখন ওদের সেই মুরোদ থাকবে না। সেসময় স্টিলের চাকাতেও জং ধরবে আর মনোযোগ না পেতে পেতে এক পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"রাশিয়ানদের ক্ষেত্রে আমরা (মুসলিমরা) কিন্তু সেটাই করেছি। আফগানিস্তানে আমরা রাশিয়ার শরির থেকে রক্ত ঝরিয়েছি। রাশিয়ানরা আফগানিস্তান যুদ্ধে ওদের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিয়েছিল। এক পর্যায়ে গিয়ে যখন ওরা আর যুদ্ধের খরচ টানতে পারছিল না, তখন ওরা পালিয়েছিল। আর পালাবার পর ওদের পুরো সিস্টেমই মুখ থুবড়ে পড়ে। আফগানিস্তানের মুজাহিদরাই ঐ বিশাল পরাশক্তিকে নত হতে বাধ্য করেছিল। আমেরিকা আর ইসরাঈলের ক্ষেত্রেও আমরা একই ঘটনা ঘটাতে পারব। আমাদেরকে স্রেফ যথেষ্ট সবর করতে হবে।" [499]

এভাবেই আমেরিকা আল-কায়েদার মূল টার্গেটে পরিণত হয়। এর সাথে উসামা বিন লাদেন ব্যাখ্যা করেন যে, মুসলিমদেরকে আল্লাহর বিজয়ের ওয়াদা অর্জিত হতে পারে যুদ্ধের তিনটি উদ্দেশ্যে সামনে রেখে এগোনোর মাধ্যমে:

১. আমেরিকাকে মুসলিম বিশ্ব থেকে যতটা সম্ভব তাড়ানো;

২. ইসরাঈল এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের জালিমদেরকে ধ্বংস করা; এবং

৩. কট্টর শিয়াদের সাথে দফারফা করা।

কিন্তু উসামা বিন লাদেন এই ব্যাপারেও জোর দিয়ে বলেছেন যে – এই উদ্দেশ্যগুলো একের পর এক করে আসবে, সবগুলো একসাথে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যাই হোক, ১২ পৃষ্ঠার ঘোষণাপত্রে এই কৌশলই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। পশ্চিমাদের কেউ কেউ তো এই ঘোষণাপত্রকে স্রেফ 'কথার ফুলঝুড়ি' ধরনের দাবি করেন। কিন্তু সেই ঘোষণা দেওয়ার দিন থেকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকা, গোটা পশ্চিম কিংবা মুসলিম বিশ্বের কেউই প্রমাণ সাপেক্ষে এই ব্যাপারে সন্দেহও তুলতে

499 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 177.

পারেনি যে – আমেরিকার পররাষ্ট নীতিই উসামা বিন লাদেন সহ গোটা মুসলিম বিশ্বের মুসলিমরদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে, সাধ্যমতো অর্থায়ন করে এই বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনে শরিক করেছে। (মুসলিমদের পক্ষ থেকে) একটি আমেরিকা বিরোধী আত্নরক্ষামূলক জিহাদ ছয়টি কারণে আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল,

[১] রাসূল সা.-এর মাতৃভূমি তথা আরব উপদ্বীপে আমেরিকার সামরিক এবং বেসামরিক নাগরিকদের উপস্থিতি,

[২] মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের জালিম প্রশাসনগুলোকে আমেরিকার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা এবং সমর্থন জোগানো,

[৩] ইসরাঈলের প্রতি আমেরিকার প্রশ্নাতীত এবং অকুণ্ঠ সমর্থন,

[৪] মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালানো (কাফির) রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আমেরিকার সমর্থন – বিশেষ করে এই ব্যাপারে রাশিয়া, চীন এবং ভারতকে সমর্থন করা,

[৫] মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি ও সম্পদগুলোকে বাজার দরের চেয়েও কমদামে শোষণ করে নেওয়া,

[৬] আরব উপদ্বীপের বাইরের মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি।[500]

পরবর্তী বিবৃতিগুলোয় উসামা বিন লাদেন এইসমস্ত পয়েন্টগুলোকেই মোটামোটি শানিত করেছেন, কিন্তু মূল মেসেজ ঘুরেফিরে অপরিবর্তিতই ছিল। এর ওপর এই পয়েন্টগুলোই পরবর্তী সময়ে নাইজেরিয়া থেকে পাকিস্তান হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত... সমস্ত জায়গার জিহাদি দলগুলোর, এমনকি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সুন্নি মুসলিমদেরও এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে জিহাদি চেতনার উৎস হিসেবে লালিত হয়েছে।

এই জিহাদ যে আদৌ আমেরিকার "লাম্পট্য এবং অবক্ষয়ে ভরা" জীবনযাপনের কারণে ছিল না – সে ব্যাপারে কিন্তু উসামা বিন লাদেন শুরু থেকেই কোনো রাখঢাক রাখেননি। এটা ঠিক যে, উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর অনুসারীরা পশ্চিমা জীবনব্যবস্থাকে লাম্পট্য এবং অবক্ষয়ে পূর্ণ মনে করেন। তারা কোনো রাষ্ট্র পরিচালনা করলে কখনোই সেটা

---

500 OBL, "Declaration of jihad against the United States", Al-Islah (Internet), 2 September 1996.

কানাডার মতো হতো না। [501] কিন্তু ইসলামপন্থীরা প্রায় দুই যুগ ধরে ইরানের নেতাদের ক্ষেত্রে পশ্চিমা অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করতে না পারার ব্যর্থতা দেখে এসেছিল। পশ্চিমা অবক্ষয়ের সমার্থক হিসেবে অনেক মুসলিমরাই 'গণতন্ত্র' বুঝিয়ে থাকে। সে যাই হোক, বাস্তবতা এটাই যে – পশ্চিম তাদের নিজেদের এই অবক্ষয়পূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে মুসলিম বিশ্বে চাপিয়ে না দিলে মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই জীবন কাটাতে থাকতো; তারা পশ্চিমের যতোসব নির্বাচন (গণতন্ত্র), লিঙ্গ সমতা, অশ্লীল সিনেমা কিংবা মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করে মরতে আসতো না। সংস্কৃতিভিত্তিক রাজনীতি কখনোই উসামা বিন লাদেনের জিহাদি চিন্তাধারার অংশ ছিল না। বরং অন্যরাই, বিশেষ করে আমেরিকা এবং পশ্চিমের রাজনৈতিক, সামরিক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা সাধারণ মানুষকে এই ধরনের কথাবার্তা বলে ঘোল খাইয়েছে। তারাই মূলত প্রচার করেছে যে, আল-কায়েদা এবং এর মিত্ররা নাকি পশ্চিমের অবক্ষয় দূর করার স্পৃহা থেকে তাড়িত। আর এই ধরনের মিথ্যাচারই আজকে ইসলামপন্থীদের কাছে পশ্চিমের হেরে যাওয়ার মূল কারণ।

আমেরিকার বিরুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের যুদ্ধ ঘোষণার আঠারো মাস পরে "বিশ্বের ক্রুসেডার এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ"-এর নির্দেশ এবং বৈধতা দিয়ে একটি ফাতওয়া আসে। একইসাথে "World Islamic Front against Crusaders and Jews" সংগঠনের পথচলার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই সংগঠনটি গড়া হয়েছিল আল-কায়েদা, আইমান আজ-জাওয়াহিরির EIJ এবং অন্যান্য চারটি জিহাদি দলের সদস্যদেরকে নিয়ে। যুদ্ধের ঘোষণাপত্রের সাথে ১৯৯৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি আসা এই ফাতওয়ার যে পার্থক্য ছিল, তা হলো – এই ফাতওয়ায় পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন বেশ কয়েকজন আলিমরা স্বাক্ষর করেছিলেন। ফলে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই ফাতওয়া ছিল একেবারে পরিপূর্ণ। তার ওপর আবার ফাতওয়াটি প্রকাশ হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের আলিমদের কয়েকটি পরিষদ থেকে "ফাতওয়াটিকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন শেষে পরিপূর্ণ সমর্থন" দেওয়া হয়। [502] এই ধরনের সমর্থনগুলোই হয়তো এই ফাতওয়ার সবচেয়ে ওজনদার দিক ছিল; কিন্তু পশ্চিমে বহুদিন ব্যাপারটি অবহেলিতই থেকেছে। আর

---

501 কানাডাকে সেক্যুলার-লিবারেল আদর্শে আমেরিকার এক ধাপ উপরে ধরা হয়। অনেকটা উন্নত আমেরিকার ইউটোপিয়ান রূপের মতো। তাই লেখক কানাডার উদাহরণ এনে বোঝাচ্ছেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র কখনোই সেরকম কিছু হতো না। কেননা কানাডার মতো রাষ্ট্রকে আমেরিকা আদর্শের মতো মানলেও ইসলামের দৃষ্টিতে কানাডাও আমেরিকার মতো লাম্পট্য এবং অবক্ষয়ে পূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়।

502 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 3", p. 19.

যদিও World Islamic Front কার্যকরী সংগঠন হিসেবে জ্বলে ওঠার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, [503] কিন্তু ফাতওয়াটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বৈধতা দিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিপরীত পক্ষের আলিমরা সেই ফাতওয়াকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিপরীত ফাতওয়া দিয়েছিল ঠিক, কিন্তু দিনশেষে এর ফলাফল ছিল "কোন পক্ষের ফাতওয়া সঠিক" – সেই ব্যাপারে এক অসীম সময়ের বাকবিতন্ডা। আর এই ধরনের বাকবিতন্ডা আদৌ আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ফাতওয়াকে সত্যিকার অর্থে রদ করতে পারেনি।

১৯৯৮-এর সেই ফাতওয়ার প্রধান অংশ ছিল, "মুসলিমদের যাদের পক্ষে যে দেশেই আমেরিকা আর তার মিত্রদের – সামরিক কিংবা বেসামরিক – যেকোনো ধরনের নাগরিককে হত্যা করা সম্ভব, তাদেরই তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের দায়িত্ব (ফারজে আইন) হয়ে গিয়েছে। আল-আকসাকে স্বাধীন করার জন্য, (মক্কার) হারাম শরিফকে মুক্ত করার জন্য, ইসলামের ভূমিগুলো থেকে ওদের বাহিনীগুলো পুরোপুরি সরে যাওয়ার জন্য এবং ওরা চূড়ান্তভাবে হেরে গিয়ে মুসলিমদেরকে শাসানো একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য... আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় – আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করে পুরস্কৃত হতে চাওয়া প্রত্যেক মুসলিমকে আহ্বান করছি, যেন তারা আমেরিকানদেরকে যেখানে পায় সেখানেই হত্যা করে এবং যেভাবে পারে লুণ্ঠন করে।" [504] [505]

---

503 World Islamic Front যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল তা পূরণে এর ব্যর্থতা উসামা বিন লাদেনের বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, "আমরা ভেবেছিলাম এই ফ্রন্ট গঠনের ফলে মুসলিম আন্দোলন, দল, এবং সাধারণ ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে। যাই হোক, মনে হচ্ছে আমরা এর ক্ষমতা এবং সম্পদকে বাস্তবতার চেয়ে বাড়িয়ে ধরেছিলাম।" দেখুন Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", 4 January 1999 এবং Zaydan, Usama bin Ladin without Mask, p. 27.

504 "Bin Laden, others sign fatwa to 'kill Americans' everywhere", Al-Quds al-Arabi, 23 February 1998, p. 3.

505 এই বিবৃতির শারঈ ভিত্তি ছিল 'তাতাররুসের ফিকহ' এবং দিফায়ি জিহাদের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা আল্লামা আহমাদ শাকিরের ফাতওয়া। ১৯৫৬ সালে ইসরায়েলের সাথে মিলে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চরা সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে মিশর ও সুদান হামলা করার পর আল্লামা আহমাদ শাকির ফাতওয়া দেন, *"বিশ্বের যে কোনো দেশের প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটি ফরজ যে, তারা ওদের (ব্রিটিশদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং ওদের হত্যা করবে- যেখানেই ওরা থাকুক না কেন- বেসামরিক কিংবা সামরিক যাই হোক।"*

সূত্রঃ

قال الشيخ أحمد شاكر في كتابه كلمة الحق ص126-137 ـ تحت عنوان

(بيان إلى الأمة المصرية خاصة و إلى الأمة العربية و الإسلامية عامة)

এটি সেসময় উসামা বিন লাদেনের রক্ষণাত্মক জিহাদের ধর্মীয় ভিত্তি হিসেবে যথেষ্ট হয়েছে। আর এই ফাতওয়া রক্ষণাত্মক জিহাদকে "প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগত দায়িত্ব (ফারজে আইন)" হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং সৌদি আরব সহ বিশ্বের সমস্ত জায়গায় আমেরিকার বেসামরিক, সামরিক যেকোনো ধরনের নাগরিককে টার্গেট বানানোর বৈধতা দেয়। উসামা বিন লাদেনের মতে, সেই ফাতওয়া একইসাথে তাত্ত্বিকভাবেও সিদ্ধ এবং কমনসেন্সের হিসেবেও যৌক্তিক। তিনি বলেন, "ইসরাঈলিরা যদি ফিলিস্তিনের বাচ্চাদেরকে হত্যা করতে থাকে, আমেরিকানরা যদি ইরাকের (অবরোধ দিয়ে) নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করতে পারে, আর আমেরিকার বেশিরভাগ জনগণ তাদের রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করতে পারে, তাহলে এর মানে দাঁড়ায় যে, আমেরিকার সাধারণ নাগরিকরাও আসলে আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আর আমাদেরও ওদেরকে টার্গেট করার অধিকার রয়েছে।" [506] তাছাড়া এই ফাতওয়ায় উল্লেখিত আমেরিকানদের সম্পদ "লুণ্ঠন" অংশটুকু থেকেও বোঝা যায় যে, পরবর্তী সময়ের আক্রমণে আমেরিকার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ফাতওয়াটি প্রকাশিত হওয়ার পর উসামা বিন লাদেন সুস্পষ্টভাবেই আত্মরক্ষামূলক জিহাদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন, যা একইসাথে ইসলামি যুদ্ধবিদ্যার সুনির্দিষ্ট মূলনীতি এবং পশ্চিমের 'স্রেফ যুদ্ধ' ধারণার সাথে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিন লাদেন বলতেন যে সব মানুষের জীবনই জীবন; মুসলিমরা সহ সকল মানুষের জীবনই সমান মূল্যবান এবং সমানভাবে প্রতিরক্ষার দাবি রাখে। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে উসামা বিন লাদেন বলেন,

> *"এই সংঘর্ষের দুটো পক্ষ রয়েছে – এক পক্ষে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইসরাঈলের নেতৃত্বে পৃথিবীর ক্রুসেডার এবং ইহুদিদের সম্মিলিত বাহিনী, আর অপর পক্ষে ইসলামি বিশ্ব। এমন এক সংঘর্ষে – প্রথম পক্ষ আমাদের জমিনে, আমাদের সম্পদে এবং আমাদের সম্মানের ওপর আগ্রাসন চালাবে, মুসলিমদের তেল সম্পদে লুণ্ঠন চালাবে; কিন্তু কোনো প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেই আবার মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করবে – এসব তো কোনোমতেই মেনে নেওয়া হবে না। এটা ওদের বোকামি নয়তো, ওরা*

---

506 Yusufzai, "I am not afraid of death."
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরা জনগণের অধিকাংশের সমর্থনেই নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাই সময়ে সময়ে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তগুলো সেই সময়ের অধিকাংশ জনগণের মতামতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ধরে নিলেও সেটাকে বাড়াবাড়ি বলার সুযোগ থাকে না।

অন্যদেরকে বোকা মনে করে। আমরা মনে করি, এটা আমাদের শারঈ দায়িত্ব যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আগ্রাসীদের প্রতিরোধ করবো এবং ওদেরকে আমাদের ওপর হওয়া জুলুমের সমান মাত্রার শাস্তি দিবো।"[507]

"আমেরিকানরা এবং কিছু পণ্ডিতদের দাবি অনুযায়ী, নিরাপরাধ (বেসামরিক) নাগরিকদেরকে হত্যা করা নাকি খুবই আজব ব্যাপার। আমাদের বাচ্চারা এবং নাগরিকরা যে নিরাপরাধ না, সেটা কে নির্ধারণ করে দিলো? আমাদের বেসামরিকদের রক্ত ঝরানো বৈধ কে নির্ধারণ করে দিলো? কে ঠিক করে দিল যে আমাদের জানমালের মূল্য কম? আমরা যদি ওদের বেসামরিক নাগরিকদেরকে হত্যা করি, তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম - গোটা পৃথিবীই আমাদের দিকে চিৎকার করতে শুরু করে। আর আমেরিকা তো রীতিমতো নিজের মিত্রবাহিনী আর দালাল বাহিনী দিয়ে মিছিল করতে শুরু করে।

অথচ এটা কে বলল যে আমাদের রক্ত রক্ত না, কেবল ওদের রক্তই রক্ত? এই ঘোষণা কে করলো? আমাদের দেশগুলোতে দশকের পর দশক ধরে কাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে? ইরাকেই তো (অবরোধ আরোপ করে) দশ লক্ষের বেশি শিশু হত্যা করা হয়েছে, বাকিরাও মৃত্যুমুখে। এসব ক্ষেত্রে এসে কেন আমরা কাউকে চিৎকার করতে কিংবা দোষারোপ করতে দেখি না? আরে তাও তো দূরের কথা, আমরা কেন কাউকে সান্ত্বনার বাণীও বলতে শুনি না?"[508]

---

507 Ismail, Bin Ladin, Al-Jazeera, and I.

508 Alouni, "Interview with Usama bin Laden", 23 May 2002.

বাদানুবাদ

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, আশির দশকে উসামা বিন লাদেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের 'আল-জিহাদ' ম্যাগাজিনের প্রকাশনায় উঠপড়ে লেগেছিলেন। আর ১৯৯৪ সালে গিয়ে তিনি সৌদ পরিবারের বিরোধিতা এবং সংস্কারবাদী আলিমদের পক্ষপাতিত্ব করতে ARC গঠন করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরপর আফগানিস্তানে ফিরে আসার পরেই কেবল তিনি আল-কায়েদার মিডিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু পশ্চিম আর আরব প্রশাসনের কাউন্টার মিডিয়ার প্রাচীর ভেদ করে সেই মিডিয়া উইং প্রথমদিকে খুব অল্পই সাফল্য পেয়েছিল।

ব্রুস উইলিয়ামস (Bruce B. Williams) বলেছিলেন যে, উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগের আধুনিক সব মিডিয়ার ব্যবহার "নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। আর সেইসব আধুনিক মাধ্যমে প্রচারের জন্য নিখুঁতভাবে সিরিজ আকারে বিবৃতিও প্রস্তুত করতেন।" [509]

উসামা বিন লাদেন যে ব্যাপক এবং সর্বাধুনিক মিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, সেটার ভিত্তি ছিল মুহাম্মাদ সা.-এর সুন্নাহ এবং সালাহউদ্দিন আল-আইয়্যুবি, আবদুল্লাহ আযযামের মতো ইতিহাসের বিভিন্ন মুসলিম নায়কদের কর্মপন্থা। উল্লেখিত প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমসাময়িক মিডিয়া ব্যবহার করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তথ্য আদান প্রদান, নির্দেশনা দেওয়া, উদ্বুদ্ধ করা কিংবা লজ্জা দেওয়া, সাবধান করা, প্রপাগান্ডা ছড়ানো – এসমস্ত কার্যক্রম ছাড়া বিজয় আসা আদৌ সম্ভব নয়। যখন আবু মুসআব আস-সুরি এবং আইমান আজ-জাওয়াহিরি উভয়েই উসামা বিন লাদেনের অত্যধিক মিডিয়া সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সাবধান করেছিলেন, তখন আসলে তাঁরা এটাই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, উসামা বিন লাদেন ইসলামের ইতিহাসের এই মিডিয়া যুদ্ধের ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং আত্নস্থ করেছিলেন। তিনি নিজের বাদানুবাদের দক্ষতা ব্যবহার করে একদিকে শত্রুকে টোপ দিতেন, অপরদিকে নিজ দলের ভাইদেরকে এক দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

---

509 Lawrence, "In bin Laden's words", Chronicle of Higher Education.

আমেরিকাকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করা

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সুদানের তুলনায় আফগানিস্তান ঢের ভাল অঞ্চল। প্রথমত, সুদানের সমতল ভূমির ওপর আমেরিকার স্যাটেলাইট খুব সহজেই নজরদারি রাখতে পারে। অপরদিকে আফগানিস্তানের মরুভূমি, পাহাড়, উঁচু পর্বত, এমনকি তার চেয়েও উঁচু পর্বতের এলোপাথাড়ি ধরনের মিশ্রণে স্যাটেলাইটের সেরকম নজরদারি আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সুদানের চারপাশে তুরাবি প্রশাসন এবং উসামা বিন লাদেনকে ঘৃণা করা প্রতিবেশি কম ছিল না; এর ওপর সবসময়ই সেখানে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আনাগোনাও ছিল ব্যাপক। এবং তৃতীয়ত, সুদানের নিরাপত্তা বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী মিলে খার্তুমের যেকোনো ধরনের ঘরোয়া শত্রু এবং বিদেশি ইসলামপন্থীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবার সামর্থ্য রাখতো। আর ৯/১১-এর আগ পর্যন্ত তালেবানদের ক্ষেত্রে আর যাই হোক, এই সমস্যাগুলো ছিল না। তাই যদিও এটা মোটামোটি স্পষ্ট, ১৯৯৬-এর মে মাসে সুদান ছাড়তে বাধ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত উসামা বিন লাদেন সেখানেই ছিলেন; কিন্তু এটাও সুস্পষ্টভাবেই আঁচ করা যায় যে, যুদ্ধকৌশলের বিবেচনায় আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করার আগে তিনি যখনই হোক – ঠিকই সুদান ছেড়ে আফগানিস্তানে পাড়ি জমাতেন।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে, উসামা বিন লাদেন আমেরিকার ওপর ঘরে-বাইরে মিলিয়ে তিনবার আক্রমণ করেছিলেন। আবু জান্দাল স্মৃতিচারণ করেছিলেন, "তিনি সবসময়ই বলতেন যে, আমেরিকাকে আমাদের এমন জায়গায় আঘাত করতে হবে, যা ওরা কল্পনাও করতে করতে পারবে না। তিনি বলতেন যে, তিনি আমেরিকাকে এমন ময়দানে টেনে এনে লড়তে চান, যে ময়দান হবে ওদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।" [510] এই স্মৃতিচারণ উসামা বিন লাদেনের নিজস্ব পরিকল্পনার সাথে খাপে খাপে মিলে যায়; তিনি আল-কায়েদার সামরিক শক্তিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, যাতে করে আমেরিকা কোনো মুসলিম ভূমিতে এসে যুদ্ধ করতে প্রলুব্ধ হয়।

১৯৯৭ সালের শুরুর দিকে উসামা বিন লাদেন বলেন, "আমাকে বলা হয়েছে, আমি যদি ফাহাদ (সৌদি আরব) আর আমেরিকার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ বন্ধ করে দিই, তাহলে নাকি আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমেরিকার দয়া আমার কোনোই প্রয়োজন নেই।

---

510 Butcher, "My life in al-Qaeda, by bin Laden's bodyguard."

আমেরিকার যদি সাহস থাকে তো ওরা নিজেরা এখানে এসে আমাকে গ্রেপ্তার করুক।” [511] আবদুল বারি আতওয়ানও এই পয়েন্টটা উল্লেখ করেছেন – উসামা বিন লাদেন নাকি তাকে ১৯৯৬-এর শেষের দিকে বলেছিলেন যে, তিনি চেষ্টা করছিলেন “আমেরিকাকে মুসলিমদের ভূমিতে টেনে এনে লড়তে।” [512]

উসামা বিন লাদেন আমেরিকার বাহিনীকে মুসলিমদের ভূমিতে টেনে আনতে এতটা উদগ্রীব ছিলেন কেন? মাইকেল ভ্লাহোস লিখেন, “আল-কায়েদার উদ্দেশ্যের জন্য আমেরিকা ছিল এক প্রয়োজনীয় উপকরণ।” আর এই উপকরণকে ঠিকমতো কাজে লাগানোর জন্য উসামা বিন লাদেনের একে হাতের নাগালে পাওয়া দরকার ছিল। [513]

> প্রথমত, মুসলিমদের ভূমিতে যেকোনো কাফির শক্তির আগ্রাসনের প্রভাব ইসলামি বিশ্বে ব্যাপক হয়ে থাকে। এর ফলে চরমপন্থী, নরমপন্থী কিংবা মধ্যমপন্থী সকল শ্রেণির মুসলিমদের মধ্য থেকেই যোদ্ধা এবং অর্থ সংগ্রহের দুয়ার খুলে যায়।
>
> দ্বিতীয়ত, আমেরিকার সেনাদেরকে উত্তর আমেরিকায় গিয়ে হত্যা করার চেয়ে আফগানিস্তানের মরুভূমিতেই হত্যা করা সহজ হয়। আর উসামা বিন লাদেনের বিশ্বাস ছিল, আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতির একটি নিয়মিত প্রবাহ ধরে রাখা সম্ভব হলেই এই ব্যাপারে আমেরিকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়ে যাবে, এক পর্যায়ে ওয়াশিংটনের যুদ্ধ করার স্পৃহা মরে যাবে, এবং শেষমেশ ফলাফল হবে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া – ঠিক যেমনটা লেবাননে (১৯৮৩) এবং সোমালিয়াতে (১৯৯৪) হয়েছিল। [514]
>
> তৃতীয়ত, আল-কায়েদার কৌশলই ছিল – আগে আমেরিকাকে মুসলিম বিশ্ব থেকে যতটা সম্ভব তাড়িয়ে দেওয়া। এরপর পরিকল্পনার ২য় এবং ৩য় পর্যায়ে অগ্রসর হওয়া: ইসরাঈল ও আরবের প্রশাসনকে গুড়িয়ে দেওয়া, এবং শিয়াদের সাথে বোঝাপড়া করা।

---

511 Mir, “Interview with Usama bin Ladin”, 18 March 1997.

512 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 221.

513 Michael Vlahos, “Terror’s mask: Insurgency within Islam”, published by Johns Hopkins University/Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, November 2003.

514 ২০২০-২০২১ সালে এসে উসামা বিন লাদেনের দূরদর্শিতার প্রমাণ মিলছে।

> চতুর্থত, উসামা বিন লাদেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমেরিকাকে হারাতে হলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাহায্য প্রয়োজন হবে। মানবসম্পদ, অর্থ এবং রসদের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখতে আমেরিকাকে টেনে আনত হবে "সমগ্র ইসলামি বিশ্বের সাথে সংঘর্ষে", ৯/১১-এর আগে উসামা বিন লাদেন এভাবেই বিষয়টিকে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, "আমরা এক বিশাল অপারেশনের (৯/১১) জন্য কাজ করছি, যেটা আমেরিকাকে এমন বড় ময়দানে টেনে আনবে, যে ময়দানকে সে আয়ত্ত করতে পারবে না।" [515]

তাই আমেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনা ছিল আল-কায়েদার কৌশলগত পরিকল্পনার শুরু। ভ্লাহোসের মতে, বিন লাদেন এবং অন্যান্য সালাফিদের দূরদৃষ্টি অনুযায়ী – এটা ছিল আল-কায়েদার ইসলামি ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে "ইতিহাস এগিয়ে যাবার বাহনস্বরূপ।" আর তাই আমেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনার প্রথম টোপগুলো ছোঁড়া হয়েছিল কেনিয়া, তানজানিয়া এবং ইয়েমেনে। [516]

পূর্ব আফ্রিকা

১৯৯৮ সালের ৭ আগস্ট কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় আমেরিকার অ্যাম্বেসিতে বোমা হামলা ছিল ওয়াশিংটনকে আফগানিস্তানে সেনা পাঠানোর প্রথম বড় পর্যায়ের কোনো আমন্ত্রণ। উসামা বিন লাদেন এই হামলাগুলোর ব্যাপারে বলেছিলেন, "দুটো শক্তিশালী সংঘর্ষ।" [517] এর এক বছর আগ থেকেই বিন লাদেন আমেরিকাকে ক্ষেপিয়ে তোলার ক্যাম্পেইন শুরু করে করেছিলেন। তাঁকে ধরতে না পারার কারণে আমেরিকাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন যে, আমেরিকানরা হলো "ভীতুর জাত; আর ওরা আমাকে ধরতেও পারবে না। যদি ওরা আমাকে মোকাবেলার চিন্তাও মাথায় আনে, তাহলে আমি ওদের এমন শিক্ষা দিব, যেমনটা কয়েক বছর আগে সোমালিয়াতে দেওয়া হয়েছিল।" [518] কিন্তু ১৯৯৮-এর

---

515 Al-Hammadi, "Interview with Abu Jandal", p. 4, and al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 5", p. 19.

516 Michael Vlahos, "Terror's mask: Insurgency within Islam."

517 OBL, "Exposing the new Crusader war in Iraq", Waaqiah (Internet), 14 February 2003.

518 "Exclusive [report]", al-Majd, 4 August 1997, p. 1.

আগস্টের সেই হামলা ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে কিছু ব্যর্থ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ছাড়া আর কিছুই এনে দেয়নি। ক্ষেপণাস্ত্র হামলাগুলো হয়েছিল (খোস্তে) আল-কায়েদার আফগান প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং খার্তুমে বিন লাদেনের ঔষধাগারে।

এই ঘটনার এক বছর পর উসামা বিন লাদেন আমেরিকাকে আবারও তটস্থ করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার এক বছর পূর্ণ তারিখ উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, সেই হামলা "মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছে।" আরও বলেছিলেন যে, কাপুরুষ আমেরিকানদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে তাঁর "কোনোই ভয় নেই।" [519]

USS Cole

২০০০ সালের ১২ অক্টোবর অ্যাডেন বন্দরে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ USS Cole-এর ওপর আল-কায়েদা হামলা চালায়। এই ঘটনার পর উসামা বিন লাদেন সাংবাদিক আহমাদ যায়দানকে বলেছিলেন, "এই বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের জন্য আমি আল্লাহকে সিজদাহ দিয়ে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছি। এই অপারেশন একেবারে আমেরিকার সম্মানে আঘাত করেছে এবং রাসূল সা.-এর হাদিস অনুযায়ী ওদেরকে আরব ভূমি থেকে চলে যাওয়ার জন্য স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।" [520]

এর একমাস পর তিনি পাকিস্তানি সাংবাদিক রহিমুল্লাহ ইউসুফজাইয়ের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, মোল্লা উমার তাঁকে (নিরাপত্তাজনিত কারণে) মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে কথা বলতে আপাতত নিষেধ করেছেন। রহিমুল্লাহ ইউসুফজাই এটাও জানিয়েছিলেন যে, "উসামা বিন লাদেন ইয়েমেনের অ্যাডেন বন্দরে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজের ওপর হামলার দায় স্বীকার করেছেন।" [521] এর আগে বিন লাদেন সাংবাদিক যায়দানকে আরও বলেছিলেন যে, তিনি আর তাঁর সহকর্মীরা ভেবেছিলেন যে অ্যাডেনের হামলা আমেরিকার বাহিনীকে আফগানিস্তানে টেনে আনতে সক্ষম হবে; তবে তার আগে আফগানিস্তানে আল-কায়েদার বিভিন্ন অবস্থানের ওপর বিমান হামলারও প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁরা ধারণা

---

519 "Bin Laden message marking U.S. embassy bombing", MENA, 7 August 1999.

520 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

521 Rahimullah Yusufzai, "Bin Laden endorses attack on USS Cole, denies Kuwaiti daily's report", News, 15 November 2000, p. 18.

করেছিলেন যে, ১৯৯৮-এর অ্যাম্বেসিতে হামলার তুলনায় ২০০০-এর যুদ্ধজাহাজে হামলায় আমেরিকার পক্ষ থেকে আরও কঠিন জবাব আসবে। আর তা মোটামোটি ২০০১ সালের জানুয়ারির মধ্যেই আসবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় যায়দান দেখেছিলেন যে, কান্দাহারে আল-কায়েদার সদস্যরা এবং তাদের পরিবাররা মিলে "নিজেদের জিনিসপত্র এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে নিয়ে রাখছিলেন"। এটা ছিল সেই সম্ভাব্য বিমান হামলার প্রস্তুতিস্বরূপ, কিন্তু সেই হামলা কখনোই আসেনি। [522] এমনকি উসামা বিন লাদেন সেসময় আইমান আজ-জাওয়াহিরিকে কাবুলে এবং আবু হাফস আল-মিশরিকে অন্য আরেক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর নিজের মৃত্যু হলেও আল-কায়েদার নেতৃত্ব সচল থেকে যায়। [523]

দিনশেষে এই প্রলুব্ধকরণও বিফলে যায়, কিন্তু আল-কায়েদা তার আফগান ভূমিতে যে ন্যুনতম ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কষেছিল, তা থেকেও বেঁচে গিয়েছিল। এছাড়া আল-কায়েদার প্রাক্তন কৌশলবিদ হাশিম আল-মাক্কি বলেছিলেন যে, Cole-এর ওপর সেই অসাধারণ হামলার ফলে পুরো মুসলিম বিশ্ব থেকে আল-কায়েদায় যোদ্ধাদের যোগদান এবং অর্থায়নের প্রবাহ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। [524]

---

522 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

523 Gutman, How We Missed the Story, pp. 212–213.

524 Al-Shafi'i, "Al-Qaeda fundamentalist: Bin Laden believed the media exaggerations about him."

জিহাদের ময়দানের চিত্রাঙ্কন

আমেরিকার ওপর সামরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের পাশাপাশি উসামা বিন লাদেন আমেরিকার 'যুদ্ধ ময়দানের চিত্রাঙ্কন' মডেল অনুসারে আল-কায়েদার জিহাদকে দক্ষিণ এশিয়াতেও বিস্তৃত করার ক্যাম্পেইন শুরু করেন। দক্ষিণ এশিয়ার অংশকে এমনভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যেন তা আল-কায়েদার উপস্থিতি এবং কার্যক্রমের জন্য শক্ত ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে। প্রাথমিকভাবে উসামা বিন লাদেনের টার্গেট অডিয়েন্স ছিল বিশেষ করে তালেবানরা, আফগান এবং পাকিস্তানি সাধারণ জনতা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী দলগুলো, সাধারণ ছাত্ররা এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের আলিমগণ।

৯/১১-এর আগ পর্যন্ত আল-কায়েদার মিডিয়া সেকশন উল্লেখিত সমস্ত টার্গেট অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যেই সাধ্যমতো কিছু না কিছু দাওয়াতি কার্যক্রম চালায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৮ সালে মোল্লা উমার এবং তাঁর লেফটেন্যান্টরা জাতিসংঘের আমেরিকান প্রতিনিধি বিল রিচার্ডসনের (Bill Richardson) দাবিদাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। তার দাবিগুলো ছিল পশ্চিমা মানবাধিকার-কেন্দ্রিক বিশেষ করে নারী অধিকার, পর্দার বাধ্যবাধকতা দূর করা ইত্যাদি নিয়ে।

মোল্লা উমার এবং তাঁর লেফটেন্যান্টরা মিলে রিচার্ডসনের দাবিদাওয়া প্রত্যাখ্যান করে দিলে উসামা বিন লাদেন তালেবানের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "রিচার্ডসন আফগানিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে বাধা দিতেই এখানে এসেছে।" তালেবানের প্রত্যাখ্যানকে বিন লাদেন "শরিয়াহর ওপর দৃঢ় থাকা এবং নিজেদের মূলনীতির ব্যাপারে আপোষহীন" উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, মোল্লা উমার সেই গর্বিত আফগান জাতির হয়ে কথা বলেছেন, "যারা তাদের ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করেছে। আর অবশ্যই তাঁরা এই কষ্টার্জিত অর্জন কখনোই কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিবে না।" [525]

---

525 "Bin Ladin warns against U.S. plan to eliminate Afghan Arabs", Al-Quds al-Arabi, 15 April 1998, p. 1, and "Bin Ladin: Afghanistan's inclusion on U.S. 'terror list' is 'certificate of good conduct' for the Taleban", Al-Quds al-Arabi, 18 May 1998, p. 3.

২০০০ সালের মধ্যভাগে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে, তালেবানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবে না। আর কথাগুলো তিনি এমনসব শব্দ দিয়ে বুনেছিলেন, যা ২০১১-তে এসে পশ্চিমের কানে বিভীষিকা হয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল,

> *"আমেরিকা এবং জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই আফগানিস্তানে অবরোধ আরোপ করেছে। ওরা ওদের সাধ্যমতো আফগানিস্তানের সীমান্তগুলো ঘেরাও করে ফেলেছে। আফগানিস্তানের বিভিন্ন আমদানি জাত পণ্যের উপর ওরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওরা এখানে অশান্তি, গৃহযুদ্ধ এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে রক্তপাত শুরু করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। আর কি চেষ্টা ওরা চালাতে চায়? ওরা তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেকোনো কিছুই করতে পারে। আসলে ওদের টার্গেট উসামা নয়, কেননা এমন উসামারা তো পুরো বিশ্বেই রয়েছে। বরং ওদের টার্গেট হলো আফগানিস্তান থেকে ইসলামের নিশানা মুছে ফেলা।*
>
> *আমেরিকার বোঝা উচিত যে, আফগানিস্তানকে কোনোকিছু দিয়েই ভয় দেখানো যাবে না। গত এক শতাব্দীতে এখানে দুইটা পরাশক্তি পরাজয় দেখেছে; প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যেসমস্ত রাষ্ট্র ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, তারা দিনশেষে ধ্বংসের মুখ দেখে। আফগানিস্তান আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিমদের একটি দেশ। একে চাপ প্রয়োগ করে, লোভ দেখিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে পরাজয় বরণ করানো যাবে না।*
>
> *ব্যক্তিগতভাবে আমি আফগানিস্তানের বান্দাদের এবং তালেবানদের প্রতি কৃতজ্ঞ – তাঁরা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এখানে আমাকে থাকতে দিয়েছে। তাঁরা আমাকে একজন মেহমান হিসেবে আপ্যায়ন করেছে। এটা সত্য যে কেবল আফগানরাই এমন ওজন নিতে পারে। আল্লাহ তাঁদেরকে সেই শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন।"*[526]

মুসলিমদের যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিল কিংবা আমেরিকার দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের প্রতি আল-কায়েদার মিডিয়া সবসময়ই মৌখিক সমর্থন দিয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াশিংটন যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে জঙ্গিবাদের অভিযোগ তুলে গোটা তালেবানকে নিজেদের ব্ল্যাকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করলো, তখন উসামা বিন লাদেন

---

526 "Interview (written) with Usama bin Ladin", Ghazi, 20 August 2000.

মিডিয়াকে বলেছিলেন, আফগানরা যে আমেরিকার সামনে মাথানত করবে না, সেটা পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মোল্লা উমারকে অভিনন্দন জানানো উচিত। একইসাথে তিনি আমেরিকার কর্মকর্তাদেরকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, সবসময় তালেবান প্রশাসনকে অস্বীকার করে আসা ওয়াশিংটন এই কাজের মাধ্যমে আসলে তালেবান প্রশাসনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। [527] জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানে আরোপ করা অবরোধকে উসামা বিন লাদেন ইসলামবিদ্বেষী এবং তালেবান-বিরোধী হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, জাতিসংঘ সেই অবরোধ দিয়েছিল কেননা আমেরিকাই আসলে জাতিসংঘকে নিয়ন্ত্রণ করে। [528] এছাড়া আমেরিকা যখন নিজেদের সন্ত্রাসী তালিকায় কাশ্মিরের বিদ্রোহী গ্রুপ 'হরকাতুল আনসার'-কে যুক্ত করলো, উসামা বিন লাদেন তখন দলটির পক্ষপাতিত্ব করেন এবং দলটির জন্য আল-কায়েদার সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতার ঘোষণা দিয়ে "পুরো বিশ্বের মুসলিমদেরকে কাশ্মীরি মুজাহিদদের জন্য সাহায্যের আহ্বান" করেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, হরকাত মুজাহিদদের একটি সংগঠন "যারা আফগানিস্তানে, কাশ্মিরে এবং সর্বোপরি ইসলামের জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।" [529]

আল-কায়েদার মিডিয়া উইং পাকিস্তানের ইসলামি জযবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে উসামা বিন লাদেন সিন্ধের আরবি বিভাগের ছাত্রদের সম্মেলনে একটি বিবৃতি পাঠান। সেই বিবৃতিতে আফগানিস্তানে এবং সুদানে ক্রুজ মিসাইল হামলার জন্য আমেরিকাকে দায়ী করা হয়েছিল। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছাত্রদের প্রশংসা করে তাদেরকে পাকিস্তানের "সেইসব যুবকদের অনুসরণ করতে" তাগাদা দেওয়া হয়েছিল, "যারা আফগানিস্তান, কাশ্মির সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামি জিহাদে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছিলেন।" [530] আর এই বিবৃতিও স্রেফ একটি উদাহরণ। পাকিস্তানি শ্রোতাদেরকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া সমস্ত বক্তব্যেই উসামা বিন লাদেন জোর দিয়ে বলতেন যে, "ইসলামের জন্য পাকিস্তানিদের রয়েছে অগাধ ভালবাসা। আর তাঁরা সবসময়ই দ্বীনের জন্য কুরবানি করে এসেছেন।" [531]

---

527 "Bin Ladin warns against U.S. plan to eliminate Afghan Arabs."

528 Ismail, "Bin Ladin, Al-Jazeera, and I."

529 Zafar Mahmood Malik, "Bin Ladin backs Harakat-al-Ansar", Jang, 20 October 1997, pp. 7 and 8.

530 "Bin Ladin message to anti-U.S. Conference", Al-Akhbar, 12 September 1998, pp. 7 and 8.

531 "Bin Ladin praises Pakistanis", Nation, 2 September 1998, p. 16.

সাধারণভাবে উসামা বিন লাদেন কাশ্মির এবং ভারতের হুমকির ইস্যুতে আল-কায়েদাকে পাকিস্তান ও এর সেনাবাহিনীর সাথে এক হিসেবে উপস্থাপন করার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা করেছিলেন। ২০০০ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তান যা-ই করবে, আমরা তা সমর্থন করি।" যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, পশ্চিম যখন "ভারতের বাহিনীর হাতে হাজার হাজার কাশ্মীরি মুসলিম নারীদের সম্মানহানি"-কে উপেক্ষা করে ভারতের পক্ষ নেয়, তখন "পাকিস্তান এই নারীদের সম্ভ্রমহানির প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।" [532] তাই উসামা বিন লাদেনের সেসময়ের মতামত ছিল, পাকিস্তানের অবস্থান আলিমদের প্রকাশ্যে সমর্থন করা উচিত; "নিজেদের মধ্যকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আল্লাহর সাহায্যে কাশ্মিরের নির্যাতিত মুসলিমদেরকে ভারতের আগ্রাসন থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার আগ পর্যন্ত সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত।" [533] [534] সেসময় তিনি পাকিস্তানকে "মুসলিম বিশ্বের হৃদয় আর জিহাদ হলো এই হৃদয়ের স্পন্দন" দাবি করার পাশাপাশি তিনি সেখানকার জেনারেলদেরকে আহ্বান জানান যেন "পাকিস্তান নিজ পারমাণবিক শক্তিকে আরও বেশি ধারালো করে এবং যেন সেই শক্তির সর্বোচ্চ প্রদর্শনী করে।" [535]

এছাড়া যেহেতু ভারত এবং ইসরাঈলের মধ্যে মিত্রতা বিদ্যমান এবং "যেহেতু মুসলিমদের প্রতি ভারতের নির্যাতন সময়ের সাথে সাথে বেড়েই চলেছে," তাই তখন উসামা বিন লাদেনের সরল মতামত ছিল – মুসলিম বিশ্বের পাকিস্তান এবং এর সেনাবাহিনীকে সমর্থন

532 "Usama bin Ladin: Jihad against India 'duty' of all Muslims", Pakistan, 23 August 2006, pp. 3 and 6; Hashmi, "Osama bin Laden - A man as strong as rock", p. 10.

533 "Usama bin Ladin pens letter in support of Kashmiri jihad", Wahdat, 8 June 1999, pp. 1 and 5.

534 ৯/১১-এর আগে জিহাদের ময়দানকে বিস্তৃত করতে বেশ কিছু শ্রেণির টার্গেট অডিয়েন্সকে মাথায় রেখে জিহাদের ক্যাম্পেইন চালানো হয়। তার মধ্যে পাকিস্তানি শাসক এবং সেনাবাহিনীও ছিল। কিন্তু ৯/১১-এর পর আমেরিকা জিহাদপন্থী মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'ওয়ার অন টেরর' ঘোষণা করলে পাকিস্তান অচিরেই আমেরিকার পক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করে; এমনকি এক পর্যায়ে আমেরিকার হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাই পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদাও পাকিস্তানকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করতে শুরু করেছিল। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পর্যায়ক্রমে আলোচনা এসেছে। সহজভাবে বললে, ৯/১১-এর আগে পাকিস্তান প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন কী বলে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা ৯/১১-এর পর মূল্যহীন হয়ে যায়।

535 "Usama bin Ladin: Jihad against India 'duty' of all Muslims", and Abu Shiraz, "Interview with Usama bin Laden", Pakistan, 20 February 1999, p. 10.

দেওয়া উচিত। স্রেফ কাশ্মির কিংবা ভারতের সীমান্তই নয়, বরং একেবারে ভারতের মধ্যে এসেও যে আল-কায়েদা "ঝামেলা পাকানোর সক্ষমতা রাখে", সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিন লাদেন তাঁর পাঠকদেরকে তাগাদা দেন যে "ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সমস্ত মুসলিমদের দায়িত্ব।" [536]

শেষে উল্লেখ করা হলেও, আল-কায়েদার মিডিয়ার টার্গেট অডিয়েন্সদের মধ্যে আফগান এবং পাকিস্তানি আলিমরা ছিল গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের। কান্দাহারে উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান কিংবা তার বাইরে থেকে আগত যেকোনো আলিম এবং মুফতিদেরকে স্বাগত জানাতেন। এছাড়া দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে গিয়েও তিনি সেখানকার আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করে আসতেন। আলিমদের কাছে তিনি তাঁর জিহাদি অবস্থানের জন্য সমর্থন চাইতেন এবং সমর্থন পেয়েও যেতেন; অতঃপর তিনি সমর্থনকারীদের প্রকাশ্যে প্রশংসাও করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৮ সালের মে মাসে "আফগানিস্তান উলামা ইউনিয়ন" আমেরিকার বাহিনীকে আরব ভূমি থেকে বের করে দেওয়ার ফাতওয়া দেন। ইউনিয়ন থেকে বলা হয় যে "আমেরিকার বাহিনী যুবসমাজের মধ্যে ইরতিদাদকে (দ্বীনত্যাগ) উৎসাহিত করছে", তাছাড়া তাদের অবস্থান "কুরআনের আয়াত, রাসূল সা.-এর হাদিস এবং উম্মাতের আলিমগণের ঐক্যমতের বিরুদ্ধাচারণ।" এই ঘটনাকে উসামা বিন লাদেন আফগান আলিমদের "মহৎ ফাতওয়া" উল্লেখ করে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, তাঁরা সেই ফাতওয়ার মাধ্যমে "অনস্বীকার্য দলিল দিয়ে কাফির বাহিনীর এই সমস্ত জমিনে প্রবেশ করা নিষেধ" প্রমাণ করে দিয়েছেন। এবং প্রমাণ করেছেন যে, "এদেরকে আরব ভূমি থেকে তাড়ানো দরকার।" [537] তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আফগান আলিমগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদেশমূলক সেই হাদিসের অবতারণা করেছেন, যেখানে "সমস্ত কাফিরদেরকে আরব ভূমি থেকে বের করে দাও" বলা হয়েছে। আর এই হাদিসের আদেশ অনুযায়ী আমল করা শুধু আরবের মুসলিমদেরই নয়, বরং "বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের ওপরই বর্তায়।" [538]

---

536 "Usama bin Ladin pens letter in support of Kashmiri jihad", pp. 1 and 5, and "Usama bin Ladin: Jihad against India 'duty' of all Muslims."

537 "Clerics in Afghanistan issue fatwa on necessity to move U.S. forces out of the Gulf; Saudi oppositionist Usamah bin Ladin supports it", Al-Quds al-Arabi, 14 May 1998, p. 4.

538 ARC, "Supporting the fatwa by the Afghan religious scholars of ejecting American forces from the Land of the Two Mosques", 7 May 1998.

এরপর ১৯৯৯ সালে পেশাওয়ারের একটি সুন্নি দেওবন্দি সভা ১৯৯৮-এর খোস্তের হামলার জন্য আমেরিকাকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছিল। সেই সভা ছিল পাকিস্তান, ভারত, আরব উপদ্বীপ এবং সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় আলিমদের নিয়ে গঠিত। আমেরিকাকে দায়ী করে বিবৃতি দেওয়ার সেই ঘটনায় উসামা বিন লাদেন বার্তা পাঠিয়ে সেই আলিমদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[539]

আল-কায়েদার মিডিয়া কার্যক্রম তিন স্তরে কাজ করে চলছিল: স্থানীয় মুসলিমরা, বিশ্বের মুসলিমরা এবং পশ্চিম সহ অন্যান্য কাফির রাষ্ট্রের মানুষেরা। বেশিরভাগ বার্তাতেই একত্রে এই তিন টার্গেট অডিয়েন্সের সবার উদ্দেশ্যেই কিছু না কিছু বলা হতো। এখানে যে বিবৃতিগুলোর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিরই সন্ত্রাসবাদ, মুসলিমদের প্রতি আমেরিকার নীতি, ভারতের আগ্রাসন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক দিক ছিল; কিন্তু সেগুলোর সবগুলোরই মূল টার্গেট অডিয়েন্স ছিল মূলত আফগান এবং পাকিস্তানিরা। আর লক্ষ্য ছিল – আফগানিস্তানে আমেরিকাকে যুদ্ধে টেনে আনতে সক্ষম হলে যেন যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় সাহায্য-সমর্থন পাওয়া যায়।

আল-কায়েদার মিডিয়ার প্রভাব সত্যিকার অর্থে কোন পর্যায়ের ছিল, তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু দুটো বিষয় একেবারে স্পষ্ট: উসামা বিন লাদেন বিশ্বাস করতেন মিডিয়া আল-কায়েদার জিহাদের এক মূল উপাদান; আর আগে থেকে শুরু হওয়া মিডিয়া ক্যাম্পেইনের কারণেই ৯/১১-এর পরবর্তী সময়ে আফগান এবং পাকিস্তানের আলিমগণের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

---

539 Aimal Khan, “Usama bin Ladin steps up public appearances in Kabul”, Frontier Post, 7 September 1999, p. 12.

এছাড়া দেখুন Osama bin Laden to the scholars of Deoband, Peshawar, Pakistan”, 27 March 2002, http://www.ctc.usma.edu, AFGP-2002-901188; Zaydan, Usama bin Ladin without Mask, p. 62.

সৌদির সরকারি আলিমদের নিন্দা

উসামা বিন লাদেনের চিন্তা-চেতনায় সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তনটা ছিল সরকারি আলিমদের প্রতি এককালের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই ক্ষয়ে আসা। এর শুরুটা হয়েছিল ১৯৯০-১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়, সুদানে তা বাড়তে থাকে এবং শেষমেশ আফগানিস্তানে এসে আরও তীব্র রূপ ধারণ করে। আর এই ব্যাপারটা ফুটে ওঠে সৌদির কিছু আলিমদের প্রতি তাঁর ক্রমেই বাড়তে থাকা আক্রমণাত্মক বক্তব্য ও বিবৃতিতে। উসামা বিন লাদেন তাদেরকে সম্বোধন করতেন "দরবারি আলিম" বলে, যাদেরকে আরব শাসকেরা নিয়োগ করেছিল স্রেফ নিজেদের ইচ্ছেমতো যেকোনো কাজের ইসলামি বৈধতা দেওয়ার জন্য।

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, সৌদির নেতৃত্বস্থানীয় আলিমদের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের ঘোর কেটে যাওয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল ARC-এর বিবৃতিগুলোর মাধ্যমে। আর সময়ের সাথে সাথে প্রশাসনের সরকারি আলিমদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা আরও তীব্র হতে থাকে। তিনি বলতেন যে, আত্মরক্ষামূলক জিহাদ ঘোষণা করা তো তাঁর দায়িত্ব হওয়ার কথা ছিল না। কান্দাহারে থাকার সময়ে তীব্র অসন্তোষ নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "আমি একজন নগণ্য এবং দুর্বল মুসলিম। জিহাদের ডাক দেওয়া তো আমার দায়িত্ব ছিল না। বরং এই দায়িত্ব ছিল মুসলিমদের সত্যিকার নেতা – আলিমগণের। আর তারা নিজেদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত। তারা খুব ভালভাবেই জানেন যে, তাদের কখন কী করবার কথা ছিল।" [540] কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর উসামা বিন লাদেনের কথানুযায়ী, মুসলিমরা এটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, এই ব্যর্থতা তাদেরকে "উম্মাহর ঘোরতর শত্রুর" মতোই ক্ষতিসাধন করে ফেলেছে। [541]

বিশেষত, বিন লাদেন এই ব্যাপারটা খুব জোর দিয়ে বলতেন যে, বিশ্বের মুসলিমরা বুঝতে শুরু করেছে – সৌদি আরবে আমেরিকার উপস্থিতি মোটেও "সাময়িক" কিছু না। তাঁর কথানুযায়ী, সৌদ পরিবারের এই বিশ্বাসঘাতকতা তো যথেষ্ট ছিলই, কিন্তু "তার চেয়েও খারাপ ব্যাপারটা হলো এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে রাজ-দরবারের আলিমদের হাতে। তারা

540 Usama bin Laden, "Letter from Khandahar", Associated Press, 16 March 1998.

541 "Interview with Mujahid Usama bin Laden", Nida'al Islam (Internet), 15 January 1997.

নিজেদেরকে সুলতানের অর্থকড়িতে সাজিয়ে নিয়েছেন, সুলতানের দেওয়া পদে নিজেদেরকে বড় ভাবতে শুরু করেছেন, সুলতানের সব জুলুমের বৈধতা দিয়েছেন। ফলস্বরূপ তারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কাফিরদেরকে আরবের ভূমিতে আনার জন্য তারা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন। সত্যকে হারিয়ে দিয়ে তারা মিথ্যার সাথে একমত হয়ে গিয়েছেন।" [542]

542 Usama bin Laden, "Letter from Khandahar."

তালেবানের সাথে বসবাস ও সহযোগিতা

উসামা বিন লাদেন মোল্লা উমারের অধীন হয়ে তালেবানের নিরাপত্তায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে মুসলিম বিশ্বে তালেবান প্রশাসনের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, উসামা বিন লাদেনকে তালেবানের আশ্রয় দেওয়া মুসলিম বিশ্বে তাদেরকে সামনের সারিতে নিয়ে চলে আসে এবং তারা যে প্রয়োজনে আফগানিস্তানের বাইরের কোনো বিষয়ের দায়িত্বও নিতেও সক্ষম, সেই গ্রহণযোগ্যতাও গড়ে তোলে। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানি পত্রিকা 'জঙ্গ'-তে উসামা বিন লাদেনকে "মহান মুজাহিদ" হিসেবে উল্লেখ করে লিখা হয়েছিল, "তাঁকে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা দিয়ে তালেবান প্রশাসন এক মহান কাজ করেছে।" [543] জর্ডানের একজন সালাফি আলিম ড. ইবরাহিম যায়েদ আল-কিলানি একইভাবে উসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে তালেবানের "শক্তিশালী এবং আন্তরিক" অবস্থানের প্রশংসা করেন। অবশ্য তিনি সাথে একটি সতর্কবার্তাও জুড়ে দেন, "আমরা বলি শরিয়াহর ফায়সালা হলো, যারাই মুজাহিদদের নেতা উসামা বিন লাদেনকে আল্লাহর শত্রুদের হাতে তুলে দিবে, তারাই ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হিসেবে এবং আমেরিকার ইসলামবিদ্বেষী পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।" [544] এছাড়া মিশরীয় আইনজীবী মুনতাসির আয-যাইয়াত ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে লিখেছিলেন যে, তালেবান উসামা বিন লাদেনকে পরিত্যাগ করলে অনেক বড় রাজনৈতিক খেসারত তাদেরকে দিতে হবে। শুধুমাত্র এই কাজটাই "ইসলামি শরিয়াহর প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার ওয়াদা এবং ইসলামি আন্দোলনের নেতাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার ওয়াদার লঙ্ঘন হয়ে যাবে। অথচ তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটিই।" [545] [546]

---

543 "U.S. aid for Ahmed Shah Massoud against Usamah."

544 Ibrahim Zayd al-Kilani, "Usamah bin Ladin, the eagle of Islam", Al-Sabil, 19 October 1999, p. 20.

545 "Interview with Egyptian Islamist lawyer Muntasir al-Zayyat", Al-Sharq al-Awsat, 12 July 1999, p. 2. এছাড়া দেখুন Zaydan, Usama Bin Ladin without Mask, pp. 25–26.

546 শরিয়াহর প্রতি দায়বদ্ধতার ওয়াদার কারণেই তালেবানরা মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। এমনকি আফগানিস্তানের জনসাধারণকে নিরস্ত্রকরণ করে তালেবানের উত্থানের সময়ও শরিয়াহর মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরার ওয়াদা করা হয়েছিল। তাই উসামা বিন লাদেন সহ আরব মুজাহিদদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দিলে একদিকে তা হতো শরিয়াহর দায়বদ্ধতার ওয়াদার খেলাফ, অপরদিকে জনপ্রিয় মুজাহিদ নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ধরে নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আফগানরাই তালেবানদের বিরুদ্ধে ফের অস্ত্র হাতে তুলে নিত।

আল-কায়েদার তাত্ত্বিক আবু মুসআব আস-সুরি লিখেছেন যে, ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট খোস্তে আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোয় আমেরিকার ক্রুজ মিসাইল আঘাত করে। তখন তালেবানদের কেউ কেউ ছাড়াও অন্যান্য অনেক আফগানও মনে করেছিল যে, মোল্লা উমার হয়তো এবার উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর যোদ্ধাদের কার্যক্রম বন্ধ করতে বলবেন। আস-সুরি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মোল্লা উমার বলেছিলেন যে, তিনি তা করবেন না। বরং তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আফগানিস্তানে আমার রক্ত ব্যতীত আর কিছু না থাকলেও আমি উসামা বিন লাদেন এবং আরব মুজাহিদদের ফিরিয়ে দিব না।"

এছাড়া তালেবানদের একজন মন্ত্রী আবু মুসআব আস-সুরিকে আরও বলেছিলেন, "আমিরুল মুমিনিন [মোল্লা ওমর] আমাদের মধ্যে যারা [আমেরিকাকে] ভয় করছিল ও হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তাদেরকে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে এবং আমেরিকাকে ভয় না পাবার শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের হাতে একসময় তাদেরকেও পরাজিত করেছেন, যারা আমেরিকার চেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং আমেরিকার চেয়ে আফগানিস্তানের নিকটবর্তী ছিল – রাশিয়ানরা! আর আল্লাহ তাআলা তো ওদের রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছেন।" [547]

সাংবাদিক রহিমুল্লাহ ইউসুফজাইয়ের মতে, "মহান আরব মুজাহিদকে" আশ্রয় দিয়ে গোটা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে সম্মানিত হওয়ার ব্যাপারটি ছাড়াও পশতুন হিসেবে মোল্লা উমার এবং তাঁর সহযোদ্ধারা পশতুন রীতিনীতির কঠোর অনুসরণ করতেন। আর পশতুনরা "তাদের কাছে আশ্রয় নেওয়া এবং নিরাপত্তা চাওয়া" কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারতো না। [548]

আল-কায়েদাও বিষয়টি এভাবেই দেখেছিল। আবু মুসআব আস-সুরি লিখেন, "তালেবান এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে আশ্রয় চাওয়া প্রতিবেশির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এসেছে। মুহাজিরিনদের প্রতি তাঁরা আনসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আসলে তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠতম প্রতিবেশি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।" [549] অতএব ২০০১ সালের ৯/১১-এর ঘটনার আগেই, তালেবানরা যে উসামা বিন লাদেনকে তুলে দেওয়ার

---

547 Al-Suri, "A drama of faith and jihad."

548 "Have Taleban changed their stand about Osama", Jang, 17 February 1999, p. 4, and Yusufzai, "Myth and Man."

549 Al-Suri, "A drama of faith and jihad."

বদলে প্রয়োজনে আমেরিকার সাথে যুদ্ধকেই বেছে নিবে, সেটার মোটামোটি দুটো শক্তিশালী কারণ স্পষ্ট ছিল – ইসলামি বাধ্যবাধ্যকতা এবং পশতুন রীতিনীতি।

আরও হিসেব কষলে, উসামা বিন লাদেন তালেবানকে যথেষ্টই সাহায্য করেছিলেন। ১৯৯৬-১৯৯৭ সময়কালে তিনি মোল্লা উমারকে আল-কায়েদার কয়েকজন অভিজ্ঞ কমান্ডারদের দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। আল-কায়েদার সেই অভিজ্ঞ কমান্ডাররা তালেবানের অল্পপ্রশিক্ষিত যোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় সামরিক এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এছাড়া তালেবানরা যখন কাবুলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন শহরটির আশেপাশে মাসউদের বাহিনীর বেশ কয়েকজন কমান্ডারকে তালেবান সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে তাদের পক্ষে চলে আসতে কিংবা অস্ত্র না ধরার জন্য রাজি করিয়ে ফেলেছিল। আর বলাই বাহুল্য, উসামা বিন লাদেন সেসময় তালেবানকে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি শাইখ ইউনুস খালিসের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী কমান্ডার – জালালউদ্দিন হাক্কানিকে তালেবানের কাবুল অভিযানে নিজের অভিজ্ঞ সেনা পাঠানোর ব্যাপারে রাজি করিয়েছিলেন।[550] রাজধানী (কাবুল) বিজয়ের পরও উত্তরে "ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া" তালেবান যোদ্ধাদের জন্য উসামা বিন লাদেন সম্পূর্ণ আল-কায়েদার মুজাহিদদের একটি বাহিনী গঠন করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরের প্রদেশগুলোতে তখন মাসউদের নেতৃত্বে Northern Alliance[551] বা উত্তরাঞ্চলীয় জোট নিজেদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া অঞ্চল পুনর্দখলের চেষ্টা করছিল। সেখানে উসামা বিন লাদেনের পাঠানো আল-কায়েদার বাহিনীর সাথে মাসউদের বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ হয়েছিল। এমনকি উসামা বিন লাদেন নিজের মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে মোল্লা উমারের সাথে আবদুর রাসুল সাইয়্যাফ এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের দূরত্ব ঘুচিয়ে তাঁদের

---

550 জালালউদ্দিন হাক্কানিকে উসামা বিন লাদেন সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের সময় বেশকিছু ক্যাম্প গড়ে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া শাইখ ইউনুস খালিসের সাথেও উসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। একারণেই জালালউদ্দিন হাক্কানি উসামা বিন লাদেনের আহ্বানে না করতে পারেননি। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি মোল্লা উমারকে বাইয়্যাত দেন এবং যুদ্ধে নিজের স্বকীয়তা ধরে রাখেন।

551 ১৯৯৬-এ তালেবান সরকার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে শরিয়াহ কায়েম করলে তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রব্বানি এবং আহমাদ শাহ মাসউদ সহ আফগান জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃবৃন্দ মিলে সেই বছরের শেষের দিকে Afghan Northern Alliance (সংক্ষেপে শুধু Northern Alliance নামে ডাকা হয়) গঠন করে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সেই সময় তালেবান ও আল-কায়েদার বিরুদ্ধে Northern Alliance-এর সামরিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আহমাদ শাহ মাসউদ। উল্লেখ্য, Northern Alliance-কে সমর্থন এবং সহযোগিতা করেছিল ইরান, রাশিয়া, আমেরিকা, তুরস্ক, ভারত, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান।

বাহিনীকে তালেবানের সাথে যোগদান করানোর প্রচেষ্টাও করেছিলেন। [552] এক্ষেত্রে তিনি সফল হননি, কিন্তু সাইয়্যাফ আর গুলবুদ্দিনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভালই ছিল। এতই ভাল যে গুলবুদ্দিন মিডিয়াকে বলেছিলেন, উসামা বিন লাদেন "আমার ভাই।"

আল-কায়েদার নিজস্ব যোদ্ধাদের সেই বাহিনীর ব্যাপারে রয় গুতমান (Roy Gutman) তার অনবদ্য বই How We Missed the Story-তে লিখেছেন যে, উসামা বিন লাদেনের বাহিনী "যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও প্রস্তুত ছিল। আর মাসউদের কমান্ডাররা এই বাহিনীকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পেতো।" [553] এমনকি মাসউদ নিজেই বলেছিল যে, তার লোকেরা তালেবানের বাহিনীকে সহজেই সামলাতে পারতো, কিন্তু একই বাহিনীতে আল-কায়েদার যোদ্ধা থাকলে কিংবা আল-কায়েদার নিজস্ব বাহিনীর মুখোমুখি হলে তারা বিপাকে পড়ে যেত।

সুদানের মতো আফগানিস্তানেও উসামা বিন লাদেন কনস্ট্রাকশনের কাজে খরচ করেছিলেন বলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কান্দাহারে একটি প্রধান বাজারের জায়গায় তিনি আধুনিক মার্কেট তৈরি করে দিয়েছিলেন। তালেবান প্রশাসনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় গড়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া একসময় সিনেমা হল থাকা একটি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। [554] সাংবাদিক আহমাদ যায়দান বলেছিলেন যে, ২০০০ সাল নাগাদ উসামা বিন লাদেনের লোকেরা কান্দাহারে আমন্ত্রিত হয়েছিল এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল কেননা তারা তালেবানকে যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করেছিল, নিজেদের পক্ষ থেকে খরচ করেছিল। যায়দান লিখেন, "আমি কান্দাহারিদের মধ্যে আরবদের উপস্থিতি নিয়ে কোনো বিরক্তির ছিটেফোঁটাও দেখিনি। বরং আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে তারা আরবদেরকে নিয়ে খুশিই ছিল। কেননা, আরবরা নিজেদের থাকার

---

552 Aimal Khan, "Osama said mediating between Hekmatyar, Sayyaf", Frontier Post, 29 December 1998, pp. 1, 12, and "Mullah Omar ready for dialogue with Hekmatyar", Ausaf, 21 March 2001, pp. 1, 7.

553 Gutman, How We Missed the Story, p. 189.

554 "Bin Ladin building new bases in Kandahar", Sunday Telegraph (Internet version), 4 October 1998, and Joachim Hoelzgen, "The rulers of Kandahar", Der Spiegel, 9 November 1998, pp. 216–220.

ভাড়াবাবদ তুলনামূলক বেশিই অর্থ দিতো। এছাড়াও শহরজুড়ে বিভিন্ন খাতে আরবদের খরচের কারণে কান্দাহারের স্থবির অর্থনীতিও কিছুটা গতি পেয়েছিল।” [555]

যায়দান আরও বলেন, “উসামা বিন লাদেনের লোকজনকে কান্দাহারের ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল পশতুনরা আন্তরিকতার সাথেই মেনে নিয়েছিল। কান্দাহারের রাস্তাঘাটে আরব আফগানদের দেখা পাওয়া ছিল একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, যেন তারাও স্থানীয়ই। আফগানদের থেকে তাদেরকে শুধু ভাষার পার্থক্যে চেনা যেত। কেননা আরবদের কেউ কেউ স্থানীয় পশতুন ভাষায় কথা বলতো না। কিন্তু বাদবাকি তাদের চলাফেরা, পোশাক আশাক, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন সবকিছু দেখে মনে হতো যেন তারা আফগানই বনে গিয়েছিলেন; আরও ভাল করে বললে কান্দাহারি হয়ে গিয়েছিলেন। আর কান্দাহারই তো পশতুন-আফগানদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ছিল।” [556] উসামা বিন লাদেনের প্রধান বডিগার্ড আবু জান্দালও কান্দাহারের ব্যাপারে প্রায় একই ব্যাপার উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সাথে কাবুলকেও যুক্ত করে বলেছেন, “কান্দাহার ও কাবুলের আরব মুজাহিদরা আফগানদের অসংখ্য অনুষ্ঠান, বিয়ে ও জানাযায় অংশগ্রহণ করতো। আফগানরা এবং আমরা একে অপরকে দেখতে যেতাম, ঈদে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতাম, একসাথে রামাদান পালন করতাম। আমরা আরব মুজাহিদরা একেবারেই সাধারণ সামাজিক জীবন কাটাতাম... যদিও সেই সমাজ আমাদের ভাষা, পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মতো ছিল না।” [557]

উসামা বিন লাদেন তালেবান সহ সাধারণভাবে সমস্ত আফগানদের প্রশংসা করতেন। বিশেষ করে বহির্বিশ্বের সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে তালেবান নিজ অতিথিদেরকে জীবনবাজি রেখে নিরাপত্তা দেওয়ার কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তিনি কখনোই কার্পণ্য করতেন না। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানি সাংবাদিক রহিমুল্লাহ ইউসুফজাইকে তিনি বলেন, “এই যুগে আফগানিস্তানই একমাত্র রাষ্ট্র, যেখানে ইসলামের সত্যিকার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আর সমস্ত মুসলিমদেরই এটা সমর্থন করা উচিত। সমস্ত মুসলিমদেরই আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সাধ্যমতো জানমাল দিয়ে আফগানিস্তানের জন্য এগিয়ে আসা উচিত... সাধ্যমতো এখানকার ইসলামি পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার সমর্থন করা উচিত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, তালেবানের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী এবং গভীর। এটা ঈমানের ভিত্তিতে

555 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

556 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

557 Al-Hammadi, “Al-Qaeda from within, part 1”, p. 17.

প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শিক মিত্রতা। এই মিত্রতা রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক নয়। বহু রাষ্ট্রই তালেবানকে বিভিন্ন লোভ কিংবা হুমকি ধামকি দিয়ে চাপ দিয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তাঁদেরকে আরও অবিচল করেছেন।" [558]

মোল্লা উমার এবং উসামা বিন লাদেন সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক বিশ্লেষণের মধ্যে রহিমাহুল্লাহ ইউসুফজাইয়ের ব্যাখ্যাই হয়তো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। ৯/১১-এর পর ইউসুফজাই লিখেন, "মোল্লা উমার এবং উসামা বিন লাদেন যেকোনো কিছুর চেয়ে যে বিষয়টা অকাট্যভাবে বিশ্বাস করেন, তা হলো – যত বড় পরাশক্তিই আক্রমণ করুক না কেন, আল্লাহ তাঁদের সাথেই থাকবেন।" [559]

---

558 Rahimullah Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", 4 January 1999; "Interview (written) with Usama bin Ladin", and Ismail, "Interview with Usama bin Laden", 23 December 1998.

559 Rahimullah Yusufzai, "Face to face with Usama", Guardian (Internet version), 26 September 2001.

শান্তির দিনের ডাক

আল-কায়েদার USS Cole এবং ৯/১১-এর আক্রমণের মাঝের এগারো মাসে উসামা বিন লাদেন একইসাথে মোল্লা উমারের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করেন এবং নিজ বাহিনীকে আমেরিকার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। Cole হামলা এবং উসামা বিন লাদেনের নিয়মিত মিডিয়া উপস্থিতির বদৌলতে আসা আমেরিকার চাপের কারণে মোল্লা উমার কিছুটা ক্ষুব্ধ থাকলেও তা তাঁদের সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলেনি। এর ওপর উসামা বিন লাদেন নিজের উত্তম আচরণ, তালেবানের প্রকাশ্য প্রশংসা এবং সাহায্য সহযোগিতা করে মোল্লা উমারকে শান্ত রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তালেবানের নেতা আফগানিস্তানে "ইসলামের এক শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছেন" এবং এখানে "উম্মাহর জিহাদের হিফাজত করেছেন।" [560] এছাড়াও উসামা বিন লাদেন প্রকাশ্যে মোল্লা উমারকে "আমিরুল মুমিনিন" সম্বোধন করে নিজের পক্ষ থেকে বায়াত দিয়েছিলেন। সেইসাথে তিনি অন্যদেরও বায়াত দিতে উৎসাহিত করতেন। আলিমদেরকে সম্বোধন করে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "সাধারণ মুসলিমদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন, আফগানিস্তানে হিজরত করতে তাগাদা দিন এবং আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাতের বৈধতার ব্যাপারে ফাতওয়া দিন।" [561] এছাড়াও আলিমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

> *"উম্মাতকে শেখান যে, জামাআতবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো ইসলাম নেই, ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআতবদ্ধতা নেই এবং আনুগত্য ছাড়া কোনো ইমারাহ নেই। আপনারা জানেন যে, এই কঠিন সময়েও আল্লাহ উম্মাতকে এমন এক ইসলামি রাষ্ট্র দিয়েছেন, যা আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়ন করে এবং তাওহিদের পতাকা সমুন্নত করে।*
>
> *সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমারকে এর নেতৃত্বে আসীন করেছেন। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন। এটা তো*

---

560 Ismail, Bin Ladin, Al-Jazeera, and I, and "Interview with Mujahid Usama bin Ladin", Nida'al Islam, 15 January 1997.

561 "Bin Ladin pledges allegiance to Mullah Omar", Al-Jazeera Satellite Television, 9 April 2001.

আপনাদের দায়িত্ব যে, আপনারা এই ইমারাতের সাথে যুক্ত হতে মানুষকে আহ্বান করবেন, জান ও মাল দিয়ে এর সমর্থন করতে তাগিদ দিবেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে এর প্রতিরক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। এই সুযোগে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমারের কাছে বায়াতবদ্ধ হয়েছি। আমি সত্যিই তাঁকে বায়াত দিয়েছি। আর আমি আশা করি, আল্লাহ আমার এই কাজকে শুধুমাত্র তাঁর জন্য হিসেবে কবুল করবেন।”[562]

উসামা বিন লাদেন কিন্তু কোথাও হামলা করা কিংবা মিডিয়ার ব্যবহার থেকে দূরে থাকার কোনোরকম ওয়াদা কখনোই করেননি। বরং তিনি মোল্লা উমারকে প্রকাশ্যে বারংবার আল-কায়েদার জনবল নিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব দিতে থাকেন। ২০০০ সালের শেষের দিকে এক পত্রিকায় এসেছিল, “উসামা বিন লাদেন আবারও মোল্লা উমারকে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, তিনি আফগানিস্তানকে বিদেশি আক্রমণ এবং ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে নিজে আফগানিস্তান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে প্রস্তুত আছেন।” [563]

কিন্তু এই প্রস্তাবগুলো মোল্লা উমার এবং তাঁর মন্ত্রীদেরকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল, কেননা এমন প্রস্তাবগুলোর মানে ছিল – উসামা বিন লাদেন হয়তো তালেবানকে আমেরিকার চাপ বহন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না; তিনি হয়তো পশতুনদের মেহমানকে নিরপত্তা দেওয়ার ঐতিহ্যের ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারছেন না; অথবা হয়তো তিনি মনে করছেন যে, আমেরিকার সাথে যুদ্ধ লেগে গেলে তাঁকে দেওয়া আফগান নাগরিকত্বকে আর রক্ষা করা হবে না। [564] মোল্লা উমার প্রতিবারই উসামা বিন লাদেনের এমন প্রস্তাব নাকচ করে দেন। উসামার প্রতি তাঁর আমন্ত্রণকে আরও শক্ত করে তিনি

---

562 “Bin Ladin asks Muslim to support Afghanistan’s ‘Prince of the Faithful,’” Al-Jazeera Satellite Television, 12 April 2001.

563 “Mullah Omar declines bin Liden’s offer to leave Afghanistan”, Ausaf, 19 December 2000, pp. 1, 7.

564 উসামা বিন লাদেন ও তাঁর পরিবারকে তালেবানের নিরাপত্তা ও নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে দেখুন “Taleban confirms its intention to try bin Ladin; Pakistan prevented him for attending an Islamic conference”, Al-Quds al-Arabi, 28 October 1998, p. 1, and bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 175.

ঘোষণা করেন, "সমস্ত তালেবানদের জন্যই এটা সম্মানের প্রশ্ন। আর তারা প্রয়োজনে নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও সেই সম্মান ধরে রাখবে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, "এটা তো পরিষ্কার যে, উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে থাকুক কিংবা না থাকুক, আমেরিকা এখানে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে।" [565]

আমার ধারণা মোল্লা উমার সৌদি আরব কিংবা আমেরিকার হাতে উসামা বিন লাদেনকে তুলে দেওয়ার কথা কখনোই ভাবেননি। এর সহজ কারণ হলো এহেন কাজকে তিনি খারাপ মনে করতেন। তাঁর ওপর ওয়াশিংটন, এর মিত্রশক্তি জাতিসংঘ ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান চাপ তাঁর জেদই কেবল বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। ৯/১১-এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানে তালেবানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আবদুস সালাম জাঈফ। তিনি মোল্লা উমারের ব্যাপারে একটি ঘটনা বলেছেন। এই ঘটনাটিতে মোল্লা উমার যা বিশ্বাস করেন না, তা না করার ব্যাপারে তাঁর নির্ভীকতা এবং প্রবল অনিচ্ছা ফুটে ওঠে। একইসাথে গল্পটি তাদের মুখেও চপেটাঘাত, যারা মনে করে পাকিস্তান চাইলেই আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

জাঈফ লিখেন, "১৯৯৯-২০০০ সালের দিকে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোশাররফ আমিরুল মুমিনিন মোল্লা উমারকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন এই আমন্ত্রণ নাকচ করে দেন। তিনি পাকিস্তানে যেতে চাননি। তারপর মোশাররফ নিজেই আমিরুল মুমিনিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে কান্দাহারে আসার আমন্ত্রণ চায়। সে আমিরুল মুমিনিনের সাথে উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে হস্তান্তর করার ব্যাপারে আলোচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন এই ধরনের আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মোশাররফকে সাফ জানিয়ে দেন যে, মোশাররফ প্রতিবেশি দেশের একজন নেতা হিসেবে তাঁর রাষ্ট্রে এসে নিরাপত্তা, অর্থনীতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। কিন্তু উসামা বিন লাদেন হলেন আমেরিকা এবং আফগানিস্তানের মধ্যকার ব্যাপার। পাকিস্তানের এই নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কিছুই নেই। আমরা তো পাকিস্তানের সাথে বিশেষ করে এই বিষয়েই কোনো আলাপ করতে চাই না, কেননা তা দুই প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নষ্ট করবে। এমন জবাব পেয়ে মোশাররফ তার আফগানিস্তান সফরের উদ্যোগ প্রত্যাহার করে নেয়।" [566]

---

565 "Mullah Omar declines bin Liden's offer to leave Afghanistan", Ausaf, 19 December 2000, pp. 1, 7.

566 Abdul Salam Zaeef, My Life with the Taliban (New York: Columbia University Press, 2010), p. 119.

ইসলামি মূলনীতি, গোত্রীয় ঐতিহ্য, (তৎকালীন বিশ্বের) একমাত্র ইসলামি ইমারাতের নেতৃত্ব হিসেবে সদ্য জন্মানো আকাঙ্ক্ষা এবং উসামা বিন লাদেনের চতুর কৌশলকে পুঁজি করে মোল্লা উমার এবং তাঁর শূরা বিভাগ আপাতত নিজেদের হাতে থাকা সবচেয়ে বড় সমস্যায় মনোনিবেশ করেন – আহমাদ শাহ মাসউদের নেতৃত্বের Northern Alliance. ২০০১ সালের বসন্তের মধ্যেই, আল-কায়েদার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট পাওয়া তালেবান বাহিনী মাসউদের যোদ্ধাদেরকে উত্তর-পূর্বদিকের ছোট অঞ্চলে আবদ্ধ করে ফেলে। মাসউদের দখলে তখন পুরো আফগানিস্তানের মাত্র ২০ শতাংশ অঞ্চল। কিন্তু তার যোদ্ধারা তখনও পুরোপুরি পরাজিত হয়নি। এর ওপর মাসউদ সুকৌশলে ইরান, রাশিয়া, আমেরিকা, ভারত, উজবেকিস্তান এবং ন্যাটোভুক্ত আরও কিছু রাষ্ট্রের (তুরস্ক, তাজিকিস্তান) কাছ থেকে সব ধরনের আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য হাত করে ফেলছিল – এমন পর্যায়ের সাহায্য, যা মাসউদকে এক অসীম সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলছিল।

এই পর্যায়ে মোল্লা উমার এবং উসামা বিন লাদেনের মনোযোগ পরস্পর অভিন্ন হয়ে যায়। উভয়েই এটা বুঝতে পারছিলেন যে, মাসউদ তার সামরিক মেধা, সংখ্যালঘু গোত্রগুলোর ঐক্য এবং অনন্যসাধারণ ক্যারিশমা দিয়ে দেশব্যাপী তালেবানের উত্থান ও ক্ষমতা অধিগ্রহণকে রুখে দিতে পারবে। মোল্লা উমার এবং তাঁর উপদেষ্টাদের জন্য Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ, রক্তক্ষয়ী এবং অনিশ্চিত যুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র পথ ছিল মাসউদকে হত্যা করা। সে-ই ছিল Northern Alliance-এর মস্তিষ্ক ও হৃদয়। আর সে নিজের কোনো উত্তরাধিকারও প্রস্তুত করেনি।

উসামা বিন লাদেনও তালেবানকে তাদের মাসউদ-বিড়ম্বনা সমাধানে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা স্রেফ নিজের আশ্রয়দাতাকে খুশি করবার জন্যই ছিল না। ২০০১ সালের মধ্যভাগেই উসামা বিন লাদেন এমন কিছু হিসেব কষছিলেন, যা মোল্লা উমার সেসময় বোঝেননি। আর তা হলো, আমেরিকার ওপর আল-কায়েদার হামলা (৯/১১-এর আক্রমণ) বছরের শেষদিকে পরিকল্পনা করা ছিল। উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর লেফটেন্যান্টরা হিসেব নিকেশ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমেরিকার ওপর আল-কায়েদার বহুল প্রত্যাশিত বড় ধরনের হামলা করার আগে মাসউদের পতন ঘটাতে পারলে তা Northern Alliance-কে নেতৃত্বশুন্য করে দিবে; ফলস্বরূপ তালেবানরা সহজেই ওদেরকে পরাজিত করে দিতে পারবে। আর আল-কায়েদা আগে মাসউদকে হত্যা করে এরপর আমেরিকার ওপর বড় আক্রমণে গেলে, যুদ্ধ করতে এসেও ওয়াশিংটন স্থানীয়ভাবে সমর্থন করার মতো কোনো শক্তি আর পাবে না। তখন আমেরিকার নিজেকেই সরাসরি

যুদ্ধে জড়াতে হবে। আর সেটা তার আফগান অভিযানকে আরও কঠিন, দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল করে তুলবে। এসব বিবেচনায় তাই মাসউদকে হত্যা করা ছিল এক 'উইন উইন' পরিবেশ।

তাছাড়া মোল্লা উমার এবং উসামা বিন লাদেন উভয়েই জানতেন যে, মাসউদকে হত্যা করা ধর্মীয়ভাবে বৈধই হবে। কেননা সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশের সালাফি আলিমদের অনেকে আরও আগেই মাসউদকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু বলে ফাতওয়া দিয়েছিলেন। ২০০৬ সালে মূসা আল-কারনি বলেছিলেন, "দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের এখানকার (সৌদি আরবের) বহু আলিমরাই তখন মাসউদের বিপক্ষে এবং হেকমতিয়ারের পক্ষে ছিলেন।" [567]

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আল-কায়েদার একজন আত্মোৎসর্গী বোমা হামলাকারী মাসউদকে হত্যা করে। কিন্তু এই হত্যার সময়টা উসামা বিন লাদেনের ধারণার চেয়ে একটু বেশিই গড়িয়ে গিয়েছিল। এটা অবশ্য এই ব্যাপারটারও এক শিক্ষা ছিল যে, আফগানিস্তানে কিছুই প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে হয় না। এর পরপরই ১১ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে এবং ওয়াশিংটনে আল-কায়েদার হামলা হয়; আর জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসন বীরদর্পে গিয়ে উসামা বিন লাদেনের ফাঁদে পা দেয়। মাসউদকে তখন সমীকরণের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ Northern Alliance-কে বেশ কিছু সময় নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। একইসাথে তা খুব অল্প পরিমাণ আমেরিকার বাহিনীকে আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শহরের সহজ দখলও এনে দিয়েছিল। আর সাথে সাথেই আমেরিকা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আল-কায়েদা এবং তালেবানকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা ছিল এক চূড়ান্ত অপরিপক্কতা।

567 Jamil al-Dhiyabi, "Interview with Shaykh Musa al-Qarni, Part 3", Al-Hayah (Internet version), 10 March 2006.

বেঁচে ফেরা এবং নব উদ্যম, ২০০১-২০১০

ম্যানহাটন, পেন্টাগন ভবন এবং পেনসিলভানিয়ার এক চারণভূমি থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছিল। কিন্তু উসামা বিন লাদেনের কাছে আনন্দ উৎযাপনের জন্য খুব বেশি সময় ছিল না। তিনি সেই ১৯৯৭ সাল থেকে আমেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর শেষমেশ ৯/১১-এর আক্রমণ হওয়ার পর তিনি মোটামোটি নিশ্চিত ছিলেন যে এবার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। [568] কিন্তু তবুও তিনি কোনো কমতি রাখতে চাননি। ২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর উসামা বিন লাদেন ঘোষণ করেন যে, ভীতু ও কাপুরুষ আমেরিকানরা যদি (আফগানিস্তানে) আগ্রাসন চালায়, "তাহলে ওরা চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হবে।" [569]

ওয়াশিংটনকে খোঁচাতে খোঁচাতে উসামা বিন লাদেন এমন ভাব করেন, যেন মাছ ইতোমধ্যেই টোপ গিলে ফেলেছে। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন যে, ৯/১১ হামলার আগে তিনি মাত্র ছয়দিনের নোটিশ দিয়েছিলেন। হামলার মূল তারিখ জানানো হয়েছিল ৫ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু বড় হামলাটির সময় যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল, তা অবশ্যই বহু আগ থেকেই সবাই আঁচ করতে পারছিল। কেননা উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরা সম্ভবত আরও আগে থেকেই সমস্ত আর্কাইভ, নথিপত্র, যোগাযোগের জিনিসপত্র সহ যোদ্ধাদেরকে আফগানিস্তানের পর্বতে কিংবা পাকিস্তানে সরিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। ৯/১১-এর আগে উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে আহমাদ যায়দান লিখেছেন, "উসামা বিন লাদেন এবং সাধারণভাবে বললে গোটা আল-কায়েদাই পশ্চিমের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের ওপর যে কোনো পর্যায়ের হামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন।" এমন পূর্বপ্রস্তুতির কারণেই তালেবান প্রশাসনের পতনের পর তারা হত্যা কিংবা গ্রেপ্তার হওয়া এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। [570] এর ওপর ওয়াশিংটন ৭ অক্টোবরের আগে আফগানিস্তানে আক্রমণ শুরুই করতে পারেনি। ফলে তারা আল-

---

568 Arnett, "Osama bin Laden: The interview", 12 May 1997.

569 "It is impossible to arrest and hand me over to the United States", Nawa-i-Waqt, 19 September 2001, pp. 1, 7.

570 Zaydan, Usama bin Ladin without Mask.

কায়েদাকে নিজ শক্তি-সরঞ্জাম আরও ভালভাবে বিক্ষিপ্ত করতে ২৬ দিন বেশি সময় দিয়ে দেয়। এই দেরি হওয়ার কারণ ছিল আফগানিস্তানের ব্যাপারে পেন্টাগনের (আগে থেকে করে রাখা) পরিকল্পনার অভাব। আরেকটি কারণ ছিল বুশ প্রশাসনের বিভিন্ন সার্ভিস ম্যান বিশেষ করে পাইলটদেরকে হারানোর ভয়। কেননা যথেষ্ট সংখ্যক পদাতিক বাহিনী প্রেরণের আগেই যদি পাইলটদের পাঠিয়ে বিমানহামলা শুরু করা হতো, তাহলে কোনোক্রমে বিমান ধ্বংস হয়ে পাইলটরা যুদ্ধক্ষেত্রে আটকা পড়লে তাদেরকে উদ্ধার করার মতো কোনো উপায় থাকতো না।[571]

সাংবাদিকরা সহ আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সামরিক বাহিনী আল-কায়েদার যে পরিমাণ নথিপত্র খুঁজে পেয়েছিল, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ৭ অক্টোবরের আগে সংগঠনটির শতভাগ স্থানান্তর সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানান্তরের সেই অপারেশনকে যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল, তাও ছিল স্পষ্ট। এমন কোনো কিছুই – যা আল-কায়েদাকে সত্যিকার ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে, যা সংগঠনটির নেতৃত্বকে খুঁজে বের করতে পারে, যা এর পৃথিবীব্যাপী নেটওয়ার্কের বাস্তব চিত্র দাঁড় করাতে পারে, এর আর্থিক খাত বা লেনদেন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য দিতে পারে কিংবা সংগঠনটির লক্ষ্য, টার্গেট বা সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে – এমন কোনো কিছুই ফেলে রেখে যাওয়া হয়নি।

৯/১১ পরবর্তী সময়ে উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে বিশ্লেষণগুলোর অধিকাংশই বিকৃত। কোনো সন্দেহ নেই যে, বিন লাদেন সম্পর্কিত লিখা ও সাহিত্যের এক বিরাট অংশই লেখকদের মনগড়া ভাবনা কিংবা ধারণার জঞ্জালে ভরে গিয়েছে। প্রচলিত জ্ঞান অনুযায়ী, আমেরিকার উপর্যুপরি আক্রমণে উসামা বিন লাদেন, তাঁর অল্প কয়েকজন সহকর্মী এবং বেশ কিছু সংখ্যক যোদ্ধা বেঁচে গেলেও সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদা নাকি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে উসামা বিন লাদেন যে বহু খাটুনি করে আমেরিকার বাহিনীকে আফগানিস্তানে টেনে এনেছিলেন, সেই ব্যাপারটা যেন একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। কেননা আল-কায়েদা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় থাকলে তিনি কখনোই আমেরিকাকে প্রলুব্ধ করতেন না।

এছাড়াও এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, ওয়াশিংটনের প্রত্যাদেশকৃত 'অল্প সামরিক উপস্থিতি' কিছু লড়াই জেতার জন্য যথেষ্ট হলেও পুরো যুদ্ধটা জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আল-কায়েদার মতো একটি স্থিতিস্থাপক এবং আক্রমণ সইতে পারা সংগঠন ৯/১১-এর আগে-

---

571 Bob Woodward, Bush at War (New York: Simon and Shuster, 2002), p. 368.

পরে নিজেদেরকে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী গোত্রীয় অঞ্চলে সরিয়ে নিয়েও কি টিকে থাকতে পারতো না? উসামা বিন লাদেনের ম্যানেজমেন্টের ধরন সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, সেটা ঠিক রেখে ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক হিউব্যান্ড এই ব্যাপারে কিছু যৌক্তিক ব্যাপার তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "বিন লাদেন স্পষ্টভাবেই কাঠামো এবং সংগঠনে বিশ্বাস করেন। আর তিনি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আল-কায়েদার যে কাঠামো তৈরি করেছিলেন, সেটা একইসাথে আল-কায়েদার মূল সাংগাঠনিক শক্তি এবং আপামর মুসলিমদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতার উৎস। আল-কায়েদা হযবরল কোনোকিছু নয়; সেখানে চেইন অব কমান্ড রয়েছে, সেখানে আদেশ-নিষেধ জারি হয়, স্থান ও সময়ভেদে পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা হয়।" [572]

হিউব্যান্ডের উপসংহার আল-কায়েদার ব্যাপারে প্রচলিত জ্ঞানের বিরোধিতা করে। প্রচলিত জ্ঞানে তো ধরে নেওয়া হয়েছিল, আমেরিকার আক্রমণে আল-কায়েদা এতই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর নেতারা এতই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে কেবল বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে নামসর্বস্ব কিছু শাখা ঘোষণা করে সেগুলোর যোদ্ধাদেরকে নিজেদের মতো দিন কাটাতে দেখা ছাড়া সংগঠনটির নাকি আর কিছুই করার ছিল না। উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত (২০১১) বেশিরভাগ বিশ্লেষণ এমনই। এগুলো সত্য হতে পারে, কিন্তু আবার মিথ্যাও তো হতে পারে। আর মিথ্যা হলে, 'আমেরিকার জন্য উসামা বিন লাদেন আর তেমন কোনো হুমকিস্বরূপ না' বলে দেওয়া তো ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার।

যদি বিন লাদেনের নেতৃত্বে আল-কায়েদা এখনও কার্যকরী এক সংগঠন হিসেবে গা ঢাকা দিয়ে থাকে, তখন কী হবে? আর ঘোষণাকৃত Al-Qaeda in the Islamic-Maghreb (AQIM), Al-Qaeda in Iraq (AQI), and Al-Qaeda on the Arabian Peninsula (AQAP) ইত্যাদি "নামসর্বস্ব শাখা"গুলো যদি সংগঠনটির কর্মক্ষমতা, আকার এবং ভৌগলিক বিস্তারের প্রমাণ হয় – তখন কী হবে?

---

572 Huband, Brutal Truths, Fragile Myths, p. 76.

ভাগ্য নাকি পরিকল্পনা?

২০০১ সালের ডিসেম্বরে উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের তোরা-বোরা পর্বত থেকে পাকিস্তানে সফলভাবে সরে যাওয়ার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ হয়েছে। তাই এখানে সেগুলোরই আবার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।[573] তবে একটি ব্যাপার তলিয়ে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো নিরাপদে সরে যেতে সেই অঞ্চলের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের যে পর্যায়ের জ্ঞান ছিল – সেই ব্যাপারে আমরা নিজেরা কী জানতাম, আর কী জানতাম না। ঘটনার শুরু ধরা যায় নভেম্বরের শুরুর দিকে। সেসময় কাবুলে কিংবা তার আশেপাশের একটি জায়গায় উসামা বিন লাদেন পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মীরকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। এর মাত্র কয়েকদিন পরেই – নভেম্বরের ১২ তারিখে কাবুলের পতন হয়। এরপর বিন লাদেন প্রথমে জালালাবাদ এবং এরপর নিজের ঘাঁটি তোরা-বোরাতে চলে যান। উল্লেখ্য, আবদুল বারি আতওয়ান ১৯৯৬-এ তাঁর এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জেনেছিলেন, "তাঁর কাছে তোরা-বোরার এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় সেটাই ছিল তাঁর প্রধান সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু এখন তিনি এটাকে ব্যবহার করেন মূলত পিছু হটে আসতে; এছাড়া নিরিবিলি চিন্তা, পরিকল্পনা এবং বিশ্রাম করতে।"[574] একইভাবে সাংবাদিক মুহাম্মাদ আশ-শাফিঈ লিখেছেন যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে কাজ এগোতে উসামা বিন লাদেন ১৯৯৬-এর গ্রীষ্মে তোরা-বোরায় গিয়েছিলেন।[575]

আতওয়ান যেমনটা বলেছিলেন, উসামা বিন লাদেন আর তাঁর যোদ্ধারা তোরা-বোরা অঞ্চলে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন সেখানে তারা ঘাঁটি, গুহা, সুড়ঙ্গ

---

573 এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ দুটো কাজ হলো – Philip Smucker, Al-Qaeda's Great Escape: The Military and the Media on Terror's Trail (Dulles, Va.: Brassey's, 2004), এবং Gary Bernsten, Jawbreaker. The Attack on bin Laden and al-Qaeda: A Personal Account by the CIA's Key Field Commander (New York: Three Rivers, 2006).

574 Atwan, The Secret History of al-Qaeda, p. 28, and Peter L. Bergen, "The Battle for Tora Bora", New Republic (Internet version), 22 December 2009.

575 Muhammad al-Shafi'i, "Al-Qaeda ideologue recounts details of confl ict between hawks and doves in organization on weapons of mass destruction", Al-Sharq al-Awsat, 12 September 2002, p. 7.

ইত্যাদি তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া ইউনুস খালিসের সাথেও উসামা বিন লাদেনের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। সেই ইউনুস খালিস, যিনি সোভিয়েত বিরোধী জিহাদ চলাকালীন সময়ে উক্ত অঞ্চলের মুজাহিদ এবং সামরিক কমান্ডারদের প্রধান ছিলেন। এর ওপর শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের সংগঠনের একজন জিহাদি ইঞ্জিনিয়ার এবং যোদ্ধা হিসেবে থাকার কারণে উসামা বিন লাদেন আফগান-পাক সীমান্তের উভয় পাশের পশতুনদের কাছেই খুব সম্মানিত একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই তাদের কাছ থেকে সাহায্য আশা করা মোটেও বিলাসিতা ছিল না। এবং পরিশেষে, উসামা বিন লাদেন জানতেন যে পাকিস্তান সীমান্ত পাহারা দিতো Frontier Corps – যা কিনা খাতা-কলমে পাকিস্তানের এক সেনাবাহিনী জেনারেলের অধীন হলেও মূলত স্থানীয় গোত্রগুলো থেকেই এর কর্মীবাহিনী নিয়োগ দেওয়া হতো। আর সেই বাহিনী বাস্তবে ঘুরেফিরে গোত্রপ্রধানদের নির্দেশই বাস্তবায়ন করতো। অতএব গোত্রগুলো উসামা বিন লাদেনের বাহিনীকে সাহায্য করতে চাইলেই Frontier Corps আর তাতে বাধা দিতো না। ১৯৯৮ সালে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন যে, "পাকিস্তানে আমরা এমন এক দরদী মানুষদের সন্ধান পেয়েছি, যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।" [576]

পশ্চিমের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে উসামা বিন লাদেনের প্রথম ঝোঁক নিজেকে বাঁচানোর ব্যাপারে হবে না। কেননা যুবক বয়স থেকেই তিনি শহীদ হতে চাইতেন। এমনকি তিনি প্রচণ্ড কষ্ট করে যুদ্ধকৌশল শিখলেও সেগুলো ব্যবহার করতে প্রচন্ড নারাজ ছিলেন। তাছাড়া তাঁর হিসেব অনুযায়ী আসন্ন যুদ্ধে তাঁর বাহিনীই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। উসামা বিন লাদেন ১৯৮৩-তে বৈরুতে আমেরিকার মেরিন ব্যারাকে হামলা হওয়ার পরে ওয়াশিংটনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন, ১৯৯৩-এ অল্পকিছু সৈন্যের ক্ষয়ক্ষতি হওয়াতেই সোমালিয়া থেকে এবং ১৯৯৮-এ দুটো আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে হামলা হওয়ার পর পূর্ব আফ্রিকা থেকে আমেরিকাকে পালিয়ে যেতে দেখেছিলেন। এছাড়াও ২০০০ সালে USS Cole-এর ওপর আক্রমণ করার পর ওয়াশিংটন সেটার পাল্টা জবাব দিতেও ব্যর্থ হয়েছিল।

এসমস্ত কারণে উসামা বিন লাদেনের হিসেব ছিল, আল-কায়েদার মুজাহিদরা আমেরিকার আক্রমণ সয়ে যেতে পারবে; বিশেষ করে এমন অঞ্চলে যা তখন তিনি খুব ভাল করে চিনে গিয়েছেন।

---

576 Ismail, Bin Ladin, Al-Jazeera, and I.

উমার বিন লাদেন বলেছিলেন যে, ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে যখন তিনি আর তার বাবা তোরা-বোরাতে ছিলেন, তখন তার বাবা মাঝে মাঝেই পাহাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাকিস্তান সীমান্তের ওপার থেকে ঘুরে আসতেন। উমার বলেছিলেন, "আমার প্রচণ্ড আতঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও একসময় বাবা আমাকেও তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আব্বা আমাকে বলেছিলেন, 'উমার, আমরা কখনোই জানি না কখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। অতএব আমাদেরকে এই পর্বত থেকে বের হওয়ার রাস্তা চিনে রাখতে হবে।' আব্বা পথের প্রত্যেকটা ইঞ্চি পর্যন্ত ভালভাবে না চেনা পর্যন্ত শান্ত হননি। তিনি তাগাদা দিতেন 'আমরা যেন অবশ্যই প্রত্যেকটা পাথর পর্যন্ত মুখস্ত করে ফেলি। পিছু হটার গোপন পথ চিনে রাখাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' "[577] উমার আরও বলেছিলেন, ৯/১১-এর পর যখন তিনি শুনতে পান যে তার বাবা তোরা-বোরাতে গিয়েছেন, তখনই নাকি উমার বুঝে গিয়েছিলেন যে, তার বাবাকে পাকড়াও করার সাধ্য আর কারও হবে না। কেননা সেই জায়গা তার বাবা যেভাবে চিনতেন আর যেমন অবলীলায় পশতু ভাষা বলতে পারতেন, তাতে তার বাবাকে ধরা অসম্ভব পর্যায়ের কাজ। উমারের ভাষায়, "ঐ পর্বতগুলোকে আমার বাবার মতো করে কেউ চেনে না।"[578]

উসামা বিন লাদেন আরও এক যুগ, এমনকি সম্ভব হলে তার চেয়েও বেশি সময় যুদ্ধ করবার জন্য পিছু হটে আসলেন। যাই হোক, তাঁর বেঁচে ফেরার ব্যাপারটাকে স্রেফ তথ্য উপাত্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করা ছাড়াও আরেক উপায়েও কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায়। আর এই উপায়টা অনেকের মনমতো না হলেও ঠিকই ভাবনার খোরাক জোগায়। আর তা হলো, ইসলামের ইতিহাসের বীর নায়কেরা দ্বীনের জন্য হওয়া বেশিরভাগ যুদ্ধেই বিশাল প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এতই বিশাল সব প্রতিকূলতা, যেগুলো অতিক্রম করতে প্রত্যক্ষদর্শী এবং বর্ণনাকারীরা মুমিনদের জন্য "আসমানি সাহায্য"[579] অবলোকন করেছিল।

বদর এং খন্দকে মুহাম্মাদ সা.-এর বিজয় হয়েছিল তুলনায় অনেক বিশাল এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে। সিরিয়াতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ রদি.-এর বাহিনী বিশাল বাইজেন্টাইন বাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছিল। সেই যুদ্ধ শুরু

---

577 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, p. 173.

578 Bin Laden, bin Laden, and Sasson, Growing Up bin Laden, pp. 246, 271, & 286.

579 Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, p. 14.

হবার সময় হঠাৎ বাতাসের দিক পরিবর্তন হয়ে বাইজেন্টাইনদের চোখেমুখে ধুলোবালি গিয়ে পড়ে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে তারা রীতিমতো অন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে রিচার্ড দ্য লায়নহার্টের বিরুদ্ধে সালাহউদ্দিনের বিজয়ও এমন ঘটনার আরেকটি উদাহরণ। আর অবশ্যই সোভিয়েতের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে আফগানদের বিজয়ও সাধারণত আল্লাহর নামে যুদ্ধে নামা মুজাহিদরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাবার কারণেই সম্ভব হয়েছিল বলে ব্যাখ্যা করা হয়। আর এই ধরনের ঘটনায় প্রমাণ করা হয় যে, "সত্যের প্রতি ঈমান আনা বাহিনী সত্যবিমুখ যেকোনো পরাশক্তিকেই হারিয়ে দিতে পারে।" [580]

আর এর বিপরীতে মুসলিমরা পরাজয়কে – এমনকি বারংবার আসা পরাজয়কেও – দেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ঈমান ও দৃঢ়তার পরীক্ষা হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, উসামা বিন লাদেনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, শত্রুরা তাঁকে ঘন ঘন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করার ফলে তিনি বিচলিত কিনা।। তখন উসামা বিন লাদেন জবাব দিয়েছিলেন, "এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে হিজরত করাটা যুদ্ধের প্রকৃতি। আপনি কিছু লড়াই জিতবেন এবং কিছু হারবেন... জয় বা পরাজয় উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিমদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কোনো মুসলিম আল্লাহর জন্য বারংবার হিজরত করলে বরং দ্বিগুণ পুরস্কৃত হয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, সকল প্রশংসা ও মহিমা তাঁরই, তিনি যেন আমাদের হিজরতকে একমাত্র তাঁর জন্য হিজরত হিসেবে কবুল করেন।" [581] যে ঈমান এমন ধরনের দৃঢ় মনোভাবকে সক্রিয় করে, তা মোটামোটি এটাও ব্যাখ্যা করে দেয় যে কেন উসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদার মধ্যে যুদ্ধক্লান্তি এত কম দৃশ্যমান। অথচ এর সদস্যদের কেউ কেউ তো বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন; এবং পরিবার ও ঘরবাড়ি থেকে দূরে রয়েছেন।

৯/১১-এর পর উসামা বিন লাদেনের বেঁচে যাওয়াকে তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞান, শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারা এবং অনেকাংশেই ভাগ্য – ইত্যাদি কারণে সম্ভব হয়েছিল বলা হয়। কিন্তু এক বিশাল, বিশাল সংখ্যক মুসলিমই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, উসামা বিন লাদেনের বেঁচে ফেরা আসমানি সাহায্যের কারণেই হয়েছিল। কেননা আর যাই হোক, ২০০১ সালের ডিসেম্বরে তোরা-বোরায় হওয়া লড়াইটা আদতে সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে 'দুর্বল এক জাতির'-ও ছিল না। বরং সেটা ছিল একজন মানুষ আর তাঁর অনুগত মাত্র কয়েকশত যোদ্ধার বিরুদ্ধে গোটা পশ্চিমের সংঘর্ষ। আর তাই লক্ষ লক্ষ মুসলিমের কাছে

---

580 Long, "Ribat, al-Qaida, and the Challenge for U.S. Foreign Policy", p. 31.

581 Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", 4 January 1999.

তোরা-বোরা থেকে উসামা বিন লাদেনের বেঁচে ফেরা ছিল মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহর অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ। তাছাড়া সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে উসামা বিন লাদেনকে সাহায্য করার একেবারে প্রথম ঘটনা ছিল বলেও মনে হয় না। জাজিতে তিনি এবং তাঁর ছোট্ট আরব দল বিশাল সোভিয়েত বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিলেন; জালালাবাদের যুদ্ধে তিনি লড়াই করে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু বেঁচে ফিরেছিলেন; একবার সোভিয়েতের একটি শেল তাঁর একেবারে পাশে এসে পড়েছিল, কিন্তু তা কেন যেন বিস্ফোরিত হয়নি; আফগানিস্তানে এবং সুদানে বেশ কয়েকবার তাঁকে হত্যাচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; ১৯৯৮-এ আমেরিকার ভয়াবহ ক্রুজ মিসাইল আক্রমণ থেকেও তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন; এবং পরিশেষে ৯/১১-এর পর আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী সব ধরনের প্রচেষ্টার পরও তাঁর গায়ে আঁচড়ও দিতে পারেনি।

তাই তোরা-বোরা থেকে বেঁচে ফেরা উসামা বিন লাদেন স্রেফ একজন সাহসী মানুষই ছিলেন না। বরং তিনি এমনই একজন অকুতোভয় মুজাহিদ ছিলেন, যাকে দিয়ে আল্লাহ আরও অনেক কিছু করাবার পরিকল্পনা রেখেছিলেন বলেই মনে হয়। আর তোরা-বোরা পরবর্তী যুগে উসামা বিন লাদেন তাঁর শত্রুদের সাথে যতই যুদ্ধ করেছেন, যতই ধোঁকা দিয়েছেন, ততই মুসলিমদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ় হয়েছিল। প্রতিটা বছর কাটছিল, আর সমসাময়িক যুগে ইসলামের একজন বীর নায়ক হিসেবে তাঁর মর্যাদা কেবল বেড়েই চলছিল। অচিরেই সালাহউদ্দিনের ন্যায় উসামা বিন লাদেনের নামও একজন কিংবদন্তী হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা হবে।

নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার

পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়ে উসামা বিন লাদেনকে মাথা গুনতে হয়েছিল – কারা বেঁচে আসতে পেরেছে, এবং কারা পারেনি। আর সেই হিসেবে সাংগাঠনিক পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছিল। তখন কাজে লাগানোর মতো বেশকিছু বড় ধরনের সুযোগও তাঁর হাতে ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার সরকার এবং সেনাবাহিনী কিছু গুরুত্বপূর্ণ আফগান শহর দখলে নিয়েই ভেবে বসেছিল, আল-কায়েদা এবং তালেবান একেবারে চিরকালের জন্য পরাজিত হয়ে গিয়েছে। তাই উসামা বিন লাদেন হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। কিন্তু আহমাদ যায়দান লিখেছেন যে, ২০০১ সালে উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তিনি আল-কায়েদার প্রত্যাশা অনুভব করেছিলেন – আমেরিকার বাহিনী আফগানিস্তানে আক্রমণ চালালে তালেবানদের পতনের জন্যও তারা প্রস্তুত ছিলেন। [582] আর উসামা বিন লাদেন ২০০৭ সালে গিয়ে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, “রাষ্ট্রের পতন মানেই সব শেষ নয়, কিংবা এর মানে এমনও নয় যে ইসলামি সম্প্রদায় ও ইসলামি ইমামের পতন ঘটেছে… কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারি থাকতে হবে; যেমনটা জারি রয়েছে আফগানিস্তানে, ইরাকে এবং সোমালিয়ায়।” [583]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের গোত্রগুলো আর পাকিস্তান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে উসামা বিন লাদেনের ভাল সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া সোভিয়েত-বিরোধী জিহাদে তাঁর ভূমিকার কারণে আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার একাংশও তাঁকে খুব ভাল জানতেন। আমেরিকা এবং ন্যাটো যখন নিজেদের আত্মপ্রশংসায় ডুবে অপরিপক্ক উদযাপনে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়টায় উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা নিজেদের পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস এবং পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনায় মনোযোগ দেয়।

২০০১-এর শেষদিকের কিছু বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকারে উসামা বিন লাদেন তাঁর শ্রোতাদেরকে জানিয়ে দেন যে, যুদ্ধের জরুরি অবস্থার কারণে তিনি প্রকাশ্যে তেমন আর আসবেন না। সাথে তিনি এটাও বলে রাখেন যে, আমেরিকা-ন্যাটো আগ্রাসন প্রতিরোধে আল-কায়েদা তালেবান নেতৃত্বের ডাক শুনবে। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দেন, আল-কায়েদা

---

582 Zaydan, “Usama bin Ladin without Mask”

583 OBL, “The way to foil plots.”

তালেবানকে এই ব্যাপারে যেভাবে পারে সাহায্য করবে।[584] কিন্তু আবারও আমেরিকা সহ গোটা পশ্চিমের কর্মকর্তারা উসামা বিন লাদেনের কথার মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়। তাদের পর্যবেক্ষণের দৌড় ছিল মোটামোটি এরকম – "হুম, এই বার্তায় হামলার হুমকি রয়েছে..." কিংবা, "এই বার্তায় হামলার হুমকি রয়েছে, কিন্তু আমরা এরকমটা আগেও শুনেছি" কিংবা, "এখানে আক্রমণের হুমকি থাকলেও সেটা কবে কোথায় হতে পারে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই।" আর পশ্চিমা মিডিয়াও স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রত্যেকটা বার্তাকে "আরেকটি অসংলগ্ন চেঁচামেচি" ধরনের তকমা দিয়ে অগ্রাহ্য করতে থাকে।

এ থেকে তিনটি প্রশ্ন সামনে আসে:

(১) পশ্চিমা কর্মকর্তারা কি এটা আশা করতেন যে, রীতিমতো দু'বার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরও উসামা বিন লাদেন আর কোনোপ্রকার হুমকি ধামকি দিবেন না?

(২) তারা কি এটা মনে করতেন যে, উসামা বিন লাদেন আল-কায়েদার পরবর্তী হামলার স্থান, কাল এবং ধরন সব বলে দিবেন?

(৩) তাদের কি একবারও মনে হলো না – আমাদের প্রতি উসামা বিন লাদেনের হুমকি ধামকির পিছনে অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে?

আমি কর্মকর্তাদের মধ্যে একজনও এমন পেলাম না, যিনি বিন লাদেনের বার্তাগুলোকে একটি সুসংহত ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন; এমন এক ক্যাম্পেইন যা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের কাছে আল-কায়েদাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের পূর্ববর্তীদের (সালাফদের) কাছ থেকে চলে আসা ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হিসেবে পরিচিত করে তুলবে; এবং এর মাধ্যমে আমেরিকার ভূমিতে আল-কায়েদার পরবর্তী আক্রমণের তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রদান করবে। এই বক্তব্যগুলো থেকে উসামা বিন লাদেনের

---

584 "Exclusive interview with Usama bin Ladin", Ummat, 28 September 2001, pp. 1 and 7; "Speech by Usama bin Ladin, leader of the al-Qaeda organization", Al-Jazeera Satellite Television, 3 November 2001; Hamid Mir, "The war has not yet begun: Detailed interview with Usama bin Laden", Ausaf, 16 November 2001, pp. 9, 11; "U.S. biggest terrorist and merchant of death: Usama", Nawa-i-Waqt, 12 December 2001, pp. 1, 10; and, "Statement by al-Qaida leader Usama bin Laden", Al-Jazeera Satellite Television, 27 December 2001.

আরেকটি দক্ষতারও প্রকাশ ঘটে; সেটা হলো কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃত নীরবতা অবলম্বন করে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার দক্ষতা। তিনি তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

> *“আমাদের অন্য আরও অনেক কিছু করার আছে। নীরবতাই আমাদের আসল প্রপাগান্ডা। (শত্রুর সমস্ত দোষারোপের) অস্বীকৃতি, কৈফিয়ত কিংবা বিশুদ্ধতা জানান দিতে যাওয়া কেবল আপনার সময়ই নষ্ট করবে। আর এগুলোর মাধ্যমে শত্রু আসলে আপনাকে এমনসব বিষয়ে মনোযোগী করতে চায়, যেগুলোর সত্যিকার কোনো প্রয়োজনই নেই। এমন বিষয়গুলো নিয়ে পড়ে থাকা আপনাকে আপনার মূল উদ্দেশ্য থেকেই দূরে সরিয়ে রাখছে।*
>
> *আসলে পশ্চিমা মিডিয়া আমাদের ব্যাপারে এমনসব ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে, যেগুলো দেখে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারি না। তবে এই ধরনের প্রপাগান্ডাগুলো একইসাথে ওদের অন্তরে কী রয়েছে, সেটাও প্রকাশ করে দেয়। আর সময়ের সাথে সাথে ওরা নিজেরাই এইসব প্রপাগান্ডার ফাঁদে মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। ওরা নিজেরাই এইসব প্রপাগান্ডা বিশ্বাস করে ভয় পেতে শুরু করেছে, নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে শুরু করেছে। আতঙ্ক হলো আধুনিক সময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র। আর পশ্চিমা মিডিয়া নির্দয়ভাবে ওদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধেই এই অস্ত্র ব্যবহার করে চলেছে... ...আর যুদ্ধবিগ্রহে ভয় এবং অসহায়ত্বে ভুগতে থাকা একটি জাতির কার্যকলাপ কেমন হবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।”* [585]

প্রায় এক যুগ ধরে উসামা বিন লাদেন তখনই কথা বলেছেন, যখন তাঁর নিজের ইচ্ছে হয়েছে এবং তিনি সেসব বিষয়েই কথা বলেছেন, যা তিনি নিজে পছন্দ করেছেন। আর এর ফলাফলে তাঁর শত্রু (আমেরিকা) যত্তসব অথর্ব এবং অপ্রমাণিত ধারণা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে বিভ্রান্ত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, আমেরিকা তো কোনো ব্যাপারে চুপ থাকার ক্ষমতা অনেক আগেই খুইয়েছিল। উসামা বিন লাদেনের দীর্ঘ নীরবতার কারণে পশ্চিম কখনও ‘উসামা বিন লাদেন মারা গিয়েছেন’ বলে উপসংহার টেনে ফেলেছিল; কখনও ‘তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে, গুহা থেকে গুহাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন’ বলে ধরে নিয়েছিল; কখনও আবার ‘তিনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন এবং আল-কায়েদাকে নেতৃত্ব

---

585 “Exclusive interview with Usama bin Ladin”, Ummat, 28 September 2001, pp. 1, 7.

দিতে পারছেন না' বলে প্রচার করেছিল। এমনকি 'বিন লাদেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে (কিডনি বিকল) আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন', 'তিনি অবসর নিয়ে আল-কায়েদার নেতৃত্ব তাঁর ছেলে এবং আইমান আজ-জাওয়াহিরির কাছে দিয়ে দিয়েছেন', 'আল-কায়েদা আর তালেবানদের মধ্যে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব হয়ে গিয়েছে, আর তাই তালেবান উসামা বিন লাদেনকে ন্যাটোর কাছে তুলে দিবে' – ইত্যাদি মনগড়া গল্পও পশ্চিমের মিডিয়া ক্যাম্পেইনে এসেছিল। আর সবচেয়ে ফালতু গল্পটা ছিল এটা – '৯/১১-এর পরপরই আমেরিকার আক্রমণে তিনি মারা গিয়েছিলেন; আর এরপর থেকে যেসব বার্তা এসেছে, সেগুলো হয় আগেই রেকর্ড করা ছিল, নয়তো কোনো বডি-ডাবলকে দিয়ে ভিডিও করা হয়েছে'। এইসব গালগপ্পের কোনোটিরই বিন্দুমাত্র প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে সবগুলো গল্পই ছিল এমন লোকদের মস্তিষ্কপ্রসূত, যারা নীরবতা সহ্য করতে পারতো না; আর তাই আন্দাজে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে ব্যস্ত হয়ে যেত। এরপর উসামা বিন লাদেন হঠাৎ করেই কোনো একটি অডিও রেকর্ডিং প্রকাশ করতেন, আর সব ধরনের জল্পনা কল্পনা ছাইপাঁশ প্রমাণ হয়ে যেত।

প্রফেসর অ্যান্ড্রু হিল (Andrew Hill) লিখেছেন, "বিন লাদেনের বক্তব্যের রেকর্ডিংগুলো তাঁর শত্রুদের সামনে তাদের এই 'Most Wanted Enemy'-কে এমনভাবে চিত্রায়ন করেছিল, যে কিনা অনবরত তাদেরকে দোষারোপ করছে, হুমকি দিচ্ছে, উত্তেজিত করে তুলছে, একবার ক্ষতি করে আবারও একইরকম ক্ষতি করার ঘোষণা দিচ্ছে, তাঁকে ধরার সব ধরনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দিচ্ছে, সর্বোপরি বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদে নিজের সাধ্যমতো অবদান রেখে চলেছে... ... অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, বিন লাদেন নিজেই তাঁর শত্রুদের জন্য এক কার্যকরী অস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন... তিনি আমেরিকার জন্য একাই এক ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যাপারটা একদিকে তাঁর অবস্থান, গতিবিধি, কার্যক্রম ইত্যাদির ব্যাপারে ধোঁয়াশা তৈরি করে দিতো। অপরদিকে পশ্চিমে তাঁকে আরও বেশি বিভীষিকাময় করে তুলতো।" হিল উপসংহার টেনেছিলেন, "(ভিডিও ফরম্যাটে) বিন লাদেনকে দেখতে না পেয়ে স্রেফ অডিও রেকর্ডিং শোনা আমেরিকানদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আরও সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিতো।" [586]

---

586 Andrew Hill, "The bin Laden Tapes", Journal for Cultural Research, Vol. 10, No. 1 (January 2006), pp. 38, 41, and 42.

২০০১ সাল থেকে উসামা বিন লাদেন এক জোরালো, উন্নত ও বাস্তবসম্মত মিডিয়া যুদ্ধ জারি রেখেছিলেন। এই যুদ্ধ তাঁর আফগান যুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী সময়ের মিডিয়া কার্যক্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। আজকের সময়ে (২০১০-২০১১) এই মিডিয়া যুদ্ধ মূলত চারটি বিষয়কে ফোকাস করেছে –

[১] আরও বেশি যুদ্ধের ধর্মীয় বৈধতা প্রচার

ক্ষয়ক্ষতি, অর্থনৈতিক সংকট, স্থাপনা ধ্বংস এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের দিক থেকে ৯/১১-এর হামলার সার্থকতা উসামা বিন লাদেনের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর কার্যক্রম (৯/১১-এর আক্রমণ) ১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারিতে জারিকৃত ফাতওয়া দ্বারা অনুমোদিত ছিল। কিন্তু তবুও তাঁকে অনেক ইসলামপন্থীদের চরম সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক অনেক অভিযোগের মাঝে এই অভিযোগও আসে যে, উসামা বিন লাদেন নাকি এই হামলার আগে কুরআন সুন্নাহের সবগুলো দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেননি – শত্রুকে সতর্ক করা, শত্রুকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানানো ইত্যাদি বাদ ছিল। এছাড়া শত্রুকে শান্তিচুক্তির আহ্বান করে যুদ্ধকে সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবেও গণ্য করা হয়নি। সহজভাবে বললে, উসামা বিন লাদেনের হামলার আগে প্রয়োজনীয় শারঈ মূলনীতির অভাব ছিল বলে অভিযোগ করা হয়।[587]

---

587 এখানে যে শর্তগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আসলে ইকদামি (আক্রমণাত্নক) জিহাদের শর্ত; দিফায়ি (আত্নরক্ষামূলক) জিহাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত নেই। উল্লেখ্য, ইকদামি ও দিফায়ি জিহাদের সংজ্ঞা ৯৫ পৃষ্ঠার 182 নং টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৯/১১-এর হামলা কাফিরদের ভূমিতে গিয়ে হয়েছিল বলে অনেকেই এই হামলাকে ইকদামি জিহাদ ধরে নেয় এবং এই আলোকে ইকদামি জিহাদের নানারকম শর্ত দেখিয়ে আল-কায়েদার জিহাদকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। উপরোক্ত শর্তগুলোও ছিল একই প্রপাগান্ডার অংশ। অথচ উসামা বিন লাদেন সহ আল-কায়েদার সমস্ত আলিম সবসময়ই নিজেদের জিহাদকে 'দিফায়ি জিহাদ' বলে এসেছেন। ইকদামি ও দিফায়ি জিহাদের সংজ্ঞা ও মূলনীতি থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্রেফ কাফিরদের ভূমিতে গিয়ে আক্রমণ (যেমন ৯/১১) করা হলেই তা ইকদামি হয়ে যায় না। কেননা এই হামলার মাধ্যমে আমেরিকায় ইসলাম কায়েম কিংবা আমেরিকান কাফিরদের থেকে জিযিয়া আদায় উদ্দেশ্য ছিল না। মাইকেল শইয়ার নিজেও এই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় ইতোমধ্যেই এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

এমনকি এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আইমান আজ-জাওয়াহিরিও নিজ গ্রন্থে লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে যুদ্ধরত কাফিরদের ভূমিতে গিয়ে আমাদের আক্রমণও দিফায়ি জিহাদের অংশ। কেননা, এই হামলাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো, যাতে এসকল আগ্রাসী কাফিররা আমাদের ভূমিগুলো থেকে চলে যায়।" [আত-তাবরিয়া, অধ্যায় ১২] তাই ইকদামি জিহাদের যেসকল শর্তের কথা বলে ৯/১১-এর আক্রমণ কিংবা কাফিরদের ভূমিতে গিয়ে আল-কায়েদার যেকোনো ধরনের হামলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়, তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

উসামা বিন লাদেন হয়তো এই অভিযোগটিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বারবার আল-কায়েদার যুদ্ধকে "ইসলামি মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত" এবং "আল্লহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর শিক্ষার আলোকে পরিচালিত" বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, "কোনো অবস্থাতেই আমাদের সাথে কাফিরদের শত্রুতাকে ভুলে গেলে চলবে না। কেননা এই শত্রুতা বিশ্বাস থেকে উৎসরিত।" [588] আল-কায়েদা পাকিস্তানে পরিপূর্ণভাবে ঘাঁটি গাড়ার পর তিনি পরপর বেশ কয়েকটি বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর যুদ্ধের সমস্ত ইসলামি শর্ত পূরণে মনোযোগী হন। [589]

২০০২ সালের শেষের দিকে তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেশকিছু সতর্কবাণী প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলোর সারমর্ম মোটামোটি একইরকম ছিল। [590] পশ্চিমাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের একজন আন্তরিক উপদেশদাতা। আমি তোমাদেরকে মুসলিম হয়ে যাওয়ার তাগাদা দিচ্ছি। তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। একমাত্র ইসলাম গ্রহণই তোমাদের এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।" [591] এমনকি তিনি পশ্চিমকে দীর্ঘমেয়াদি শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, শত্রুরা যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি চাইলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.

---

588 "Statement by Usama bin Laden in 'The first war of the century' program", Al-Jazeera Satellite Television, 3 November 2001.

589 লেখক মাইকেল শইয়ার এটা জানতেন যে, আল-কায়েদার জিহাদ কুরআন সুন্নাহের মূলনীতি অনুসারে দিফায়ি জিহাদ। কিন্তু ৯/১১-এর পর জিহাদবিরোধী ইসলামপন্থীরা যেসব শর্তের কথা বলে আল-কায়েদার জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে, সেগুলো যে আদতে ইকদামি জিহাদের শর্ত ছিল, তা লেখক জানতেন না। একারণে পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেন আমেরিকাকে ইসলামের দিকে আহ্বান কিংবা শান্তিচুক্তির প্রস্তাব করলে সেগুলোকে লেখক জিহাদের শর্ত পূরণ করা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আসলে তা ছিল উসামা বিন লাদেনের মিডিয়া ক্যাম্পেইনের নতুন কৌশল মাত্র। কেননা তিনি জানতেন যে আমেরিকা সহজে মাথা নত করবে না, বরং যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। ফলে তখন ব্যাপারটাকে ফোকাস করে মুসলিমদেরকে জিহাদের দিকে আহ্বানও আরও জোর দিয়ে করা যাবে। আর পরবর্তীতে এমনটাই হয়েছিল।

590 "Statement by Usama bin Ladin", Al-Qala'ah (Internet), 14 October 2002; OBL, "Message to countries allied with the United States", Al-Jazeera Satellite Television, 12 November 2002.

591 "Bin Ladin audio message", Al-Jazeera Satellite Television, 6 October 2002; OBL, "Letter to the American people", Waaqiah (Internet), 12 November 2002; "Bin Laden's letter to Americans", Observer (Internet version), 24 November 2002; and OBL, "Message to the American people", Al-Fallujah Islamic Minbar (Internet), 8 September 2007.

মুসলিমদেরকে শান্তিই বেছে নিতে বলেছেন। [592] এরকম মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার যুদ্ধের ভিত্তি দৃঢ় হয়। একইসাথে এই মিডিয়া কার্যক্রমগুলো দেখে মনে হয় – আল-কায়েদা যে পশ্চিমের সাথে শান্তিচুক্তি করতে চেষ্টা করেছিল, সেটা তারা খুব জোর দিয়ে মুসলিমদের জানা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দেওয়া একটি বার্তায় উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, "তাদের সাম্প্রতিক জনমত জরিপের ব্যাপারে [যেখানে আফগানিস্তান এবং ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা উঠে এসেছিল] আমাদের অবস্থান তো আপনারা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন। তাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং আমাদের কাছে লাঞ্ছিত হওয়া বন্ধ হওয়ার ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে শান্তিচুক্তির জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর আমাদের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রুসেড অব্যাহত রেখেছে।" [593]

[২] শাসকদের ইরতিদাদকে (ধর্মত্যাগ) ধোলাই

৯/১১-এর ঘটনার পর, উত্তর আফ্রিকা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর শাসকেরা উসামা বিন লাদেনের সহজ টার্গেটে পরিণত হয়। বেশিরভাগ শাসকেরাই আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের সমর্থন করেছিল। আর যখন পুরো বিশ্বের মুসলিমরা ইরাকে আমেরিকার আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করছিল, ঠিক সেই সময়টায় মিশর, জর্ডান, সৌদি আরব সহ অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রের শাসকেরা নিজেদের নৌবন্দর, বিমানবন্দর, সামরিক ঘাঁটি এবং আকাশসীমা আমেরিকার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ইরাকের ওপর আমেরিকার আগ্রাসনের ঘোর বিরোধিতার সাথে সাথে উসামা বিন লাদেন লিখেছিলেন, "এসমস্ত অঞ্চলের শাসকেরা শেষ পর্যন্ত আমেরিকার চাপে নতি স্বীকার করেছে এবং তাদের ভূমি, সাগর, বিমানঘাঁটি ইত্যাদি খুলে দিয়ে স্পষ্টভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তারা এমন গর্হিত অপরাধ

---

592 OBL, "Message to the American people", Al-Jazeera Satellite Television, 19 January 2009, and OBL, "Message to our neighbors north of the Mediterranean", Al-Arabiyah Television, 14 April 2004.

593 OBL, "O Muslim People", Al-Sahab Media, 26 April 2006.

করেছে, যা ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।" [594] পাকিস্তানও এইসব আরব রাষ্ট্রের পাশাপাশি হেঁটেছে, এবং ফলস্বরূপ "আরেকটি রাষ্ট্র ক্রুশের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে।" এছাড়া আফগানিস্তানের কার্জাই সরকারকে তো শুরু থেকেই শয়তান-পরিচালিত বলে অভিহিত করা হয়েছিল। [595] মোশাররফ, জারদারি এবং কারযাইয়ের অধীনে তথা পাকিস্তানি এবং আফগান প্রশাসন সবগুলোই "আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারতের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে কাজ করেছে" এবং "ইসলামবিরোধী তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছে"। [596]

সৌদির তৎকালীন ক্রাউন প্রিন্স আবদুল্লাহর ২০০২ সালের ইসরাঈল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রস্তাবনাকেও উসামা বিন লাদেন "ইহুদি-আমেরিকান" (Zio-American) কর্মযজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। পরবর্তীতে একটি কবিতায় তিনি আরব শাসকদেরকে তিরষ্কার করেন; এছাড়া ইসরাঈলকে ধ্বংস করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত না করার কারণে তিনি তাদেরকে "আরব-জায়নিস্ট" বলেও আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এটা এমন এক দুনিয়া হয়ে গিয়েছে, যেখানে শিশুদেরকে বকরির মতো জবাই করা হচ্ছে, ইহুদিরা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করছে আর আরবরা কিনা কনফারেন্স করে বেড়াচ্ছে।" [597]

ফিলিস্তিন ইস্যুকে কেন্দ্র করে উসামা বিন লাদেন শিয়াদেরকেও প্রকাশ্যে ধুয়ে দিয়েছিলেন; আর তাঁর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ছিল দুর্লভ। তিনি লেবাননের হিযবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হোসনি মোবারক এবং "আরবের অন্যসব পুতুল শাসকদের মতোই" ইসলামবিরোধী শিবিরে অবস্থানকারী হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। কেননা হিযবুল্লাহ জাতিসংঘ এবং "জায়নিস্টদের" সাথে চুক্তি করেছিল এবং জাতিসংঘের ১৭০১ প্রস্তাবনাকে

---

594 OBL, "Message to the Muslim nation", Islamic Research and Studies Center (Internet), 4 March 2004.

595 OBL, "Message to Muslims in Pakistan", Al-Jazeera Satellite Television, 3 June 2009; OBL, "Message to the Pakistani people", Al-Jazeera Satellite Television, 1 November 2001, and OBL, "Exposing the new Crusader war in Iraq."

596 OBL, "Remove the apostate", Al-Sahab Media, 20 September 2007, and OBL, "To Muslims in Pakistan", Al-Jazeera Satellite Television, 3 June 2009.

597 OBL, "Crown Prince Abdullah's initiative is high treason", Al-Quds al-Arabi, 28 March 2002, p. 3; OBL, "Practical steps to liberate Palestine", Al-Sahab Media, 14 March 2009; and Muhammad al-Shafi'i, "A site close to al-Qa'idah posts a poem by bin Laden", Al-Sharq al-Awsat, 20 June 2002.

অনুমোদন দিয়েছিল। অথচ সেই প্রস্তাবনায় "ইহুদিদেরকে নিরাপত্তা দিতে ক্রুসেডার বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।" [598] উসামা বিন লাদেন সতর্ক করেছিলেন যে, ইহুদিদের কোনো সহযোগীই "উপযুক্ত সময় চলে এলে" প্রতিশোধ থেকে মোটেও রক্ষা পাবে না। [599]

[৩] সরকারি আলিমদের সমালোচনা

উসামা বিন লাদেন যাদেরকে 'দরবারি আলিম' বলে ডাকতেন, তারাও ছিল তাঁর মিডিয়া ক্যাম্পেইনের সহজ টার্গেট। তাদেরকে 'উলামায়ে সু' বলার পাশাপাশি বিন লাদেন এই বাস্তবতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, সেইসব আলিমদের প্রায় কেউই আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনে সহায়তার জন্য আরব প্রশাসনকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেনি। এমনকি বিরোধিতা তো দূরের কথা, এই আলিমরা ওইসব "বিশ্বাসঘাতক শাসকদেরকে" রীতিমতো "ন্যায়নিষ্ঠ রক্ষাকর্তা" বলে এবং তাদের আনুগত্য ও সমর্থন করা বাধ্যতামূলক বলে প্রচার করেছিল। [600] আরবের জালিম শাসকদের প্রতি এই আলিমদের সমর্থন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কাফিরদের আক্রমণের ব্যাপারে তাদের নির্লিপ্ততা, জিহাদের ময়দানে গিয়ে লড়াই করতে আগ্রহী যুবক মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদির ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন,

> *"এগুলো হলো মুসলিম বিশ্বে চরম অসততা ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ। যেসব ইমামরা আরব শাসকদের দিকে ঝুঁকে আছে, যেসব আলিমরা মুসলিম বিশ্বের শাসকদের দিকে ঝুঁকে আছে, তারাই আজকে মূলত মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে। মিডিয়া থেকে শুরু করে তাদের নিজস্ব যা কিছু মাধ্যম রয়েছে, সবকিছু ব্যবহার করে... দিন-রাত তারা মানুষকে জাহান্নামের*

598 OBL, "Practical steps to liberate Palestine", and OBL, "A message to the Muslim nation", Al-Sahab Media, 18 May 2008.

599 OBL, "Second Message to Iraqi people", Al-Jazeera Satellite Television, 18 October 2003.

600 OBL, "Message to Americans", Al-Fallujah Islamic Minbar (Internet), 8 September 2007; OBL, "Exposing the new Crusader war."

দরজার দিকে আহ্বান করছে... আর আল্লাহ যাদেরকে দয়া করেছেন, তারা বাদে বাকি সবাই নিজেদের এইসমস্ত হঠকারি ইমাম এবং আলিমদের গুণকীর্তন করতে ব্যস্ত রয়েছে। এই আলিমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর বিরোধিতা করা শাসকদের প্রশংসা করে বার্তা পাঠায়। শাসকেরাও পুরো জাতিকে ধোঁকার মধ্যে রাখা এসব আলিমদের প্রশংসা করে করে বার্তা পাঠায়। সংবাদপত্র সহ অন্যান্য মিডিয়াগুলোও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর বিরুদ্ধাচরণ করা প্রপাগান্ডা ছড়াতে ব্যস্ত থাকে।” [601]

৯/১১-এর পর মুসলিমদের ওপর কাফিরদের আগ্রাসনের ব্যাপারে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের প্রশাসনগুলো সমর্থন দিয়েছিল। আর নিজ নিজ প্রশাসনকে এমন সমর্থনের ধর্মীয় বৈধতা এনে দিয়েছিল সরকারি আলিমরা। এর ফলে তারা আসলে এক স্ববিরোধী অবস্থান নেয়। কেননা, আফগানিস্তানে সোভিয়েতরা আক্রমণ করলে এই আলিমরা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বৈধতা দিয়েছিল। অথচ পরবর্তীতে আমেরিকা একইভাবে ইরাক এবং আফগানিস্তানে আক্রমণ চালালে একই আলিমরা জিহাদের বিরোধিতা করে বসে; ইসরাঈল লেবাননে (২০০৬) এবং গাযায় (২০০৮) আক্রমণ করলে, মিশর থেকে গাযায় খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করতে দেয়াল তৈরি করলে একই আলিমরা তাদের নিয়োগকারীদের (প্রশাসনের) পাশাপাশি নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি তাদের নেতারা যখন কাফিরদের সাথে “আন্তঃধর্মীয় সংলাপে” (২০০৭) ব্যস্ত হয়েছিল, তখনও এই আলিমরা ছিল নীরব। অবশ্য পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের ওপর এই আলিমদের প্রভাবের পতন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের কোনো কথাই ৯/১১ কিংবা এর পরে জ্বলে ওঠা কোনো সশস্ত্র আন্দোলনকে ঠেকাতে পারেনি। যেসব সরকারি আলিম ও মুফতিরা উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদাকে নিয়ে সমালোচনায় মেতে থাকতো, তাদেরকে ইঙ্গিত করে পাকিস্তানি পত্রিকা ‘আউসাফ’-এ উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমাদের কাছে দরবারি আলিমদের বিবৃতিগুলোর কোনো মূল্যই নেই। তারা তো ইসলামে নিষিদ্ধকৃত সবকিছুই সমর্থন করে যাচ্ছে।” [602]

---

601 “Speech by Osama bin Laden”, MEMRI, Special Dispatch, No. 539, 18 July 2003. আরও দেখুন – Souhail Karam, “Saudi fatwa ruling seeks to contain clergy”, http://www.reuters. com, 23 August 2010

602 Hamid Mir, “The war has not yet begun – Detailed interview with Usama bin Laden”, Ausaf, 16 November 2001, pp. 9 and 11.

[৪] আমেরিকার নীতিমালার ওপর গুরুত্বারোপ

৯/১১ পরবর্তী সময়ে উসামা বিন লাদেনের ফাঁদে অনেকেই জড়িয়েছে, কিন্তু কারও অবস্থাই আমেরিকার মতো চূড়ান্ত বোকামিপূর্ণ ছিল না। ২০০৫-এ আবু জান্দাল বলেছিলেন, "হ্যাঁ, প্রথমদিকে (সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়) আমেরিকা শাইখ উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদাকে সহায়তা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে শাইখ উসামা আমেরিকাকে আক্রমণ করে মুসলিম বিশ্বের সামনে এর প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে দিতে চেয়েছেন। এর অপকর্মগুলো প্রকাশ করে দিতে চেয়েছেন। আর সত্যি সত্যি সেটাই হয়েছে।" [603] আমেরিকা তো আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছিল তালেবান আর আল-কায়েদাকে হারাতে এবং তাতে ব্যর্থও হয়েছে। আমেরিকা আফগানদেরকে পশ্চিমা বানাতে এসেছিল; কিন্তু এখন সে একই আফগানদের কাছে হেরে যাচ্ছে। এরপর সে ইরাক আক্রমণ করে বসে এবং সেখানে শিয়া পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। একইসাথে সেখানকার সব ধরনের সুন্নি – হোক সে উগ্রবাদী, রক্ষণশীল কিংবা মধ্যমপন্থী – সবাইকে একঘরে করে দেয়। আফগানিস্তান এবং ইরাক – উভয় জায়গাতেই আমেরিকা এক নিথর, অতিসজ্জিত এবং সব ধরনের ক্ষতি এড়ানো বাহিনী নামিয়েছিল। আর এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল যত্তসব ক্যারিয়ারিস্ট জেনারেলরা, যারা কিনা 'New Age' ধরনের পত্রিকার পণ্ডিতদের আর্টিকেল থেকে উপদেশ গ্রহণ করতো। অথচ ঐসব পত্রিকার পণ্ডিতরা জনগণের মন রাঙ্গানোর উদ্দেশ্যে কলম চালাতো, সব ধরনের রক্তাক্ত সংঘাত এড়িয়ে চলার বুলি ফেরি করে বেড়াতো।

এইসমস্ত কার্যকলাপ ওবামা প্রশাসনের সময়ও জারি ছিল। ওবামার অধীনে ওয়াশিংটন আফগানিস্তানে নিজের সামরিক এবং বেসামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার করেছিল, পাকিস্তান সীমান্তে আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ইয়েমেন ও সোমালিয়াতে নতুন করে রাজনৈতিক-সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এছাড়া ওবামার সময়ে আমেরিকা দুই পুলিশ রাষ্ট্র – সৌদি আরব ও মিশরের সাথেও সম্পর্ক আরও জোরদার করেছিল, ইসরাঈলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যানের অনুমতি দিয়েছিল এবং আমেরিকার অভ্যন্তরের জায়নিস্ট র‍্যালিগুলোয় ওবামা-বিরোধী মনোভাব দূর করেছিল। আর এইসমস্ত কার্যকলাপ যখন মুসলিমরা নিজেদের চোখের সামনে ঘটতে দেখছিল, তখন আমেরিকার উভয় পার্টিই (ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান) আমেরিকান জনগণকে কেবল

603 Al-Hammadi, "Al-Qaeda from within, part 8", p. 17.

ধোঁকার মধ্যেই রেখে চলেছিল। তারা বারবার সাধারণ আমেরিকানদেরকে বুঝিয়েছে যে উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা কিংবা তাদের অন্যান্য ইসলামপন্থী মিত্ররা, এমনকি সাধারণভাবে সমস্ত মুসলিমরা আমেরিকাকে ঘৃণা করে আমেরিকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উদারপন্থা এবং লাইফস্টাইলের কারণে; মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার কার্যকলাপের কারণে নয়।

৯/১১-এর পর থেকে আমেরিকার কর্মকর্তারা এত খেটেখুটে যেন উসামা বিন লাদেনের কাজই এগিয়ে দিয়েছে। মুসলিম বিশ্বের স্কুলের সিলেবাস পরিবর্তন করা, জিহাদকে বিদায় করে সেক্যুলারিজমের প্রসার ঘটানো, মুসলিমরা ঘৃণা করে - এমনসব পররাষ্ট্রনীতি বেছে বেছে আরও জোরদার করা – এইসমস্ত কার্যকলাপের কারণে আমেরিকা গোটা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে আরও স্পষ্ট খলনায়কে পরিণত হয়েছে। আর ফলে উসামা বিন লাদেনের কাজ আরও সহজ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "এই ব্যাপারগুলো এটাই প্রমাণ করে যে এই সংগ্রাম আদর্শিক ও ধর্মীয় সংগ্রাম; আর এই দ্বন্দ্ব সভ্যতার দ্বন্দ্ব।" [604]

604 OBL, "Message to the ummah in general, and to our Muslim brothers in Iraq in particular", Al-Qal'ah (Internet), 6 May 2004.

উপহার হাতছাড়া; অতঃপর ফিরে পাওয়া

উসামা বিন লাদেন, আল-কায়দা এবং অন্যসব ইসলামপন্থীদের জন্য ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণ ও দখলের ঘটনা ছিল আল্লাহপ্রদত্ত উপহারস্বরূপ। আজও (২০১০-২০১১) তেমনটাই রয়েছে। আর অদূর ভবিষ্যতেও হয়তো তেমনটাই থাকবে। ইরাক আগ্রাসন কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক (দিফায়ি) জিহাদের একেবারে যথাযথ পরিবেশ এনে দেয়: একটি কাফির রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমণ চালিয়েছে, দখল করেছে, সেখানে আল্লাহর আইনের বদলে মানবরচিত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শিয়াদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়েছে। ফলে আমেরিকার ইরাক আগ্রাসন শুধু জিহাদপন্থীদের জন্যই নয়, বরং গোটা বিশ্বের মুসলিমদের জন্যই সেই সংগ্রামে যোগ দেওয়ার অখন্ডনীয় দলিল প্রদান করে, যে সংগ্রামের দিকে উসামা বিন লাদেন ১৯৯৬ থেকেই ডাকছিলেন – এক বিশ্বময় জিহাদ।

ইরাক আগ্রাসনের মাত্র চার মাস আগে উসামা বিন লাদেন মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “কখনোই ভাববেন না যে আসন্ন যুদ্ধটা স্রেফ আমেরিকা বনাম ইরাকের, কিংবা বুশ বনাম সাদ্দামের। বরং এই যুদ্ধের এক পক্ষে আপনি আমি সহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা, আর বিপরীত পক্ষে বিশ্বের ক্রুসেডার এবং জায়নিস্ট শক্তি।” [605]

এছাড়াও, ইরাক আগ্রাসন উসামা বিন লাদেনকে এমন একটি কাজ করে দিয়েছিল, যা তিনি নিজেও নিজের জন্য করেননি: এটা সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের চোখে তাঁকে আমেরিকার পরিকল্পনার একজন সূক্ষ্ম বিশ্লেষক হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। সেই ১৯৯৬ সালের আগস্ট থেকেই উসামা বিন লাদেন মুসলিমদেরকে সতর্ক করে আসছিলেন যে, ওয়াশিংটন শক্তিশালী মুসলিম ভূমিগুলোকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে, নীলনদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত বিস্তৃত “বৃহত্তর ইসরাঈল রাষ্ট্র” গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যেকোনো মুসলিম প্রশাসনকে হটিয়ে দিতে চাইছে, তেলসম্পদে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূমিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। আর ইরাকে ওয়াশিংটন এর সবগুলোই করেছিল। ইরাক প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, আমেরিকা মুসলিম বিশ্ব থেকে আল্লাহর আইনের শাসন হটিয়ে মানবরচিত

---

605 OBL, “Message to the people of the [Arabian] Peninsula”, Al-Quds al-Arabi, 28 November 2002, p. 1.

আইন, মানবরচিত সংবিধান, গণতন্ত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।[606] মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিই তার নিজের কাছে বাস্তবতা। আর এখন বহু মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গিতেই উসামা বিন লাদেনের সতর্কবার্তা সঠিক ছিল। এই ব্যাপারটি মুসলিম বিশ্বে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা কেবল বাড়িয়েই দিয়েছে।

উসামা বিন লাদেনের সতর্কবার্তায় বিশেষ করে আমেরিকা-ইসরাঈল সম্পর্কের ব্যাপারটি স্পষ্টতই সত্য। ইরাক যুদ্ধে ইসরাঈলপন্থী নব্য রক্ষণশীলদের ভূমিকা মুসলিমদের কাছে উন্মোচিত হয়ে যাওয়ায় উসামা বিন লাদেনের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর ২০০১ সালে তিনি বলেছিলেন, "আমি আগেই বলেছি যে, আমরা আমেরিকার সাধারণ জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নই। বরং আমরা এই সিস্টেমের প্রতিদ্বন্দ্বী যেটা অন্যসব জাতিকে আমেরিকার গোলাম বানায়, যে সিস্টেম আমেরিকার সুবিধার্থে জাতিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বন্ধক রাখতে বাধ্য করে। এই সিস্টেমটা পুরোপুরিভাবেই আমেরিকার ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর ওদের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হলো ইসরাঈল, আমেরিকা নয়। সহজ করে বললে আমেরিকানরা নিজেরাও আদতে এইসব ইহুদিদের গোলাম; আর তাদেরকেও এই ইহুদিদের বেঁধে দেওয়া নিয়ম ও মূলনীতিতে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাই শান্তি ইসরাঈল পর্যন্তও পৌঁছা দরকার। সত্য হলো ইসরাঈলই মুসলিমদেরকে রক্তের জোয়ারে ভাসাচ্ছে আর আমেরিকা কোনো শব্দও উচ্চারণ করছে না।"[607] ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইরাক আগ্রাসন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসকেরা এবং তাদের পোষ্য আলিমদের বিরুদ্ধে বিন লাদেনের ক্রোধ বৃদ্ধি করেছিল। সৌদি আরব, মিশর, জর্ডান, কুয়েত, কাতার এবং বাহরাইনের সাহায্য ছাড়া ইরাকের ওপর আক্রমণ আদতে সম্ভবই হতো না। এই প্রশাসনগুলোর সহায়তা ছাড়া আমেরিকার দখলদারিত্বও টিকতো না। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে, এই ব্যাপারটাকে মুসলিম হত্যায় কাফিরদেরকে সাহায্য করা ব্যতীত ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার কোনো অবকাশই ছিল না; আর এই কাজ যে কাউকেই ইসলামের শত্রুতে পরিণত করে।[608]

---

606 OBL, "Message to our brothers in Iraq", Al-Jazeera Satellite Television, 11 Feb 2003.

607 "Exclusive interview with Usama bin Laden", Ummat, 28 Sep 2001, pp. 1, 7.

608 ঈমান ভঙ্গের একটি কারণ হলো, যুদ্ধ বা সংঘর্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করা। শরিয়াহর পরিভাষায় এটি 'তাওয়াল্লি' হিসেবে পরিচিত। কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী আলিমদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত। লেখক এখানে এই মূলনীতির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। সাথে এটাও উল্লেখ্য যে, কাফিরদেরকে প্রতিহত করতে অন্য কাফিরদের সহায়তা নেওয়া তাওয়াল্লির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আফগানিস্তানে আশির দশকে সোভিয়েত কাফিরদেরকে প্রতিহত করতে আরেক কাফির আমেরিকার সাহায্য নেওয়া কিংবা বর্তমানে এই ধরনের পরিস্থিতিগুলো ইসলামের মূলনীতি অনুসারে অবৈধ কিছু নয়।

ইরাক আগ্রাসনে আরব শাসকদের সমর্থন আরেকবার প্রমাণ করে দেয় যে, এই শাসকেরা সবসময়ই মুসলিমদেরকে হত্যা করতে কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করবে। মুসলিমদের মাঝে অন্তত এই দৃষ্টিভঙ্গিই বদ্ধমূল হয় এবং শাসকদের ক্ষমতায় থাকার ধর্মীয় বৈধতা বিলীন করে দেয়। আসলে "দরবারি আলিমরা" শেষ পর্যন্ত ইসলামি জ্ঞানের খাদেম থাকেনি; বরং সম্পদ ও পদমর্যাদার মোহ, কিংবা কোনোভাবে গ্রেপ্তারি এড়িয়ে নির্মল জীবন কাটানোর তাগিদে তারা নিজেদের শাসকদের খাদেমে পরিণত হয়েছে। এমনকি প্রশাসনের কার্যকলাপে তাদের মৌনসম্মতিও যেন যথেষ্ট ছিল না। নিজেদের অবশিষ্ট গ্রহণযোগ্যতাটুকুও মাটি করে দিয়ে তারা ফাতওয়া দিয়েছিল যে, ইরাকের বাইরের মুসলিমদের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনের মতো উপহার পাবার পর সেটা কীভাবে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহযোদ্ধাদেরকে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তারা সকলেই জানতেন যে, এর জন্য কথার সাথে আল-কায়েদার কাজের মিল থাকা প্রয়োজন; স্রেফ আফগানে বসে বসে ইরাকের সুন্নি যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ দিতে থাকলেই চলবে না। আল-কায়েদার নেতারা দুটো লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন – একটি ইসলামিক, অপরটি সাংগাঠনিক। সিদ্ধান্ত হয়, এই দুই লক্ষ্যই আলাদাভাবে অর্জন করা যাবে, কিন্তু কাজ চলবে একইসাথে। ইসলামি লক্ষ্য ছিল – ইরাকে আমেরিকা বিরোধী সুন্নি আন্দোলনে শরিক হওয়া ও সহায়তা করা, আগ্রাসী কাফিরদের পরাজিত করা, দেশব্যাপী শিয়া শাসন উচ্ছেদ করা এবং সুন্নি ইসলামপন্থী একটি সরকার গঠন করা। ১৯৯৯-এ আল-কায়েদা সুন্নি কুর্দি বাহিনী, দক্ষিণে আনসার আস-সুন্নাহ এবং আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির বাহিনীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ইরাক আক্রমণের সময় এই বাহিনীগুলো ছাড়াও উসামা বিন লাদেনের নিজস্ব কিছু ক্ষুদ্র দল ইরাকে অবস্থান করছিল। আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির বাহিনী ৯/১১-এর আগের সময়টায় আফগানিস্তানে কাজ করেছিল; এবং এরপর তারা ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু যাওয়ার আগে যারকাউয়ি উসামা বিন লাদেনের কাছে বায়াত দিয়ে যাননি।

ইসলামি লক্ষ্যে তালগোল

শুরু থেকেই ইরাক এমন পরিস্থিতি পেশ করেছে, যা উসামা বিন লাদেনের খুব একটা পছন্দের ছিল না: এই ময়দান আল-কায়েদাকে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করার এবং হিসেব কষে নিজেদের লোক স্থাপনের জন্য খুবই কম সময় দিয়েছিল। ফলে ইরাকের জন্য মুজাহিদ দল নির্ধারণ, তাতে আল-কায়েদার অংশীদার হওয়া ইত্যাদি দৌড়ের ওপর গুছিয়ে নিতে হয়েছিল। ইরাক আগ্রাসনের পর উসামা বিন লাদেন সহ আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির সাথে আলাপে বসেছিলেন। যারকাউয়ি আল-কায়েদায় যোগ দিতে চান কিনা, যোগ দিলে তাঁর ভাল-মন্দ কী বলার আছে ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় হয়।[609] আফগানিস্তানে থাকতেই আবু মুসআব আয-যারকাউয়ি থেকে ব্যাপক জযবা এবং শিয়াদের প্রতি তীব্র মাত্রার ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছিল; আর তা নিয়ে আল-কায়েদার নেতৃত্ব যারপরনাই চিন্তিত ছিল।[610] কিন্তু শেষমেশ – আমার মতে – তাঁরা যারকাউয়ি থেকে আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করে তাঁকে ইরাকে আল-কায়েদার প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, যাতে করে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে যথাসম্ভব ফায়দা বের করা যায়। উসামা বিন লাদেন তখন আল-কায়েদার পক্ষ থেকে যারকাউয়ির বাহিনীকে "উষ্ণ" অভ্যর্থনা জানান; কিন্তু একইসাথে জোর দিয়ে যারকাউয়িকে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর আদেশের প্রতি নিজ দায়িত্বের" ব্যাপারে সতর্ক থাকারও নির্দেশ দেন।[611]

উসামা বিন লাদেনের উদ্বেগ পরবর্তীতে সত্য হয়েছিল। কেননা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যারকাউয়ি আল-কায়েদার কৌশলগত লক্ষ্যের এমন হুমকি হয়ে দাঁড়ান, যা ছিল ৯/১১ পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদার অন্যতম কৌশলগত বিপর্যয়। তালেবানের আফগানিস্তান খোয়ানো বড় ধরনের কৌশলী পরাজয় ছিল ঠিক; কিন্তু আবু মুসআব আয-যারকাউয়ি, তাঁর চিন্তাভাবনা এবং কার্যকলাপ আল-কায়েদাকে একটি নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠন হিসেবে রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিয়েছিল।

---

609 Atwan, The secret history of al-Qaeda, p. 205.

610 Calvert Jones, "Al-Qaeda's innovative improvisers: Learning in a diffuse international network", Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, No. 4 (December 2006), p. 559.

611 Osama bin Laden, "Message to Muslims in Iraq in particular, and the ummah in general", Al-Sahab Media, 28 December 2004.

ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, সেই ১৯৯৬ সাল থেকেই উসামা বিন লাদেন আল-কায়েদার যুদ্ধের যে তিনটি লক্ষ্য স্পষ্ট করে রেখেছিলেন, সেগুলো হলো – মুসলিম বিশ্ব থেকে আমেরিকাকে তাড়ানো, মুসলিমদের ভূমিতে হওয়া জুলুম... বিশেষ করে ইসরাঈলকে ধ্বংস করা এবং পরিশেষে শিয়াদের সাথে দফারফা করা। সাথে তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে – এই লক্ষ্যগুলোতে ক্রমান্বয়ে হাত বাড়াতে হবে, একসাথে নয়।

কিন্তু কেন? কারণ প্রথমত, উসামা বিন লাদেন বিশ্বাস করতেন যে, শুরুর দিকেই শিয়া-সুন্নি যুদ্ধ তাঁর সুন্নি যোদ্ধাদের মধ্যে টার্গেট হিসেবে আমেরিকাকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব কমিয়ে দিবে। কেননা সুন্নিরা – বিশেষ করে ওয়াহাবি এবং সালাফিদের অনেকেই আমেরিকাকে যতটা না ঘৃণা করে, শিয়াদেরকে অনেকক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করে। ফলে যুদ্ধটা আমেরিকার পাশাপাশি শিয়াদের বিরুদ্ধে তখনই ছড়িয়ে দিলে আল-কায়েদা এবং তার মিত্রদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকেই শিয়াদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে উসামা। বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বজনীন নয়। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, শিয়াদের মতো ফিরকাগুলোর সাথে দফারফা করার আগে ইসলামের জন্য আরও বড় হুমকি – আমেরিকা, আরব প্রশাসন এবং ইসরাঈলকে কাত করতে হবে।

উসামা বিন লাদেনের মতে, শিয়াদের সাথে যদি আগেই বোঝাপড়া করতে যাওয়া হয়, তাহলে তিনটি সমস্যা দেখা দিবে। প্রথমত, আমেরিকার দিকে মুজাহিদদের ফোকাসে ফাটল ধরবে। দ্বিতীয়ত, ইরাকের ময়দানে ইরান সমর্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের বিরুদ্ধে স্রেফ এক তেল সম্পদই হবে সংখ্যালঘু সুন্নিদের একমাত্র অবলম্বন। তখন দেখা যাবে আল-কায়েদা কর্তৃক অনৈসলামিক ঘোষিত সব সুন্নি শাসক, একনায়ক ও সেনানায়করা ইরাকের সুন্নি মুজাহিদদের অপরিহার্য অস্ত্র সরবরাহকারী হয়ে উঠছে।

এর ওপর ঐসব শাসকদের সরকারি আলিমরাও দেখা যাবে ইরাকের শিয়া-সুন্নি যুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ঘোষণা করছে; এমনকি সেই যুদ্ধে শরিক না হওয়া সুন্নি যুবকদেরকে তীব্র নিন্দা করলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই ফিরকাগত সংঘাত এতই প্রবল আকার ধারণ করতে পারে যে, শিয়াদের বিরুদ্ধে ইরাকের সুন্নিদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আল-কায়েদাও আরবের জালিমদের সমর্থিত শক্তির সাথে কাজ করতে বাধ্য হতে পারে। তৃতীয়ত, আরব শাসকেরা তখন এই ফিরকাকেন্দ্রিক যুদ্ধের দায় আল-কায়েদার

ইরাক শাখার ওপর চাপাতে পারবে। আর ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী আল-কায়েদার সমর্থন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[612]

কিন্তু আবু মুসআব আয-যারকাউয়ি ইরাকি শিয়াদের ব্যাপারে উসামা বিন লাদেনের পরিকল্পনাকে তেমন গুরুত্বই দিলেন না। আনুগত্যের বায়াত দিয়ে ইরাকে আল-কায়েদার প্রধান ঘোষিত হওয়ার দিন থেকেই তাঁর কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যেন তিনি আল-কায়েদাকে ধ্বংস করতেই নেমেছেন। তিনি শিয়া ইরাক প্রশাসনের টার্গেটগুলোতে নিয়মিত ও কার্যকরীভাবে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। কিন্তু সেইসাথে তাঁর সেনাদের একাংশ চরমপন্থী তাকফিরিদের মতো আচরণ করতে শুরু করলো – বেসামরিক শিয়া এমনকি সুন্নিদেরও (পশ্চিমা সেক্যুলার মানসিকতার) যারা ধর্মীয় সহ বিভিন্ন বিষয়ে সেনাদের নির্দেশনা মানতো না, তাদেরকে হত্যা শুরু হয়। এছাড়া যারকাউয়ি শিয়াদের উপাসনালয়ে হামলা করেন, স্থানীয় মোল্লা এবং গোত্রীয় প্রধানদেরকে হত্যা করেন, বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালান এবং যুদ্ধবন্দিদেরকে শিরোচ্ছেদ করার ভিডিও ধারণ করে প্রচার করেন।

এছাড়াও তিনি আল-কায়েদার দুইটি অলিখিত নিয়মও অগ্রাহ্য করেন: এক. কোনো নির্দিষ্ট ভূমির মুজাহিদদের নেতৃত্ব সেই ভূমির স্থানীয় কারও হাতেই থাকবে; এবং দুই. স্থানীয় মুজাহিদদেরকে আল-কায়েদা প্রয়োজনমতো উপদেশ ও সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করবে, কিন্তু তাদের নিজেদের যুদ্ধটা তারা কীভাবে পরিচালনা করবে, তা আগাগোড়া বলে দিবে না।[613] ফলে আল-কায়েদা ইরাকের স্থানীয় সুন্নিদেরকে সহায়তা করে একটি ইসলামি রাষ্ট্র

---

612 এখানে আরও সংযোজন এই যে, দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে চলা যুদ্ধে যখন প্রত্যেক পক্ষেরই শক্তিশালী সাপোর্টিং রাষ্ট্র থাকে, তখন সেই যুদ্ধ এক অনির্দিষ্টকালের যুদ্ধে পরিণত হয়। সহজ করে বললে, ইরাকের শিয়াদেরকে ইরানের সাপোর্ট আর সুন্নিদেরকে সৌদি আরব, জর্ডান ইত্যাদি প্রশাসনের সাপোর্ট সেই যুদ্ধকে এত দীর্ঘায়িত করে দিবে, যা কখন সমাপ্ত হবে, ফলাফল কী হবে ইত্যাদি সবকিছুই অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এর ওপর এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকা, রাশিয়ার মতো অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলো কোনো এক পক্ষ নিয়ে নিজেদের অস্ত্র বিক্রিরও একটি বাজার পেয়ে যায়।

আর বর্তমান প্রজন্ম এমনটা ইতোমধ্যেই ইয়েমেনে প্রত্যক্ষ করেছে। ইয়েমেনের ভূমিকে ফিরকাকেন্দ্রিক প্রক্সি যুদ্ধের ময়দান বানিয়ে সৌদি আরব এবং ইরান এক কূল কিনারাহীন সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। এই সুযোগে আমেরিকা সৌদি আরবের কাছে সহস্র কোটি টাকার অস্ত্রও বিক্রি করেছে।

613 আমেরিকার ইরাক আক্রমণের এক মাস আগেই উসামা বিন লাদেন প্রকাশ্যে আল-কায়েদার ঐতিহ্যবাহী কার্যপদ্ধতি প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি জোর দিয়েছিলেন যেন অবশ্যই সকল সুন্নি মুজাহিদরা এগিয়ে এসে সহযোগিতা করে; কেননা জয়ের জন্য ঐক্য অপরিহার্য। দেখুন Osama bin Laden, "Message to our brothers in Iraq", Al-Jazeera Satellite Television, 11 February 2003.

প্রতিষ্ঠা করারও যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল, আবু মুসআব আয-যারকাউয়ি খুব অল্প সময়ে সেটাও খুইয়ে ফেলেন। সেই সাথে তিনি ইরাক সহ গোটা মুসলিম বিশ্বে আল-কায়েদার মর্যাদাকেও মারাত্নকভাবে জখম করে বসেন। ইরাকের জোট এবং তাদের সেনাদেরকে হত্যার জন্য যারকাউয়ি যে অভিযান চালিয়েছিলেন, তা বাহ্যিকভাবে সফল তো ছিল। এমনকি উসামা বিন লাদেনও প্রকাশ্যে সেগুলোকে "দুঃসাহসিক অপারেশন" বলেও মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু একইসাথে তা ছিল আল-কায়েদার দিকে দ্রুতবেগে ছুটে আসা এক ট্রেন। পশ্চিম এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্গদের যারা আগে থেকেই উসামা বিন লাদেন বিরোধী ছিল, তারা মোটামোটি ২০০৫ সালের মধ্যভাগ নাগাদই যারকাউয়িকে, এমনকি টেনেটুনে আল-কায়েদাকে চরমপন্থী তাকফিরি ট্যাগ দিতে শুরু করেছিল।

ইরাকে বেসামরিক লোক হত্যা নিয়ে অনেক প্রলাপই বকা হয়েছিল। আর সেগুলোর অধিকাংশই ছিল পশ্চিমা রাজনীতিবিদ, পন্ডিত ও বিশ্লেষকদের। তারা জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিল যে কুরআন নাকি সমস্ত পরিস্থিতিতেই মুসলিম হত্যা নিষিদ্ধ করে। আর তাদের এই অচল অবস্থানকে প্রশাসন পরিচালিত আরব মিডিয়া, সৌদি আরবের অর্থায়নে পরিচালিত ইউরোপের আরবি মিডিয়া আউটলেটগুলো তুমুল সমর্থন দিয়েছিল। এক মুসলিম অন্য মুসলিমদেরকে খামখেয়ালি করে এবং গণহারে হত্যা করা অবশ্যই নিষিদ্ধ, যেমনটা যারকাউয়ি ইরাকে করছিলেন। কিন্তু কাফিরদের সাহায্যকারী মুসলিম ও স্বৈরাচারী শাসকরা যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করে না - এদের ব্যাপার আলাদা। উসামা বিন লাদেন কিংবা অন্যান্য সালাফি নেতারা এই দুই কাজের যেকোনো একটি কিংবা উভয়েই লিপ্ত থাকা ব্যক্তিকে হত্যার যে বৈধতা দেন, তা সর্বপ্রথম স্পষ্ট করেছিলেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ।[614]

---

614 আসলে আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন না করা কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করার মতো বিষয়গুলো 'দ্বীন ত্যাগ' হওয়া ইসলামের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন না করার ক্ষেত্রে সূরাহ তাওবাহের ৩১ নং আয়াতের তাফসির, আদি বিন হাতিম তাঈ রদি.-এর হাদিস (সুনানুত তিরমিযি ৩০৯৫) দেখা যেতে পারে। আর তাওয়াল্লির ক্ষেত্রে সূরাহ মুমতাহিনার তাফসির, হাতিব বিন বালতাআ রদি.-এর হাদিস দ্রষ্টব্য। তবে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর সময় আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন না করার ব্যাপারটি তাতারদের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন, তা বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল এবং তৎকালীন সময়ের সংশয় দূর করে দিয়েছিল।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "আমরা বলি, এমন কোনো দল / ফিরকা / জামাআত যা ইসলামের তর্কাতীত, সন্দেহাতীত, অনস্বীকার্য এমন কোনো বিধান ত্যাগ করে, যার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রজন্মের পর প্রজন্ম কোনোরকম বিরাম ছাড়াই একমত; তবে বিধান ত্যাগকারী সেই দলের বিরুদ্ধে ইমামদের ইজমা অনুযায়ী যুদ্ধ করা আবশ্যক। এমনকি যদি তারা দুটি কালিমার সাক্ষ্য দেয় (আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তবুও।" [মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড ৪, বাব উল-জিহাদ]

আর ইবনু তাইমিয়্যাহর অবস্থানকে বিংশ শতাব্দিতে এসে সৌদির প্রয়াত গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ বিন বাযও পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি "ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ" নামক ফাতওয়ায় দশটি কারণ বর্ণনা করেছেন। কোনো মুসলিম সেই দশটি বিষয়ের কোনোটিতে লিপ্ত হলেই সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার জীবন ও সম্পদ অন্য মুসলিমের জন্য বৈধ হয়ে যায়। ঈমান ভঙ্গকারী অষ্টম পয়েন্টে বলা হয়, "মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করা (মুসলিম থাকা) ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। এর দলিল হলো আল্লাহর আয়াত, "...আর যারাই ওদের (কাফিরদের) সাথে তাওয়াল্লি (মিত্রতা) করবে, তারা ওদেরই অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম লোকদেরকে হিদায়াত দেন না।" [সূরাহ মায়িদাহ, ৫১] [615]

তাই ইরাকে উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার জন্য (পশ্চিমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী) মুসলিম নামধারী হওয়া মাত্রই হত্যা বন্ধ করা লক্ষ্য ছিল না। বরং লক্ষ্য ছিল যারকাউয়ির নির্বিচারে হত্যাকে যথাসম্ভব বৈধ টার্গেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, যেমনটা ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং শাইখ বিন বাযের মতো সালাফি আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। এই মূলনীতি অনুসারে, ইরাকে এবং আফগানিস্তানে বেসামরিক মুসলিমদের যারা আমেরিকার হয়ে কিংবা আমেরিকার পাশে থেকে কাজ করছিল, তারাও বৈধ টার্গেট হিসেবেই গণ্য হয়; ঠিক যেমনটা পুলিশি রাষ্ট্র মিশর এবং সৌদি আরবের সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা টার্গেট হিসেবে বৈধ গণ্য হয়।

উসামা বিন লাদেন নিজের ম্যানেজমেন্টের ধাঁচ বজায় রাখলেন; তিনি প্রকাশ্যে যারকাউয়ির সাথে সব ধরনের বিতর্ক এড়িয়ে গেলেন। এর বদলে তিনি তাঁর সহকারী নেতা আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং আল-কায়েদার আরেকজন উর্ধ্বতন নেতা আতিয়াহ আবদুর রহমানকে দায়িত্ব দিলেন যেন তাঁরা – যারকাউয়িকে বেসামরিক নাগরিক হত্যা বন্ধ করতে চাপ দেন; ইরাকে আল-কায়েদার কৌশলগত কাজে যারকাউয়ির ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত তা ভালভাবে খোলাসা করেন; এবং সর্বোপরি যারকাউয়ির কর্মকান্ড কীভাবে ইরাক সহ পুরো বিশ্বে আল-কায়েদার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে – এসব ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন।

তবে আল-কায়েদার ইরাক প্রধানকে চাপ দিতে গিয়ে উসামা বিন লাদেনকে সন্তর্পণে এগোতে হয়। যারকাউয়ির (শিয়াবিরোধী) অভিযানগুলোর কারণে তিনি যুবকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একারণেও উসামা বিন লাদেন নিজে তাঁকে প্রকাশ্যে

615 Shaykh Abdul Aziz bin Baz, "The nullifiers of Islam"

সমালোচনা না করাই ছিল কৌশলের দাবি। তাছাড়া তিনি এটাও জানতেন যে যারকাউয়ির অভিযানে যেসমস্ত বেসামরিক সুন্নি এবং শিয়ারা মারা পড়ছে, তাদের একাংশকে টার্গেট করা শারঈভাবে অবৈধও নয়। কেননা যেমনটা ইতোমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে – আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বাহিনী কিংবা জোটের বসানো প্রশাসনের হয়ে স্বেচ্ছায় যারাই কাজ করছিল, তারা শারঈভাবে বৈধ টার্গেটই ছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করা তাদের ঈমানকে বরবাদ করে দিয়েছিল। তাই আল-কায়েদাকে চরমপন্থী তাকফিরি ট্যাগ দেওয়ার বিপরীতে উসামা বিন লাদেন কখনোই এটা বলেননি যে, মুসলিম নামধারী হলেই আর কেউ হত্যাযোগ্য থাকে না। কেননা শারঈভাবেই এমন কথা সত্য নয়। তাছাড়া তিনি নিজে প্রকাশ্যে যারকাউয়ির সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তা যারকাউয়িকে খাটো করা হতো; এবং সর্বোপরি মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব করে তুলতো।

সমস্ত কিছু বিবেচনা করে তাই ২০০৪ সালের শেষদিকে উসামা বিন লাদেন বলেন, "যেসব ইরাকিকে হত্যা করা হয়েছে, ওরা প্রধানমন্ত্রী আল্লাভির মুরতাদ সরকারের সেনাবাহিনী, সিকিউরিটি এজেন্সি কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীতে ছিল। ওরা আসলে আবু জাহেলের মতো। ওদেরকে হত্যা করা বৈধ কেননা ওরা প্রকৃতপক্ষে কাফির। ওদের জন্য দুআ করা মুসলিমদের জন্য সমীচীন নয়... ... ইসলামের আলিমগণ কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই এই ব্যাপারে ঐক্যমত যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান একটি কারণ; এই কাজ ঈমান ভঙ্গের দশটি প্রধান কারণের একটি। আর কাফিররা বিদেশি হোক, আরব হোক, শাসক কিংবা শাসিত হোক, সমস্ত ক্ষেত্রেই বিধান একই।" [616] এভাবে প্রকাশ্য সমস্যাটি উসামা বিন লাদেন নিজের কাঁধেই উঠিয়ে নিলেন। আর তাঁর সহকর্মীদেরকে দায়িত্ব দিলেন যারকাউয়ির সাথে চলা আভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করার – আল-কায়েদার জন্য ক্রমেই যেটা অসহনীয় মাত্রার হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

২০০৫ সালের অক্টোবরের একটি চিঠিতে আইমান আজ-জাওয়াহিরি একজন বিজ্ঞ চাচার স্বরে আবু মুসআব আয-যারকাউয়িকে স্পষ্ট কিন্তু তুলনামূলক মৃদু ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। দশ পৃষ্ঠার সেই চিঠিতে তিনি যারকাউয়ির নিজের, ইরাকের সুন্নি আন্দোলনের এবং সর্বোপরি আল-কায়েদার অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে চারটি ইস্যু তুলে ধরেন।

---

616 OBL, "Message to Muslims in Iraq in particular, and the ummah in general", Al-Sahab Media, 28 December 2004.

প্রথমত, ডা. জাওয়াহিরি লিখেছিলেন, ইরাকের মুজাহিদদের বোঝা উচিত যে "ইরাক থেকে আমেরিকার সৈন্যদের তাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই তাদের মিশন শেষ হয়ে যায় না।" বরং তাদেরকে "রাজনৈতিক ময়দানেও মাঠপর্যায়ে কাজ করে যেতে হবে", যাতে করে সকল মুজাহিদ দলকে একত্র করে "এমন একটি নিউক্লিয়াস গড়ে তোলা যায়, যেটাকে ঘিরে অন্যসব গোত্র এবং তাদের প্রধানরা জড়ো হবে... এবং জড়ো হবে সেসমস্ত লোকেরা, যারা দখলদার আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে কলঙ্কিত হয়নি।" একইসাথে ডা. জাওয়াহিরি সতর্ক করেছিলেন যে, আমেরিকান দখলদাররা চলে যাওয়ার আগেই মুজাহিদরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে না পারলে "সেক্যুলাররা এবং মুনাফিকরা" তাদের ওপর চেপে বসবে।

দ্বিতীয়ত, আল-কায়েদার (তৎকালীন) এই সহকারী প্রধান লিখেছিলেন যে, বন্দিদের শিরোচ্ছেদ করার ভিডিওটেপ ইরাকের সুন্নি মুজাহিদদের জনসমর্থনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ডা. জাওয়াহিরি বলেন, "মুসলিমদের মধ্যে যারা আপনাকে ভালবাসে এবং সমর্থন করে, তাদেরও সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়গুলোর একটি হয়েছে ঐ বন্দীদেরকে হত্যার দৃশ্য। এই ভিডিওগুলো মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। বন্দীদেরকে যদি হত্যা করতেই হয়, তাহলে বুলেট দিয়ে হত্যা করাই শ্রেয় হবে।"

তৃতীয়ত, আইমান আজ-জাওয়াহিরি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, ইরাকের সুন্নি বিদ্রোহী দলগুলোকে পথ দেখাতে এসে "সেই দলগুলোর নেতৃত্বে নন-ইরাকিদেরকে দায়িত্ব দিয়ে" যারকাউয়ি কি পরিস্থিতি "সংবেদনশীল" করে ফেলছেন না? এই ধরনের স্পর্শকাতর পরিস্থিতি পরবর্তীতে কী বয়ে আনবে, আর তা "জিহাদের কাজকে নষ্ট না করে ও কোনোরকম হুমকির মুখে না ফেলে" কীভাবে সমাধান করা হবে – এমনসব প্রশ্ন করে ডা. জাওয়াহিরি যারকাউয়িকে এহেন কাজের ক্ষতিকর দিক স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন।

চতুর্থত, শিয়াদের ওপর কিংবা তাদের উপাসনালয়ে এলোপাথারি হামলা জিহাদের মূল উদ্দেশ্যকে ঐ শিরোচ্ছেদের মতোই ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। ডা. জাওয়াহিরি স্পষ্ট করেছিলেন, "শিয়ারা বাতিল আর ওদেরকে দমন করাও দরকার ঠিক আছে। কিন্তু এখনই শিয়াদের ওপর হামলার কারণে অন্যান্য মুজাহিদ দলগুলোও আমেরিকাকে টার্গেট করা থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে। সেই সাথে মুসলিমদের যে বিশাল অংশ এখনও শিয়াদেরকে হত্যার কথা চিন্তাও করতে পারে না, তারা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।" [617]

---

617 "Letter from al-Zawahiri to al-Zarqawi, 11 October 2005", released by the Office of the Director of National Intelligence on 9 July 2006, www.dni.gov

কিন্তু আইমান আজ-জাওয়াহিরির সেই পত্রের পরেও যারকাউয়ির কার্যক্রম নিয়ে উসামা বিন লাদেন অসন্তুষ্ট ছিলেন। ২০০৫-এর ডিসেম্বরে যারকাউয়ির উদ্দেশ্যে আরও কঠোর ভাষায় আরেকটি পত্র পাঠানো হয়। এই পত্রটি ছিল আল-কায়েদার আরেক উর্ধ্বতন নেতা আতিয়াহ আবদুর রহমানের পক্ষ থেকে। ডা. জাওয়াহিরির মতো আতিয়াহ আবদুর রহমানও প্রথমে যারকাউয়ি এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করেন। এছাড়া তাদের সামরিক বিজয়গুলোর প্রশংসা করে বলেন, "সর্বোপরি, আপনারা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মুজাহিদ... আপনারাই তো আমেরিকার অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেছেন... আমেরিকার অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।" এছাড়াও আল-কায়েদার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ – মুসলিমদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং "মুসলিম বিশ্বের নতুন প্রজন্মের মধ্যে জিহাদের স্পৃহা জাগানোর জন্যও" যারকাউয়ির ব্যাপক প্রশংসা করা হয়। কিন্তু নম্র তোষামোদ এখানেই শেষ হয়।[618] এরপর আতিয়াহ যারকাউয়ির কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন,

"ইরাকে আল-কায়েদার উদ্দেশ্য শুধু শত্রুদের হত্যা করতে থাকা নয়। যুদ্ধপ্রীতির ওপর মূলনীতি প্রাধান্য পাওয়া আবশ্যক... আর এটা যুদ্ধের এমন এক ভিত্তি, যে ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত জাতিই একমত।" "অতএব, আমাদের সামরিক কার্যক্রম শরিয়াহর ব্যাপক মূলনীতির অনুগামী না হলে, আমাদের নিকটবর্তী লক্ষ্য ও সাফল্যগুলো দীর্ঘমেয়াদি ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সেগুলো শক্তিক্ষয়, জবরদস্তি এবং মতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।"[619]

আতিয়াহ এরপর যারকাউয়ির চিন্তা ও আচরণের কিছু স্পষ্ট "কমতি", "ভ্রান্তি" এবং "ভুল" ধরিয়ে দেন। এবং সেইসব ভুল সংশোধনে তাঁর নিজের চক্রের বাইরেও অন্যান্য অভিজ্ঞদের "মতামত, উপদেশ এবং নির্দেশনা" শোনার তাগিদ দেন। আতিয়াহ আবদুর রহমানের চিন্তাভাবনা উসামা বিন লাদেনের সাথে হুবহু মিলে যায়। তাঁর উল্লেখিত মূল পয়েন্টগুলো বিন লাদেনীয় চিন্তাধারার অধীনেই পড়ে।

---

618 একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষক্রটি দেখিয়ে দেওয়ার পূর্বে সেই মুসলিম ভাইয়ের প্রশংসা দিয়ে শুরু করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। তাই এখানে আসলে তোষামোদের কিছু ছিল না। তাছাড়া প্রশংসা মানুষের অন্তরের জন্য পরবর্তীতে আসা তিক্ত সত্য গ্রহণ করে সংশোধন হতেও সহজ করে।

619 Atiyah to Abu Musab al-Zarqawi, http://ctc.usma.edu, 11 December 2005.

মুসলিমরা দেখছে

যারকাউয়িকে আতিয়াহ বলেন, “আপনি আল-কায়েদার প্রতিনিধিত্ব করেন। আপনাকে মানুষ দেখছে। আপনার কাজ, সিদ্ধান্ত এবং আচরণের ফলাফলে যে লাভ বা ক্ষতি হয়, তা কিন্তু শুধুই আপনার একার নয়, বরং তা ইসলামেরও। আর আপনার কর্মযজ্ঞ সমস্ত বিশ্বে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।” যারকাউয়িকে আতিয়াহ জানিয়ে দেন যে, ইরাকে তাঁর কাজ বৈশ্বিক “জিহাদি প্রচেষ্টার” সাথে “সামঞ্জস্য” রেখেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আদেশ মেনে চলুন

যেহেতু যারকাউয়ির কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছিল, তাই তাঁর সিদ্ধান্তগুলো শুধুই তাঁর একার নেওয়ার মতো ছিল না। আতিয়াহ লিখেছিলেন, “আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি এমন এক ময়দানের নেতা, যা আরও বৃহৎ এক নেতৃত্বের অধীন। আর নিঃসন্দেহে এই নেতৃত্ব অধিক ক্ষমতাসীন এবং মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।” তাই এরপর থেকে “কোনো ব্যাপক বিষয়ে” যারকাউয়ি নিজে থেকে ততক্ষণ সিদ্ধান্ত নেবেন না, যতক্ষণ না তিনি শাইখ উসামা, ডাক্তার সাহেব (আইমান আজ-জাওয়াহিরি) এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে থাকা তাঁর অন্যান্য ভাইদের সাথে পরামর্শ করছেন।” [620]

সবার সাথে মানিয়ে চলুন

উসামা বিন লাদেনের একটি চিন্তাধারার প্রতি আতিয়াহ প্রবল গুরুত্বারোপ করেন। সেটা হলো – স্থানীয় মুসলিমদের সমর্থন জরুরি; আর আল-কায়েদাকে ত্রুটিপূর্ণ মুসলিমদেরকে “আলিঙ্গন করে” সাথে নিয়েই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। স্থানীয় কিংবা গোত্রীয় গণ্যমান্যরা – বিশেষ করে আলিমগণের (যথাসম্ভব) হৃদয় জয় করে অবশ্যই আল-কায়েদার পক্ষে আনতে হবে, কেননা তাঁরাই গণমানুষকে আন্দোলনে শরিক করতে পারেন। “মোট কথা আলিমগণই হলেন মুসলিম সমাজের চাবি এবং মুসলিমদের নেতা। এই কারণে সমস্ত শারঈ কিংবা বাস্তবিক বিষয়েই তাঁদের সাথে দ্বিমত না করে বরং আমাদেরকে কিছুক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করে, কিছুক্ষেত্রে তাঁদের ভুলত্রুটি পাশ কাটিয়ে গিয়ে এবং সর্বোপরি

620 Atiyah to Abu Musab al-Zarqawi, 11 December 2005.

তাঁদের ভাল কাজগুলোর প্রশংসা করে তাঁদের হৃদয় জয় করতে হবে।" ইরাকের সাধারণ (সুন্নি) জনগণকেও কাছে টানা এবং জিহাদের ফারজিয়্যাত আদায় করার দিকে ডাকা তখনই সহজতর হবে, যখন আমরা "তাদের মধ্যকার ভাল গুণগুলোর প্রশংসা করবো এবং তাদের ছোটখাট ভুলত্রুটিগুলো উপেক্ষা করবো।"

তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো – ইরাকের সুন্নিদের মধ্যে যেকোনো মতপথের আলিম, গোত্রীয় নেতা কিংবা গণ্যমান্য যাদের বিশাল সংখ্যক অনুসারী রয়েছে, তাদেরকে কোনো কারণে হত্যা করতে হলে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উসামা বিন লাদেনের নির্দেশনার মতোই যারকাউয়িকে আতিয়াহ বলেছিলেন যে, যদি তিনি কাউকে স্রেফ দুর্নীতিপরায়ণ কিংবা ইসলামবিরোধী হিসেবে জেনেই হত্যা করতে উদ্যত হন, অথচ "বিপুল সংখ্যক সুন্নি মুসলিমরা তাদেরকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে", তাহলে সেটা হবে "রাজনীতি এবং নেতৃত্বের সমস্ত মূলনীতির বিরুদ্ধাচারণ।" পরিশেষে, যারকাউয়িকে আতিয়াহ আবদুর রহমান আদেশ করেন – যেন তিনি "অন্য ফিরকার (শিয়াদের) সাথেও আপাতত মানিয়ে চলেন। এখনই তাদেরকে হত্যা করা যথার্থ নয়। তাদের বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া কল্যাণকর তো নয়ই, বরং ক্ষতিকর। এবং আল্লাহই ভাল জানেন।" [621]

ধৈর্য্যশীল হোন

আতিয়াহ এরপর যারকাউয়ির মধ্যে থাকা আল-কায়েদার ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্য 'অধৈর্য্য'-এর দিকে আলোকপাত করেন। তিনি উপদেশ দেন, "একা একা কাজ করে বসবেন না এবং কখনোই অতিরিক্ত জযবা ধারণ করবেন না। মুসলিম উম্মাহর সংস্কার এবং সংশোধনে তাড়াহুড়ো করবেন না। দ্রুত বিজয়ের জন্য শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না; কেননা আমাদের এই পথ সত্যিই অনেক দীর্ঘ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার নিজের সুনাম এবং মুজাহিদদের পবিত্রতা ধরে রাখা।" আতিয়াহ উল্লেখ করেন যে, সামরিক কর্মকান্ডে ধৈর্য্য এক আবশ্যক উপাদান। আর তাই আল-কায়েদার নেতৃত্বের সাথে কোনোরকম পরামর্শ না করেই বিভিন্ন হামলা, উদাহরণস্বরূপ – জর্ডানের হোটেলগুলোতে হামলা ছিল "ধীরস্থিরভাবে না এগোনোর কারণে হওয়া ভুল।" [622]

---

621 Atiyah to Abu Musab al-Zarqawi, 11 December 2005.

622 Atiyah to Abu Musab al-Zarqawi, 11 December 2005.

সবসময় ঐক্যবদ্ধ থাকুন

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগানে জয়ী হওয়ার পরও মুজাহিদরা ঐক্যবদ্ধ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে না পারার ভুলটা যেন ইরাকে আরেকবার হতে চলছিল। আর উসামা বিন লাদেন যেভাবে হোক, সেই একই গর্তে পা না দিতে মরিয়া ছিলেন। এই বিষয়টিরই প্রতিফলন ঘটিয়ে যারকাউয়িকে আতিয়াহ সতর্ক করলেন যে, তাঁর আচরণ ইসলামের জন্য কাফিরদেরকে তাড়ানোর ফসল বিনষ্ট করে দিতে পারে। ১৯৯৪-১৯৯৫ সালের আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতার কথা টেনে আতিয়াহ উল্লেখ করেন যে, যদিও প্রশাসন "একেবারে পতনের মুখে ছিল", কিন্তু সাধারণ জনগণের প্রতিও মুজাহিদদের নিজেদের "কঠোরতা এবং নির্দয় আচরণের মাধ্যমে; ক্ষমা, দয়া এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের অভাবের মাধ্যমে" সাধারণ জনগণকে তাঁরা দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এভাবে করে মুজাহিদরা "নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস রচনা করে নিয়েছিলেন।" শত্রুরা তাঁদেরকে হারাতে পারেনি, বরং "তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।" একইভাবে ইরাকে যারকাউয়ির অবস্থানও যে পাকাপোক্ত না, আতিয়াহ সেটাও স্পষ্ট করে দেন। এছাড়া আতিয়াহ বলেছিলেন যে, যখন অধীনস্থ কেউ আদেশ অমান্য করতে থাকে এবং এমনভাবে কাজ করতে থাকে যা মানুষকে "আমাদের আদর্শ ও জিহাদ থেকে দূরে ঠেলে দেয়", তখন আল-কায়েদার নেতৃত্বের জন্য তাকে "প্রতিস্থাপন করে দেওয়া" ছাড়া গতি থাকে না। [623]

আতিয়াহ আবদুর রহমানের এই চিঠি সেইসমস্ত পশ্চিমা লেখকদের খন্ডন করে দেয়, যারা দাবি করেছিল – ৯/১১-এর পরে আল-কায়েদা নাকি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই চিঠি স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছিল যে, আল-কায়েদা তখনও এক নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনই ছিল; আর সংগঠনটির দক্ষিণ এশিয়ার (আফগানিস্তান-পাকিস্তান) বাইরের নেতাকর্মীরাও পুরোপুরি স্বাধীন ছিলেন না, বরং তাদের কার্যক্রমও পুরো সংগঠনকে প্রভাবিত করতো; আর তাই তাদেরকেও আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদেশ নিষেধ মান্য করতে হতো।

অবশ্য দিনশেষে আইমান আজ-জাওয়াহিরি কিংবা আতিয়াহ আবদুর রহমান – কেউই এই ব্যাপারে তেমন সফল হননি। এমন সময় আমেরিকা আল-কায়েদার উপকার করে বসলো; ঠিক যেভাবে সে আল-কায়েদার আফগান ফাঁদে পা দিয়ে উপকার করে বসেছিল। ২০০৬

623 Atiyah to Abu Musab al-Zarqawi, 11 December 2005.

সালের ৭ই জুন আমেরিকার এক বিমান হামলায় যারকাউয়ি মারা গেলেন। চোখের পলকেই ইরাকে আল-কায়েদার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা যেন নেই হয়ে গেল; সংগঠনটিকে ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার সুযোগ করে দিল। উসামা বিন লাদেন যারকাউয়ির স্থলে দীর্ঘ সময়ের আল-কায়েদা সদস্য আবু হামযা আল-মুহাজিরকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন একজন মিশরীয়।

যারকাউয়ির প্রতি আতিয়াহ আবদুর রহমানের দেওয়া আদেশগুলো অনুসরণই ছিল আবু হামযা আল-মুহাজিরের প্রথম কাজ। তিনি সমস্ত সুন্নিদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, ইরাকে আল-কায়েদা এসেছে – আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে জিহাদে সহায়তা করতে, ইরাকিদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে আমেরিকাকে উৎখাত করতে চাওয়া যেকাউকে সহায়তা করতে। আল-কায়েদা সেখানে জিহাদের নিয়ন্ত্রণ নিতে কিংবা মানুষকে তাদের আকিদাহ বিশ্বাস শেখাতে আসেনি। আল-মুহাজিরকে বলা হয়েছিল যেন তিনি "আল-কায়েদা কিংবা যেকোনো সংগঠনের নাম উচ্চারণ করে উদ্দীপনা ছড়ানো থেকে সাবধান থাকেন।" তিনি এসেছিলেন নীরবে নিভৃতে কাজ করে যেতে, যাতে মনে করা হয় "সমস্ত মুজাহিদরাই আমাদের ভাই। সুন্নিরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম থাকছে, তারা আমাদের ভাই এবং মিত্র। এমনকি তারা কিছুটা অবাধ্য কিংবা দাম্ভিক ধরনের হলেও, তারা (আল-কায়েদা) সংগঠনের কিংবা সংগঠনের বাইরের কেউ হলেও।" [624]

অপরদিকে প্রকাশ্যে, যারকাউয়ি পরবর্তী সময়ে উসামা বিন লাদেনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল – আমেরিকার জোট এবং ইরাকিদের মধ্যে কাফিরদের হয়ে কাজ করা লোকদের ওপর যারকাউয়ির সমুদয় হামলার প্রশংসা করা এবং আল্লাহর কাছে তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেওয়ার দুআ করা। এভাবে যারকাউয়ি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইসলামের একজন বীর হয়ে গেলেন; ঠিক যেমনটা তাঁর অনুসারীদের কাছে জীবিত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তিনি আল-কায়েদার জন্য আর হুমকিস্বরূপ রইলেন না। এরপর উসামা বিন লাদেন ইরাকে আল-কায়েদা সংগঠনের সম্ভাব্য সাফল্যের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করেন। প্রথমত, তিনি যারকাউয়ির মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এরপর থেকে ইরাকে আল-কায়েদার কার্যক্রম সমঝদার সমস্ত মুসলিমের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি শহীদ যারকাউয়ির ভুলত্রুটিগুলো এড়িয়ে গিয়ে তাঁর যথাসম্ভব প্রশংসা করলেন। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করা যে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং এর বিধান হলো হত্যা, তা কুরআনের আয়াত দিয়ে বর্ণনা করে উসামা বিন লাদেন

---

624 Atiyah to Abu Musab al-Zarqawi, 11 December 2005.

শেষ পর্যন্ত আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির পক্ষাবলম্বন করলেন।[625] উসামা বিন লাদেন আরও ঘোষণা করলেন যে, তিনি আবু হামযা আল-মুহাজির এবং আবু উমার আল-বাগদাদীকে যারকাউয়ির স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন। সেই সাথে তাঁর শ্রোতাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে, উভয়ই হিন্দুকুশ পর্বতে আমেরিকা ও ন্যাটোর অব্যাহত বিমান হামলায় "সবর এবং দৃঢ়তা"র পরিচয় দিয়েছেন। যেহেতু আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই মুসলিমদের মাঝে প্রচন্ড সম্মানের চোখে দেখা হতো, তাই উসামা বিন লাদেন এটাও উল্লেখ করে দিলেন যে, "তাঁরা উভয়েই আপনাদের আফগানিস্তানের ভাইদের মধ্যে সমাদৃত।"[626]

এরপর উসামা বিন লাদেন সময়ের অন্যতম বড় সমস্যা - ইরাকের সুন্নি মুজাহিদদের ঐক্যের ব্যাপারে আলোকপাত করলেন। সুন্নিদেরকে মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন, "কিন্তু আপনাদের কেউ কেউ আরেকটি দায়িত্বের ব্যাপারে কিছুটা আলসেমি করছেন, অথচ সেটাও দ্বীনের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। আর তা হলো – আপনাদের সমস্ত দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি দল গঠন করা, যেমনটা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।"[627] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "ঐক্য হলো দয়া, আর অনৈক্য হলো জুলুম।" এছাড়াও এর আগে ইরাকিদেরকে তিনি "সালাহউদ্দিনের উত্তরাধিকার" উল্লেখ করে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু তা আল-কায়েদার অধীনে নয়।[628] ইরাকিদেরকে, বিশেষ করে আল-কায়েদার সদস্যদেরকে তিনি বলেন,

> *"আমি নিজেকে, সাধারণভাবে সমস্ত মুসলিমদেরকে এবং বিশেষভাবে সমস্ত প্রান্তের আল-কায়েদা সদস্যদেরকে উপদেশ দিচ্ছি – যেন সকলে উগ্র পক্ষপাতিত্ব থেকে সতর্ক থাকেন; বিশেষ করে কোনো ব্যক্তি, দল কিংবা নিজের জন্মভূমির প্রতি অন্ধ গোঁড়ামি থেকে... মুসলিমদেরকে যেন কেবল ঈমানের ভ্রাতৃত্বই একত্রিত রাখে; সেটা যেন গোত্র, জন্মভূমি কিংবা সংগঠনের প্রতি গোঁড়ামিতে না গড়ায়। জামাআহর স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য পাবে, ইসলামি রাষ্ট্রের স্বার্থ জামাআহর স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য*

625 OBL, "Eulogy for Abu-Musab al-Zarqawi", Al-Sahab Media, 30 June 2006.

626 OBL, "The way to foil plots", Al-Sahab Media, 27 December 2007.

627 OBL, "Message to our people in Iraq", Al-Sahab Media, 23 October 2007.

628 OBL, "The way to foil plots"; and OBL, "Second message to the Iraqi people", Al-Jazirah Satellite Televsion, 18 October 2003.

পাবে এবং উম্মাহর স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য পাবে। এই ধারণাগুলো আমাদের নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে হবে... আমি মুসলিমদেরকে সালাফদের বলা কথাগুলোই বারবার স্মরণ করিয়ে দিব, যাতে করে আজকে তাদের কারও কারও মধ্যে যে বাড়াবাড়ির আবির্ভাব হয়েছে, তা দূরীভূত হয়। এই ধরনের বারাবাড়ি মূলত নিজের দল কিংবা নেতার আদেশকে অতিরিক্ত মহিমান্বিত করার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে।"[629] [630]

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে উসামা বিন লাদেন আমেরিকা এবং পশ্চিম ছাড়াও যেসব মুসলিমরা কাফিরদেরকে সহায়তায় লিপ্ত হয়েছিল – হোক তা ব্যক্তি, দল কিংবা প্রশাসন – তাদেরকেও আল্লাহর শত্রু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। এছাড়াও আস-সাদর বাহিনী, বদর ব্রিগেড এবং আদ-দাওয়াহ পার্টি নামে শিয়াদের যেসমস্ত দল ইরাকের সুন্নিদের ওপর "নৃশংস আঘাত" চালাচ্ছিল কিংবা কাফিরদেরকে যেকোনোভাবে সহায়তা করছিল, তাদেরকেও শত্রু আখ্যায়িত করা হয়। [631] "এই শ্রেণির অপরাধীদের দমন করা, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং এদের বিস্তৃতি বন্ধ করতে প্রথম পদক্ষেপ রাখার জন্য" উসামা বিন লাদেন যারকাউয়ির প্রশংসা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, জর্জ বুশ সুন্নি মুসলিমদের বিরুদ্ধে শিয়া নেতাদের পক্ষ নিয়ে "এই তথাকথিত গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে। সে ভেবেছিল এর মাধ্যমে যুদ্ধের ফলাফল দ্রুত তার অনুকূলে চলে যাবে।" [632] এছাড়া আরও বলেছিলেন, আমেরিকার বাহিনী কতক সুন্নিদেরকেও টাকা পয়সার "লোভ দেখিয়ে তাদের মিত্রতা কিনে নিয়েছে।" ওইসমস্ত মুসলিমরা কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়ে "নিজেদের দুনিয়া এবং আখিরাত বরবাদ করে ফেলেছে।" [633] আর এর আগে তিনি বলেছিলেন যে, তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে নিজেদের ইসলাম ত্যাগের প্রমাণ দিয়েছে, আর তাই "তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ হয়ে গিয়েছে।" [634]

---

629 OBL, "Message to our people in Iraq."

630 অনেকের মতে, উসামা বিন লাদেনের এই বক্তব্য থেকেও পরবর্তীকালের চরমপন্থী তাকফিরি গোষ্ঠী 'দাওলাতুল ইসলাম' বা Islamic State (IS)-এর আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

631 OBL, "The way to foil plots"

632 OBL, "Message to the American people", Al-Fallujah Islamic Minbar (Inter-net), 8 September 2007; OBL, "The way to foil plots".

633 OBL, "The way to foil plots."

634 OBL, "Message to our brothers in Iraq", Al-Jazirah Satellite Televsion, 11 February 2003.

পরিশেষে উসামা বিন লাদেন যারকাউয়ির তুলনামূলক কঠোরতা এবং বাছবিচারহীন হত্যাকান্ডের প্রতি পুনরায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, "আমি সমস্ত মুসলিমকে, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলের মুসলিমদেরকে আশ্বস্ত করছি যে, (ইরাকে) মুজাহিদদের কাছ থেকে আপনারা কল্যাণ ছাড়া আর ভিন্নকিছু পাবেন না ইনশাআল্লাহ। আমরা তো আপনাদেরই সন্তান। ক্রুসেডার কাফির এবং তাদের সাহায্যকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে চালানো অপারেশনে যেসব সাধারণ মুসলিমদের জীবন ঝরে গিয়েছে, তাদের কেউই আমাদের ইচ্ছাকৃত টার্গেট নন। এসব অপারেশনে যখন কোনো মুসলিমের রক্ত ঝরে যায়, তখন তা যে আমাদেরকে কতোটা দুঃখ ভারাক্রান্ত করে – তা কেবল আল্লহই জানেন। তবুও আমরা নিজেদেরকেই দায়ী করি এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তিনি এমন মুসলিমদেরকে ক্ষমা করে দেন, জান্নাতকে তাদের শেষ ঠিকানা বানিয়ে দেন এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে এর প্রতিদান দেন।" [635]

আল-কায়েদার প্রধান কার্যালয় (আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত) থেকে কীভাবে মাঠে ময়দানের অধীনস্থদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করা হয়, উক্ত বার্তা থেকে তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের এপ্রিলে আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং আবু হামযা আল-মুহাজির পর পর তিনটি বিবৃতিতে ইরাকের সুন্নি যোদ্ধাদের মধ্যকার মারাত্মক বিভক্তির কথা বর্ণনা করেন। সেইসাথে বিবৃতিগুলোতে সুন্নি যোদ্ধাদের প্রতি নিজেদের পার্থক্যগুলোকে একপাশে রেখে Islamic State of Iraq তথা ISI-এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ISI ছিল আল-কায়েদার তৎকালীন ইরাকি শাখা, যা মূলত সুন্নি মুজাহিদ দলগুলোকে একত্রিত করার মানসেই গড়া হয়েছিল। [636]

ইরাক আগ্রাসনের পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আইমান আজ-জাওয়াহিরি একটি বক্তব্যে উসামা বিন লাদেনের পূর্বেকার কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন যে, ইরাকে আমেরিকা এবং জোট শক্তি অচিরেই "ব্যর্থতা এবং পরাজয়ে" মুখ থুবড়ে পড়বে। তিনি জেনারেল পেট্রিউসের আমেরিকার সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া "স্থগিত রাখার" আহ্বানকে উপহাস করে বলেন যে, "এটা আসলে ইরাকে ওদের পরাজয় লুকোবার এবং বুশকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার উদ্ভট ধান্ধাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।" এমন

---

635 OBL, "The way to foil plots."

636 ২০০৬-এর অক্টোবরে আবু উমার আল-বাগদাদীকে প্রধান করে Islamic State of Iraq বা ISI গঠন করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত টিকা রয়েছে।

কর্মকান্ডকে তিনি ইরাকে "ক্রুসেডার শক্তির পরাজয় বরণ"-এর ঘোষণা এবং আমেরিকার ইরাক সমস্যাকে কৌশলে "পরবর্তী প্রেসিডেন্টের কাঁধে তুলে যাওয়া" বলে আখ্যায়িত করেন। আইমান আজ-জাওয়াহিরি এটাও উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার কিনে নেওয়া সুন্নি সংস্কারবাদী দলগুলোর জন্যও পতন আসন্ন। মুজাহিদরা এইসব দালালদেরকে তাড়া করে ফিরছিল; আর তাই ওদেরকে সহায়তা করার জন্যই মূলত আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার "স্থগিত রাখার" সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। [637]

আইমান আজ-জাওয়াহিরির কথার আরেকটি পয়েন্ট সাধারণত কম উল্লেখ করা হলেও সমান গুরুত্বের দাবিদার। আর তা হলো, সামরিক সমস্যা ঘুচে যেতে শুরু করলেও ইরানের আগ্রাসন রোধ করে সুন্নি মুজাহিদ দলগুলো ইরাককে পরিচালনা করার উপযোগী হতে আরও অনেক কাজ বাকি ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, সামরিক সফলতাকে কাজে লাগাতে হলে "ইরাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত বান্দাদেরকে আরও অনেকখানি সবর এবং দৃঢ়তার পথ অতিক্রম করতে হবে।" আমেরিকা সৈন্য অপসারণ তথা পালাবার তারিখ নিয়ে নাস্তানাবুদ থাকতে থাকতেই আইমান আজ-জাওয়াহিরি সমস্ত সুন্নি মুজাহিদদেরকে ISI-এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কেননা একমাত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই সুন্নি যোদ্ধারা ইরাকি শিয়া আর তাদের প্রভু ইরানকে রুখতে পারবে। ডা. জাওয়াহিরির মতে, ইরান সেসময় দক্ষিণ ইরাক সহ আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের একাংশ দখলের পাঁয়তারা করছিল। আর এভাবে তারা "লেবাননে নিজেদের শিয়া যোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগের রাস্তা বানানোর পরিকল্পনায়" ব্যস্ত ছিল। আর সুন্নি মুজাহিদরা একমাত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই তা রুখতে পারতো। এর আগে ইরান এবং পশ্চিম উভয়েই আবু মুসআব আয-যারকাউয়িকে একজন ভিনদেশী এবং সুন্নি বিদ্রোহীদের ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল। আর এবার আইমান আজ-জাওয়াহিরি ইরাকের শিয়াদের 'মুকতাদা আস-সাদর' দলটিকে "একটি বাচ্চা ছেলে" বলে আখ্যায়িত করলেন, যে কিনা কখন যুদ্ধে জড়াবে আর কখন শক্তি প্রদর্শন করবে – এসবের কিছুই জানে না। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আস-সাদরকে আসলে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থা নিজেদের "হাতের পুতুল" বানিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছিল। [638]

---

637 Ayman al-Zawahiri, "Five years after the invasion of Iraq and decades of injustice by tyrants", Al-Sahab Media, 18 April 2008.

638 Ayman al-Zawahiri, "Five years after the invasion of Iraq and decades of injustice by tyrants", Al-Sahab Media, 18 April 2008.

এরপর আবু হামযা আল-মুহাজির সুন্নি যোদ্ধাদেরকে ISI-এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়ে একটি বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে আইমান আজ-জাওয়াহিরির কথারই প্রতিধ্বনি করে তিনি সমস্ত মুসলিমদেরকে জানিয়ে দেন যে, ইরাকে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন শক্তির বিরুদ্ধে "চূড়ান্ত বিজয় একেবারেই সন্নিকটে" আর "মহাশক্তিধর আল্লাহর সাহায্যে অচিরেই" সুন্নিরা ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিবে। যোদ্ধারা "ক্রুসেডার শক্তি এবং আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে" কেবল "কিছু ভূমি পাওয়ার জন্য লড়ছে না" বরং তারা যুদ্ধ করছে "আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করবার জন্য।" মুসলিমদের জন্য "আল্লাহর প্রতি ভরসাই হলো বিজয় এবং সংহতির প্রধান উপাদান" আর কেবলমাত্র সত্যিকারের ঐক্যই "গৌরব, বিজয় এবং সংহতি" এনে দিতে পারে। আবু হামযা আল-মুহাজির এই পর্যায়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, তবুও সুন্নিরা ঐক্যবদ্ধ নয়। কেউ কেউ তো জিহাদ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, আর বাকিরা তাদের কার্যক্রমেই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ঐক্য ছাড়া কোনো বিজয়ই সম্ভব নয় "এমনকি আমাদের কমান্ডার সৃষ্টির অন্যতম সেরা কেউ কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিদের একজন হলেও।" [639]

সুন্নি শক্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আবু হামযা আল-মুহাজির রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর উদাহরণকে সামনে রাখার কথা বলেন। সেইসাথে সমস্ত সুন্নি যোদ্ধা – এমনকি যারা ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছে বা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, যারা তথাকথিত পুনর্জাগরণে যোগ দিয়েছে বা ছেড়ে এসেছে – এক কথায় সমস্ত সুন্নিদেরকে ISI-এর পতাকাতলে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়: "রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়েও যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছিল, তাদেরকে তিনি তিরস্কার করেননি, তাদের পলায়নকে গালমন্দের উপলক্ষ্যও বানাননি। বরং তারা যে তাওহিদকে বরণ করে নিয়েছিল, তারা যে জিহাদে অগ্রগামী হয়েছিল – ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাদেরকে গৌরবের দিকে ফিরে আসার আহ্বান করেছেন। কঠিন সময়ে একজন কমান্ডারের জন্য এটাই শ্রেয় যে তিনি প্রথমে আল্লাহর দিকে ফেরার পর জিহাদে যারা অগ্রগামী হয়েছিল, তাদের দিকে ফিরবেন; গোত্রসমূহের নেককার সন্তানদের দিকে ফিরবেন; এবং তাদেরকে কোনোরূপ তিরস্কার করবেন না। আমরা যদি তাদেরকে ছেড়ে দিই, তাহলে সেটা হবে তাদেরকে শয়তান আর তার দলবলের কাছে ছেড়ে দেওয়া। আর তা অবশ্যই জিহাদ এবং মুজাহিদদের ক্ষতির কারণ হবে। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম এহেন কাজ সমর্থন করতে পারে না।" [640]

---

639 Abu Hamza al-Muhajir, "The Paths of Victory", Al-Fuqran Establishment for Media Production, 19 April 2008.

640 Abu Hamza al-Muhajir, "The Paths of Victory"

অতঃপর আইমান আজ-জাওয়াহিরি ইন্টারনেটে আবেদন করা কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে সুন্নি ঐক্য প্রচেষ্টার পক্ষ থেকে এই আহ্বানকে পরিপূর্ণ করে দেন। তাঁর জবাবে তিনি ইরাকের পরিস্থিতির ব্যাপারে আলোকপাত করেন; বিশেষ করে সেই প্রশ্নের জবাবে যেখানে প্রশ্নকারী মন্তব্য করেছিল – ইরাকের সংখ্যালঘু সুন্নিরা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এবং ISI গঠন মুজাহিদদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এর জবাবে আইমান আজ-জাওয়াহিরি বলেছিলেন, "তিনি যা বলেছেন, আমি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কেননা ইরাকে সুন্নিরা সংখ্যালঘু নয়, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর তার কারণ হলো কুর্দিরা এবং তুর্কিমেনিরাও সুন্নি।" আর ISI-এর ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট করেন যে তা ঐক্যের জন্য গঠিত হয়েছে, বিভক্তি বাড়ানোর জন্য নয়। তিনি বলেন, "(ISI-এর) মুজাহিদ শুরা পরিষদের ভাইয়েরা ইরাকের সমস্ত গনিমত আগে সুরক্ষা করার প্রচেষ্টা করেছেন। এমনকি তারপরও ISI-এর ঘোষণা বেশ কয়েক মাস বিলম্ব করেছেন যাতে করে ইরাকের সমস্ত মুজাহিদ দলের নেতৃত্বের সাথে সম্পর্কস্থাপন করা যায়।" তাঁর মতে উক্ত ঘোষণা বিভক্তি বাড়াবে না; বরং মুজাহিদদেরকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া থেকে ঠেকাবে – যেমনটা আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের পতনের পর শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে এমন সমস্ত দল, জোট বা "ব্যক্তিবর্গ", যারা "ISI-কে জাতীয়তাবাদ-বিহীন সেক্যুলারিজম-শুন্য বিশুদ্ধতার জন্য ভালবাসেন; যারা ইসলামি খিলাফাতের লক্ষ্যে কাজ করতে চান, মুসলিম ভূমিগুলোকে ক্রুসেডার আর ইহুদিদের কাছ থেকে মুক্ত করতে চান" – এমন সকলকে ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি "এই একক সত্তায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে এবং আলোচনায় বসতে" আহ্বান জানান।[641]

এই ঘটনাপ্রবাহটি উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ইতিহাসের সেইসমস্ত বিরল দৃষ্টান্তের একটি, যেখানে আল-কায়েদা নেতৃত্বের কোনো সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে সেটার সমাধান করার প্রচেষ্টা পর্যন্ত স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই ঘটনাপ্রবাহ একইসাথে বেশ কয়েকটি বিষয় প্রকাশ্যে এনে দেয়। সেগুলো হলো: উসামা বিন লাদেনই ছিলেন মূল পথপ্রদর্শক; আল-কায়েদা স্পষ্টভাবেই একটি কর্মক্ষম, চেইন অব কমান্ডে পূর্ণ সংগঠন, যেটার শক্তিশালী 'আদেশ প্রদান এবং বাস্তবায়ন' (command and control) ক্ষমতা রয়েছে; আল-কায়েদার নেতৃত্ব থেকে ময়দান পর্যন্ত যোগাযোগ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হলেও অসম্ভব পর্যায়ের কিছু না; ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং দক্ষ কর্মীদেরকে সংরক্ষণ করা সংগঠনটির সিগনেচার হিসেবে বহাল ছিল; এবং তাত্ত্বিক কিংবা প্রায়োগিক – কোনো দিক দিয়েই সংগঠনটির মধ্যে চরমপন্থী তাকফিরি দৃষ্টিভঙ্গির ছাপও নেই।

---

641 Ayman al-Zawahiri, "Open Interview, 2", Al-Sahab Media, 22 April 2008.

কিন্তু বর্ণিত প্রক্রিয়াটি কি ইরাকে আদৌ কোনো সাফল্য আনতে পেরেছিল? উত্তরটা আসলে হ্যাঁ, পেরেছিল। ২০০৯ সালের শেষার্ধের মধ্যেই AQI [642] সামরিকভাবে আরও

642 ইরাকে ২০০৪ সালে আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির হাত ধরে আল-কায়েদার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল Al-Qaeda in Iraq বা সংক্ষেপে AQI হিসেবে। পরবর্তীতে ২০০৬-এর জুনে আবু মুসআব আয-যারকাউয়ি শহীদ হলে AQI-এর প্রধান হিসেবে আবু হামযা আল-মুহাজিরকে নিযুক্ত করা হয়। একই বছরের, অর্থাৎ ২০০৬-এর অক্টোবরে আবু উমার আল-বাগদাদীকে প্রধান করে গঠন করা হয় Islamic State of Iraq বা ISI. ইরাকে কাজ করা অন্যান্য দলগুলোকে একত্রিত করতেই মূলত ISI গঠন করা হয়েছিল। এরপর ২০১০ সালের এপ্রিলে আমেরিকা এবং ইরাকের যৌথ একটি অপারেশনে আবু হামযা আল-মুহাজির এবং আবু উমার আল-বাগদাদী উভয়ই শহীদ হন। তখন ISI-এর শুরা সদস্যরা নেতৃত্বের জন্য বেছে নেয় আবু বকর আল-বাগদাদীকে। তখন থেকে আলাদাভাবে আর AQI-এর অস্তিত্বও রাখা হয় না। তার এক বছর পর ২০১১-এর মে মাসে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে উসামা বিন লাদেন শহীদ হলে আল-কায়েদার নেতৃত্বে আসেন ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি। তখনও ISI আল-কায়েদার কাছে বায়াতবদ্ধ ছিল। এই বইটি ২০১০-২০১১ সময়কালে লিখিত হওয়ায় তার পরবর্তী তথ্যগুলো আর আসেনি।

এরই মধ্যে ২০১১ সালে সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়; আর সেখানে আল-কায়েদা নেতৃত্বের আদেশে ইরাকের ISI থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধা পাঠিয়ে ‘জাবহাত আন-নুসরাহ’ গঠিত হয়। তবে জাবহাত আন-নুসরাহ যে ISI হয়ে আল-কায়েদারই শাখা ছিল, তা কৌশলগত কারণে প্রথমদিকে গোপন করা হয়েছিল। এর পরবর্তী তিন বছর সিরিয়া এবং ইরাকে ব্যাপক অঞ্চল দখলের পর আবু বকর আল-বাগদাদী ২০১৩ সালের এপ্রিলে ISI-এর নতুন নাম Islamic State in Iraq and the Levant or, Syria (ISIL or ISIS) ঘোষণা করে। আর এই সময় থেকেই সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ISIS-এর সাথে আল-কায়েদার নেতৃত্বের বাদানুবাদ শুরু হয়। বিশেষ করে সিরিয়ায় জাবহাত আন-নুসরাহের নিয়ন্ত্রণ করা অঞ্চলও দখল করতে ISIS উপর্যুপরি হামলা চালাতে থাকে। সেসময় সিরিয়ার জাবহাত-আন নুসরাহ ISIS-এর সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে সরাসরি আল-কায়েদা নেতৃত্বের কাছে বায়াতবদ্ধতার ঘোষণা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেও ISIS-এর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এভাবে আল-কায়েদা এবং ISIS সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে কাজ করা শুরু করে। (অবশ্য পরবর্তী সময়ে জাবহাত আন-নুসরাহও ন্যাটোসদস্য তুরস্কের কূটনৈতিক চালের শিকার হয়ে আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল) একই বছরে অর্থাৎ, ২০১৪ সালের জুন মাসে ISIS তাদের নেতা আবু বকর আল-বাগদাদীকে খলিফা করে নিজেদের মতো খিলাফাত ঘোষণা করে দেয়। এরপর থেকে ISIS-এর সাথে আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের শারঈ এবং কৌশলগত বাদানুবাদ, এমনকি ময়দানেও এই দুইটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ পূর্বের চেয়েও মারাত্মক আকার ধারণ করে। আল-কায়েদার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে বহুবার ISIS-এর চরমপন্থী তাকফির এবং তাদের খিলাফাতকে শারঈভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। উভয় দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ আজও বিদ্যমান।

২০১৪ থেকে ২০১৯-এর মাঝের সময়টায় সিরিয়ায় ISIS-এর অধিকৃত সীমানা বহুবার পরিবর্তন হয়েছে। আল-কায়েদার সাথে বিচ্ছেদের সময় ISIS-এর দখলে বিপুল পরিমাণ অঞ্চল থাকলেও পরবর্তী কয়েক বছরে আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট সিরিয়ার সেক্যুলার গণতান্ত্রিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে সেই সীমানা কমতে থাকে। পরিশেষে ২০১৯ সালের মার্চে গিয়ে আমেরিকার সাপোর্ট পাওয়া গণতান্ত্রিক বাহিনীর হাতে ISIS সিরিয়ায় তাদের সর্বশেষ ঘাঁটি বাগুজ শহরও হারিয়ে বসে। আর এর মাত্র কয়েক মাস পর ২০১৯-এর অক্টোবরে আবু বকর আল-বাগদাদীকেও হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর ISIS-এর প্রধান হিসেবে নতুন নাম ঘোষণা করা হলেও দলটি তাদের পূর্বের অবস্থানে আর পৌঁছাতে পারেনি।

তৎপর হয়ে ওঠে, তারা তাদের হামলাগুলো সব বৈধ টার্গেটে সীমাবদ্ধ করে নিয়ে আসে; আমেরিকার বসানো ইরাকি প্রশাসন, তাদের সেনাবাহিনী এবং সিকিউরিটি সার্ভিস, মুসলিমদের মধ্যে যারা প্রশাসনের হয়ে কাজ করে (ধর্মত্যাগের অপরাধে লিপ্ত হয়), বাগদাদে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস এবং বিশেষ করে পশ্চিমা সেনা ও নৌবাহিনীর ওপর হামলার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা হয়।[643] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, মুসলিমদের ওপর AQI-এর এলোপাথাড়ি আক্রমণ একেবারে শুন্যের কোঠায় নেমে আসে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১০ সালের মার্চে সংসদ নির্বাচন হওয়ার সময় AQI-এর যোদ্ধাদেরকে ভোট থামানোর নির্দেশ দেওয়া হলেও তা কোনোরকম রক্তপাত বা সংঘর্ষ ছাড়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছিল।[644]

অবশ্য ২০১০ সালের এপ্রিলে এসে আমেরিকা এবং ইরাকি বাহিনী মিলে তিকরিত শহরের অদূরে আবু হামযা আল-মুহাজির এবং আবু উমার আল-বাগদাদীকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ফলস্বরূপ AQI এবং ISI-এর ঘুরে দাঁড়ানো ব্যাহত হয়ে যায়।[645] এই সময়টায় এটাই দেখার বাকি ছিল যে, উসামা বিন লাদেনের পরবর্তী নিয়োগকৃত নেতার অধীনে AQI আরেকবার স্থির হতে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে নিতে সক্ষম হয় কিনা। এর পর পরই ISI-এর একজন শুরা সদস্য বিশ্বের মুজাহিদদেরকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, "ISI-এর নেতৃত্ব উত্তম এবং শক্তিশালী একজনের হাতেই গিয়েছে।"

643 "Al-Qaeda in Iraq shifting its tactics", http://www.CNN.com. 16 December 2009; Muhammad Shamsaddin Megalommoatis, "Avert the founding of the al-Qaeda state 'Kurdistan' in northern Iraq", http://www.americanchronicle.com, 24 February 2010; "Renewed fear of al-Qaeda return to Anbar", http://www.nigash.org, 17 February 2010; "Islamic State of Iraq: A statement on the blessed Tikrit raid", Al-Fajr Media Center (Internet), 9 December 2009; "Islamic State of Iraq: A statement on the fifth wave of the prison raid in Baghdad", Al-Fajr Media Center (Internet), 8 April 2010; Martin Chulov, "Al-Qaeda bombs hit three Baghdad embassies", http://www.guardian.co.uk, 5 April 2010; and "Iraq in 'open war' with Qaeda after bombings", http://www.kuwait-times.com, 8 April 2010.

644 Abu-Umar al-Baghdadi, "Stop them do not kill them", Al-Fajr Media Center (Internet), 23 March 2010.

645 Tim Arango, "Top Qaeda leaders in Iraq reported killed in raid", http://www.nytimes.com, 19 April 2010, and "Al-Qaeda in Iraq confi rms death of two top commanders", Agence-France Presse, 18 April 2010.

নিহত হওয়া দুইজন শাইখ এবং শুরা পরিষদ “এমন দিনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং আগের থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।” [646] [647]

আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির রেখে যাওয়া প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্তি না মিললেও আল-কায়েদা ইরাকে তার সাংগাঠনিক লক্ষ্য অর্জনে ভালই সফল হয়েছিল। [648] যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি ছিল – ইরাকের আশেপাশের সীমান্তবর্তী সিরিয়া, তুরস্ক এবং আরব উপদ্বীপ সহ সেইসব অঞ্চলে নিরাপদ ঘাঁটি তৈরি করা, যেসব অঞ্চলে সংগঠনটির তেমন কোনো অবস্থানই ছিল না। আসলে এইক্ষেত্রে আল-কায়েদা প্রশ্নাতীতভাবে সাফল্য অর্জন করেছিল, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা সালাফি যোদ্ধাদের জন্য ইরাকের মধ্য দিয়ে শাম এবং গাযা পর্যন্ত প্রবেশপথ তৈরিতে আল-কায়েদা

---

646 “Statement by the Ministry of Shariah Commissions in the Islamic State of Iraq”, Al-Fajr Media Center (Internet), 25 April 2010.

647 আসলে এর পর উসামা বিন লাদেন কিংবা আল-কায়েদা নেতৃত্বের কেউ ISI-এর প্রধান নির্ধারণ করেননি। বরং তা নির্ধারণ করেছিল ISI-এর তৎকালীন শুরা সদস্যরা। তারা সকলে মিলে নতুন প্রধান হিসেবে আবু বকর আল-বাগদাদীকে ISI-এর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছিল। নতুন প্রধান নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি সহ আল-কায়েদা নেতৃত্বের শুধু দিক নির্দেশনা দেওয়া ছিল – নতুন প্রধান যেন স্থানীয় অর্থাৎ, ইরাকি কাউকেই করা হয়। আর সেই সুযোগে ISI-এর তৎকালীন শুরা সদস্যরা আবু বকর আল-বাগদাদীকে প্রধান নিযুক্ত করেছিল। উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি কিংবা আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে আবু বকর আল-বাগদাদীর কখনও পূর্বে সাক্ষাৎও হয়নি। আর তাই ২০১০ সালে ISI-এর শুরা সদস্যরা আবু বকর আল-বাগদাদীকে প্রধান ঘোষণা করলে উসামা বিন লাদেন কিংবা আইমান আজ-জাওয়াহিরি থেকে তার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। মন্তব্য এসেছিল স্রেফ ISI-এর শূরা সদস্যদের কাছ থেকেই।

বলা বাহুল্য, প্রথমদিকে আবু বকর আল-বাগদাদী আল-কায়েদা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল বলে স্বাভাবিকভাবে সেই সময় তার বিরুদ্ধেও কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে এই বাগদাদীই (২০১৩) চরমপন্থী তাকফিরি দল ISIS-এর নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। ঘটনাক্রমে ২০১৪-তে আল-কায়েদা এই চরমপন্থী দলটি থেকে নিজেদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, যা পূর্বের একটি টিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ISI-এর পরিবর্তিত রূপ ISIS-এর সেই শুরা সদস্যরাই পরবর্তীতে ২০১৪-এর জুনে আবু বকর আল-বাগদাদীকে কুরাইশ বংশের দাবি করে নিজেদের খলিফা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল।

648 এখানে আরেকবার স্মরণিকা যে, লেখকের বই লিখার সময়কাল ২০১০-২০১১। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনেকখানি অংশ জুড়ে লেখক সেই সময়ের হিসেবেই বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সেসময় ইরাক এবং সিরিয়াকে ঘিরে আল-কায়েদার সাংগাঠনিক কাজ যতটুকুই এগিয়েছিল, তা পরবর্তীতে ISIS-এর উত্থানের কারণে অনেকখানি ব্যাহত এমনকি নষ্টও হয়ে যায়। এই প্যারাতে লেখক আল-কায়েদার যেসমস্ত সুবিধাদি পাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন, তা মূলত ISI-এর খাতায় যোগ হয়েছিল। পরবর্তীতে আল-কায়েদা এবং ISI বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আল-কায়েদাকে অনেকটাই শুন্য থেকে কাজ শুরু করতে হয়েছিল।

সফল হয়েছিল। ইরাকে আমেরিকার দখলদারিত্ব যখনই শেষ হোক, পুরো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে সক্ষম একটি কেন্দ্রীয় (সেক্যুলার) সরকার গঠন অসম্ভব বলেই মনে হয়। ইরাকের প্রদেশগুলোকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক কিংবা শিয়া-সুন্নি গৃহ যুদ্ধ শুরু হোক, ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে; কিন্তু সেখানে আল-কায়েদা ঠিকই থাকবে। আসলে গৃহযুদ্ধ কেবল আল-কায়েদার নিরাপদ ঘাঁটি টিকিয়ে রাখাই নিশ্চিত করবে। অপরদিকে ইরাকের সুন্নিরা সংখ্যায় অল্প হয়ে যাওয়ার কারণে যে কোনো উৎস থেকেই যোদ্ধা এবং সহায়তা নিতে শুরু করবে – এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে হলেও আল-কায়েদার প্রতি তাদের ক্ষোভ ভুলে যাবে।[649]

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে[650] উসামা বিন লাদেনের অভিপ্রায় এবং আল-কায়েদার সামর্থ্যের ব্যাপারে পশ্চিম আফগানিস্তান এবং ইরাক আগ্রাসনের আগে থেকেই জানতো। ফিলিস্তিনকে উসামা বিন লাদেন অন্যতম প্রধান ইসলামি ইস্যু বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি চেষ্টা করেও ফিলিস্তিনের আশেপাশে যোদ্ধা মোতায়েন করতে সমর্থ হননি; আর একারণে তিনি বিমর্ষও ছিলেন।[651] আর তাই তাঁকে শামের বাইরের ইসরাঈলি টার্গেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। এছাড়া তিনি মিশর, লেবানন এবং জর্ডান প্রশাসনের প্রতিও ঘৃণা পোষণ করতেন, কারণ তারা মুজাহিদদের জন্য সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে ইসরাঈলকে নিরাপত্তা দিয়ে চলছিল।

---

649 এই প্যারাতে লেখক আল-কায়েদার যেসমস্ত সুবিধাদি পাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন, তা মূলত আল-কায়েদার তৎকালীন ইরাক শাখা ISI-এর খাতায় যোগ হয়েছিল। পরবর্তীতে আল-কায়েদা এবং ISI বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আল-কায়েদা এইসমস্ত ফায়দা হারায়।

650 এই প্যারা থেকে লেখক আবার কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে, ২০০৬-০৭ সময় থেকে ফিলিস্তিন সংকটকে ঘিরে উসামা বিন লাদেনের চিন্তা ও কার্যক্রমকে তুলে ধরেছেন।

651 ফিলিস্তিন নিয়ে উসামা বিন লাদেনের বিষন্ন ছিলেন ঠিক, কিন্তু তা ২০০৮-এর পর ফিলিস্তিনের আশেপাশে যোদ্ধা মোতায়েন নিয়ে আর ছিল না। কেননা ২০০৮ সালে আল-কায়েদা সমর্থিত দল ফিলিস্তিনে কাজ শুরু করেছিল। এই ব্যাপারে লেখক পরবর্তীতে আলোচনা করেছেন। উসামা বিন লাদেনের কষ্ট ছিল মূলত তখনও ফিলিস্তিনের জন্য প্রভাবজনক কিছু করতে না পারার কারণে। এই ব্যাপারে পরবর্তীতে ২০১৪ সালে আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার ম্যাগাজিনের একটি প্রবন্ধে কিছুটা বিস্তারিত এসেছিল। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং শিরোনাম ছিল 'Days with the Imam'। আগ্রহীরা সেই লিখাটি পড়ে দেখতে পারেন।

ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে ফিলিস্তিনিদেরকে কীভাবে সাহায্য করবেন, তা নিয়ে উসামা বিন লাদেন মুশকিলে ছিলেন। তবে সাদ্দামের পতনের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদেরকে সহায়তা করতে না পারার সমস্যা কিছুটা মিটে গিয়েছিল। কেননা ইসরাঈলের নিরাপত্তার প্রশ্নে – ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সাদ্দাম ছিল আমেরিকা এবং ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠ মিত্র। সে ফিলিস্তিনের বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন দিয়ে শান্ত রেখেছিল, কিন্তু আবার দক্ষিণ এশিয়া থেকে শাম পর্যন্ত সুন্নি যোদ্ধাদের পথ রুদ্ধ করতেও সব ধরনের দালালি করে যাচ্ছিল। সাদ্দাম সরে যাওয়ার পর ইসরাঈলের বোঝাপড়া করার জন্য এমন কিছু ফিলিস্তিনি নেতাকর্মী রইলো যারা খুবই অল্প কার্যকর, সহজেই ভীত এবং যাদেরকে অর্থকড়ি দিয়ে অনায়াসেই বশে রাখা যায়।

উসামা বিন লাদেন বিশ্বাস করতেন ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা স্রেফ ফিলিস্তিনিদের ইস্যুই নয়, বরং তা আরব ভূমি থেকে পশ্চিমাদের উচ্ছেদের মতোই ইসলামের ইস্যু। তিনি বলেন, “প্রত্যেক মুসলিমই গাযা উপত্যকায় আমাদের মাজলুম ভাইবোনদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। যারা আল-আকসাকে স্বাধীন করতে সত্যিই আন্তরিক, তাদের জন্য ইরাক যুদ্ধ এক দুর্লভ এবং অমূল্য সুযোগ।” [652] ইরাকে মুজাহিদ উপস্থিতি গড়ার মধ্যেই সমাধান নিহিত। কেননা তখন ইরাক সীমান্ত দিয়ে মুজাহিদদেরকে শাম হয়ে গাযা পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনে কিছু আল-কায়েদা যোদ্ধা ছাড়াও অন্যান্য সালাফি যোদ্ধাদেরকে পাঠানো বেশি প্রয়োজন। ইসরাঈল স্রেফ আমেরিকার সাপোর্ট এবং আরব শাসকদের কাপুরুষতার ওপর ভর দিয়ে এখনও ক্রুসেডারদের ঘাঁটি হয়ে রয়েছে। উসামা বিন লাদেন মুসলিমদের উদ্দেশ্য বলেন, “আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ফিলিস্তিনের ভূমিতে দখল নেওয়া জায়নিস্টরা (ইহুদিবাদী) খুবই ভঙ্গুর, ওদের অনেক অনেক দুর্বলতা। ওরা নিজেরাও খুব ভাল করেই জানে যে, চারপাশে এত বিশাল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের মাঝে পশ্চিম এবং তাদের দালাল আরব শাসকদের সহায়তা-সমর্থন ছাড়া ওদের টিকে থাকা সম্ভব না।” [653]

২০০৭-এর শেষ দিকে, উসামা বিন লাদেন আত্নবিশ্বাসী ছিলেন যে ইরাকে আল-কায়েদা যথেষ্ট শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে পেরেছে, যা আশেপাশের রাষ্ট্রগুলোতে এর প্রভাব, সংগঠন এবং বিদ্রোহীদের পক্ষে সহায়তা বিস্তার করতে সক্ষম। বিশেষ করে শামের রাষ্ট্রগুলোর

---

652 OBL, “Message to the Muslim nation”, Al-Sahab Media, 18 May 2008, and OBL, “Practical steps to liberate Palestine”, Al-Sahab Media, 14 March 2009.

653 OBL, “Message to the Muslim nation”, Al-Sahab Media, 18 May 2008.

জন্য তিনি ব্যাপারটি অধিক প্রযোজ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। একটি বক্তব্যে তিনি লেবানন এবং ফিলিস্তিনের ব্যাপারে খুবই সাবলীল এবং ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে কথা বলেন, যেমনটি আগে কখনও করেননি। তিনি দাবি করেছিলেন যে আল-কায়েদাই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং ফিরিয়ে আনবেও, কেননা হিযবুল্লাহ এবং হামাস এইকাজে ব্যর্থ হয়েছিল। [654]

২০০৬-এর গ্রীষ্মে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লেবাননের হিযবুল্লাহ এবং এর সেক্রেটারি জেনারেল নাসরুল্লাহকে আল-কায়েদা যে সমর্থন দিয়েছিল, [655] এবার (২০০৭-এর শেষে) কিছুটা সংশোধনের ভঙ্গিতে বিন লাদেন তা প্রত্যাহার করে নিলেন। এবার তিনি হিযবুল্লাহর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার এবং ওয়াশিংটন ও তার দালাল আরব শাসকদের হয়ে কাজ করার অভিযোগ করলেন। তিনি বলেন, "লেবাননে কী ঘটে গেল, তা তো মুসলিমরা দেখেছে। জাতিসংঘের প্রস্তাবনা ১৭০১-এর মাধ্যমে হিযবুল্লাহ এবং ইসরাঈলের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তিরক্ষী বাহিনী ডেকে আনা হলো – এই পুরো ব্যাপারটা যে আসলে একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না, মুসলিমরা তা ভাল করেই জানে। এই শান্তিরক্ষীরা যে আমেরিকান-জায়নিস্ট মিত্রশক্তিরই আরেক চেহারা, তা কি মানুষ বোঝে না? তাছাড়া হিযবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহও মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। সে এইসব বাহিনীকে প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, এমনকি তাদেরকে সাহায্য করারও ওয়াদা করেছে; অথচ সে খুব ভাল করেই জানে যে, এই বাহিনী ইহুদিদেরকে নিরাপত্তা দিতে এবং হকপন্থী মুজাহিদদের জন্য সীমান্ত অবরুদ্ধ করতেই আসছিল। নাসরুল্লাহ তাকে সাপোর্ট দেওয়া দুই রাষ্ট্র – সিরিয়া এবং ইরানের ইচ্ছা পূরণেই এসব করেছিল; সে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার না করে বরং নিজের সংগঠনের উন্নতিকে প্রাধান্য দিয়েছে।" নাসরুল্লাহর কর্মকান্ডকে উসামা বিন লাদেন "বিশ্বাসঘাতক" – মিশরীয় রাষ্ট্রপতি আনওয়ার সাদাত এবং জর্ডানের রাজা হুসেইন – এর মতো বলে আখ্যায়িত করেন। এদের উভয়ই মূলত "চুক্তি করে নিজেদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিল, যাতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুজাহিদরা কোনো অপারেশন পরিচালনা করতে না পারে।" [656]

---

654 OBL, "The way to foil plots", Al-Sahab Media, 29 December 2007.

655 Ayman al-Zawahiri, "The Zionist-Crusader aggression on Gaza and Lebanon", Al-Sahab Media, 28 July 2006.

656 OBL, "The way to foil plots."

অবশ্যই বিন লাদেন তখন থেকেই বলে আসছিলেন যে, ফিলিস্তিনিরা এমন এক অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে, যেখানে গোটা শাম সহ মিশর হলো "কাঁটাতার দেওয়া রাষ্ট্র।" [657]

নাসরুল্লাহকে এক হাত নেওয়ার পর উসামা বিন লাদেন হামাসের নেতারদের বিরুদ্ধে "সেই অঞ্চলের আমেরিকান এজেন্টদেরকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করার" অভিযোগ করেন। আর একারণে তিনি তাদেরকে "উম্মাহর বিরুদ্ধে চরম মাত্রার বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দুষ্ট" বলেও অভিহিত করেন। তাঁর মতে, হামাসের কয়েকজন নেতা "দুই পবিত্র ভূমির (সৌদি আরবের) শাসকদের" দ্বারা পুরোপুরি "প্রলুব্ধ" হয়েছিল; ফলস্বরূপ তারা নিজেদের সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুসলিমদের আসলে "হামাস আন্দোলনের নেতৃত্বের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা রিয়াদ সহ আরবের অন্যান্য প্রশাসনগুলোকে মান্য করে এবং আন্তর্জাতিক হুকুমকে সম্মান করে একতা রাষ্ট্রে (Unity State) আবদ্ধ হলো। এতে একদিকে তারা নিজেদের দ্বীনকে হীয় প্রতিপন্ন করলো; অপরদিকে এই কাজ করে শেষমেশ তারা দুনিয়াবি কোনো ফায়দাও পেল না।" সৌদির হস্তক্ষেপে ওয়াশিংটন এবং ইসরাঈলকে খুশি করতে গিয়ে হামাস "জেরুজালেমকে, আল-আকসা মসজিদকে এবং শহীদদের রক্তকে বিক্রি করে দেওয়ার" সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। [658]

অতঃপর উসামা বিন লাদেন "দালাল শাসক" তথা আরব শাসকদেরকে তুলোধুনা করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল-কায়েদা এবং এর মিত্ররা তাদেরকে উৎখাত করে "ইসলামি বিচারব্যবস্থার আওয়ায় আনতে" বদ্ধপরিকর রয়েছে। বিশেষ করে তিনি বলেছিলেন যে, "ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পথ সুগম করতে" শামের শাসকদেরকে ধ্বংস করতে হবে, কেননা এই শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল দিয়েই রণক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "জর্ডান এক শ্রেষ্ঠ এবং প্রশস্ত রণক্ষেত্র উপহার দিয়েছে, বিশেষ করে যেহেতু এর প্রায় অর্ধেক বাসিন্দাই ফিলিস্তিনি।" এরপর শুধু ফিলিস্তিনিদেরকেই নয়, বরং সমস্ত মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদেরকে আল-কায়েদা সরাসরি সাহায্য করতে শুরু করবে। এটা ছিল অভূতপূর্ব এক ঘোষণা। আর এর মাধ্যমে উসামা বিন লাদেন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই কাজের

---

657 OBL, "Practical steps to liberate Palestine", Al-Sahab Media Production Organization, 14 March 2009.

658 OBL, "The way to foil plots."

জন্য আল-কায়েদার যথেষ্ট সামরিক এবং লজিস্টিক সামর্থ্য হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘‘আমি বিশেষ করে আমাদের ফিলিস্তিনের ভাইদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আল্লাহর ইচ্ছায় শীঘ্রই আমরা আমাদের জিহাদের পরিধি বিস্তৃত করবো। আর আমরা সাইকস-পিকটের সীমানা কিংবা ঔপনিবেশিকদের বসানো দালাল শাসকদেরকে পরোয়া করবো না। আল্লাহর কসম, ৯/১১-এর পর আমরা আপনাদেরকে ভুলে যাইনি। কেউ কি তার নিজের পরিবারের কথা ভুলে যেতে পারে?... রিয়াদের দেখাদেখি আরব শাসকরা তো একে একে ইসরাঈলকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমরা ইহুদিদের রাষ্ট্র মানিনা, ফিলিস্তিনের ভূমির এক ইঞ্চিও ওদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে না।’’ [659]

ইসরাঈল এবং আরব শাসকদের জন্য আমেরিকার মতো সামরিক বোঝাপড়াকেই সমাধান হিসেবে উল্লেখ করে উসামা বিন লাদেন উপসংহার টানলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ‘‘রক্তের বদলা রক্ত, ধ্বংসের বদলা ধ্বংস।’’ এছাড়াও বলা হলো যে ফিলিস্তিনের পাশাপাশি আল-কায়েদা ‘‘হিত্তিনকে পুনরুদ্ধার করতেও লড়ে যাবে।’’ [660] হিত্তিন হলো ফিলিস্তিনের সেই স্থান, যেখানে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সালাহউদ্দিন আল-আইয়ুবি ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রশ্নাতীত বিজয় অর্জন করেছিলেন। হিত্তিনের বিজয়ের সেই ঘটনা একই বছরের অক্টোবরে গিয়ে মুসলিমদের জন্য জেরুজালেম বিজয়ে রূপ নিয়েছিল।

অতীত যেন উসামা বিন লাদেনের হয়ে আভাস দিচ্ছিলো: যদি তিনি বলেন যে আল-কায়েদা কিছু একটা করবে, তাহলে তা করার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি কিন্তু প্রথমদিকে শামে কিংবা ইসরাঈলে আল-কায়েদার বড় ধরনের আক্রমণের কথা বলতেন না। বরং সবসময় জোর দিয়ে তিনি এটাই বলে এসেছেন যে, মুজাহিদরা ‘‘ইরাকে, আফগানিস্তানে, ইসলামিক মাগরিব এবং সোমালিয়াতে আমেরিকা এবং তার দালালদের বিরুদ্ধে’’ লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যারকাউয়ির মৃত্যুর পর এক পর্যায়ে আল-কায়েদার অন্যান্য মুখপাত্রদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি নির্দেশনা আসতে শুরু করে – কীভাবে আল-কায়েদা কিংবা, আরও ভালভাবে বললে আল-কায়েদা সমর্থিত সালাফি মুজাহিদদের আগমনের আগে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। উসামা বিন লাদেনের ভাষায় যে যোদ্ধারা ‘‘ইহুদিদের রাষ্ট্র মানবে না, ফিলিস্তিনের ভূমির এক ইঞ্চিও ছেড়ে দিবে না।’’ [661]

---

659 OBL, “The way to foil plots.”

660 OBL, “The way to foil plots.”

661 OBL, “The way to foil plots.”

২০০৮-এর শুরুর দিকে, আল-কায়েদার মুখপাত্র বলেন, "ইরাক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতির (সালাহউদ্দিন আল-আইয়্যুবি) পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফিলিস্তিনই হবে তাদের গন্তব্য।"

আল-কায়েদার একজন স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক তখন 'AsadAl-Jihad2' ছদ্মনাম ব্যবহার করে লিখতেন। সেই সময়টায় (২০০৮) তিনি ফিলিস্তিনিদেরকে উসামা বিন লাদেনের সহযোগিতার ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রকাশ্যে তেমন উচ্চ্যবাচ্য না করলেও ইসরাঈলের ওপর আক্রমণের জন্য আল-কায়েদা দীর্ঘ সময় যাবৎ প্রস্তুতি নিয়ে আসছিল। তিনি ঘোষণা দেন যে, আল-কায়েদা তখন তিন বছর মেয়াদী এক প্রস্তুতির মাঝামাঝি সময়ে অবস্থান করছিল, যেটা ২০০৭-এ শুরু হয়েছিল এবং "শেষ হবে ২০০৯-এর শেষে গিয়ে।" দাবি করা হয় যে, এরপর থেকেই মূলত আল-কায়েদার যোদ্ধারা "দখলকৃত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যাবে।" লেখক সতর্ক করে জানিয়ে দেন, ২০০৯-এর পর থেকে ইসরাঈলিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুধু ফিলিস্তিনের ভূমিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং "পৃথিবীর যেখানেই ইহুদিদের দৌরাত্ম রয়েছে, আক্রমণ সেখান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।" [662] [663]

ফিলিস্তিনিদেরকে ধৈর্য্যশীল হওয়ার অনুরোধ করে 'AsadAl-Jihad2' খোলাসা করেন, "ফিলিস্তিনে আল-কায়েদার শাখা কিংবা ঘাঁটি রাতারাতি গঠন করা সম্ভব নয়। আর তা (গঠিত হলেও) ২০০৮ সালের শেষের (আমেরিকার রাষ্ট্রপতি) নির্বাচন হয়ে যাওয়ার আগে

---

662 AsadAl-Jihad2, "The timing of the entrance of the al-Qaeda organization to Palestine", http://www.al-boraq.info, 28 January 2008.

663 আল-কায়েদা সমর্থিত সালাফি দল 'জুনুদ আনসারুল্লাহ' নামে ২০০৮ সাল থেকে ফিলিস্তিনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ শুরু করে। এখানে মূলত এই দলটির আবির্ভাবের ইতিহাসই বর্ণিত হয়েছে। ২০০৯ সালে ফিলিস্তিন অঞ্চলে আল-কায়েদা সমর্থিত বাহিনীর পক্ষ থেকে সেখানে 'ইসলামি ইমারাহ' গঠনের ঘোষণা দেওয়া হলে হামাসের যোদ্ধারা ইবনু তাইমিয়্যাহ মসজিদে আল-কায়েদার যোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং হত্যা করে।

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনে নিজের অনুগত মুজাহিদ বাহিনীকে আল-কায়েদা প্রথমদিকে ইরাকে নিজেদের তৎকালীন শাখা ISI-এর মাধ্যমে সাপোর্ট দিতে চেয়েছিল। এই ব্যাপারে পরবর্তীতে লেখক কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে দুটো দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ফিলিস্তিনেও উভয়ের আলাদা অনুগত বাহিনী নিজেদের মতো কাজ শুরু করে। এভাবে বহু চড়াই উতরাই পাড়ি দিয়ে ফিলিস্তিনে আল-কায়েদা সমর্থিত দলটি 'জাইশুল উম্মাহ ফি বাইতিল মাকদিস' নাম গ্রহণ করে। বর্তমানে সংক্ষেপে 'জাঈশুল উম্মাহ' নামেও ডাকা হয়, যা অবশ্যই সিরিয়ায় একই নামের ক্ষণস্থায়ী আরেকটি দল থেকে ভিন্ন। পরবর্তী সময়ে ইসরাঈলিদের বিরুদ্ধে জাঈশুল উম্মাহ বেশকিছু আক্রমণ পরিচালনা করে।

ঘোষণা দেওয়া হবে না।” এরপর তিনি আল-কায়েদার আগমনের পূর্বে ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে বেশকিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখার তাগাদা দেন:

মার্শাল আর্ট, বোমা প্রস্তুতকরণ এবং বিস্ফোরক ও রকেট তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। বিশেষ করে, “আগ্রহী ফিলিস্তিনি যুবকদেরকে লড়াই এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দক্ষতার উন্নয়নে” দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মুহাজিরদের (বিদেশি যোদ্ধা) জন্য ফিলিস্তিনে প্রবেশের পথ তৈরি করা এবং “প্রথমদিকে তাঁদের সুরক্ষা ও থাকার ব্যবস্থা করা।” এই আহ্বান “গাযার সম্মানিত বাসিন্দাদের” জন্য, যেখান থেকে মাত্র ৩৫০ জন মুজাহিদ “যথাযথ প্রশিক্ষণ, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে আল-কায়েদায় শামিল হলে তারাই জায়নিস্টদের ভিত নাড়িয়ে দিতে যথেষ্ট হতো।”

যতো বেশি সম্ভব অস্ত্র সংগ্রহ করা, সেগুলো নিরাপদে সংরক্ষণ করা এবং গুপ্ত স্থানসমূহের “এনক্রিপ্টেড ম্যাপ” প্রস্তুত করা।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করতে শেখা এবং যুদ্ধকালীন সময়ের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য চিহ্নিত করা।

পাঁচ কিংবা তার কমসংখ্যক লোক নিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করা, যারা প্রতি সপ্তাহে কেবল একবার একত্রিত হবে। তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পন্ন করতে দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিস্ফোরক বানানো কিংবা আল-কায়েদার নেতাদের ভিডিও, বক্তব্য বিশেষ করে আইমান আজ-জাওয়াহিরির ভিডিও ও প্রিয়ভাজন যারকাউয়ির লেকচার শুনতে দেওয়া ইত্যাদি।

ফিলিস্তিনের সালাফি দাঈগণকে অবশ্যই “নম্র এবং দয়াদ্রভাবে” দ্বীন শেখাতে হবে, এবং অবশ্যই “হামাসের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে” জড়ানো যাবে না। [664]

664 AsadAl-Jihad2, “The timing of the entrance of the al-Qaeda organization to Palestine”, http://www.al-boraq.info, 28 January 2008.

স্থানীয় দুই আল-কায়েদা মিত্র উসামা বিন লাদেনের ওয়াদা অনুযায়ী গাযায় অস্ত্র এবং যোদ্ধা পাঠিয়েছিল। ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে, ফিলিস্তিনে ফাতাহ আল-ইসলামের [665] নেতা আবু আবদুর রহমান আল গাযযাউয়ি ঘোষণা দেন যে, তার দল "তাদেরকে দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী - তা বুঝতে পেরেছে; আর সেটা হলো ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের পক্ষ থেকে সাপোর্ট প্রদান।" তিনি জোর দিয়ে "ফিলিস্তিন থেকে তাদের জিহাদ শুরু করার" কথা ব্যক্ত করেন। কেননা "ইহুদিদের রক্ষক, এবং শয়তানের হিযব (দল)" – শিয়া হিযবুল্লাহ ফাতাহ আল-ইসলামকে দক্ষিণ লেবাননে ঘাঁটি স্থাপনে বাধা দিয়েছিল। এছাড়া ফিলিস্তিনে "মুহাজির" বিদেশি যোদ্ধা আনার কথাও বলা হয়। এরপর প্রয়োজনে ফাতাহ (ফিলিস্তিন জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন), হামাস, শিয়া কিংবা "ইহুদিদেরকে টার্গেট করতে বাধা দেওয়া" যেকোনো দলের বিরুদ্ধেই লড়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। [666] [667]

---

665 'ফাতাহ আল-ইসলাম' এবং বর্তমানের শুধু 'ফাতাহ' ভিন্ন দুইটি সংগঠন। 'ফাতাহ' হলো ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ১৯৫৯ সালে গঠিত দলের বর্তমান সংস্করণ। 'ফাতাহ' মৌলিকভাবে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দল; তবে নিজস্ব কিছু মিলিশিয়া বাহিনী দিয়ে সময়ে সময়ে সংঘর্ষে জড়ায়।

অপরদিকে 'ফাতাহ আল ইসলাম' হলো সুন্নি জিহাদপন্থীদের দ্বারা ২০০৬ সালে উদিত হওয়া দল। এই দলটির উদয়ের পর প্রথমদিকে উসামা বিন লাদেনের বক্তব্য তথা আল-কায়েদা থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো বক্তব্য দিলেও মূলত ইরাকের ISI দ্বারা অধিক অনুপ্রাণিত ছিল। গঠনের পর থেকে বিভিন্ন সংঘর্ষে জড়িয়ে বেশ কয়েকবার স্পটলাইটে এসেছিল। তবে ২০১১ সালে সিরিয়ার যুদ্ধ, ২০১২ সালে সংগঠনটির বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীর মৃত্যু এবং ২০১৩-২০১৪ সালে ISIS গঠিত হয়ে নিজেদের খিলাফত ঘোষণা – এই পুরো সময়কালে 'ফাতাহ আল-ইসলাম'-এর অধিকাংশ যোদ্ধা ISIS-এ গিয়ে যোগ দিয়েছিল। আর অল্পকিছু যোদ্ধা তৎকালীন আল-কায়েদা সমর্থিত জাবহাত আন-নুসরাহ সহ অন্যান্য দলে যায়। এভাবে ২০১৪ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনের ফাতাহ আল-ইসলাম দলটি প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

666 Abu Abd al-Rahman al-Ghazzawi, "An announcement and statement to the Islamic nation", Media Division of Fatah al-Islam, 13 February 2008.

667 বাধাপ্রাপ্ত হলেই নির্বিচারে যেকোনো দলের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘর্ষে জড়ানো আল-কায়েদার মূলনীতি ও যুদ্ধকৌশলের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আগের প্যারাতেই ২০০৮-এ আল-কায়েদার প্রাবন্ধিক হামাসের সাথে লড়াইয়ে না জড়ানোর জন্য কঠোরভাবে বারণ করার কথা এসেছে। এমনকি পরবর্তীতে বিভিন্ন বাহিনী - বিশেষ করে হামাস সরাসরি আল-কায়েদা সমর্থিত যোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ এমনকি হত্যা করলেও আল-কায়েদা 'নিজে থেকে' এই ধরনের দলগুলোর সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার মূলনীতিতে অটল ছিল; যদিও হামাসের মতো দলগুলোর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে উম্মাহর সাথে গাদ্দারি করার অভিযোগ করে অনেক বিবৃতি আল-কায়েদার পক্ষ থেকে এসেছে। ফাতাহ আল-ইসলামের এমন বাছবিচারহীন হত্যার ঘোষণার সাথে পরবর্তী সময়ের চরমপন্থী তাকফিরি দল ISIS-এর কার্যকলাপের অধিক সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। আর ISIS গঠিত হওয়ার পর ফাতাহ আল-ইসলামের অধিকাংশ যোদ্ধারা ISIS-এ যোগদান করার ব্যাপারটিও উভয় দলের মানসিকতার সামঞ্জস্যতার ইঙ্গিত দেয়।

একই (২০০৮) ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আবু উমার আল-বাগদাদী ইসরাঈলকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন, যেখানে ইহুদিধর্ম এবং ইহুদিবাদের (Judaism & Zionism) মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়কেই তিনি "বিপর্যয়ের মূল এবং উৎস" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "ইসরাঈল হলো এমন এক জীবাণু, যেটাকে উম্মাহর শরীরে বপণ করা হয়েছে; আর এটাকে উপড়ে ফেলা অত্যাবশ্যক।" [668]

প্রাবন্ধিক AsadAl-Jihad2-এর মতোই আবু উমার ফিলিস্তিনিদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন: যেন বিস্তরভাবে সালাফি দাওয়াহ দেওয়া এবং তরুণদের জিহাদকে ভালবাসতে শেখানো হয়; হামাসের সামরিক উইংকে যেন আল-কায়েদা এবং এর মিত্রদের সাথে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়; সিরিয়া, জর্ডান এবং লেবানন থেকে আসা "মুহাজির" মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং জিহাদি মিডিয়ার কন্টেন্ট যেন সাধ্যমতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে, আবু উমার "আল-আকসার ইস্যু প্রত্যেক মুসলিমের ইস্যু" ঘোষণা করে ইরাকের মুজাহিদরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে কী ভূমিকা রাখবে তাতে জোর দেন। [669]

উসামা বিন লাদেনের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আল-কায়েদার প্রত্যেক মুখপাত্রই – প্রকাশ্যে ইসরাঈল এবং ফাতাহকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছিলেন; হামাসের ন্যায়পরায়ণ 'আল-কাসসাম ব্রিগেড'-এর যোদ্ধাদের থেকে "বিশ্বাসঘাতক" রাজনীতিবিদদের পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন; [670] ফিলিস্তিনিদের সামরিক সহায়তা প্রেরণের ঘাঁটি হিসেবে ইরাক ও শামের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন; পরোক্ষভাবে বুঝিয়েছিলেন যে মুহাজির যোদ্ধাদেরকে ব্যতীত ফিলিস্তিনিরা ইসরাঈলকে হারাতে সক্ষম হবে না; ফিলিস্তিনে বিদেশি মুজাহিদ প্রবেশ

---

668 Abu-Umar al-Baghdadi, "Religion is sincere advice", http://www.muslim.net, 14 February 2008.

669 আবারও উল্লেখ্য, যেহেতু ISI তখনও ইরাকে আল-কায়েদার শাখা হিসেবেই ছিল, তাই উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি সহ অনেক নেতাই তাই তিনি ISI-এর সম্ভাব্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আর আবু উমার আল-বাগদাদী তো সেসময় আল-কায়েদার পক্ষ থেকে ISI-এর প্রধানই ছিলেন। কিন্তু ২০১৩-১৪ সময়কালে আল-কায়েদা এবং ISI বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ISI নিয়ে আল-কায়েদা নেতৃত্বের পূর্বের বক্তব্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই বইটিতে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিষয়বস্তু আসায় পরের ঘটনাবলি আসেনি। আর এই ব্যাপারগুলো পূর্বের বেশ কয়েকটি টিকায় ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

670 অথচ পরবর্তীতে হামাসের 'আল-কাসসাম ব্রিগেড'-ই ইবনু তাইমিয়্যাহ মসজিদে আল-কায়েদা সমর্থিত যোদ্ধাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। এই ব্যাপারে বিস্তারিত টিকা কিছুদূর পরেই আসছে।

করানোর এবং স্থানীয় মুজাহিদদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অন্তর্বর্তী সময়ে সবাইকে ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ফিলিস্তিনি যুবকদেরকে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান করেছিলেন। সর্বোপরি উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ইরাকে আল-কায়েদা নিরাপদ ঘাঁটি স্থাপন করার মাধ্যমে কৌশলগত বিজয় অর্জন করেছিল; আল-কায়েদা ও তার মিত্রদের দ্বারা ইসরাঈল পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে টার্গেট হবে; এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থান করেও আল-কায়েদা ফিলিস্তিনে যোদ্ধা পাঠানোর মতো ব্যাপারেও কিনা আত্মবিশ্বাসী।

এই আত্মবিশ্বাস কি যৌক্তিক? বর্তমানে (২০১০-২০১১) ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে সালাফি যোদ্ধাদের উপস্থিতি খুবই ক্ষুদ্র হলেও গাযায় সালাফিদের কার্যক্রম সামরিক ছিল ক্রমবর্ধমান। কয়েকটি সালাফি সংগঠন গাযায় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছিল এবং তা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারও করেছিল। তারা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিচ্ছিলো, "ওহে ইহুদিরা, আমরা আসছি!" [671] গাযায় আগ্রাসন চালানো ইসরাঈলের সৈন্য এবং সেখানকার খ্রিস্টান ও আমেরিকান বিভিন্ন টার্গেটে তারা হামলা চালিয়েছিল। [672] সেই সালাফি দলগুলো দাবি করতো যে, তাদের অর্থায়ন স্থানীয়ভাবেই হচ্ছে এবং তারা "তাদের আল-কায়েদার ভাইদের সাথে শুধুমাত্র আদর্শিক দিক দিয়েই জড়িত।" [673]

এটা বলে রেখে, প্রশিক্ষণের সময় তারা উসামা বিন লাদেনপন্থী স্লোগান দিতো। তাছাড়া সালাফি মুখপাত্র আবদুল্লাহ আল-গাযযাউয়ি স্পষ্ট রাখতেন যে, স্রেফ "নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারে" আল-কায়েদার সাথে তাদের যোগাযোগ বজায় থাকে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা

---

671 "A call to Salafi groups in Gaza to join forces and confront Hamas", MEMRI, Special Dispatch, No. 1946, 3 June 2008, http://www.memri.org. By April 2010, four of the groups—Jund Ansar Allah, Jam'at Jaysh al-Islam, Al-Tahwid wal Jihad, and Jund Allah—had joined together in an umbrella organization called Jaljalat. See Ibrahim Qannan, "Exclusive: New Salafist Gaza faction numbers 11,000", http://www.maannews.net, 23 April 2010.

672 Nidal al-Mughrabi, "Pro-al-Qaeda fighters train in Gaza strip", http://www.alertnet.org, 1 September 2008, and Michael Freund, "The growing al-Qaeda threat to Israel", Jerusalem Post (Internet version), 21 October 2008.

673 "Middle East: New militant group emerges in Gaza", http://www.adnkronos.com, 2 September 2008.

তাঁকে (বিন লাদেন) নিয়ে গর্বিত, কেননা তিনি এমন একজন সম্মানিত শাইখ যিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা করেন, যিনি ইসলাম এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করা সবার বিরুদ্ধে লড়েন। আমরা তাঁকে সমর্থন করতে মানুষকে তাগাদা দিই।" [674]

গাযায় সালাফিরা মৌলিকভাবেই হামাসের বিরোধী। একবার হামাসের যোদ্ধারা সালাফিদের কিছু মসজিদে হামলা করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল; সেইবার হামাস সালাফি যোদ্ধাদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছিল। [675] এই বিদ্বেষ ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে, কেননা গাযায় আল-কায়েদার সমর্থিত সালাফি জিহাদিরা হামাসের আল-কাসসাম ব্রিগেডের মধ্যেও দাওয়াতি কাজ করে ধীরে ধীরে যোদ্ধা বাগিয়ে আনছিল। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হামাস যোদ্ধাই তাদের নেতাদের সাথে ইসরাঈলের বোঝাপড়ার "তিক্ত" বাস্তবতা নিয়ে বিব্রত ছিল; তারা ইসরাঈল আর হামাসের মধ্যকার 'এই আছে, তো এই নেই' ধরনের "শান্ত" সামরিক পরিস্থিতি নিয়েও দারুণ হতাশ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮-এ হামাসের তিনজন যোদ্ধা প্রকাশ্যে আল-কায়েদাকে আহ্বান জানায়, যেন হামাসের নেতাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়, কেননা তারা "জিহাদের পথ থেকে সরে গিয়েছে এবং পশ্চিমের সমর্থনপুষ্ট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে কূটনৈতিক বোঝাপড়ায় লিপ্ত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ ফিলিস্তিনিদের গলার ফাঁস আরও আঁটসাঁট হয়ে গিয়েছে।" তারা আল-কায়েদার "বৈশ্বিক জিহাদের" প্রতি সমর্থনের ওয়াদা করে এবং "আল-কায়েদাকে তাদের সামরিক কার্যক্রমে সহায়তা করার" আহ্বান জানায়। [676] এছাড়াও ইন্টারনেটে নিজেদেরকে হামাসের বলে দাবি করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধা বলেন যে,

---

674 "Al-Qaeda affiliated group in Gaza", Al-Arabiyah Televsion, 3 September 2008.

675 ২০০৯-এর ১৪ই আগস্ট শুক্রবারে, গাযার রাফাহ শহরের ইবনু তাইমিয়্যাহ মসজিদে আল-কায়েদা সমর্থিত 'জুনুদ আনসারুল্লাহ'-এর প্রধান শাইখ আবদুল লতিফ মূসা জুমুআর খুতবাহে ফিলিস্তিনে একটি জিহাদি ইসলামি ইমারাহ গঠনের ঘোষণা দেন। এরপর পরই হামাসের বাহিনী ইবনু তাইমিয়্যাহ মসজিদে 'জুনুদ আনসারুল্লাহ'-এর মুজাহিদদের ওপর চড়াও হয়। সেই হামলায় শাইখ আবদুল লতিফ মূসা ছাড়াও মোট ১৫ জন মুজাহিদ শহীদ হন।

[Hamas cracks down on Salafists in Gaza Strip, Al Monitor]

সেই ঘটনায় বেসামরিক নাগরিক সহ নিহতের মোট সংখ্যা ছিল ২৮, আহত ১০০ জনের বেশি। এছাড়া গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল ১০০ জনের বেশি লোককে।

[Palestinian Centre for Human Rights (August 15), www.terrorism-info.org.il/en/18223/]

676 Ubaidah al-Saif, "Qassam brigades in Gaza issue urgent appeal to leaders of al-Qaeda", http://www.jiahdunspun.com, 26 June 2008.

"ফিলিস্তিনের মানুষদেরকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার জন্য" আল-কায়েদার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। কেউ কেউ বলেন, "সত্যিকারের ঈমানদাররা শাইখ উসামা বিন লাদেনকে ভালবাসে। আর কেবল বেঈমানরাই তাঁকে ঘৃণা করে।" [677]

২০০৩ সালে ইসরাঈলি কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, লেবাননের ফিলিস্তিনি শরনার্থী ক্যাম্পে, বিশেষ করে 'আইন আল-হিলওয়াহ'-তে নাকি আল-কায়েদার উপস্থিতি ছিল। একই বছরে মিডিয়ায় এসেছিল যে, সেই ক্যাম্পে মোসাদ কিংবা এর প্রতিনিধির হাতে নাকি আবদুস সাত্তার আল-মিশরি নামে একজন মিশরীয় আল-কায়েদা নেতা নিহত হয়েছিলেন। সাত বছর আগে ইসরাঈলের দাবি যাচাই করাটা ছিল কঠিন। এমনকিছু সত্যিই ঘটেছিল নাকি স্রেফ আরও কিছু আমেরিকান সহায়তা পাওয়ার জন্য জঙ্গি হুমকির নাটক সাজানো হয়েছিল তা বলা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আজকে এই ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গাযাভিত্তিক সালাফি দলগুলো প্রকাশ্যে নিজেদের উপস্থিতির ঘোষণা দিয়েছিল। এছাড়া ২০০৮-এর শেষের দিকে The Jerusalem Post রিপোর্ট করেছিল যে, "আল-কায়েদার সংশ্লিষ্ট দল" ইসরাঈলে ২১ টি রকেট ও ১৮ টি মর্টার নিক্ষেপ করেছিল; এবং সুরক্ষা বেষ্টনীর কাছে বিস্ফোরক স্থাপন করেছিল। [678]

অতএব আজকে (২০১০-২০১১) শামে সালাফি সামরিক কার্যক্রমের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে; আর এটা কমে যাবে ভাবার কোনো কারণ নেই। সিরিয়া, জর্ডান এবং লেবানন প্রশাসনের স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা হবে। সেই সাথে পরীক্ষা করা হবে ইসরাঈলের নিরাপত্তাও; অবশ্য তা সাদ্দামের পতনের সাথে সাথে এমনিতেই দফারফা হয়ে গিয়েছিল। তাই আমেরিকার বাহিনী যখনই ইরাক ত্যাগ করবে, তখন থেকে ইসরাঈল অবশ্যই সালাফিদের দ্বারা আরও বড় হুমকির সম্মুখীন হবে। আমেরিকা বিদায় নিলে বাগদাদের শিয়া প্রশাসন তখন দেশটির পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে সালাফিদের অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়ার উৎসাহ হারাবে। এই পুরো দৃশ্যপট সামনে রাখলে ইসরাঈলি লেখক Amos Harel ইরাকে আল-কায়েদার সাংগাঠনিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতার যে চিত্রায়ন করেছেন, সেটাকে যথাযথ বলেই মনে হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, আরব ইসরাঈলিরা [679] এবং ফিলিস্তিনিরা ক্রমশ সন্ত্রাসী

---

677 উদাহরণস্বরূপ, দেখুন, Abu-Muadh al-Maqdisi, "To the lions of al-Qassam in the relentless den", Bayt al-Maqdis Islamic Forums (Internet), 22 February 2008.

678 Freund, "The growing al-Qaeda threat to Israel."

679 ইসরাঈলি লেখক এখানে 'আরব ইসরাঈলি' বলতে ফিলিস্তিনের ইহুদি দখলকৃত ভূমিতে বসবাসরত আরব মুসলিমদের কথা বুঝিয়েছে।

হামলার দিকে ঝুঁকছিল। তার ভাষায়, "আল-কায়েদার এজেন্ডার সাথে যে তারা নিজেদের মিল খুঁজে পাচ্ছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর তা হামাস কিংবা ইসরাঈলের (দখলকৃত ফিলিস্তিনের) ইসলামি আন্দোলনের চেয়েও অধিক চরমপন্থী। বেশ কয়েক বছর ধরেই উসামা বিন লাদেনের প্রকাশ্য বক্তব্য, বিবৃতি এবং সহায়তা এসেছে সন্ত্রাসী হামলার জন্য ইসরাঈল সহ পৃথিবীব্যাপী ইহুদিদেরকে টার্গেট বানানোকে ফোকাসে রেখে। বর্তমানে এটাও জানা কথা যে গাযা উপত্যকায় আল-কায়েদার সাথে সম্পর্কযুক্ত বেশ কিছুসংখ্যক সেল এখন তুলনামূলকভাবে আরামেই কার্যক্রম পরিচালনা করে।"

তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইসরাঈলে (দখলকৃত ফিলিস্তিনে) আল-কায়েদা "উর্বর ভূমির" সন্ধানে রয়েছে।[680]

680 Amos Harel, "Al-Qaeda in Israel: Fertile ground for terrorism", http://www.haaretz.com, 20 July 2008.

বিন লাদেন যুগ

নতুন বছরের সময়টা হলো ফিরে দেখার। যখন পৃথিবীর কিছু অংশে শ্যাম্পেইনের ছিপি খুলে ২০১১ সালকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছিল, তখন আরও অনেকের মতো উসামা বিন লাদেনও হয়তো তাঁর জীবনের দিকে একবার ফিরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। যুবক বয়সে যাদেরকে তিনি নিজের রোল মডেল হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বিশেষ করে রাসূল মুহাম্মাদ সা., সালাহউদ্দিন এবং তাঁর বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেনকে অনুকরণ করতে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁদের মতোই তিনি সবসময় তাঁর কথা ও কাজের মিল রেখে চলেছিলেন; আর সেটাও করেছিলেন এক কঠিন, ঝুঁকিপূর্ণ, আন্তরিক ধার্মিকতাপূর্ণ এবং দুনিয়াবিমুখ জীবন বজায় রেখে। ২০১১-এর শুরুতেও তিনি, আল-কায়েদা এবং এর মিত্রশক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আর তখনও নিজেদের সামরিক দৃঢ়তার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাঁদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের সেই ওয়াদার সত্যতা হিসেবেই অনুভূত হয়েছিল, যে ওয়াদা তিনি তাঁর রাস্তায় জিহাদরত মুসলিমদের জন্য দিয়েছেন। নতুন বছরের শুরুতে এমন ভাবনা এবং (প্রতি রাতের) সলাতের পর উসামা বিন লাদেন হয়তো শত্রুকে ধ্বংস করার আরও নতুন উপায় খোঁজার আর প্রয়োজন অনুভব করেননি। অপরদিকে পশ্চিমে শ্যাম্পেইন নিয়ে পড়ে থাকা মাতাল মানুষগুলো না মনোযোগ দিয়েছিল উসামা বিন লাদেন কিংবা নিজেদের হারতে থাকা যুদ্ধের দিকে, না মনোযোগ দিয়েছিল পরদিন সকালের মাতলামি কাটানোর দিকে।

নতুন বছরের ব্যাপারটা আসলে সম্পূর্ণ ইতিহাসের ছোট্ট এক অংশমাত্র; পশ্চিমা এবং মুসলিম ক্যালেন্ডার একটি অপরটার সাথে খাপে খাপ মিলে না। কিন্তু আজকের এই যুগে যখন তারকাদেরকে সবচেয়ে বেশি ফোকাসে রাখা হয়, তখনও পশ্চিমা নেতা, পণ্ডিত এবং সেনাবাহিনী জেনারেলেরা তাদের জন্য একজন অসামান্য তারকার প্রতি নিতান্ত উদাসীনতা দেখিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য উসামা বিন লাদেনকে হলিউড, ক্রীড়া কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মতো স্রেফ আরেকজন তারকা বললে অনেক বড় একটি ভুল হবে। বরং উসামা বিন লাদেন হলেন অদ্বিতীয়, এবং একজন মহাকাব্যের মতো। পশ্চিমের উদাসীনতা হয়তো এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, সমসাময়িক তারকাদের বেশিরভাগই বড়জোর মাঝারি মানের হয়। হয়তো পশ্চিম এবং বিশেষ করে আমেরিকার নেতারা উসামা বিন লাদেনকে স্রেফ আরেকজন গুন্ডা ধরনের মনে করেছিল; তাঁকে ধরে নিয়েছিল একজন আরব Al

Capone, একজন “খারাপ মানুষ” হিসেবে। অবশ্য এই ধরনের শ্রেণিকরণ আমেরিকানদের জন্য খুবই স্বাভাবিক এবং আরামদায়ক। কেননা বহু বছর যাবৎ তারা মনের মধ্যে লালন করে এসেছে যে, অপরাধী মাত্রই তাকে ‘আইন এবং শাসন’ (Law and Order) দিয়ে বশ করে ফেলা যাবে। এই ব্যাপারটা সেইসব আমেরিকানদের ক্ষেত্রেও সত্য হয়ে ধরা দেয়, যাদেরকে শেখানো হয় – ইতিহাস কেবল অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি মহৎ ও নিরপেক্ষ ফ্যাক্টরের মাধ্যমেই রচিত হয়, আর ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষ স্রেফ এই ধরনের শক্তি দিয়েই পরিচালিত হয়ে থাকে। অথচ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যাদেরকে ইতিহাসের রচয়িতা কিংবা মহৎ ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রায়ন করা হয়, অনেকক্ষেত্রেই তারা আসলে খলনায়ক কিংবা প্রতারকও ছিল; উদাহরণস্বরূপ সেইসব মৃত, শ্বেতাঙ্গ, নারীবিদ্বেষী, ক্রীতদাস বানানো বর্ণবাদীদের কথা বলা যেতে পারে, যাদেরকে আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের জনক বলে ডাকা হয়।

একজন তারকা হওয়া সত্ত্বেও উসামা বিন লাদেনও তেমনই “মহৎ ব্যক্তিত্ব”-দের একজনই ছিলেন। এটা বললেই বরং সঠিক হয় যে – গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ, সরকার এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে একক যেকোনো ব্যক্তির তুলনায় উসামা বিন লাদেন অধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁর কার্যক্রম আমেরিকান জনগণকে নিজেদের সরকারের সক্ষমতা নিয়ে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে; কখনও সেই সংশয় পৌঁছে গিয়েছে ‘আমেরিকান সরকার আদৌ জনগণকে নিরাপত্তা দিতে চায় কিনা’ – সেই প্রশ্নে। উসামা বিন লাদেন আমেরিকান জনগণের মধ্যে তাদের সরকারের সমস্ত স্তরে পুলিশি ক্ষমতার উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের মধ্যে নিজেদের প্রতিবেশি, অভিবাসী এবং পর্যটকদের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমেরিকানরা নিজেদের সেনাবাহিনীকে একসময় ‘পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ’ বলে মনে করতো, খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। উসামা বিন লাদেন সেই সেনাবাহিনীকে একটা বিশাল সম্পদখেকো দানব হিসেবে প্রমাণ করে ছেড়েছেন, যেটা কিনা যুদ্ধ জেতা ছাড়া আর সবই করতে পারে। সর্বোপরি তিনি এক ধর্মীয় যুদ্ধ শুরু করেছেন, যে ব্যাপারটাই আজকের পশ্চিমাদেরকে একেবারে বিভ্রান্ত করে দেয়।

আমার মতে এই সমস্তকিছু আমেরিকার নেতৃবৃন্দের উসামা বিন লাদেনকে না বোঝা থেকেই উৎসরিত। আর এর ফলস্বরূপ তারা এটাও বুঝতে অক্ষম ছিল যে, কীভাবে তিনি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মুসলিমকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেন; তাও আবার এমন এক যুদ্ধে, যেটাকে কিনা তিনি আমেরিকার প্রতিটি শহরে, নগরে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন বুনেছেন। নেতারা যদি সত্যিই বুঝে থাকতো, তাহলে তারা আমেরিকান জনগণকে

শেখানো শুরু করে দিতো যে, উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর ভক্ত অনুসারীরা আমেরিকার শক্তিকে এক অচল অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন; নেতারা শেখাতো যে, তাঁদেরকে (বিন লাদেন ও তাঁর যোদ্ধাদেরকে) গণহারে 'গুটিকয়েক অপরাধী', 'অনৈসলামিক', 'ধ্বংসবাদী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে আদতে ভুল উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি নেতারা জনগণকে জানিয়ে দিতো, আল-কায়েদার যে পরাজয় আজ আমেরিকার বাঁচামরার প্রশ্ন, সেটা আর যাই হোক – সুনিশ্চিত হওয়ার ধারেকাছেও নেই।

যে যুগটাকেই 'বিন লাদেন যুগ' বলে ডাকা যায়, সেই যুগের পুরো সময় জুড়ে আমরা ব্যক্তিটির সম্পর্কে আন্দাজে ভুল ধারণা করে নিজেদেরকে স্বস্তির এক মিথ্যা অনুভূতি দিয়েছি; আমরা এক ভিত্তিহীন বিশ্বাস নিজেদের মনে গেঁথে নিয়েছি যে, (সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে পশ্চিমই সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। পশ্চিমের ভুল ধারণা পরিমাপ করার সবচেয়ে ভাল পন্থাটা হলো এখনও বিদ্যমান কিছু অনুমানের দিকে নজর দেওয়া, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমা প্রশাসনগুলো তাদের শত্রুকে বিচার করেছে। উদাহরণস্বরূপ – তারা সবসময়ই নিজেদেরকে এই বলে কিছুটা আশ্বস্ত করে এসেছে যে, উসামা বিন লাদেন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আলিম নন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষার কারণে অনেকে তো তাঁকে প্রতারক বলেই উড়িয়ে দেন। পণ্ডিত মাইকেল কলিন্স (Michael Collins Dunn) এই ব্যাপারটাকে উল্লেখ করেছিলেন, "তাঁর একজন আলিম হওয়ার দাবি বড় আকারে প্রশ্নবিদ্ধ।" [681] ২০০৫ সালে স্টিভ কোল তাঁকে আবদুল্লাহ আযযামের মতোই একজন উচ্চাকাঙ্খী "সক্রিয় ধর্মতত্ত্ববিদ" বলে আখ্যায়িত করেন। [682] অধ্যাপক খালেদ ফাদল লিখেছিলেন যে, উসামা বিন লাদেন নাকি "নিজেকে ধর্মতত্ত্ববিদ এবং মুফতি বলে মনে করেন, অথচ দু'টোর কোনোটিতেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।" [683] ২০০৬ সালের শেষের দিকে ওয়েস্ট পয়েন্টের Combating Terrorism Center থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণায় ঘোষণা করা হয় যে, "উসামা বিন লাদেন বিশ্বব্যাপী ইসলামি জিহাদের একজন সামনের সারির প্রতীক হতে পারেন, কিন্তু ইসলাম নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় তিনি অখ্যাত অনেক আলিমের চেয়েও কম যোগ্যতা রাখেন।" [684]

---

681 Michael Collins Dunn, "Usama bin Laden: The nature of the challenge", Middle East Policy, Vol. 6, No. 2 (October 1998), p. 25.

682 Coll, Ghost Wars, p. 269.

683 Fadl, "The Crusader."

684 "Bin Laden not top Islamist thinker: Study", Reuters, 16 November 2006.

এই ব্যাপারে অধিকাংশই একমতে পৌঁছে গিয়েছে যে – যেহেতু তাঁর ইসলামের ব্যাপারে, ইসলামের দায়িত্বের ব্যাপারে নিজে থেকে কর্তৃত্বশীল হয়ে (আলিমদের মতো) কোনো কথা বলতে পারবেন না, অতএব মুসলিমরা তাঁকে অনুসরণও করবে না।

এমন ধারণা স্বস্তিদায়ক হলেও একেবারেই ভুল। উসামা বিন লাদেন কখনোই নিজেকে আলিম হওয়ার দাবি করেননি; বরং সময়ে সময়ে তিনি নিজের ২০০০ সালের আগস্ট মাসে দেওয়া বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেছেন, "আমার কাজ নেতৃত্ব দেওয়া নয়, বরং অনুসরণ করা... আমি সবসময়ই ইসলামের গণ্যমান্য অনেক আলিমদের থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে থাকি।" [685] আর আশেপাশের অনেকের দ্বারাই তাঁর নিজের এই মূল্যায়ন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শাইখ মূসা আল-কারনি বলেছিলেন, "শরিয়াহ সম্পর্কে তাঁর কিছু জ্ঞান আছে। সেইসাথে তিনি সেইসব প্রাতিষ্ঠানিক আলিমদের পরামর্শ নেন, যাদের ওপর তিনি নিজে আস্থা রাখেন... তিনি নিজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো মুফতি নন... আর তিনি নিজেকে মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলিমদের চেয়ে যোগ্য ভাবেনও না।" [686]

সত্য হলো, উসামা বিন লাদেন বারংবার নিজের আলিম হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন; উল্টো তিনি সবসময়ই নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন "আল্লাহর একজন নগণ্য বান্দা" হিসেবে, যিনি কিনা "মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলিমদের"-কে প্রশাসনগুলো নীরব করে রাখার কারণেই প্রকাশ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। আল-কায়েদার এই নেতার জীবনী নিয়ে বিস্তারিত কাজ করা প্রথম চারজন সাংবাদিকদের একজন শেরিফ ঔয়াযাই (Cherif Ouazai) লিখেছিলেন, "তিনি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা জানেন। আর সেই কারণেই তিনি নিজের আশেপাশে ইমাম এবং আলিমদেরকে রাখতেন।" [687] এছাড়া এই সত্যটাও জোর দিয়ে উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদার ধর্মীয় আলিমদের কমিটি রয়েছে, বিভিন্ন দায়িত্বেও অনেক আলিমরা রয়েছেন; এমনকি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যোগ্য মুখপাত্রও রয়েছেন। প্রথমদিকে ছিলেন সুলাইমান আবু গাইস, যিনি এখন (২০১০-২০১১) সম্ভবত ইরানে আটক আছেন; আর এখনকার মুখপাত্র হলেন আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি। তাছাড়া সেই ১৯৯০ থেকেই উসামা বিন লাদেন গোপনে সৌদি আরব সহ মুসলিম বিশ্বের অনেক আলিমদের থেকে বারংবার পরামর্শ নিয়ে এগিয়েছেন।

---

685 "Interview of Usama bin Ladin", Ghazi Magazine, 20 August 2000, and "Interview with Usama bin Laden", Takbeer, 5–12 August 1999, p. 22.

686 Al-Dhiyabi, "Interview with Shaykh Musa al-Qarni, Part 2."

687 Ouazai, "The bin Laden mystery."

উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে এই একটি প্রচলিত ধারণাকে যদি এভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অন্যান্য ধারণাগুলোর অবস্থাও কেমনই বা হবে? তাঁর ব্যাপারে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ কিংবা মুসলিম সমালোচকদের যতজনই লিখেছেন, তাদের প্রায় সবাই-ই তাঁকে 'মৌলিক চিন্তাশীল' না হওয়ার অভিযোগ দিয়ে খাটো করতে চান (ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি যে এটা সৌদি ন্যারেটিভেরও একটি অন্যতম উপাদান)। স্টিভ কোল দাবি করেছিলেন যে উসামা বিন লাদেনের "দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সবসময়ই সীমিত ছিল।" হাশিম আল-মাক্কি উল্লেখ করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক সক্ষমতায় "দুর্বলতা" হিসেবে। লরেন্স রাইট বলেছিলেন, উসামা বিন লাদেন নাকি "নিজেকে কখনোই একজন চমৎকার কিংবা মৌলিক চিন্তার অধিকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেননি"। পাকিস্তানের প্রয়াত গোয়েন্দা কর্মকর্তা খালিদ খাওয়াজা তো তাঁকে কেবল "প্রতিভাবান কেউ নন" বলেই ক্ষান্ত হননি, সাথে "তেমন বুদ্ধিমানও নন" বলে দিয়েছিলেন। খালেদ ফাদল বলেছিলেন, উসামা বিন লাদেন নাকি "স্বচ্ছ এবং সামঞ্জস্য ধরে রাখা চিন্তাধারর অধিকারী কেউ না।" এবং বিন লাদেনের ব্যাপারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের সম্পাদক ব্রুস লরেন্স উপসংহার টেনেছিলেন যে, তিনি আদৌ "মৌলিক চিন্তাশীল" কিংবা "কুরআনের অসাধারণ আলিম" কেউ নন। [688] সৌদির (তৎকালীন) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ বলেছিলেন যে, উসামা বিন লাদেন নাকি শুধু একজন "বোকা মানুষ"-ই নন, বরং বিদেশি কোনো গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট, খাওয়ারিজদের মতো ইসলামের শত্রু যারা রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর "মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একে দুর্বল করে তুলেছিল এবং শত্রুদেরকে সহায়তা করেছিল।" [689]

এবং পরিশেষে, প্রিন্স বান্দার বিন সুলতান – যিনি বর্তমানে (২০১১) সৌদির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা – তিনি উসামা বিন লাদেনকে বর্ণনা করেছিলেন অতি সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে, যাকে "আমার কাছে কোনো নেতা হওয়ার মতো বলে মনে হয়নি... আমার কাছে মনে হয়েছিল সে আটটা হাঁস নিয়ে রাস্তাটাও পার হতে পারবে না।" [690]

---

688 Coll, The Bin Ladens, p. 406; "Welcome in Yemen, bin Laden, but!"; Wright, The Looming Tower, p. 152; Bergen, The Osama bin Laden I Know, p. 55; Fadl, "The Crusader"; Lawrence, Messages to the World, p. xvi.

689 Raid Qusti, "Bin Laden an intelligence agent", http://www.arabnews.com, 21 September 2006, and "Naif calls al-Qaeda Khawarij", Arab News (Internet version), 17 March 2010.

690 Quoted in PBS Frontline, http://www.pbs.org, 11 October 2001.

এমন বর্ণনাসম্পন্ন একজন মানুষ পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তির বিরুদ্ধে প্রায় দেড় যুগ ধরে যুদ্ধ পরিচালনা করলে সেটা আমার কাছে অলৌকিক বিষয়ই মনে হতো; তাও আবার কেবল নিজে বেঁচে থেকেই নয়, বরং সেই পরাশক্তিকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিয়ে। কিন্তু এই কথাগুলো তো আজকে উল্টো প্যাঁচাল এবং দেশপ্রেমহীনতা বলেই ধরা হবে; কেননা এমন আলাপ "আমেরিকার আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিজয়"-এর দিবাস্বপ্নে সংশয় ঢুকিয়ে দেয়। উসামা বিন লাদেনের "মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী না হওয়া" অভিযোগটির অকাট্য এক জবাব হলো, "তাতে কী হয়েছে?" একেবারে মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী কয়জন রয়েছে? মহান কিছু সম্পাদন করতে মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া কি বাঞ্চনীয়? জেফারসন (Jefferson) তো সবসময়ই বলে গিয়েছেন যে, স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে কিছু উদ্ভাবন করেননি; বরং পুরোনো ধারণা এবং তত্ত্বগুলোর ওপরেই কাজ করেছিলেন মাত্র। অলিভার হোমসের (Oliver Wendell Holmes) মূল্যায়নে রুসভেল্টের (Franklin Roosevelt) মস্তিষ্ক ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির, কিন্তু তার স্বভাব ছিল প্রথম শ্রেণির। [691]

উসামা বিন লাদেনের ক্ষেত্রে, একেবারে মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী না হওয়াটা বরং ছিল তাঁর শক্তিশালী দিক। মৌলিক চিন্তাচেতনা তো মৌলিক সব ধ্যানধারণার জন্ম দেয়, কিন্তু সাধারণ মানুষকে সেগুলোর বেশিরভাগই তেমন অনুপ্রাণিত করতে পারে না। আইন্সটাইনের চিন্তাভাবনার মৌলিকত্ব খুব অল্প মানুষই সত্যিকারে উপলব্ধি করতে ও মূল্যায়ন করতে পারে। উসামা বিন লাদেন যা সম্পন্ন করতে চেয়েছেন, সেটার হিসেবে তাঁর মস্তিষ্ক একেবারে যথার্থই বলা যায়। কুরআন এবং হাদিসের ওপর তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। তাছাড়া একজন দক্ষ বক্তা হিসেবে তিনি খুব সহজেই ১.৩ বিলিয়ন মুসলিমদের সাথে ভাবনার বিনিময় করে ফেলতে পারতেন; সেই সাথে নিজের কথা ও কার্যক্রমকে যাচাই করার জন্য মুসলিমদের পরিচিত মাপকাঠি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিল প্রমাণও তিনি দিয়ে দিতেন। [692]

---

691 Thomas Jefferson (১৭৪৩ - ১৮২৬) ছিলেন একজন আমেরিকান রাজনীতিবিদ, কূটনৈতিক এবং আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। তিনি আমেরিকার ৩য় রাষ্ট্রপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর Franklin Roosevelt ছিলেন আমেরিকার ৩২তম রাষ্ট্রপতি। আমেরিকায় যেহেতু তাদেরকে অনেক সম্মানের চোখে দেখা হয়, তাই লেখক এমন উদাহরণগুলো এনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহান কিছু সম্পাদন করতে সবসময় মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়।

692 Lawrence, Messages to the World, p. xvi.

সৌদির ভিন্নমতালম্বী লেখক আবদুল্লাহ আর-রশিদ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সৌদি আরব সহ গোটা মুসলিম বিশ্বের সালাফিদের মধ্যে উসামা বিন লাদেনের নিরঙ্কুশ সমর্থন বরং তাঁর চিন্তাধারায় নতুনত্ব না থাকার কারণেই হয়েছে। নতুনত্বের দিকে না ঝুঁকে বরং তিনি "ইসলামের আবহমানকাল ধরে চলে আসা পূর্বসূরীদের বার্তাই দিয়েছেন বলে আজকের মুসলিম প্রজন্ম তাঁকে এতটা আপন করে নিয়েছে।" [693]

মৌলিকত্ববিহীন উসামা বিন লাদেন অন্যান্য গুণে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ বক্তা। বার্নার্ড লুইসের ভাষায় বললে, ক্লাসিক্যাল আরবিতে ছন্দময় "এমনকি কখনও কাব্যিক ধাঁচের" কথাতেও পারদর্শী – আরব বিশ্বে প্রভাবশালী নেতা হওয়ার জন্য আজও যে গুণটাকে অপরিহার্য উপাদান বলে গণ্য করা হয়। [694] এছাড়া সমসাময়িক বিশ্বে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো সম্পর্কেও উসামা বিন লাদেন যথেষ্ট ধারণা রাখতেন, সবসময় আপডেট থাকতেন এবং নিজের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সময় সমকালীন তথ্যাদির ওপরই নির্ভর করতেন। তিনি নিজের ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতীয়তা এবং বিভিন্ন ভাষার মানুষদের এমন এক সংগঠন পরিচালনা করতেন, যা মুসলিম বিশ্বে অনন্য। তাঁর মধ্যে একইসাথে ঠান্ডা মাথায় লাভ-ক্ষতির হিসেব কষা একজন ঝানু ব্যবসায়ী এবং সুচতুর একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দেখা যায়।

উসামা বিন লাদেনের ধৈর্য্য, চাপের মধ্যেও দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় ছিল অনন্যসাধারণ। আর এই বিষয়গুলো তাঁকে কেবল দীর্ঘদিন টিকে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই সাহায্য করেনি, সাথে নিজের করে ফেলা ভুলগুলোর মধ্যেও তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, জাজিতে নিজের যোদ্ধাদেরকে পরিপূর্ণরূপে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগেই সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া; প্রিন্স তুর্কি এবং সৌদির গোয়েন্দারা সৌদ পরিবারের ওপরে ইসলামকে প্রাধান্য দিবে বলে মনে করা, সৌদি আরবে বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি রেখে আসার পর সেগুলো বাজেয়াপ্ত হতে দেখা; সুদানের স্বার্থপর নেতা হাসান আত-তুরাবিকে বিশ্বাস করা; World Islamic Front against Crusaders and Jews গঠন করে ইসলামপন্থীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা এবং ইরাকে আবু মুসআব আয়-

693 Abdallah al-Rashid, "Will option of containment succeed? Al-Qaida is dragging [the Saudi] government into a war of legitimacy", Shu'un Sa'udiyah (Internet version), 4 July 2004.

694 Bernard Lewis, "License to kill", Foreign Affairs, Vol. 77, No. 6 (November/December, 1998), p. 14.

যারকাউয়িকে আল-কায়েদার প্রধান বানানো... এইসমস্ত কাজ পরবর্তীতে ভুল বলে গণ্য হলেও উসামা বিন লাদেন সেগুলোর মধ্যেও ফায়দা বের করে এনেছিলেন।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হলো, উসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিগত জীবন ও আচার আচরণে ইসলামের ইতিহাসের বীরদের, বিশেষ করে সালাহউদ্দিন আল-আইয়ুবির বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। আর সালাহউদ্দিনের ব্যাপারে তো জেমস রেস্টন জুনিয়র (James Reston Jr.) লিখেছেন, "এমন একজন ব্যক্তি, যাকে দেখলে বোঝা যায় ভাল মুসলিম বলতে আসলে কী বোঝায়।" [695]

উসামা বিন লাদেন এমন একজন কিংবদন্তী, যা সব সংস্কৃতিতেই বিরল। তিনি নিজের বিশ্বাসের জন্য লড়াই করতে গিয়ে বিলিয়নিয়ার লাইফস্টাইল ত্যাগ করেছেন, বেশিরভাগ সময়ই পৃথিবীর রুক্ষ সব জায়গায় যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক, উদার এবং সাহসী মানুষ। তিনি সততার সাথে আচরণ করতেন। আর কথা বলতেন এমন ভঙ্গিতে, যা অনায়াসেই তাঁর শ্রোতাদের মনে স্বস্তি ও অনুপ্রেরণা জোগাতো। তাঁর পোশাক ছিল শালীন, আচরণ সশ্রদ্ধ। ধনী ও ক্ষমতাসীনদের সাথে যেমন মিশতে পারতেন, তেমনটাই পারতেন গরিবদের সাথেও।

University of Wichita-এর আইন বিভাগের অধ্যাপক লিয়াকত আলী খান লিখেন, "উসামা বিন লাদেনকে যেকেউ একজন কিংবদন্তী হিসেবে দেখতে পারবে; এমনকি রবিন হুডের চেয়েও বড় আকারের কিংবদন্তী... শত্রুর দৃষ্টিকোণ থেকেও এমন মানুষকে শ্রদ্ধা করা যায়, যার গল্প নটিংহ্যামের সীমানা ছাড়িয়ে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সভ্যতাকেও অতিক্রম করে ফেলে। আইনবিরোধী মানুষের জন্য আইনের বাইরের আইন খুঁজে ফেরা এবং সন্ত্রাসের মধ্যেও ন্যায়কে কেন্দ্রে স্থান দেওয়াই যদি প্রতিভা বলে বিবেচিত হয়, তাহলে উসামা বিন লাদেন সার্থক। তিনি তো বলেছেন যে, তিনি বিদেশি শত্রুদের বিরুদ্ধে, নব্য ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আর তা ফিলিস্তিনিদের কাছে, যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের কাছে, এমনকি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছেও খুবই বিশ্বাসযোগ্য। আর যদি আইনবিরোধী মানুষের জন্য নিজের আইনবিরোধিতার স্বপক্ষে জনপ্রিয় বয়ান দাঁড় করানোই হয় প্রতিভার পরিচয়, তবুও উসামা বিন লাদেন সার্থক।" [696]

---

695 Reston, Jr., Warriors of God, p. 95.

696 Liaquat Ali Khan, "Who is feeding the Bin Laden legend", http://www.thedailystar.net, 28 December 2004.

উসামা বিন লাদেন তাঁর নিজস্ব কার্যক্রমের ঐতিহাসিক সামঞ্জস্যতার ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। তাঁর বক্তব্যে-আলোচনায় ইসলামের ইতিহাস এবং বীর নায়কদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারটাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মুসলিম জনসাধারণের বিশাল অংশ সুশিক্ষিত না হলেও তারা নিজেদের দ্বীনের ইতিহাস, বিশেষ করে ইসলামের সামরিক বিজয়ের ইতিহাস সম্পর্কে যতটা জ্ঞান রাখে, ততটা পশ্চিমের সাধারণ জনগণ নিজেদের সম্পর্কে রাখে না। সাপ্তাহিক খুতবাহ, বয়ান ইত্যাদির মাধ্যমে শতাব্দীকাল ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের ইতিহাস সাধারণ মুসলিমদের মাঝে উজ্জীবিত রাখা হয়েছে। মুসলিমরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনেও এগুলো নিয়ে আলাপচারিতায় অভ্যস্ত।

উসামা বিন লাদেন নিজেকে সেই ইতিহাসের অংশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একইসাথে তিনি ব্যাপারটাকে আরও জরুরি ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। তাঁর কথায় ও কাজে পশ্চিমা আগ্রাসন এবং মুসলিমদের নিজেদের সরকারের নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির কারণে মুসলিমদের মনের কোণে জমে থাকা ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বিন লাদেনের দীর্ঘদিন টিকে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণে মুসলিমদের এক বিশাল অংশই তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পেরেছে। এই ব্যাপারটা একজন লেখকের ভাষায় ফুটে উঠেছে এভাবে, "তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা এমন এক সময়ে জিহাদের পতাকা উত্তোলনের জন্য পছন্দ করেছেন, যখন সমস্ত মুসলিমরাই নিজেদের থেকে এবং নিজেদের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।" [697] তাই বলি, আল্লাহ উসামা বিন লাদেনকে একটু বেশি মৌলিক এক মস্তিষ্ক দিলে আমেরিকা সহ গোটা পশ্চিমের জন্য বরং ভালই হতো। কেননা তখন তিনি এমনসব কথাবার্তা বলতেন, যা খুব কম লোকই বুঝতে পারতো।

তৃতীয় প্রচলিত ধারণা হলো, উসামা বিন লাদেন সহ অন্যান্য জিহাদপন্থীরা যুদ্ধ জয়ের পর কী করবেন – সেসম্পর্কে নাকি কোনো চিন্তাভাবনাই রাখেন না, শাসনব্যবস্থার কোনো পরিকল্পনাই নাকি তাঁদের নেই। উদাহরণস্বরূপ, উসামা বিন লাদেনের প্রথমদিকের জীবনীকার জোনাথান র‍্যান্ডেল লিখেছিলেন যে, "তিনি প্রশাসন পরিচালনার মতো পার্থিব বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না।" [698] এমনকি মাইকেল ভ্লাহোসও এক্ষেত্রে ভুল উপসংহার টেনে

697 "11 September and some doubts", Open Source Center, 5 May 10.

698 Randall, Osama, p. 14.

বলেছিলেন যে, উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা নাকি "জনগণ যে সমস্যার সমাধান চাইছে, তা দিচ্ছে না।" আর তাই মুসলিমরা নাকি "আল-কায়েদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের জন্য নতুন রোল মডেল এবং বাস্তব ফলাফল খুঁজতে শুরু করেছে।" [699]

সত্যটা আসলে ঠিক এর বিপরীত। উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর প্রবীণ সহকর্মীদের মনে যুদ্ধপরবর্তী প্রশাসন পরিচালনা বরং এক অন্যতম ভাবনাই ছিল। আবদুল্লাহ আর-রশিদ লিখেছেন, "এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, আল-কায়েদা নতুন এক শাসনব্যবস্থার ভিত রচনা করছে।" তাঁর মতে, যদিও সব দলিল প্রমাণ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, উসামা বিন লাদেন বিশ্বাস করতেন 'শত্রুর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটা টেকসই সরকার গঠনের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত'। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারটাকেই ভুল বুঝে বসে। [700] ২০০৩-এর জানুয়ারিতে আবদুল্লাহ আর-রশিদ তাঁর পাঠকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, উসামা বিন লাদেন কিন্তু বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্ত আরব শাসকদেরকে সরিয়ে বৈধ রাজনৈতিক এবং শরিয়াহভিত্তিক প্রশাসন গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে যারা আন্তরিক, বিশেষ করে যেসকল আলিমদেরকে জনগণ মেনে চলে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন তারা এই স্বৈরাচারী আরব শাসকদের ক্ষমতার বাইরে নিরাপদ কোথাও গিয়ে সংঘবদ্ধ হন। এরপর তারা যেন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) নিয়ে এমন একটি পরিষদ গঠন করেন, যাদের কাজ হবে ঐসব শাসকদের শারঈ অবহেলা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অথর্বতার কারণে সৃষ্ট শুন্যস্থান পূরণ করা।" [701]

নথিপত্রের রেকর্ডও আবদুল্লাহ আর-রশিদের পক্ষেই যায়। ARC থেকে প্রকাশিত বিবৃতিগুলো ছাড়াও অন্যান্য অনেক বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকারে উসামা বিন লাদেন সৌদি প্রশাসন সহ অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসকদেরকে পর্যাপ্ত পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদানে গাফেলতির অভিযোগ করেছেন। এমনকি ১৯৯৬ সালে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাপত্রেও উসামা বিন লাদেন এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কীভাবে এই যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বে আরও উন্নত শাসনব্যবস্থা নিয়ে আসবে। তিনি লিখেছিলেন, "আজকে আমরা কথা, কাজ এবং আলোচনা শুরু করছি সাধারণভাবে গোটা মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষভাবে দুই পবিত্র মসজিদের ভূমিতে যে দুর্দশা নেমে

---

699 Vlahos, Fighting Identity, pp. 69 and 127.

700 Al-Rashid, "Will option of containment succeed?"

701 Al-Rashid, "Will option of containment succeed?"

এসেছে, সেই ব্যাপারে। আমরা সেইসব পন্থা নিয়ে অধ্যয়ন করতে চাই, যেগুলো অবলম্বন করে এই ভূমিগুলোর প্রকৃত মালিকদের অধিকার পুনর্বহাল করা সম্ভব হয়। কেননা আজকে মানুষ তাদের দ্বীন এবং জীবন নিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন। তাও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ – বেসামরিক, সামরিক, নিরাপত্তা কর্মী, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র এবং পাশ করে বেকার থাকা যুবক – এককথায় সেইসব শত সহস্র মানুষ যারা সমাজের এক বিস্তৃত অংশ দখল করে রয়েছে। তাছাড়া একই দুর্দশা নেমে এসেছে কৃষি কিংবা শিল্পের সাথে জড়িত লোকজন, গ্রাম কিংবা শহরের লোকজন এবং মরুভূমি কিংবা জনপদের লোকজনের ওপরও... মানুষ তাদের জীবিকা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে। অর্থনৈতিক পতন, উচ্চ মূল্য, বিশালাকার ঋণ, (অপরাধ করে বা না করেও) কারাগারগুলো মানুষে ভর্তি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা আজকের সমাজে ব্যাপক এবং সীমাহীন হয়ে পড়েছে।” [702]

দ্বীনদার, মেধাবী লোকদের অবশ্যই শরিয়াহভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা শুরু করতে হবে, যার মাধ্যমে সমস্ত মুসলিমের জন্যই সুদিন ফিরে আসবে। ১৯৯৮-এর বসন্তে বিন লাদেন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন, “ধর্মীয় এবং বাস্তবিক – উভয় দিক থেকেই রাজারা এবং শাসকেরা তাদের বৈধতা হারিয়েছে।” তাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ এবং মেধাবী বান্দাদের দায়িত্ব হলো একটি পরিষদ গঠন করা, যাতে “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিচালনা করে দখলদার শক্তিকে বিতাড়িত করা যায়” এবং যাতে শাসনক্ষমতাকে ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করে শরিয়াহর ভিত্তিতে প্রশাসন গঠন করা যায়। [703] সাথে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছিলেন যে, এই কাজ মোটেই তাঁর একার নয়; বরং আরও ব্যাপক পরামর্শের বিষয়। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “নেককার ব্যক্তিদের মধ্যে যারা এই বিষয়টা নিয়ে উদ্বিগ্ন, উদাহরণস্বরূপ আলিমগণ, এমন নেতৃবর্গ যাদেরকে মানুষ ভালবাসে এবং মেনে চলে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব এবং প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের উচিত এই স্বৈরাচারী আরব শাসকদের ক্ষমতার বাইরে নিরাপদ কোথাও গিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়া; এবং তাদের মধ্যকার আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদদের নিয়ে এমন একটি পরিষদ গঠন করা, যাদের কাজ হবে ঐসব শাসকদের

---

702 OBL, “Declaration of war on the United States”, Al-Islah (Internet), 2 September 1996.

703 OBL, “Letter from Kandahar”, Associated Press, 16 March 1998; “Bin Ladin urges jihad and expulsion of U.S. forces from the Gulf”, Al-Quds al-Arabi, 23 March 1998, p. 4.

শারঈ অবহেলা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অথর্বতার কারণে সৃষ্ট শুন্যস্থান পূরণ করা। একজন ইমাম নির্ধারণ করা উম্মাহর অধিকার। আর ইমাম যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, বিশেষ করে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) বা বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি পাওয়া গেলে তাকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকারও উম্মাহর রয়েছে।" [704]

একবার সমবেত হয়ে যাওয়ার পর, এই পরিষদের সদস্যরা সেইসব "আন্তরিক আলিম, দাঈ, চিন্তাবিদ এবং লেখকদের তালিকা করবেন, যারা উম্মাহর জন্য কল্যাণের উপদেশ দিতে সক্ষম"। তারা আলোচনা করবেন কীভাবে প্রশাসনকে পুনর্গঠন করা যায় এবং উম্মাহর ওপর চেপে বসা "ব্যর্থ নেতৃত্বের" পঙ্গুত্বকে দূর করা যায়। আজকে মুসলিমদের প্রয়োজন "সতিকারের সৎ, স্বাধীন, শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব যারা সমসাময়িক বিষয় এবং শরিয়াহর ফিকহ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।" কেবলমাত্র তখনই মুসলিমদের ওপর হওয়া জুলুম এবং আগ্রাসনকে নির্মূল করা এবং "দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং অসুস্থতার বিস্তার" ঠেকানো সম্ভব হবে। এই ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন যতটা সম্ভব, সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসলিমদের উপস্থিতির ব্যাপারেও জোর দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের প্রত্যেক ব্যাপারে একমত হওয়া জরুরি না; আর চিন্তাগত ত্রুটিবিচ্যুতিও এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বরং সেই ত্রুটিগুলো টুকে নিয়ে আবারও পরামর্শ করতে হবে।" এই ব্যাপারে তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাই হলেন নিখুঁত। আর সৃষ্টির মধ্যে আম্বিয়াগণই হলেন মাসুম। সাধারণ মানুষ ভুল করে এবং তাকে উপদেশ দেওয়া হয় কীভাবে তা ঠিক করা যায়। কিন্তু কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সবার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য ফেলে রাখা যাবে না। সকলের ঐক্যমত হওয়ার জন্য বসে থাকার মানে হলো যখন "কোনো আলিমই আর দ্বিমত করবেন না" (যা অসম্ভব)। আর যারা "আলিম গণ্য হওয়ারই যোগ্য না" তাদের কথা তো বাদই। [705]

এছাড়াও উসামা বিন লাদেন মুসলিমদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, দখলদার কাফির এবং স্বৈরাচারী আরব শাসকদেরকে হটানোর পর অনৈসলামিক বিশ্বের সাথে মুসলিমদের

---

704 . OBL, "Message to the Muslim nation", Islamic Studies and Research Center (Internet), 4 March 2004; এছাড়া দেখুন – "Interview with Usama bin Laden", 23 December 1998; OBL, "Letter from Kandahar", Associated Press, 16 March 1998; and Yusufzai, "Interview with Osama bin Laden", 4 January 1999.

705 OBL, "Practical steps for the liberation of Palestine", Al-Sahab Media, 14 March 2009.

আচরণবিধি কীরূপ হবে, সেই ব্যাপারে যেন আগেই চিন্তাভাবনা করে রাখা হয়। মুসলিমরা এক বৃহত্তর পৃথিবীর অংশ; আর তাই তাদেরকে পুরো পৃথিবীর সাথে রাজনৈতিকভাবে আচরণ করতে হবে। কাফিরদের সাথে সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা ঠিক আছে, কিন্তু তা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণস্বরূপ, উসামা বিন লাদেন "আন্তরিক মুসলিমদেরকে, বিশেষ করে আলিম, দাঈ এবং ব্যবসায়ীদের" প্রতি আহ্বান করেন যেন তারা "সেইসমস্ত পরিসংখ্যান এবং সমীক্ষার ফায়দা নেন, যেগুলোতে উঠে এসেছে যে ইউরোপের মানুষ শান্তি চায়।" মুসলিম নেতৃবৃন্দের উচিত "পরিষদ গঠন করে ইউরোপের লোকদেরকে আমাদের যুদ্ধের কারণগুলো, বিশেষ করে প্রথমত ফিলিস্তিনের ব্যাপারে জানানো... আর এক্ষেত্রে উচিত আধুনিক মিডিয়ার বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো।" [706] এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, একই ধরনের কাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। নিজের শ্রোতাদেরকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "আমরা এই দ্বীনের পঞ্চাদশ শতকে অবস্থান করছি। এই দ্বীনে একজনের সাথে আরেকজনের লেনদেন কীভাবে হবে, আল্লাহর প্রতি মুমিনদের হক কী কী, যুদ্ধ কিংবা শান্তিতে ইসলামের ভূমির সাথে কুফরের ভূমির আচরণবিধি কীরূপ হবে – ইত্যাদি সবকিছু স্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমরা আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে, যুদ্ধে এবং শান্তিতে মুসলিম জাতির সাথে অন্যান্য জাতির অনেক প্রকার আচরণই প্রসিদ্ধ রয়েছে – চুক্তি থেকে শুরু করে বাণিজ্য সবকিছুই। তেলের ক্ষেত্রে বলতে চাই, তেলের দাম নির্ধারিত হবে বাজার অনুযায়ী। আমরা বিশ্বাস করি, তেলের আজকের বাজারদর অবাস্তব কেননা সৌদি প্রশাসন আমেরিকার দালাল হয়ে কাজ করছে এবং বাজারকে এমনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে, যার ফলে তেলের মূল্যমান অনেক কমে গিয়েছে।" [707]

অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণার বিপরীতটাই সঠিক। আর সেটা হলো – উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা এবং অন্যান্য জিহাদপন্থীরা এক নতুন ইসলামি সমাজব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর গড়ার চেষ্টা করছেন।

পশ্চিমা সমালোচকরা আসলে তাকালেই দেখেন যে, ইসলামপন্থীদের হাতে কোনো সংবিধান নেই, কোনো সাংসদীয় কার্যব্যবস্থা নেই, কোনো দলিলপত্র কিংবা প্রশাসনিক কাগজপত্র নেই। সহজভাষায় বললে, একটি রাষ্ট্রগঠন এবং এর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু

---

706 OBL, "Message to our neighbors north of the Mediterranean", Al-Arabiyah Television, 15 April 2004.

707 Arnett, "Osama bin Ladin: The interview", 12 May 1997.

তারা অত্যাবশ্যক মনে করেন, তার কিছুই তারা খুঁজে পান না। অথচ কুরআন সুন্নাহই যদি মুসলিম বিশ্বের সামাজিক কাঠামো এবং প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হয়ে না থাকে, তাহলে আর কী যথেষ্ট হবে? ঠিক যেমনটা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত সালাফি আলিম আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি বলেছেন, "পবিত্র কুরআনের শাসন ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে উসামা বিন লাদেন এই উম্মাহকে আবারও সম্মানিত করতে চান।" [708] আল-মাকদিসির কথার সাথে মিল রেখে বার্নার্ড লুইস কুরআনকে মোটামোটি দুই ভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন: এক. কীভাবে বিদ্যমান (কুফরি) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়, দুই. কীভাবে শক্তির একত্রীকরণ করে একটি শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই ব্যাপারে দিকনির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনীর মাক্কী যুগের দিকে নির্দেশ করে লুইস লিখেছেন যে, "সেই সময়ে (নাযিলকৃত) কুরআনের আয়াতগুলো বিদ্যমান (কুফরি) শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা-বিদ্রোহ, এমনকি কারও কারও ভাষায় বললে বিপ্লব ধারণ করে।" কিন্তু হিজরত পরবর্তী সময়ের তথা মাদানি যুগের আয়াতগুলোর "মূল বিষয়বস্তু ছিল শাসনকার্য পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়াদি।" [709]

এছাড়াও কুরআনে এবং সুন্নাহতে স্বৈরাচারের পতনের পরবর্তী কিংবা কোনো অঞ্চল বিজয় পরবর্তী মূলনীতি ও করণীয় একেবারে বিস্তারিতই রয়েছে। আর সেগুলোর ওপর ইসলামের ইতিহাসের পূর্বসূরীরা আমলও করে গিয়েছেন; বিশেষ করে মুহাম্মাদ সা., তাঁর সাহাবারা রদি. এবং তাঁদের ঠিক পরবর্তী প্রজন্ম – যে তিন প্রজন্মকে উসামা বিন লাদেন সহ বেশিরভাগ মুসলিমরাই "শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম" হিসেবেই বিশ্বাস করেন, তাঁরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সফল উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। ইসলামের এই প্রথমদিকের প্রজন্মদের রেখে যাওয়া কথা ও কাজকে উসামা বিন লাদেন "জ্ঞানের উৎস" বলে অভিহিত করেন। আমরা পশ্চিমে যারা রয়েছি, তাদের কাছে হয়তো এই উৎস থেকে গড়ে ওঠা ইসলামি শাসনব্যবস্থা তেমন পছন্দ হবে না; কিন্তু সেকারণে আমাদের নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়াও উচিত না। উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সঙ্গীদের অবশ্যই যুদ্ধ পরবর্তী প্রশাসন গঠনের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে; তাও সেটা এমন এক প্রশাসন (শরিয়াভিত্তিক), যা এক বিশাল সংখ্যক মুসলিমের কাছেই তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিবে।

---

708 Abu Muhammad al-Maqdisi, "Obama's speech versus Osama's speech", http://al-faloja.org/vb/, 12 June 2009.

709 Bernard Lewis, "Freedom and justice in the modern Middle East", Foreign Affairs (Internet version) (May/June 2005).

এবং পরিশেষে, সবচেয়ে আত্মঘাতী কিন্তু প্রচলিত ধারণা হলো, উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা নাকি আমেরিকার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে, কেননা তারা নাকি কাফিরদের তুলনায় মুসলিমদেরকেই বেশি মারছে। ডেভিড কিলকুলেন (David Kilcullen), ম্যারি হ্যাবেক (Mary Habeck) এবং লরেন্স রাইটের মতো লেখকরা এই ধারণাকে রীতিমতো ঐক্যমতে রূপ দিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন। তারা ব্যাখ্যা করেছেন যে, উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তালেবান সহ অন্যান্য জিহাদি দল তাকফিরি চিন্তাধারা লালন করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, তাকফির করা মানে হলো "কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা।" যাই হোক, এই বহুল প্রচলিত ধারণাও আমেরিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ; কেননা আমেরিকার আফগানিস্তান যুদ্ধের কৌশলই গঠন করা হয়েছে এমন ধারণার ওপর ভিত্তি করে। এজন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ(!) ডেভিড কিলকুলেনের অত্যধিক পঠিত বই 'The Accidental Guerrilla'-কে।

২০০৯ সালের শেষের দিকে এই প্রচলিত ঐক্যমতটি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল। আর কারণ ছিল সেসময় ওয়েস্ট পয়েন্টের সন্ত্রাস দমন সেন্টার থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা। সেই গবেষণায় ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত আল-কায়েদার আক্রমণে কতোজন মুসলিম হত্যার শিকার হয়েছিল, সেইসব তথ্য ফোকাস করা হয়েছিল। মিডিয়ার অনেকেই সেই গবেষণার ফলাফলকে একেবারে আল-কায়েদার পতনের আলামত হিসেবে দেখেছিল; সেই গবেষণাকে তারা নিয়েছিল 'আল-কায়েদার যুদ্ধ তো আদতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে' বলে চালিয়ে দেওয়ার অন্যতম দলিল হিসেবে।

আল-কায়েদার আক্রমণগুলোয় পশ্চিমের পাশাপাশি মুসলিমদেরও কমবেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ঠিক। তাছাড়া এখনও এই যুদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত ভূখন্ডেই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু আরও প্রাসঙ্গিক হতো, যদি ২০০৪ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে আমেরিকার বাহিনী এবং এর মিত্রদের আক্রমণের ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কিংবা শুধুমাত্র ইরাক ও আফগানিস্তানে মুসলিমদের প্রাণহানির হিসেব করা হতো। এটা কি নিশ্চিতভাবেই অনুমেয় না যে, West Point-এর সমীক্ষায় যে ৪৫০ জন মুসলিমকে আল-কায়েদার দ্বারা নিহত দাবি করা হয়েছে, সেই সংখ্যাটা আসলে তার চেয়ে অনেক কম? এছাড়া ইসরাঈলের দ্বারা লেবাননে (২০০৬) এবং গাযায় (২০০৮) কতো সংখ্যক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা কি আসলেই বিশ্বাস করে যে, মুসলিমরা বোঝেই না কে তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে – আল-কায়েদা ও এর মিত্ররা নাকি প্রেসিডেন্ট মুবারাক, আলজেরিয়ার জেনারেলরা এবং আলে সৌদরা?

সমস্যার গোড়া হলো, পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা ইসলামি শরিয়াহর একটি সাধারণ মূলনীতিকে সর্বযুগের সমস্ত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িয়েছেন। আর সেই সাধারণ মূলনীতিটি হলো "একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমকে হত্যা করা নিষিদ্ধ"। এটিকে একেবারে অকাট্য ধরে নিয়ে যেকোনো মুসলিমেরই এর থেকে বিচ্যুতি ঘটামাত্র পশ্চিমা পণ্ডিতরা তাকে "তাকফিরি" আখ্যা দিয়ে বসেছেন। অথচ এই ব্যাপারটা একেবারেই অযৌক্তিক। এটা অনেকটা এরকম বলার মতো যে, (২য় বিশ্বযুদ্ধে) জার্মান এবং জাপানিজ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের রুখে দাঁড়ানো এবং নাস্তানাবুদ করা উচিত হয়নি কারণ (বাইবেলের) "প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করো", "কখনও হত্যা করো না" ইত্যাদি একেবারে সমস্ত সময় এবং সমস্ত প্রেক্ষাপটে অকাট্যভাবে প্রযোজ্য। অথচ আমরা নিজেরাও জানি যে, এই মূলনীতিগুলো এমন অকাট্য কিছু নয়। নইলে উসামা বিন লাদেন কিংবা কোনো মুসলিমের জন্য আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করাও তো বৈধ হতো না। তাছাড়া এমন হলে নবি সা. এবং তাঁর সাহাবারাও রদি. নিজেদের প্রতিরক্ষা করতেন না, আর ফলস্বরূপ জন্মলগ্নেই ইসলামের সমাধি রচিত হয়ে যেত।

স্পষ্টতই কুরআন এবং হাদিসের উক্ত মূলনীতিকে চূড়ান্তভাবে অকাট্য বোঝানো হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, West Point-এর গবেষণার ফলাফল যখন প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়টাতে সৌদি এবং ইয়েমেনের প্রশাসন গোলাবারুদ, বিমান এবং হেলিকপ্টার দিয়ে ইয়েমেনের সুন্নি এবং শিয়া উভয়কেই গণহারে হত্যা করছিল। অথচ সৌদির সরকারি আলিম কিংবা পশ্চিমের পণ্ডিতরা – কারও কাছ থেকেই কিন্তু বিন্দুমাত্র অভিযোগ আসেনি। অনুরূপভাবে, ১৯৯০-১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে যখন সৌদির মুফতিগণ আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বিষয়কে (মুসলিম হত্যা) বৈধ ঘোষণা করলো, তখন তো সৌদির মুসলিম বাহিনী কাফির বাহিনীর সাথে মিলে ইরাকি মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যা করেছিল। এবং পরিশেষে, কুরআন এবং হাদিসে যদি এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ থাকে, তাহলে আফগানিস্তান প্রশাসনের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর মোট প্রায় চার লক্ষ সদস্যকে ওয়াশিংটন এবং ন্যাটো কীভাবে অন্যান্য আফগান-অনাফগান মুসলিমদেরকে হত্যার জন্য প্রশিক্ষণ দিলো?

"ইসলামি সমরনীতি" সম্পর্কে আমি ইংরেজিতে যতো উৎস থেকে অধ্যয়ন করেছি, অবাক করা হলেও তাতে পশ্চিমের সমরনীতির সাথে অনেক সাদৃশ্যই খুঁজে পেয়েছি। উভয় ক্ষেত্রে নিয়্যাতই হলো মুখ্য। একইভাবে পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা, বিজয় এবং যুদ্ধের বৈধতার ধারণাতেও উভয় সমরনীতির মধ্যে মিল রয়েছে। তবে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির

ক্ষেত্রে ইসলামে আদৌ পশ্চিমের মতো এত অনুপাত বজায় রাখার পাড়াপাড়ি আছে কিনা, সেটা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। বিশেষ করে ১৯৪৫ পরবর্তী সময়ে, জাপানের পরাজয়ের পর থেকে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির অনুপাত কম রাখার জন্য আমেরিকার এত বাড়াবাড়ির কারণে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হতে হয়েছে। [710] ইসলামি সমরনীতি এবং পশ্চিমা সমরনীতি - উভয়টিতেই অপ্রয়োজনীয় বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে চলার ব্যাপারে তীব্র উদ্বেগ দেখা যায়। কিন্তু কোনোটাতেই সেজন্য একেবারে যুদ্ধকেই এড়িয়ে যাওয়া, কিংবা চূড়ান্ত বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানকে থামিয়ে রাখা হয় না। আর ইসলামের সমরনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত আলিমরাই ঐক্যমত যে, কোনো মুসলিম (ব্যক্তি বা দল) অপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের হয়ে কাজ করলে, কাফিরদের সাথে মিলে যুদ্ধ করলে কিংবা সমর্থন দিলেও সেই মুসলিম হত্যাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সালাফিজম বিশেষজ্ঞ কুইনটন উইকটরোউইকয (Quintan Wiktorowicz) লিখেন, "কোনো আলিম যদি কাউকে (মুসলিমকে) সুস্পষ্টভাবে আমেরিকার সেনাবাহিনীর আগ্রাসনে সহায়তাকারী হিসেবে বিবেচনা করেন, তাহলে সেই মুসলিমের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের সেইসমস্ত দলিলগুলোই অধিক প্রযোজ্য হয়, যেগুলোতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহায়তাকারীর বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর ইসলামের সমস্ত আলিমরাও এই ব্যাপারে ঐক্যমত যে, এমন ব্যক্তি টার্গেট হিসেবে বৈধ।" [711] [712]

---

710 আমেরিকা আসলেও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির অনুপাত কম রাখতে চায়, নাকি স্রেফ যুদ্ধের বৈধতা কিংবা কৌশলের উচ্চমার্গীয় কথাবার্তা বলে-কয়ে ইমেজ ধরে রাখার ক্যাম্পেইন করে, সেটাও খতিয়ে দেখার বিষয়।

বিভিন্ন সমীক্ষা অনুসারে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল শতকরা ৫০ থেকে ৬৭ ভাগ পর্যন্ত। ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, স্রেফ ইরাকেই আমেরিকার আরোপ করা অবরোধে মোট ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার 'শিশু' মৃত্যুবরণ করেছিল। আর বেসামরিক নারী-পুরুষ ছিল আরও ৪ লক্ষ। ২০১৮ সালে Global Research : Centre for Research on Globalisation থেকে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে উঠে এসেছিল, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭৩ বছরে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী ২-৩ কোটি মানুষ হত্যা করেছে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিল আমেরিকান ইতিহাসবিদ জেমস এ লুকাস। আমেরিকার পঞ্চাশ ভাগ সামরিক টার্গেট হওয়ার দাবি মেনে নেওয়া হলেও বেসামরিক সংখ্যাটা থেকে যায় এক থেকে দেড় কোটি। অর্থাৎ, লেখক মাইকেল শইয়ার আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের যে মানসিকতাকে 'বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির অনুপাত কম রাখার বাড়াবাড়ি' বলে উল্লেখ করেছেন, সেটার ন্যুনতম সংখ্যাটা এক থেকে দেড় কোটি।

711 Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi movement."

712 লেখক বোঝাতে চাইছেন যে, মুজাহিদদের দ্বারা যেসমস্ত মুসলিম হত্যার অভিযোগ আনা হয়, তাদের এক বিরাট অংশ বাহ্যিকভাবে 'মুসলিম' বলে গণ্য হলেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা তথা 'তাওয়াল্লির' প্রমাণ পাওয়া গেলে তারা বৈধ টার্গেটে পরিণত হয়। আর এই ব্যাপারটা হিসেবে রাখলে মুজাহিদদের দ্বারা বেসামরিক মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত সংখ্যাও অনেকখানি কমে আসে।

আমি পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করেছি যে, উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরা কখনোই তাকফিরি চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন না এবং তারা সবসময়ই এমন চিন্তাধারার লোকদের সাথে প্রকাশ্যে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। সৌদির শাসকদেরকে উদ্দেশ্য করে উসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, ‘‘আমরা গণহারে তাকফির করি না। আর আমরা অবহেলা করে মুসলিমদের রক্তও ঝরাই না। কিন্তু যদি মুজাহিদদের কোনো অপারেশনে কিছু মুসলিম নিহত হয়ে যায়, তাহলে তা বৈধ বিষয়েরই আওতাভুক্ত।’’ [713] এছাড়াও আমরা দেখেছি যে, সুদানে এবং আফগানিস্তানে উসামা বিন লাদেন নিজেও একাধিকবার স্বঘোষিত তাকফিরি গুপ্তঘাতকদের টার্গেট হয়েছিলেন।

তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহকর্মীরা তাকফিরি অভিযোগটিকে খুব গুরুত্বের সাথেই নিতেন। আর তাঁরা এমন অভিযোগকে কখনোই প্রকাশ্যে শক্তভাবে রদ করতে ছাড়েননি। তাঁরা জানতেন যে, এই ধরনের একটি আখ্যা মুসলিদের মাঝে তাঁদের সমর্থন এবং আবেদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমনটা আলোচনা করা হয়েছিল, আল-কায়েদার জন্য ৯/১১ পরবর্তী সবচেয়ে বড় কৌশলগত হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইরাকে আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির তাকফিরি ধ্যানধারণা ও কার্যক্রম। এভাবে আল-কায়েদার নিজস্ব একজনই সংগঠনটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছিল এবং ইরাকে ওয়াশিংটন আর তার মিত্রদেরকে আরও বড় ধরনের ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও নির্মম পরিহাস হলো, আমেরিকা কর্তৃক যারকাউয়ির হত্যাকান্ড ইরাকে আল-কায়েদার পতনকে ঠেকিয়ে দিয়েছিল, এবং সেখানে সংগঠনটিকে পুনর্গঠনের সুযোগ করে দিয়েছিল।

উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর সহযোদ্ধারা যদি তাকফিরি না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা আসলে কী? অবশ্যই উসামা বিন লাদেনের ক্ষেত্রে ‘ওয়াহাবি’ এবং ‘সালাফি’ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগই বেশি, কিন্তু আমার মতে ‘সালাফি’ শব্দটাই বেশি মানানসই। অধ্যাপক খালেদ ফাদল সালাফি ধারা এবং ওয়াহাবি ধারার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য নিরূপণ করেছেন; আর তা হলো ‘‘ওয়াহাবি ধারা বৈচিত্র্য এবং মতপার্থক্যের প্রতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম সহনশীল।’’ [714] উদাহরণস্বরূপ, সৌদি ওয়াহাবি ধারার আচরণে নিজেদের প্রতি এমন এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়; একইসাথে ভিন্ন ধারার প্রতি এবং অনারবদের প্রতি এক

713 OBL, “Statement to Saudi rulers”, http://www.jihadunspun.com, 16 December 2004.

714 Khaled Abou El Fadl, “Islam and the theology of power”, Middle East Report No. 221 (Winter 2001), p. 32.

ধরনের অবজ্ঞা এবং অসহনশীল আচরণও দেখা যায়। আর সেরকমটা আল-কায়েদার মধ্যে থাকলে তা সংগঠনটির আভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট করতো।[715] কুরআন, হাদিস এবং ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের কথা ও কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ উসামা বিন লাদেনকে সালাফি শ্রেণিতে ফেলে। এই চিন্তাধারা সুন্নি ইসলামের সর্বাধিক জনপ্রিয় না হলেও দ্বীনদারিতার জন্য এটি সর্বমহলেই কমবেশি সম্মানিত। আর অবশ্যই এই চিন্তাধারা ইসলামের বৈধ মতপার্থক্যেরই একটি। তাছাড়া এই সালাফি চিন্তাধারা "মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইসলামি আন্দোলনেরও উৎস"; যা কিনা ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার পুরুষ নারী সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।[716] ইসলামের প্রথম যুগের প্রতিষ্ঠাতাদের কার্যক্রমকে ভিত্তি করে উসামা বিন লাদেনের (সাধারণভাবে সমস্ত সালাফিদের) এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে আমেরিকানদের বোঝানো সহজ হতে পারে সেইসব নাগরিকদের উদাহরণ দিলে, যারা বিশ্বাস করে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা অবশ্যই এর প্রতিষ্ঠাতাদের "মূল উদ্দেশ্যকে" ভিত্তি করে হতে হবে।

সৌভাগ্যবশত, বিদ্বান পন্ডিতদের বেশ কয়েকজনই ৯/১১ পরবর্তী সালাফি ধারা নিয়ে অসাধারণ কিছু কাজ করেছেন। তারা সালাফি চিন্তাধারাকে আরও স্পষ্ট শ্রেণিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই কাজে অগ্রবর্তী ছিলেন কুইনটন উইকটরোউইকয। তার মতে, সালাফিরা মোটামোটি তিন ধরনের:

---

715 প্রকৃতপক্ষে সকল চিন্তাধারার লোকদের মধ্যেই চরমপন্থা, দলান্ধতা ইত্যাদি রয়েছে। আবার উদারপন্থা, আন্তরিকতাও কমবেশি সকল দলের কিছু সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান। তাই এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে ওয়াহাবি এবং সালাফি – দুটো ভিন্ন ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা বিশুদ্ধ নয়। সালাফি দাবিদারদাররা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে নিজেদের একজন ইমাম হিসেবেই গণ্য করে থাকে। তাছাড়া সালাফি দাবিদার এবং ওয়াহাবি দাবিদারদের আকিদাহ, মূলনীতি ইত্যাদি মুখ্য বিষয়গুলোতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

যে কারও মধ্যে কুরআন-সুন্নাহের দলিল প্রমাণ ছাড়া স্রেফ নিজের অনুসৃত ধারার কারণে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবণতা দেখা গেলে তা 'হিযবিয়্যাহ' বা দলান্ধতা বলে গণ্য হয়। একইভাবে স্রেফ আরব হওয়ার কারণে অনারবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা উল্টোটা কারও মধ্যে দেখা গেলে তা আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতি বলে বিবেচিত হয়। আর ইসলামে উভয়টিই বাতিল।

716 Quintan Wiktorowicz, "Framing jihad: Intra-movement framing contests and al-Qaeda's struggle for sacred authority", International Review of Social History, Vol. 49 (2004), p. 159, and Assaf Moghadam, "Motives for Martyrdom", International Security, Vol. 33, No. 3 (Winter 2008/2009), p. 63.

এক. সালাফি বিশুদ্ধতাবাদী (Salafi Purists) – এই সালাফিরা হলেন মূলত সেইসব আলিমগণ, যারা কুরআন-হাদিস এবং ইসলামের অন্যান্য উৎস নিয়ে গবেষণা করেন; ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন একাডেমিক কিতাবাদি রচনা করেন, যাতে মুসলিমরা নিজেদের দ্বীন বুঝতে এবং মেনে চলতে পারে; এবং সচরাচর জনসাধারণ থেকে দূরে দূরে একপ্রকার নির্জনতা অবলম্বন করে চলেন। মুসলিম শাসকদের ক্ষেত্রে তারা গোপনে উপদেশ দেওয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, শাসককে প্রকাশ্যে কিছু বলা কিংবা প্রশাসন বিরোধী কোনোপ্রকার উস্কানির ঘোর বিরোধিতা করেন এবং সহিংসতা চরমভাবে ঘৃণা করেন। এই বিশুদ্ধতাবাদীরা মূলত সৌদি প্রশাসনের ধর্মীয় কার্যক্রমের সাথে জড়িত, এবং সালাফিদের মধ্যে এরাই মোটামোটি প্রবীণতম গোষ্ঠী। [717]

দুই. সালাফি রাজনৈতিক (Salafi Politicos) – এই শ্রেণির সালাফিরা মনে করেন যে স্রেফ একাডেমিক অধ্যয়ন আর শাসককে পর্দার আড়ালের পরামর্শই আলিমদের দায়দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যায় না; বরং ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে অহিংস গণআন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। এই সালাফি রাজনৈতিকদের মূল আবির্ভাব ঘটে ১৯৯০ সালে তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি বিন বায ফাতওয়া দিয়ে আমেরিকা এবং পশ্চিমের বাহিনীকে আরবের ভূমিতে আসার বৈধতা দেওয়ার পর। উসামা বিন লাদেনের বন্ধু শাইখ সফর আল-হাওয়ালি সেই ফাতওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, সেটা ছিল আরব উপদ্বীপে কাফিরদের ঔপনিবেশ গড়ার অনুমোদন। [718]

তিন. সালাফি জিহাদি (Salafi Jihadist) – এই সালাফিরা দাবি করেন, বিশুদ্ধতাবাদীরা শাসকদের প্রতি অতি অনুগত এবং একপ্রকার পরাধীন; আর রাজনৈতিকদের সমসাময়িক ইস্যু সম্পর্কে তুলনামূলক ভাল ধারণা থাকলেও সেগুলোর ব্যাপারে কিছু করার ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত ভীতু। [719] এই সালাফিদের আবির্ভাব ঘটেছে মূলত আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ চলাকালীন (১৯৭৯-১৯৯২) সময়ে। তারা ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিশুদ্ধতাবাদীদের

717 Wiktorowicz, “Anatomy of the Salafi movement.”

718 Wiktorowicz, “Anatomy of the Salafi movement.”

719 Wiktorowicz, “Framing jihad: Intra-movement framing contests and al-Qaeda’s struggle for sacred authority”, p. 170, and The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network, 2006.

একাডেমিক লিখালিখি সমর্থন করেন, সেইসাথে রাজনৈতিক সালাফিদের সংস্কারপন্থী গণআন্দোলনেরও সমর্থন দেন। কিন্তু এই জিহাদি সালাফিরা বিশ্বাস করেন যে, বিশুদ্ধ ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে এবং মুসলিমদেরকে আল্লাহর শাসনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আত্মরক্ষামূলক জিহাদ পরিচালনা করতে হবে; হোক সেই শত্রুরা কাফির কিংবা নামেমাত্র মুসলিম। জিহাদকে তারা এক প্রকার ইবাদাত এবং ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলে বিশ্বাস করেন; উসামা বিন লাদেনের ভাষায় বললে, "প্রকৃত ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর।" [720] এছাড়া সালাফি জিহাদিরা (বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানের) মুজাহিদ নেতাদেরকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়াকেই নিজেদের মূল দায়িত্ব বলে মনে করেন, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা সেখানে আসীন হওয়াকে নয়। তারা জিহাদের কমান্ডারদেরকে অস্ত্রশস্ত্র, টার্গেট নির্ধারণ, অপারেশনের কৌশল, বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। উসামা বিন লাদেনের ভাষায় এটা হলো "বাস্তব পরিস্থিতির ফিকহ"। [721]

সালাফিদের এইরূপ শ্রেণিকরণ [722] উসামা বিন লাদেনের আলোচনায় এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ উসামা বিন লাদেন সহজেই তৃতীয় শ্রেণি তথা সালাফি জিহাদিদের একজন হিসেবে পরিগণিত হন। ফলস্বরূপ, পশ্চিমের জন্য উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে

---

720 Quintan Wikand John Kaltner, "Killing in the name of Islam: Al-Qaeda's justification for September 11", Middle East Policy, Vol. 10, No. 2 (September 2003), p. 78; Joas Wagemakers, "A purist jihadi-Salafi : The ideology of Abu Muhammad al Maqdisi", British Journal of Middle Eastern Studies (Internet version), Vol. 36, No. 2 (August 2009); Moghhhadam, "Motives for Martyrdom", pp. 47 and 63; and The Arab Ansar in Afghanistan, Islamic Muhajirun Network, 2006.

721 এছাড়া উসামা বিন লাদেনের বাস্তবতাকে ব্যবহারের সক্ষমতা বুঝতে দেখুন OBL, "Lecture: The hadith of Ka'ab ibn Malik concerning the Tabuk expedition", c. March 2006.

722 কুইনটনের করা সালাফিদের শ্রেণিবিভাগ খেয়াল করলে দেখা যায়, তিনি মূলত শাসকের (প্রধানত সৌদির) একান্ত অনুগতদেরকে 'বিশুদ্ধতাবাদী' (Purist), সাহওয়ার অহিংস কর্মপন্থা বেছে নেওয়া সংস্কারপন্থীদেরকে 'রাজনৈতিক' (Politico) এবং জিহাদকে কর্মপন্থা হিসেবে বেছে নেওয়া সালাফিদেরকে একই নামে অর্থাৎ 'সালাফি জিহাদি' (Jihadist) নামকরণ করেছেন। তবে ইসলামি শরিয়াহর আলোকে দেখলে, পার্থক্যকরণের ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস আর কর্মপন্থাকে রাখলে বিষয়টি আরও বিশুদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেসব শাসকরা পরিপূর্ণ শরিয়াহ দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তাদেরকে কাফির বলা হবে কি হবে না – এই ব্যাপারটি কেন্দ্র করে একটি দ্বন্দ্ব হয়, যা বিশ্বাস বা আকিদাহগত দ্বন্দ্ব। আবার এমন শাসকদেরকে কাফির বা তাগুত আখ্যায়িত করা হলে, এরপর জমিনে কোন পন্থায় ইসলামি শরিয়াহ ফিরিয়ে আনার কাজ চলবে – সেটি আরেকটি দ্বন্দ্ব, যা কর্মপন্থা বা মানহাজগত দ্বন্দ্ব।

উপলব্ধি করার এবং তাঁদের সাথে কীভাবে কূটনৈতিক বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে এমন ভুল অবশ্যই করা যাবে না যে, তিনি এবং আল-কায়েদা তাকফিরি এবং ইসলামের বৈধ চিন্তাধারার বাইরে চলে গিয়েছেন। এমন চিন্তা করা হলে তা শুরুতেই এক মারাত্নক ভুল হবে। এটা ঠিক যে, সালাফি জিহাদি হওয়া ইসলামের কিংবা সালাফি চিন্তাধারারও একেবারে সামনের সারির কিছু হয়ে যাওয়া নয়। কিন্তু পশ্চিম যদি সত্যিই উসামা বিন লাদেনের প্রভাবকে দমন করতে চায়, তাহলে সাথে এটা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি একজন ভাল মুসলিম; এবং তাঁর থেকে ভিন্ন চিন্তাধারার মুসলিমদের এক বিশাল অংশের নিকটও তিনি একজন ভাল মুসলিম হিসেবেই সমাদৃত। আল-কায়েদার সামরিক নীতি নিয়ে হয়তো মুসলিমদের অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে, কিন্তু উসামা বিন লাদেন যে একজন ভাল মুসলিম – এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনোই সন্দেহ নেই। এমনকি সালাফি চিন্তাধারায় তাঁর বিশুদ্ধতাবাদী এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের (যদিও তারা কমবেশি প্রশাসনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, তবুও) অনেকেই তাঁকে বাতিল বলে দেন না। বরং তারা তাঁকে বেনেফিট অব ডাউট দেন এবং তাওবাহের দিকে আহ্বান করেন।[723]

উসামা বিন লাদেন যে ইসলামের ওপরেই আছেন এবং তাঁকে যে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে, এই ব্যাপারটাতে আরও জোর দিতে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসির মতামতও প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে বেঁচে থাকা জিহাদি তাত্ত্বিকদের মধ্যে শাইখ মাকদিসি অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রভাবশালী একজন, যাকে অনেকসময়ই সালাফি জিহাদিদের "মুফতি সাহেব" হিসেবে ডাকা হয়। তাঁর জন্ম ১৯৫৯ সালে পশ্চিম তীরের নাবলুসে। কৈশোরের সময় থেকেই তিনি সালাফি আলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীতে তিনি পর্যায়ক্রমে জর্ডান, কুয়েত এবং সৌদি আরব ভ্রমণ করেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী জিহাদ শুরু হলে তিনি পাকিস্তান চলে যান। সেখানে তিনি জিহাদ বিষয়ে লিখালিখি করতে শুরু করেন; এবং সেখানেই আবু মুসআব আয-যারকাউয়ির সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তীতে জর্ডানে উভয়ই গ্রেপ্তার হলে শাইখ মাকদিসি যারকাউয়ির প্রশিক্ষক হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পর ২০০৩-এ ইরাক যুদ্ধ শুরু হলে শাইখ মাকদিসি যারকাউয়ির চরমপন্থী কার্যক্রম ও পদ্ধতির সমালোচনাও করেন। ইরাকে আমেরিকা জোটের বিরুদ্ধে জিহাদরত অবস্থায় তাঁর এক সন্তান শহীদও হয়। ২০০৮-এর মার্চে জর্ডানের প্রশাসন তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু এটা লিখার সময়কার (২০১১) বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, জর্ডান পুলিশ শাইখ মাকদিসিকে আবারও গ্রেপ্তার করেছে।

---

723 Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi movement."

সালাফি জিহাদিদের মধ্যে শাইখ মাকদিসির মতামত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়ে থাকে; এমনকি সালাফি বিশুদ্ধতাবাদী এবং রাজনৈতিকদের অনেকেও তা গ্রহণ করে। এই মতামতগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো – গণতন্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র কুফরি ধর্ম হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা; বর্তমান আরব শাসকদেরকে পশ্চিমের দালাল আখ্যা দেওয়া; শাসকরা একমাত্র এবং পরিপূর্ণভাবে শরিয়াহ দ্বারা শাসন না করলে তাদেরকে তাগুত বলে ঘোষণা করা; সৌদি আরবকে দারুল হারব বলে ঘোষণা করা; গণহারে তাকফির থেকে বেঁচে থেকে সেই সমস্ত ব্যক্তি ও দলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাকফিরের সমর্থন দেওয়া, যাদের কাজ স্পষ্টভাবেই ঈমানকে নাকচ করে দেয়, উদাহরণস্বরূপ - মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের হয়ে কাজ করা বা সমর্থন দেওয়া; মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে কাফির রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ করে আমেরিকার সমস্ত চুক্তি এবং ঐক্যের অবসান ঘটানো, কেননা তারা ইসলামকে অস্বীকার করে; জিহাদ পরিচালনা কেবল শত্রুর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাথে উম্মাহর ঐক্যের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা; এবং পরিশেষে জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে ‘মন্দের উপর সত্যের বিজয়’-কে ফোকাস না করে বরং একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করাকে নির্ধারণ করা। [724]

সচেতন পাঠকেরা হয়তো খেয়াল করেছেন যে, শাইখ মাকদিসির ধর্মীয় মতামতগুলো মোটেই ইসলামের বাইরের কিছু নয়। তাছাড়া উসামা বিন লাদেনও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের দিকে আহ্বান করতে যেসব যুক্তিপ্রমাণ ব্যবহার করেন, সেগুলোর সাথেও শাইখ মাকদিসির বক্তব্য ও অবস্থান অনেকাংশেই মিলে যায়। শাইখ মাকদিসি অবশ্যই উসামা বিন লাদেনকে আলিম ভাবেন না। কিন্তু নিজ দ্বীনের একজন আন্তরিক সাহায্যকারী হিসেবে তিনি উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে কেমন ধারণা রাখেন? ২০০৯ সালে শাইখ মাকদিসির একটি প্রবন্ধের দুটো অনুচ্ছেদ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য –

> *“শাইখ উসামা বিন লাদেন হলেন এই যুগের মুজাহিদদের ইমাম। তিনি তাঁর দ্বীনকে সহায়তা করার জন্য যা কিছু করেছেন, তা কেবল কাফিররা এবং জালিম শাসকদের আনুগত্যকারী স্বার্থান্বেষী মুনাফিকরা ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এহেন সত্য তো কেবল সেইসমস্ত মূর্খ ভীরুরাই অস্বীকার করতে পারে – যারা নিজেদের দ্বীন এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশ জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞ, যারা দ্বীনের প্রতি উসামা বিন লাদেনের আন্তরিকতার*

724 Wagemakers, “A Purist jihadi-Salafi.”

জন্য আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা ও বিজয় দিয়েছেন তা নিয়ে ঈর্ষান্বিত। তাঁর সাথে দেখা করার সৌভাগ্য কখনও আমার হয়নি; যদিও আফগানিস্তানে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার পর আমি সংগঠনটির ক্যাম্পে এবং পরবর্তীতে পেশাওয়ারে এর আইনশাস্ত্র কেন্দ্রের লেকচারগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলাম।[725]

শাইখ উসামা বিন লাদেন আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং সেই সমস্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান, যারা উম্মাহর ভূমি দখল করেছে এবং সম্পদ লুটপাট করেছে। শাইখ উসামা নিপীড়িত নারী ও শিশুদের সুরক্ষা দিতে চান এবং বন্দীদের মুক্ত করতে চান। তিনি কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উম্মাহকে সম্মান এনে দিতে চান। তিনি হোয়াইট হাউসের উপরে সেই পতাকা উত্তোলন করতে চান, যেখানে লিখা থাকবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি সেই ইহুদি-ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়তে চান, যারা মুসলিমদের কাছ থেকে আল-আকসাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত, যারা এখনও শিশুহত্যা এবং আমাদের মা-বোনদের সম্মানহানি করার মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত। সহজ কথায়, শাইখ উসামা নববী পন্থায় একহাতে কুরআন এবং অপর হাতে অস্ত্র নিয়ে একটি ন্যায়নিষ্ঠ খিলাফাত প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।"[726]

এই সবকিছুই উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে হিংস্র তাকফিরি হওয়ার অপবাদ ঘুচিয়ে দেয়। তাছাড়াও আফগানদের প্রায় সবাই-ই তো সুন্নি ইসলামের খুবই শিথিল মাযহাব অনুসরণ করে; আবদুল্লাহ আনাসের ভাষ্যমতে, "তারা হানাফি মাযহাবের কঠোর অনুসরণকারী।" কিন্তু তবুও উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর অনুসারীরা তো আফগানিস্তানে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। অথচ তাঁরা কেবল সালাফিই নন, বরং ইসলামের চার মাযহাবের সবচেয়ে কঠোরটিই অনুসরণ করে থাকেন – যে মাযহাব ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল অষ্টম শতাব্দীতে গোড়াপত্তন করেছিলেন।[727]

---

725 "Response by Shaykh Abu Muhammad al-Maqdisi", http://www.alboraq.info, 3 April 2009.

726 Abu Muhammad al-Maqdisi, "Obama's speech versus Osama's speech", http:// al-faloja.org/vb/, 12 June 2009.

727 "Arab Afghan says Usama bin Ladin's force strength overblown."

আরও একবার আবদুল বারি আতওয়ানই সুস্পষ্ট ব্যাপারটা পশ্চিমা পণ্ডিতদের জন্য সহজ করে ব্যাখ্যা করে দিতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন,

> *“যে বিষয়টা আল-কায়েদাকে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মতো ইসলামপন্থী সংগঠনগুলো থেকে অনন্য করে তুলেছে, তা হলো – সংগঠনটির আদর্শিক নমনীয়তা এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা। আল-কায়েদার নেতৃত্বের নিজস্ব তাত্ত্বিক অবস্থান সালাফি হলেও সংগঠনটির ছাদ অন্যান্য মাযহাব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও জায়গা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত।*
>
> *আল-কায়েদার সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে ওয়াহাবি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বালি, হানাফি – এক কথায় সকল ঘরানার মানুষই রয়েছে। এমনকি তাদের অনেকে তো এমনও আছেন, যাদের চিন্তাধারা ও কার্যক্রম সালাফি চিন্তাধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক; উদাহরণস্বরূপ, আফগান মুজাহিদদের অন্যতম নেতা ইউনুস খালিস। তিনি তো ছিলেন একজন সুফিবাদী, যিনি বরকতের আশায় বুজুর্গ ব্যক্তিদের মাজারও জিয়ারত করতেন। আর এটি উসামা বিন লাদেনের ওয়াহাবি-সালাফি চিন্তাধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। সংগঠনটির এহেন উদারতার একমাত্র ব্যতিক্রম হলো শিয়া ভাবধারা। আল-কায়েদা শিয়াদের কট্টর বিরোধী, কেননা সংগঠনটি শিয়া মতবাদকে ইসলামবিরোধী বলে মনে করে।”* [728]

---

728 Atwan, The secret history of al-Qaeda, p. 233.

আজ-কাল

যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, উসামা বিন লাদেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে রয়েছেন (জানুয়ারি, ২০১১)। যদিও নিঃসন্দেহে তিনি সর্বদা কঠিন অস্তিত্ব সংকটের মধ্যেই থাকেন এবং পশ্চিমের লাগাতার পিছু ছোটা তাঁকে ক্রমশ নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। তাঁর অবশিষ্ট দিন পরিমাপ করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা এবং আচরণ পরিমাপ করা যায়। আমেরিকাই আল-কায়েদার প্রধান টার্গেট হিসেবে বহাল থাকবে, কিন্তু কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাবে মুসলিমদেরকে জিহাদের দিকে আহ্বান করা। আমেরিকাকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেওয়ার পর আল-কায়েদা পর্যায়ক্রমে মনোযোগ দিবে আরবের স্বৈরশাসন উৎখাত ও ইসরাঈলকে ধ্বংস এবং সবশেষে শিয়াদের সাথে দফারফা করার দিকে। তবে উসামা বিন লাদেন কিন্তু কখনোই এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি যে, তিনি এই পরিকল্পনার সমস্ত কাজ শেষ করার মতো যথেষ্ট সময় বেঁচে থাকতে চান।

আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উসামা বিন লাদেন এমন এক যুদ্ধের প্রত্যাশা করেছিলেন, যা হবে মূলত সাম্রাজ্যকে ক্রমশ দুর্বল করার এবং যে যুদ্ধ যুগ যুগ ধরে চলবে; আর এজন্য তিনি আগেভাগে পরবর্তী পরিকল্পনাও করে রেখেছেন। ৯/১১-এর কিছু সময় পর জিহাদকে বহুপ্রজন্মব্যাপী এক সাধনা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, মশাল হস্তান্তর করা হচ্ছে। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা আমাদের যৌবনকাল থেকে লড়াই করে আসছি" আর তার বিপরীতে "সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর পর মুসলিম যুবকদের ওপরই ভরসা করে আছে" যাতে তাঁরা একইরকম আত্মত্যাগ জারি রাখে। ৯/১১ পরবর্তী সময়ে উসামা বিন লাদেনের ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নীরবতার অন্যতম একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি এবং আযযাম আল-আম্রিকির মতো আল-কায়েদার পরবর্তী প্রজন্মকে আল-কায়েদার শ্রোতাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন।[729]

তাই প্রশ্ন হলো, এই নতুন প্রজন্মের আল-কায়েদা কীরূপ হুমকি হয়ে উঠতে পারে? এখানে মনে রাখতে হবে, এই প্রজন্ম গঠিত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে ইরাক, চেচনিয়া, উত্তর ককেশাস, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, মিন্দানাও, কাশ্মির ও আফগানিস্তানের

---

729 OBL, "Message to Muslim youth", Markaz al-Dawa (Internet), 13 December 2001.

সশস্ত্র বিদ্রোহগুলো থেকে, এবং সেইসাথে শিক্ষা নিয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং উত্তর নাইজেরিয়ার চলমান তালেবানিকরণ থেকে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ মোটামোটি তিনটি প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করে। প্রথমত, এই উদীয়মান প্রজন্ম আগের প্রজন্মের চেয়ে আরও বেশি নিবেদিতপ্রাণ, আরও বেশি পেশাদার এবং স্বল্প দৃশ্যমান হবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রজন্মে আরও বেশি সংখ্যক, বেশি কার্যকরী এবং সম্ভাবনাময় সৈন্যদল গড়ে উঠবে। এবং তৃতীয়ত, তারা অধিক শিক্ষিত হবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি – বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র এবং তথ্য প্রযুক্তিতে পারদর্শী হবে।

তাছাড়া সহজলভ্য স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট ভিডিও স্ট্রিমিং সাইটগুলো ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিম সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণাকে আরও গভীর এবং বিস্তৃত করে তুলছে। ইরাকে, ফিলিস্তিনে এবং আফগানিস্তানে পশ্চিমা আগ্রাসনের হাত ধরে আসা যুদ্ধের একেবারে রিয়েল টাইম ভিডিওগুলোর প্রভাবকে পশ্চিমা কূটনৈতিক কিংবা সামরিক/গোয়েন্দা বাহিনী কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে নতুন নতুন কঠোরতর সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন; সেই সাথে গুয়েন্তানামো বে, আবু গারিব এবং বাগরামের বন্দিদের ব্যাপারে লোমহর্ষক সব কাহিনী পশ্চিমবিরোধী মনোভাবকে আরও দৃঢ় করে তুলছে। দুইটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মের মৌলিকিকরণ ইতোমধ্যেই মৌলবাদী ইসলামের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে আফ্রিকার মিলিট্যান্ট খ্রিস্টবাদ নতুন করে ইসলাম বনাম খ্রিস্টবাদের ঐতিহাসিক সংঘর্ষকে (ক্রুসেড) জীবন্ত করে তুলছে, যার ফলে উভয় পক্ষেই একরকম প্রতিরক্ষা এবং হুমকির আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

এই নতুন প্রজন্মের ব্যাপ্তি ঠিক কতোটা বৃহৎ? সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই মুশকিল, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমা কর্তৃপক্ষ এই প্রজন্মের পূর্বসূরীদের ব্যাপ্তিকে কিন্তু ছোট করে দেখেছিল। অফিসিয়াল হিসেবমতে এখনও পর্যন্ত (২০১১) আল-কায়েদার ক্ষয়ক্ষতি মোটামোটি ৫০০০-৭০০০ এর মধ্যে; সেই সাথে ধারণা করা হয় যে সংগঠনটি এর নেতৃবৃন্দের প্রায় দুই তৃতীয়াংশকে হারিয়েছে। বারংবার 'অস্তিত্বই নেই' বলে অভিহিত করা কোনো সংঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলো কিন্তু বিশাল।

অপরদিকে আমেরিকার অসাধারণ(!) গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে যোগ করতে হয় যে, আল-কায়েদার অধিকাংশ নেতৃত্ব হারানোর কারণ ছিল তাদের কমবেশি অসচেতনতা। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালি খান, খালিদ শেখ মুহাম্মাদ এবং শাইখ আল-লিবি প্রমুখরা ইসলামপন্থী হিসেবে অনেকবেশি অতিসজ্জিত, সার্বজনীন – এককথায় অনেকবেশি

রোমাঞ্চপ্রবণ ছিলেন। তাঁদের কাজকর্মে বেপরোয়া ভাব ছিল, যেন কোনো বুলেট কিংবা কারাগারই তাঁদের জন্য না। তাঁরা যে আটক হয়েছিলেন, সেটার এক বিরাট অংশই ছিল বিপদের ব্যাপারে তাঁদের ভাবলেশহীনতার কারণেই। আজকের সময়ে, আল-কায়েদা তার নতুন প্রজন্মের মুজাহিদদেরকে পুরোনোদের হয়ে যাওয়া ভুলগুলো অধ্যয়ন করে সেখান থেকে শিক্ষা নিতে বলে। আজকের প্রজন্মকে দীক্ষা দেওয়া হয় যে, পশ্চিমের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে "নিরাপত্তার ইস্যুই" সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে। আল-কায়েদার এক নেতা সংগঠনটির নতুন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, "যতদিন না পর্যন্ত ইসলামি আন্দোলন নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত বিজয় তার আগমনের জন্য আবশ্যক এই উপাদানটির অভাবেই রয়ে যাবে।" [730]

আল-কায়েদা এবং তার মিত্ররা ক্রমশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই তাদের সদস্য সংগ্রহ করছে, যারা কিনা সহজেই পশ্চিমের রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং যারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকেও আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। [731] যোদ্ধাদের টেকনিশিয়ানরা এমনসব দূরপাল্লার বিস্ফোরক (IED) এবং গাড়িবোমা উৎপাদন জারি রেখেছে যেগুলো কিনা আমেরিকার ট্র্যাকার বা জ্যামারকেও ফাঁকি দিতে পারে। নিঃসন্দেহে আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিগুলো একে একে যোদ্ধাদের প্রযুক্তির কাছে হার মানছে। এর ওপর আল-কায়েদার রসদ সরবরাহকারী এবং প্রশিক্ষকরা ইয়েমেন, থাইল্যান্ড, সোমালিয়া এবং পাকিস্তানের যোদ্ধাদের মধ্যে IED উৎপাদন কৌশল ছড়িয়ে দিয়েছে। উসামা বিন লাদেনের মিডিয়াও আধুনিক প্রযুক্তিময়, বাস্তবধর্মী এবং সর্বব্যাপী। তারা টার্গেটসমূহে মুজাহিদদের আক্রমণের একেবারে লাইভ ভিডিও, মুজাহিদ নেতাদের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রভাব বিস্তারকারী কন্টেন্ট বানিয়ে ২৪/৭ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

সর্বোপরি, এই নতুন প্রজন্মের সামনে রয়েছে আধুনিক সালাহউদ্দিন – উসামা বিন লাদেনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণের সুযোগ। তিনি তাদের অনুপ্রেরণা, সেটা তিনি রোলমডেল হোন বা না হোন। যদিও আমরা এখনও উসামা বিন লাদেনের মতো এক

---

730 Sayf-al-Din al-Ansari, "But take your precautions", Al-Ansar (Internet), 15 March 2002. আল-আনসারির কথাগুলো উসামা বিন লাদেনের চিন্তাকে আরও শাণিত করেন। কেননা উসামা বিন লাদেন মনে করতেন, মুসলিমদের সমস্যার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাদের ব্যর্থতাই কাফিরদেরকে বিজয়ের সুযোগ এনে দেয়।

731 বিশেষ করে দেখুন – Sageman, Understanding Terror Networks, and Robert Pape, Dying to Win. The Logic of Suicide Terrorism (New York: Random House, 2005).

শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখিই আছি; কিন্তু পশ্চিম অবশ্যই বিন লাদেন পরবর্তী যুগে এমন এক প্রজন্মের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, যারা একইসাথে হবে স্বল্প দৃশ্যমান এবং অধিক ক্ষিপ্র। ২০১০-এর প্রথমদিকে উমার বিন লাদেন মিডিয়ায় বলেন, "আমার আব্বা এবং তাঁর আশেপাশের মানুষদের ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি, তা থেকে আমার বিশ্বাস হলো আব্বাই সকলের মধ্যে সবচেয়ে দয়াশীল। কেননা কেউ কেউ রয়েছেন আরও অনেক বেশি কঠোর।" [732]

732 Lara Setrakian, "Exclusive: Osama bin Laden's son warns his sucessors will be worse", http://abcnews.go.com, 11 February 2001.

পরিশেষ

এই বইয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল উসামা বিন লাদেনকে তথা তাঁর চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং কার্যপদ্ধতিকে – এমনভাবে চিত্রায়ন করা, যা প্রাথমিক উৎসগুলোর সঠিক প্রতিফলন ঘটায়। আমি তাঁকে একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইনি; বরং চেয়েছি একজন যোগ্য শত্রু হিসেবে তাঁর পরিচয় উদঘাটন করতে – এমন একজন শত্রু, যাকে আমরা অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুল বুঝে এসেছি। অবশ্য এটা তো স্পষ্টই হয়ে যাবার কথা যে আমি তাঁর ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়নতা এবং দক্ষতাকে সম্মান করি। আমি বিশ্বাস করি আমেরিকাকে প্রতিরক্ষা করার এই যুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে নির্জলা ভুল অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা মারাত্নকভাবে ক্ষতিকর; বিশেষ করে যখন সেসমস্ত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আমাদের রাজনৈতিক, সামরিক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর ভয়াবহতার ব্যাপারে আমেরিকানদেরকে ভুল বোঝায়। এই বই যেমনটা দেখাতে চেয়েছে – উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা এবং তাদের মিত্ররা মিলে যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, সেই যুদ্ধটা আমরা নিজেদের ভুল কার্যপদ্ধতির কারণে হেরে যেতে বসেছি। সেই সাথে আমরা নিজেদের ভূমিতে আরেকবার হামলা হওয়ার সম্ভাবনাকেও বেশি খাটো করে দেখেছি। আমার মতে, আমরা আসলে বাঁচামরার লড়াই করছি। এখন এই লড়াইয়ে যদি আমরা স্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে বিজয়ী হতে না পারি, তাহলে স্পষ্ট এবং অকাট্যভাবেই আমরা হেরে যাব।

আর পাঠকেরা আমার উপসংহারের সাথে একমত হোক বা না হোক, আশা করি বইটা অন্তত দেখাতে পেরেছে যে আমেরিকানদের জন্য আর যাই হোক – উসামা বিন লাদেন এবং তাঁর বাহিনীকে ভুল বোঝার গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর নেই। আমরা এখন আর এক যুগ আগের মতো অবস্থায় নেই। এখন আমাদের ভুল বোঝাবুঝিকে শুদ্ধ করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসগুলো ইংরেজিতে খুবই সহজলভ্য। এমনকি উসামা বিন লাদেন নিজেও আমাদের শেখার মতো প্রচুর তথ্য দিয়েছেন। অবশ্য আমেরিকানদের সম্পর্কে তিনি আরেকটি যে ব্যাপার উল্লেখ করেছিলেন, তা আমাদের নেতৃবৃন্দ সত্য প্রমাণ করে দিয়েছিল। আর তা হলো, “আমেরিকানরা উপদেশ দানকারী কাউকে পছন্দ করে না।” [733]

---

733 OBL, “Address to the American people”, 14 September 2009

উসামা বিন লাদেন তো আমেরিকাকে তাঁর ব্যাপারে অন্ধকারে থাকার কোনো সুযোগই দেননি। তিনি কে, কী বিশ্বাস করেন কিংবা যুদ্ধ জেতার জন্য কী করতে চান – এই সবকিছু শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল। আব্রাহাম লিংকন জোট সভাপতি জেফারসন ডেভিসকে প্রায়ই "বিদ্রোহীদের নেতা" বলে ডাকতেন। তার সম্পর্কে আব্রাহাম লিংকন একবার এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমি উসামা বিন লাদেনের ক্ষেত্রেও সমানভাবেই সত্য মনে করি।

১৮৬১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসে লিংকন বলেছিলেন, "সমস্ত তথ্য প্রমাণ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হচ্ছে না – বিদ্রোহীদের নেতার সাথে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে আদৌ কোনো ফায়দা হবে। তিনি আমাদেরকে খন্ড বিখন্ড করে দেওয়ার তুলনায় কম কিছুতে খুশি থাকবেন না; আর বিশেষ করে এটাই আমরা হতে দিব না, দিতে পারি না। এই ব্যাপারে তার ঘোষণাসমূহ একেবারেই স্পষ্ট। আর তা বারংবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন না। এমনকি এই ব্যাপারে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়ার মতো কোনো পথও তিনি রাখেননি। তিনি আমাদেরকে (ইউনিয়নকে) স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারবেন না, আর আমরা স্বেচ্ছায় হার মানতে পারি না। তাঁর এবং আমাদের মধ্যকার ইস্যু একেবারেই স্পষ্ট, সরল এবং ছাড়াছাড়ির অযোগ্য। যদি আমরা ছাড় দিই, তাহলে আমরা হেরে গেলাম; আর যদি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ তাকে ছেড়ে যায়, তাহলে তিনি হেরে গেলেন। যেটাই ঘটুক, জয়-পরাজয় কেবল যুদ্ধের পরেই আসবে।" [734]

আমার মতে কথাগুলো উসামা বিন লাদেনের ক্ষেত্রে এভাবে বলাও সমীচীন যে, মুসলিমরা যদি তাঁকে ছেড়ে যায়, তাহলেই তিনি হেরে যাবেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের কাজ করা উচিত। তবে উসামা বিন লাদেন সম্বন্ধে আমরা যেসব ধারণা নিয়ে চলি, সেগুলোর বেশিরভাগই একেবারে নির্জলা ভুল; সেটা আমাদের আরামপ্রিয়তা থেকে হোক, বিরক্তি বা অলসতা থেকে হোক, কিংবা হোক আত্নপক্ষ সমর্থন থেকে। অথচ তাঁর ব্যাপারে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়ার মতো কোনো পথ তিনি রাখেননি।

---

734 Abraham Lincoln, "State of the Union message", 3 December 1861

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটি লিখতে গিয়ে আমি তিনটি ঋণে আবদ্ধ হয়েছি, যা আমার অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। প্রথমত, আমি আমার সাহিত্য প্রতিনিধি স্টুয়ার্ট ক্রিশেভস্কি (Stuart Krichevsky) এবং তার কর্মীদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। একজন লেখক হিসেবে যতটুকু সাহায্য পাবার আশা থাকে, তারা আমাকে তার চেয়েও বহুগুণ বেশি সাহায্য করেছেন। স্টুয়ার্ট আর তার টিম মিলে বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করার সুযোগ খুঁজে বের করা, চুক্তির মধ্যস্থতা, বইটিকে আরও রহস্যময় করা ইত্যাদি সবকিছুই আঞ্জাম দিয়েছে; আর সেই সাথে সমস্ত বিষয় সময়ে সময়ে আমাকে অবগত রেখেছে। তাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমার নিজেকে গর্বিত এবং ভাগ্যবান বলে মনে হয়েছে।

এরপর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে আমার সম্পাদক টিমোথি বেন্টকে। তিনি বইয়ের পান্ডুলিপি নিয়ে খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করেছেন। তার হাতের সম্পাদনা বইটিকে আরও উন্নত করে তুলেছে। বিশেষ করে এই বইটির কাজ তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল; কেননা বইটি উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞানকে শুধু চ্যালেঞ্জ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং বিপরীতে এক বিস্তর আলোচনাও জুড়ে দেয়। ফলস্বরূপ, পুঙ্খানুপুঙ্খ দলিল-প্রমাণ যোগ করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও টিমোথি বইয়ে উল্লেখিত অসংখ্য উক্তি ও বক্তব্যগুলোর অর্থ বিকৃত করা ছাড়াই সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে তিনি বইয়ের শেষে ব্যাখ্যামূলক টিকা ও রেফারেন্স যুক্ত করে দিয়েছেন।

পরিশেষে, আমেরিকার প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের অসাধারণ, অল্প উল্লেখিত এমনকি প্রায়ই নিন্দার শিকার দুইটি দলের উৎসাহ আমাকে আমাদের শত্রুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে বারংবার অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষ করে পুরো বই জুড়েই যেখানে উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিকোণ প্রচলিত ধারণা থেকে অনেক আলাদা হিসেবে উঠে এসেছে, সেখানে এই অনুপ্রেরণা খুবই প্রয়োজন ছিল। উসামা বিন লাদেনকে আমি বহুদিন কেবল আমেরিকার সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবেই দেখেছি; তাঁর বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা শুধুমাত্র আমাদের নীতিবিরোধী হওয়ার কারণেই তাঁকে অভিসম্পাত করেছি, দোষী সাব্যস্ত করেছি; কিন্তু পুরো বিষয়টি তখনও সম্পূর্ণ ভেবে দেখিনি। ১৯৯৬ সালে আমি CIA কর্মকর্তাদের একটি ছোট দলে যোগ দিয়ে ঘরে (আমেরিকায়) ও বাইরে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করি। সেসময় তারাও বিন লাদেনকে ঘৃণা করতেন ঠিক, কিন্তু সাথে তারা এটাও বুঝতেন যে

শুধুমাত্র ঘৃণা আমেরিকাকে রক্ষা করতে যথেষ্ট না। এই কর্মকর্তারা উসামা বিন লাদেনের কার্যক্রমের পেছনের প্রেরণাকে সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করাকে নিজেদের মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন; তারা বিন লাদেনের দক্ষতাকে স্বীকার করে তা মাপতে চেয়েছিলেন; এবং পরিশেষে তা স্পষ্টরূপে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁকে হত্যা করা যায় এবং আল-কায়েদাকে ধ্বংস করা যায়।

তারা বারংবার নিজেদের জীবন ও ক্যারিয়ারকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে এই মিশন সম্পন্ন করেছেন। বলা বাহুল্য, এই কাজ করতে গিয়ে তারা বারংবার ওপর মহলের স্বার্থান্বেষী কাপুরুষ বুদ্ধিজীবী সমাজের আদর্শিক চুলকানির শিকারও হয়েছেন। আর তার ফলে হাজারো আমেরিকানরা ভুগেছে।

এক যুগ পর এসে তৃতীয়বার সরকার পরিবর্তন হলো। এবার বারাক ওবামা প্রশাসনের অধীনে ঐ কর্মকর্তাদের কয়েকজন আবারও উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদাকে খুঁজতে শুরু করেছেন। কিন্তু ওবামা প্রশাসনও মনে করছে যে হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং ধর্মীয় উদ্দীপনায় ভরপুর এই শত্রুকে তারা স্রেফ জঙ্গি, সন্ত্রাসী ট্যাগিং এবং নিজেদের নৈতিকতাকে স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে দেওয়র মাধ্যমেই হারিয়ে দিতে পারবে। এমনটা ভাবার মাধ্যমে ওবামা প্রশাসনও নিজেদেরকে প্রতারণার মধ্যেই রেখেছে। তারা তো ভাবছে যে তারা এক সেকেলে ইসলামপন্থী শত্রুর সাথে লড়ছে। আজকে তারা কেবল উসামা বিন লাদেনের টিকে থাকার বোঝাই বহন করছে না, বরং সেই সাথে যোগ হয়েছে উন্মাদ করে দেওয়ার মতো আরেক ঘটনা। আর তা হলো, ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে CIA-এর প্রাক্তন যে কর্মকর্তা উসামা বিন লাদেনের সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের পরিকল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেই কিনা আজকে (২০১১) ওবামার "চরমপন্থা" বিষয়ক সিনিয়র উপদেষ্টা। এই 'চরমপন্থা'র সঠিক ইসলামি পরিভাষা খুঁজলে অজ্ঞতা এবং ধোঁকার কাছাকাছি কিছুই পাওয়া যায়। তাই আজকের যে সময়টায় ওয়াশিংটন প্রকৃত বিপদকে খাটো করে প্রচার করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়টায় উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা এবং এর মিত্রদের ব্যাপারে ঐসকল কর্মকর্তাদের জ্ঞান এবং এই শত্রুদেরকে সত্যিকারে ধ্বংস করতে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা গোটা আমেরিকার সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার দাবি রাখে।

কিন্তু যতো যাই হোক, ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র নীতি যতদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে যাবে, ততদিন পর্যন্ত CIA-এর এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সাথে স্পেশাল ফোর্সের অপারেশন, ড্রোন হামলা, আইন প্রয়োগকারী কার্যক্রম – এককথায় কোনোকিছুই সত্যিকারের বিজয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না। আর এটা এখন কেবল আমেরিকান নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর গতানুগতিক ইউনিটগুলোর পক্ষেই সম্ভব।

২০০৪ সালের শেষে CIA থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে আমার সৌভাগ্য হয়েছে – তরুণ নৌ ও সেনা এনসিও এবং জুনিয়র কর্মকর্তাদেরকে বোঝানোর এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার; বিশেষ করে আল-কায়েদা এবং এর মিত্ররা বিশ্বকে কোন চোখে দেখে, সেই ব্যাপারে। এই যুবকদের কয়েকজন তখনও কোনো যুদ্ধেই যায়নি, কিন্তু অধিকাংশই ছিল ইরাকে বা আফগানিস্তানে কিংবা উভয় স্থানেই সফর করা অভিজ্ঞ যোদ্ধা। এই যুবক দলটিকে আমি শালীন, বুদ্ধিমান, শক্তসমর্থ এবং হাসিখুশি হিসেবেই পেয়েছি; অবশ্য সাথে কিছুটা ঘৃণা এবং রাগের মিশ্রণও ছিল। ঘৃণা ছিল কারণ তাদের যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তারা শত্রুদেরকে সিনিয়র কমান্ডারদের বর্ণনানুযায়ী স্বাধীনতা ঘৃণাকারী, ধ্বংসবাদী হিসেবে আদৌ পায়নি। বরং তারা আবিষ্কার করেছিল যে এই শত্রুরা কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী এবং বুদ্ধিমান যোদ্ধা, যারা কেবল মুসলিম বিশ্ব থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চায়।

আর সেই যুবকদের মধ্যে রাগ ছিল কেননা তাদেরকে ময়দানে এমনসব নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে নামানো হতো, যা শেষমেশ শত্রুর জন্যই ফায়দা এনে দিতো আর তাদের ঘরে ফেরার সম্ভাবনাকেও শুন্য করে দিতো। সহজকথায় বললে, এমন এক শত্রুর জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা হয়েছিল যার অস্তিত্বই আসলে নেই; আর সত্যিকার অর্থে যে শত্রুর মুখোমুখি তারা হয়েছিল, তাদেরকে হারানোর মতো সমস্ত কার্যক্রমেই বাঁধাধরা নিয়ম বসানো ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তরুণ ছেলেমেয়েরা এমন এক পরিবেশে টিকে থেকেছিল, যেখানে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির কারণে যতো বিদ্রোহী যোদ্ধার আবির্ভাব হয়, সেই তুলনায় হত্যা করা যায় খুব অল্পকেই। তাই সমস্ত আমেরিকানদেরই উচিত এই তরুণদেরকে সমর্থন ও সম্মান করা; আর তাদেরকে এমন সিংহ হিসেবে মনে রাখা, দুর্ভাগ্যক্রমে যাদেরকে পরিচালনা করেছিল একদল ধান্দাবাজ কাপুরুষের দল।

সার্থক পরিসমাপ্তি?

এই বইটি প্রকাশের মাত্র তিন মাস পর ২০১১ সালের ২রা মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে আমেরিকার স্পেশাল কমান্ডোরা এক অপারেশন চালিয়ে উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। শুধুমাত্র এই অপারেশনের পুরো ঘটনা নিয়েই আলাদা বই, ডকুমেন্টারি, সিনেমা অনেককিছুই হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার পয়েন্ট অব ভিউ থেকে যেহেতু অনেকবারই এই কাহিনী রচনা করা হয়েছে, তাই আরেকবার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা এখানে লক্ষ্য নয়। বরং এই বইয়ের লেখকের মূলনীতি ঠিক রেখে ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে এই ব্যাপারে পরবর্তীতে যা জানা গিয়েছিল, তা-ই সংক্ষেপে উল্লেখ করার পাশাপাশি উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর ব্যাপারে লেখকের মূল্যায়ন উল্লেখ করাই এই পরিশিষ্টের লক্ষ্য।

আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে মিডিয়া কার্যক্রম চালানোর তাগিদ দেওয়া হলেও আল-কায়েদার মুজাহিদরা এইসব তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপত্তা ফাঁদের ব্যাপারেও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। আর সংগঠনের নেতা হিসেবে উসামা বিন লাদেনের এইসব ব্যাপারে সতর্কতা ছিল আরও তীব্র। একদিকে তো তিনি প্রযুক্তিবিমুখ জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন, এর ওপর নিরাপত্তার কারণে তিনি ইন্টারনেট, মোবাইল ইত্যাদি যেকোনো ধরনের ট্র্যাকিং ডিভাইসও ব্যবহার করতেন না। এমনকি তাঁর আশেপাশের কারও জন্য সেই অনুমতি ছিল না। এই কারণেই পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান সীমান্তের এক বিশাল সংখ্যক ডিভাইস দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ট্র্যাকিং করা হলেও আমেরিকা বেশ কয়েক বছর উসামা বিন লাদেনের হদিস খুঁজে পায়নি।

কিন্তু নিয়মের পাশাপাশি নিয়মের ব্যতিক্রমও থাকে। উসামা বিন লাদেনের আশেপাশের কারও জন্য ডিভাইস ব্যবহারের অনুমতি না থাকলেও তাঁর বার্তাবাহক আবু আহমাদ কুয়েতির জন্যই কেবল প্রটোকল মেইন্টেইন করে মোবাইল ডিভাইস ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর এই আবু আহমাদ কুয়েতি বার্তা আদান-প্রদানের জন্য সময়ে সময়ে উসামা বিন লাদেনের অ্যাবোটাবাদের বাসাতেও অবস্থান করতেন।

ধারণা করা হয় যে, আমেরিকা আবু আহমাদ কুয়েতির ব্যাপারে প্রথম জানতে পেরেছিল গুয়েন্তানামোর কারাবন্দী আল-কায়েদা সদস্যদেরকে অমানুষিক নির্যাতন করার মাধ্যমে। প্রত্যেক মানুষই তো আর ইসলামের বিলাল রদি.-এর মতো হতে পারেন না, তাই চরম নির্যাতনের মুখে এক পর্যায়ে তথ্য দিয়ে দেওয়া একেবারে অস্বাভাবিক কিছুও না। যাই

হোক, আবু আহমাদ কুয়েতির ব্যাপারে জেনেও আমেরিকা বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁকে ট্র্যাক করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এভাবে কয়েক বছরের প্রচেষ্টার পর এক পর্যায়ে পাকিস্তানের গোয়েন্দাবাহিনীর সাদা পোশাকের তথ্যদাতাদের সাহায্যে আমেরিকা উসামা বিন লাদেনের বার্তাবাহক আবু আহমাদ কুয়েতির খোঁজ পেয়ে যায়। ৯/১১-এর পর আমেরিকার War on Terror বা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান যে আমেরিকার মিত্র হয়ে উঠেছিল, সেটা তো বলাই বাহুল্য।

আবু আহমাদ কুয়েতি যেহেতু বার্তাবাহক ছিলেন, তাই বিভিন্ন জায়গায় সফর করতে হতো। তিনি নিরাপত্তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রটোকল অনুসরণ করতেন। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আল্লাহর তাকদিরকে তো এড়ানো যায় না। পাকিস্তান গোয়েন্দাদের সহায়তা নিয়ে এক পর্যায়ে আমেরিকা তাঁকে চিহ্নিত এবং অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। এভাবেই তারা শেষমেশ পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে উসামা বিন লাদেনের গোপন ঘাঁটিরও খোঁজ পেয়ে যায়। অতঃপর আমেরিকার স্পেশাল কমান্ডোরা ২০১১ সালের ২রা মে দিবাগত রাতে এক শ্বাসরুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। এভাবেই এক সংগ্রামী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু ইসলামপন্থীরা ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই শত্রুর হাতে এমন মৃত্যুকে চরম আকাঙ্ক্ষার ‘শাহাদাত’ বলেই অভিহিত করে থাকে। এমনকি স্বয়ং উসামা বিন লাদেনও এমন শাহাদাতের মৃত্যুকে জীবনের সফলতা বলে মনে করতেন। তাই আল-কায়েদার মুজাহিদদের, এমনকি এর সমর্থকদের হিসেবে উসামা বিন লাদেনের পরিসমাপ্তি ছিল এক বিরাট সার্থকতা। কিন্তু শুধু তাও না, উসামা বিন লাদেনের শুধুমাত্র এমন পরিসমাপ্তির কারণেও মুসলিম বিশ্বে মুজাহিদ সমর্থকদের মধ্যে তিনি একজন কিংবদন্তী রোলমডেল বনে যান। আর এই অবস্থা পরিবর্তনের কোনো সুযোগও নেই।

কিন্তু যুদ্ধের অপর পক্ষ – আমেরিকার জন্য উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুকে কীভাবে দেখা হয়েছিল? সত্য হলো, উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুতে আমেরিকা আর তার মিত্রদের জন্য যে আনন্দ বয়ে এনেছিল, তা বোধ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর আমেরিকার ইতিহাসে আর কখনও আসেনি। গোটা আমেরিকাই আনন্দে আত্নহারা হয়ে এই ঘটনাকে ‘ওসামার পরাজয় এবং ওবামার বিজয়’ হিসেবে আখ্যায়িত করে বসেছিল। কিন্তু মাইকেল শইয়ারের মূল্যায়ন আমেরিকার আনন্দে আবারও পানি ঢেলে দেওয়ার মতোই ছিল। ২০১১ সালের ১৩ই মে অর্থাৎ, উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর মাত্র এগারো দিনের মাথায় সংবাদ সংস্থা CNN থেকে মাইকেল শইয়ারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেখানে তিনি উসামা বিন

লাদেনের মৃত্যুকে 'সার্থক পরিসমাপ্তি' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সেটা কীভাবে? - সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে মাইকেল শইয়ার বলেন, "শুরু থেকেই তো উসামা বিন লাদেনের লক্ষ্য সামরিক ছিল না। বরং তিনি তো সবসময়ই বলে এসেছিলেন যে তিনি খুবই সাধারণ একজন মুসলিম, তার সংগঠনও খুবই ক্ষুদ্র; আর বলেছিলেন যে তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো অন্য মুসলিমদেরকে অস্ত্র হাতে নিতে, অর্থায়ন করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে আমেরিকাকে তাড়াতে অনুপ্রাণিত করা। আর আজকে যদি আপনি মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোর দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন যে আল-কায়েদা ৯/১১-এর সময়ের তুলনায় চেয়ে অনেক বেশি বড় হয়েছে, তাদের ভৌগলিক অবস্থান অনেক বিস্তৃত হয়েছে। তাছাড়া সংগঠনটি গত পাঁচ বছরে নিজেদের কার্যক্রমে অনেক বেশি সক্রিয়ও হয়ে উঠেছে... এমনকি পশ্চিমেও তারা উপস্থিতির জানান দিয়েছে; তাও কিনা সেটা আমেরিকার ইংরেজি বলা মুসলিমদেরকে দিয়ে। তাই ইসলামি ইতিহাসের দিকে তাকালে উসামা বিন লাদেনকে নিদেনপক্ষে (মুসলিমদের) একজন রবিনহুড বলতেই হবে।" [735]

এরপর সাংবাদিক বলেন যে তিনি (সাংবাদিক) আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন কিংবা ইসলামপন্থীদের একজন আইকন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উসামা বিন লাদেনের সার্থকতার ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন না; কিন্তু ৯/১১-এর পর থেকে আমেরিকায় আল-কায়েদার বড় ধরনের আর কোনো হামলা করতে না পারা, আল-কায়েদার মধ্যে উসামা বিন লাদেনের সাথে অন্যান্যদের মতবিরোধের ব্যাপারগুলো কি আমেরিকার সার্থকতা হিসেবে উল্লেখ করা যায় না?

তখন মাইকেল শইয়ার বলেন, "আলাপ আলোচনা আর মতানৈক্য তো প্রত্যেক সংগঠনেই হয়। আল-কায়েদা একটি বহুজাতিক, বহুভাষী মানুষদের সংগঠন। সেখানে অন্য যেকোনো বহুজাতিক (মাল্টি ন্যাশনাল) প্রতিষ্ঠানের মতোই সুবিধা-অসুবিধা থাকবেই। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় – আমরা যদি শুধুমাত্র এভাবে দেখি যে, আমেরিকায় তো আল-কায়েদার আর কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয়নি, যেখানে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী ইরাকে এবং আফগানিস্তানে দুই দুইটা জায়গায় হেরে যাচ্ছে... তাও সেসব জায়গায় আল-কায়েদার কমপক্ষে আদর্শিক সমর্থন, কিংবা সরাসরিই অংশগ্রহণে... এমন একটি পরিস্থিতিতে শুধু আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলা হলো কিনা, সেটা আসলে আমাদের খুবই সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা হয়ে গেল।

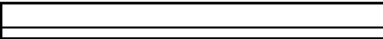
---

735 CNN: Scheuer 'Osama bin Laden died a success', 13 May, 2011.

আমরা যখন পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে আসবো, তখন কিন্তু আমরা (না চাইলেও) এই প্রজন্মের মুসলিমদেরকে সেইভাবেই ব্র্যান্ডিং করে ফেলবো, ঠিক যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন উসামা বিন লাদেনের প্রজন্মের মুসলিমদের ব্র্যান্ডিং করে বসেছিল। আর এটি খুবই গুরুতর একটি ব্যাপার। এটি কোনো চোর-পুলিশ খেলা নয়, জনাব।" [736]

উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পরপর তাঁর এবং আল-কায়েদার ব্যাপারে মাইকেল শইয়ারের মূল্যায়ন ছিল এমনই। এরপর আল-কায়েদার নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি। এখানে একটি ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়। ২০০১ সালে ৯/১১-এর পর পরই যেখানে উসামা বিন লাদেন নিজের সম্ভাব্য মৃত্যুর হিসেব নিকেশ কষে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন, সেখানে আরও প্রায় দশ বছর সময় পেয়েও তিনি 'যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে দিতে পারেননি' কিংবা 'আল-কায়েদার পতন অবশ্যম্ভাবী' ধরনের ভাবনা আসলে শিশুসুলভ ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং আরও দেখা গিয়েছে, পরবর্তী সময়ের চরমপন্থী তাকফিরি গোষ্ঠী ISIS-এর সমস্যাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করেও আল-কায়েদা নিজেদের আফগানিস্তান এবং আফ্রিকাকেন্দ্রিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে অবিচল থেকেছে। পাশাপাশি কাফিরদের ভূমিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নিয়ে ব্যঙ্গ করার প্রতিবাদে শার্লি হেবদোর মতো হামলাও আল-কায়েদা করেছে। এমনকি আল-কায়েদার পক্ষ থেকে একইরকম অপরাধীদের শাস্তি বাংলাদেশ পর্যন্তও পৌঁছে যায়।

অবশ্য উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুতে আমেরিকা এবং তার মিত্ররা ক্ষণিকের আনন্দে ফেটে পড়লেও রিয়াদ ন্যারেটিভে প্রবলভাবে আক্রান্ত সাংবাদিক, লেখকরা কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। তারা যেহেতু ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরিকে আগের থেকেই উসামা বিন লাদেনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছিল, তাই ডাক্তার সাহেবের নেতৃত্বের আল-কায়েদাকে তারা আরও বেশি ভয়ঙ্কর বলে নানারকম বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছিল। আর যদিও ক্রমে ক্রমে এই ন্যারেটিভে আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু মূল ব্যাপার যে যথাযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে এবং যোগ্যদেরকে দায়িত্ব দিতে সংগঠনটির কঠোর সাধনা, তা মাইকেল শইয়ারের মতো খুব অল্পই অনুধাবন করতে পারে। আর যারা অনুধাবন করতে পারে না, তারা উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর ফলে যেভাবে মূল ময়দানে



736 CNN: Scheuer 'Osama bin Laden died a success', 13 May, 2011.

আমেরিকার বিজয়ের স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল, তারা ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি কিংবা তাঁর পরবর্তীদের মৃত্যুর পরও একই দিবাস্বপ্নই দেখতে থাকবে।

তবুও প্রশ্ন করা যায়, মাইকেল শইয়ার ২০১১ সালে উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর পরও আল-কায়েদাকে যেরূপ হুমকিস্বরূপ দেখেছিলেন, তেমনটা কি আজকে দশ বছর পর ২০২১ সালে এসেও প্রযোজ্য হয়? এর উত্তর অনেকভাবেই দেওয়া সম্ভব। তবে মাইকেল শইয়ার যেভাবে আল-কায়েদার ভৌগলিক বিস্তৃতির ফ্যাক্টরটিকে উল্লেখ করেছিলেন, সেই ফ্যাক্টর নিয়ে বিবেচনা করলেও এই তথ্যগুলোই উত্তর পাবার জন্য যথেষ্ট হয় – আজকে আফ্রিকার এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদ বাহিনী শরিয়াহ কায়েম করেছে; আফগানিস্তানে আল-কায়েদার নতুন প্রজন্ম তালেবানদের সাথে আমেরিকাকে বিতাড়িত করে শরিয়াহ কায়েমের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এমনকি দুই দশকের যুদ্ধের পর ২০২০-২০২১ সালে কাতারে তালেবানদের সাথে আমেরিকার সৈন্য অপসারণের চুক্তির সময়ও আমেরিকা একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বের সাথে নিশ্চিত করতে চেয়েছে। আর তা হলো আফগানিস্তানকে যেন আল-কায়েদা কিংবা এর মিত্ররা আবারও ৯/১১-এর মতো কোনো হামলার লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। এভাবেই দোহা চুক্তিতে তালেবানদের কাছে আমেরিকার দেওয়া শর্তের অন্যতম ছিল আল-কায়েদার হুমকি প্রশমন। আফ্রিকা এবং আফগানিস্তানের এই দুটো ঘটনা থেকেও আজকের সময়ে আল-কায়েদার অবস্থান এবং হুমকির ব্যাপারে আঁচ করা যায়। আর এটাও মাইকেল শইয়ারের ব্যবহৃত ভৌগলিক বিস্তৃতির ফ্যাক্টরের হিসেবেই।

লেখক এই বইতে উপসংহার টেনেছিলেন যে, মুসলিমরা যদি উসামা বিন লাদেনকে ছেড়ে যায়, তাহলেই তিনি হেরে যাবেন। কিন্তু এই কথাগুলো বলার এক দশক পরে এসেও যখন আল-কায়েদার হেরে যাওয়া প্রমাণ করা দুঃসাধ্য-দুষ্কর, তখন ব্যাপারটা তো এটাই প্রমাণ করে যে – মুসলিমদের একাংশ এখনও উসামা বিন লাদেনকে ছেড়ে যায়নি; তারা এখনও উসামা বিন লাদেনের আদর্শ ও কর্মপন্থায় অবিচল রয়েছে।

অনুভূতি

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

আমার উদ্দেশ্য উসামা বিন লাদেনের প্রশংসা করা নয়, বরং তাঁকে কবর দিতে সাহায্য করা। কিন্তু তা করার জন্য, আমাদের আগে ‘তিনি কে’ এবং ‘তিনি কী’ সে সম্পর্কে আন্তরিক মনের, স্পষ্ট দৃষ্টির মূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা যদিও এটা সত্য যে উসামা বিন লাদেন কোনো ইউনিফর্ম পরিধান করেন না, কিন্তু আমেরিকার নিরাপত্তা এমনকি টিকে থাকার জন্য ইতিহাসের যেকোনো শত্রু জেনারেলের চেয়েও তিনি বড় হুমকিস্বরূপ...

...আর আজকে উসামা বিন লাদেনকে আমরা নিজেরা যেভাবে কল্পনা করতে পছন্দ করি তা সরিয়ে রেখে তিনি আসলেই যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনটাই বুঝতে যাওয়ার অর্থ হলো কিছু অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হওয়া...

...আসুন তাঁকে আমরা ঠিক সেভাবেই নিই, যেভাবে সত্যিই খুঁজে পাই।

মাইকেল শইয়ার
প্রাক্তন প্রধান
বিন লাদেন ইস্যু ইউনিট
সিআইএ

INKLIGHT